সমালোচনা-সাহিত্য

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি.
অবসর-প্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল, এম. এ.
সম্পাদিত

এ.ম

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ : কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ গ্রন্থবিচার

তৃতীয় খণ্ডঃ তুলনামূলক ও প্রাচীন সাহিত্য-বিচার

গ্রন্থ-পরিচিতি

(১)

বাঙ্গালা সাহিত্যে সমালোচনা-বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয় নাই এইরূপ অনুযোগ সচরাচর শুনা যায়। এই অনুযোগ যে কিয়দংশে সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী মৌলিক সাহিত্যের সহিত তুলনায় আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য বস্তুতঃই অনেকটা অনগ্রসর ও অপরিণত। কিন্তু এই অনুযোগের যাথার্থ্য-স্বীকার সত্যের সমগ্র চিত্র নহে। এ বিষয়ে শুধু যে আমাদের আত্মগ্লানির ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমাদের আত্মপ্রসাদেরও যথেষ্ট অবসর আছে। বাঙ্গালা সাহিত্য যেমন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের জীবনীরসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ ইহার সমালোচনা ও বৈদেশিক বিচার-পদ্ধতির মূলসূত্রগুলিকে আত্মসাৎ করিতে ও ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করিতে যে সাধনা করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়। বাঙ্গালী সাহিত্যিক যেমন একদিকে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ বাঙ্গালী সমালোচকও এই নবজাত সাহিত্যের রসাস্বাদন ও মূল্যনির্ধারণের জন্য যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত বৈদেশিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত নূতন মানদণ্ড উদ্ভাবন করিয়াছে। মাইকেলের বিপ্লবকারী অভিনব সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর রচনার অল্পদিনের মধ্যেই উহার রসগ্রাহী ও মৌলিকতার বিশ্লেষণকারী সমালোচকের আবির্ভাব হইয়াছে। মোটের উপর ১৮৫০ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীব্যাপী রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের সমালোচক-গোষ্ঠী সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার ও রসবিশ্লেষণে যে অভ্রান্ত-প্রায় অনুভব-শক্তি দেখাইয়াছেন, যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে অপরিচিত ও অজ্ঞাতপূর্ব সাহিত্যিক সৌন্দর্যের সহিত নিজ অনভ্যস্ত রুচির মিলন ঘটাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর মানস প্রকর্ষ ও প্রগতিশীলতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই দিক্ দিয়া ইংরাজী সাহিত্যের সহিত তুলনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের কৃতিত্ব অধিক বই অল্প নহে। ইংরাজী সাহিত্যে চসার, স্পেন্সার ও শেক্সপিয়ারের অনুপম সাহিত্য-সৃষ্টির দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদের গুণজ্ঞ সমালোচকের উদ্ভব হয়। কবি-প্রতিভার অপ্রাকৃত বিস্ময়কে প্রাকৃতিক নিয়মের আয়ত্তাধীন, চিরন্তন সাহিত্য-বিধানের

অনুগামী রূপে প্রতিপন্ন করিতে সমালোচনাকে সুচিরকাল প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া কাব্য-সৌন্দর্য-ধারায় অভিষিক্ত সহৃদয়ের রসদৃষ্টিতেই কবিত্বের ইন্দ্রধনু সপ্তবর্ণ-সংশ্লেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। ইহার সহিত তুলনায় বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিক সৃষ্টি ও তাহার নিপুণ রসগ্রাহিতার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত অল্প। অভিনব সাহিত্যের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার রক্তিম ভাস্বর প্রতিচ্ছবিটি সূক্ষ্মদর্শী, পাঠকের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইংরাজ সমালোচকের সহিত তুলনায় তাঁহার ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী সহকর্মী যে অনেক বেশী পরিণত ও রসগ্রাহী মনোবৃত্তি লইয়া সাহিত্যরসাস্বাদনে রত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমান সঙ্কলন-গ্রন্থে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত যে সমস্ত সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে তাহারাই উপরের মন্তব্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাতে বিভিন্ন বাঙ্গালী সাহিত্য-রসিকের মনীষা, সাহিত্যের মর্মোদ্‌ঘাটনের বিচিত্র ও বহুমুখী শক্তি প্রকটিত হইয়াছে। কতকগুলি প্রবন্ধে সাহিত্যের মূলসূত্র আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। কতকগুলির উপজীব্য বিষয় সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা; ও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখক বা গ্রন্থ সম্বন্ধে মূল্য-নির্দ্ধারণ-প্রচেষ্টা। এই সমস্ত প্রবন্ধ বাঙ্গালী মনের রসগ্রাহিতার, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সৃজ্যমান সাহিত্যের আলোচনা-নৈপুণ্যের এবং বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাঙ্গালা যে আজ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সহিত তুলনায় সর্বাধিক অগ্রবর্তী, তাহার মুখ্য কারণ অবশ্য ইহার মৌলিক সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রাচুর্য; কিন্তু ইহা ছাড়াও সাহিত্যালোচনায় সর্বতোমুখী সক্রিয়তা, সাহিত্যরসাস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও এই রসবিশ্লেষণ ও পরিবেশনের ঐকান্তিক আগ্রহ বাঙ্গালী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিতে কম সহায়তা করে নাই। বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জে শুধু যে নানা বিচিত্র, বর্ণে ও গন্ধে মনোহর ফুল ফুটিয়াছে তাহাই নহে; সমালোচনার সদা সক্রিয় বায়ুপ্রবাহ ইহার সৌরভকে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া তাঁহাদের মনে সাহিত্যরস-আস্বাদনের প্রতি উন্মুখতা জাগাইয়াছে।

এই ভাবের আদান-প্রদানে, স্রষ্টা ও সমালোচকের সহযোগিতায় এমন একটি অনুকূল প্রতিবেশ রচিত হইয়াছে যাহাতে সাহিত্যের সামগ্রিক ঐশ্বর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(২)

বিভিন্ন লেখক দ্বারা রচিত এই সমালোচনা প্রবন্ধসমূহের মধ্যে, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-পদ্ধতির নানা পার্থক্য থাকিলেও, কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে। ইঁহারা সকলেই পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-প্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং ইহার মূলসূত্রগুলিকে ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহার করিযাছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের নিকট ইঁহারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই—পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার মূলসূত্র-প্রয়োগের মধ্যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছেন। ইংরেজী ও ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য সম্বন্ধে ইঁহারা তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। ইঁহারা জানেন যে ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতি পূর্ণভাবে প্রাচ্য সাহিত্যে প্রযোজ্য নহে। সমস্ত উন্নত, গরীয়ান্ সাহিত্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু দেশ, কাল ও ঐতিহ্যের ভেদ অনুসারে কোন বিশেষ জাতির সাহিত্যে যে একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য বদ্ধমূল তাহাও তুল্যরূপ সত্য। যেহেতু বাঙ্গালা সাহিত্য হুবহু ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণ নহে, যেহেতু উভয় সাহিত্যের সামাজিক প্রেরণা ও বিবর্তনের ধারা একরূপ নহে, সেহেতু ইংরেজী সাহিত্য হইতে গৃহীত সমালোচনা-পদ্ধতি বাঙ্গালা সাহিত্যের রসাস্বাদন ব্যাপারে চূড়ান্ত সত্য-নির্ধারণের মানদণ্ড হইতে পারে না। এই সমালোচক-গোষ্ঠী যেমন একদিকে ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, সেইরূপ অন্যদিকে তাঁহারা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন। সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্য-বিচারে উভয় রীতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-স্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের সাহিত্যিক জাতীয়তাবোধ এত তীব্র যে যেখানে ইংরেজী ও সংস্কৃত সমালোচনারীতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা সংস্কৃত অলঙ্কারের অনুশাসনকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নিছক কলাসৌন্দর্য-সৃষ্টিই যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও সমাজের কল্যাণসাধন ইহার পক্ষে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক, পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার এই

মূল স্বীকৃতিকে ইঁহারা কখনই সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লন নাই। সাহিত্যতীর্থে যে সত্য-শিব-সুন্দরের ত্রিবেণী-সঙ্গম তাহার উৎকর্ষ-পরাকাষ্ঠার হেতু, তাঁহাদের এই বদ্ধমূল ধারণা বৈদেশিক সাহিত্যের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হয় নাই। সুতরাং সাহিত্যে নীতির প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং সময় সময় ইহাকেই তাঁহাদের সাহিত্য-বিচারের প্রধান মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য এই নীতিবাদ মধ্যে মধ্যে আতিশয্য-দোষগ্রস্ত হইয়াছে ও বিচার-বুদ্ধির স্বচ্ছতাকে মলিন ও রসগ্রাহিতাকে অনুদার সঙ্কীর্ণতার প্রভাবে অভিভূত করিয়াছে। একাধিক সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী আলোচনায় তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি ও, রসোদ্ভাবন-কুশলতা অপেক্ষা তাঁহার সামাজিক আদর্শবাদের দিকেই বেশী জোর দিয়াছেন ও প্রধানতঃ ইহারই উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিমের সাহিত্যিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিন্দা ও প্রশংসাসূচক অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহাদের মানস-প্রবৃত্তি ও সৌন্দর্যরুচি রামায়ণ-মহাভারতের ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের মহনীয় প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা জোলা, ব্যালজাক প্রভৃতির নগ্ন বাস্তবতা-প্রধান রচনায় যে তৃপ্তি লাভ করিবেন না তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় বিশেষ নাই। পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যে খুন' নামক প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনোভাবের এই পার্থক্য কৌতূহলোদ্দীপকভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে ট্রাজেডির চরম মর্মান্তিকতা কেন উদাহৃত হয় নাই, শোকাবহ ঘটনার বিশুদ্ধ করুণ-রস কেন মৃত্যুর বীভৎসতায় আবিল হইয়া উঠে নাই, পাঠকের শান্ত-রসাস্পদ চিত্তপ্রসাদকে অপ্রতিবিধেয় সাংঘাতিক পরিণতির নৃশংসতায় বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত করা কেন শিষ্ট-রীতি-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত তাহার একটি চমৎকার যুক্তি-সমর্থন এই প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায়। ইহার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতা সত্ত্বেও ইহাতে জীবন-দর্শনের যে আদর্শটি প্রতিবিম্বিত হয় তাহার একটি চিরন্তন-মূল্য আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গালার সমালোচনা বৈদেশিক প্রেরণার স্বীকরণের মধ্যে নিজ প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে লব্ধ দৃষ্টিভঙ্গী হারায় নাই, অনুকরণের মধ্যেও নিজ স্বাধীনচিত্ততা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। এ বিষয়ে সমালোচনা মৌলিক সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে। নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন ও প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায়

ইহার সাহিত্য-সমালোচক-সংঘও দেশের সহিত বিদেশের, নূতনের সহিত পুরাতনের একটি সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশ্য সমালোচনা মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির মত পরিণতির পথে এতটা অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু উভয়ের অন্তঃপ্রেরণা অভিন্ন। বাঙ্গালার সমালোচনা-সাহিত্য যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে এই বলিষ্ঠ, নিজ ঐতিহ্যগৌরব সম্বন্ধে সচেতন মনোভাব। ইহা বাহির হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে নিজ স্বাধীন রসবোধ ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিয়া লইতে ছাড়ে নাই।

(৩)

এইবার সংগৃহীত প্রবন্ধগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে আলোচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও রসগ্রাহিতার উৎকর্ষের মান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সর্বপ্রথম যে সমস্ত প্রবন্ধে সমালোচনার মূলসূত্র নিরীক্ষার বিষয় সেইগুলিরই আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রাচীন সংস্কৃত-অলঙ্কার-শাস্ত্রের রসবিচারের যে চমৎকার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়াছেন তাহাই প্রথমে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-বিচারের মধ্যে যে আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত তুলনায় গ্রীক্ সমালোচনাকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়। এমন কি আধুনিক সাহিত্য-বিচারের যে পরিণত অন্তর্মুখিতা তাহারও সহিত ইহা সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে। কাব্য-সৌন্দর্যের স্বরূপ-সন্ধানে ইহা যেরূপ বিশ্লেষণের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোকবর্তিকা হস্তে সৃষ্টিরহস্যের মর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, চরম সত্য আবিষ্কারের প্রেরণায় পূর্বতন সিদ্ধান্তকে এহ বাহ্য বলিয়া অতিক্রম করিয়া দুর্গমতর পথে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে বিরল। অলঙ্কার, রীতি-গুণ, প্রকাশ-ভঙ্গীর অসাধারণত্ব (বক্রোক্তি), সহৃদয় কাব্যামোদীর আনন্দ-বিধান প্রভৃতি স্তর-পরম্পরাকে একে একে পরীক্ষা ও অতিক্রম করিয়া ইহা এই চরম সত্যে আসিয়া স্থির হইয়াছে যে, সার্থক রসসৃষ্টিই কাব্য-সৌন্দর্যের মূলীভূত হেতু ও ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাই কাব্যের আত্মা। লৌকিক বা বস্তুনিষ্ঠ ভাবনিচয়ের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী রসে রূপান্তরীকরণেই কাব্য-সৌন্দর্যের সার-নির্যাস

নিহিত। এই পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারাই প্রাচীন আলঙ্কারিক কাব্যের অনির্বচনীয়তাকে ভাষার ইন্দ্রজালে বন্দী করিতে চাহিয়াছেন, যাহা কেবল মাত্র অনুভবগম্য তাহাকে প্রকাশের ও সচেতন প্রকৃতি-নির্দেশের সীমায় অবরুদ্ধ করিয়াছেন। ভাবের সাধারণীকরণে, ইহার দেশকাল-পাত্রাতিশায়ী সার্বভৌমত্ব-বিধানে রসের উৎপত্তি। যুক্তিপ্রমাণ-নিরপেক্ষ, সর্ববিধ বাধাবিঘ্নাপসারী, বিশুদ্ধ চৈতন্যানুভূতির জগতে ইহার প্রতিষ্ঠা বলিয়া এই রস অলৌকিক বা লোকোত্তর। বিচ্ছিন্ন শব্দসমূহের বাচ্যার্থ অতিক্রম করিয়া ইহা যে অখণ্ড মানস প্রতীতির সৃষ্টি করে তাহাতে কাব্য-প্রতিপাদিত ভাবের উন্মুক্ত, ভগ্নাবরণ-চৈতন্যলোকবিহারী সামগ্রিক রসমূর্তিটি স্বচ্ছ সলিলে বস্তুচ্ছায়ার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ইন্দ্রজাল-প্রভাবে পাঠকের চিত্তে যে একটি ভাবমুগ্ধ পুলকরোমাঞ্চ জাগে, আনন্দানুভূতির যে অনাবিল প্রবাহ তাহার চৈতন্যকে বিশুদ্ধ ভাবরাজ্যের ধ্যানতন্ময়তায় প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার উন্মীলিত তৃতীয় নেত্রের নিকট যে চরম সত্যের মর্মরহস্য ক্ষণিকের জন্য উদ্ঘাটিত হয়, সেই নিগূঢ় মানস প্রতিক্রিয়ার এরূপ সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ প্রতিচ্ছবিটি আর কোন দেশের সমালোচনা-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে নাই।

মুখ্যতঃ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার সাহায্যেই এই রসপ্রতিষ্ঠা সাধিত হয়। ব্যঞ্জনার স্বরূপ-বিশ্লেষণেও আলঙ্কারিকেরা অনুরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও দুরবগাহ বিষয়ের আলোচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ব্যঞ্জনা অর্থপ্রকাশের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যাহা দ্বারা প্রকাশিত অর্থের চারিদিকে একটি সুদূর-প্রসারী সাঙ্কেতিকতার পরিমণ্ডল রচিত হয়। যেমন দিগন্ত-প্রসারিত বিস্তারের মধ্যে কোন একটি বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্য নানা সমধর্মী ও বিভিন্ন দৃশ্যের সমবায়ে নিজ রূপস্বাতন্ত্র্যটি বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত করে, তেমনি ব্যঞ্জনা হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যেই কাব্যের অর্থ নিবিড়ভাব-দ্যোতনার শক্তি আহরণ করে—ইহাই 'সঙ্কীর্ণের মধ্যে বিস্তার, নিকটের মধ্যে দূরত্ববোধ, বিশেষের মধ্যে সার্বভৌমত্বের ধারণাসৃষ্টি করিতে কাব্যার্থের সহায়তা করে। রমণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিন্যস্ত দেহলাবণ্যের সহিত এই ব্যঞ্জনাশক্তির তুলনা ইহার প্রকৃতিকে চমৎকারভাবে প্রকাশিত করিয়াছে। ইহার মধ্যেই আলঙ্কারিক কাব্যের বাহিরের দেউড়ি অতিক্রম করিয়া ইহার অন্দরমহলের চাবিকাঠিটির সন্ধান

পাইয়াছেন ; ইহার অস্থিমাংসমেদ, অবয়ব-বিন্যাস প্রভৃতি বাহ্য উপাদানের অন্তরশায়ী প্রাণশক্তির স্পন্দনরহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র তিনটি আধুনিক দৃষ্টান্তের বিচার করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতবাদের সার্বজনীনতা, সকল দেশের ও কালের সাহিত্যে ইহার প্রযোজ্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রয়াস অনেকাংশে সার্থক হইলেও, ইহা হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ প্রমাদমুক্ত বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বসাহিত্যের উন্নততম দৃষ্টান্ত-সমূহ, পাঠকের চিত্তের উপর প্রভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে, প্রায় সমধর্মী বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ব্যঞ্জনার সার্থক প্রয়োগ, রসসৃষ্টির অখণ্ড ও স্ববিরোধহীন সম্পূর্ণতা প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট রচনার উৎকর্ষের হেতু। সুতরাং শেষ ফল দিয়া বিচার করিলে সংস্কৃত সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ড সর্বত্রই প্রায় সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে কোন্ জাতীয় কাব্য আলোচনার ফলে আলঙ্কারিকেরা এইরূপ সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন? হ্যামলেট নাটকের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র যে একটি সর্বব্যাপী নির্বেদরসের ব্যঞ্জনা অনুভব করিয়াছেন, যাহা অন্তরালবর্তী থাকিয়া নিজ প্রচ্ছন্ন প্রভাবে সমস্ত নাটকটির অন্যান্য ঘটনা-নিঃসৃত রসগুলিকে গভীর ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছে, কোন বৃহৎ ঘটনাবহুল কাব্যের সমস্ত শাখা-প্রশাখা-সঞ্চারী সেইরূপ একটি সর্বাতিশায়ী রসব্যঞ্জনা সম্বন্ধে কি আনন্দ-বর্ধন সচেতন ছিলেন? কুমারসম্ভব হইতে যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ব্যঞ্জনা একটি মাত্র শ্লোকে সীমাবদ্ধ ও প্রকাশভঙ্গী-বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অলঙ্কার-ধ্বনির পর্যায়ভুক্ত মনে হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি যাহাতে মনে হইতে পারে যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটি সমালোচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল? প্রত্যেকটি শব্দনির্বাচন, প্রত্যেকটি রেখার টান, বর্ণানুরঞ্জনের সূক্ষ্মতম অনুমিশ্রণ যে একটি কেন্দ্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতা, কাব্যরসের সামগ্রিক বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন সমালোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায়? শকুন্তলার মৃগানুসরণের বর্ণনাটি সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল চিত্র হিসাবে উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহাতে কি পলায়মান মৃগশিশুর হিমস্পর্শ আতঙ্ক-

শিহরণটুকু সম্পূর্ণভাবে অনুভব-গোচর হইয়াছে? সুন্দর শব্দ-পরম্পরা-গ্রথিত, যথাযথ গুণসম্পন্ন এই চিত্রে কি মৃত্যু-ভয় রূপ ধরিয়া আমাদের কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়াছে? বিশেষতঃ সমস্ত শকুন্তলা নাটকের সহিত এই খণ্ডাংশের ভাবগত সামঞ্জস্যের কোন লক্ষণই আলোচিত হয় নাই।

এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয় তাহা এই যে যদিও প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণকেন্দ্র রূপে নির্দেশ করিয়া কাব্যবিচারের একটি মৌলিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা এই ব্যঞ্জনার চরম শক্তির পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ব্যঞ্জনার ক্রিয়া কাব্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে উদাহৃত, সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত নহে। যাহাকে বলা হয় atmosphere বা সামগ্রিক ভাবাবহ, কাব্যালোচনায় তাঁহাদের দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। কীটসের 'Eve of St Agnes'-এ তরুণ, স্বপ্নবিভোর প্রাণের যে রক্তিম, ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রণয়াবেগ, মদির ভাববিহ্বলতা ও উচ্ছল প্রাণশক্তি কাব্যের সমস্ত আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বা টেনিসনের 'Lotos-Eaters'-এ যে শিথিল, সৌন্দর্যমদিরাপানে ঢুলুঢুলু অবসাদ, চির-অপরাহ্ণের ম্লান সুষমা ছন্দে, ভাষায়, ভাবের এলায়িত ভঙ্গিমায় রূপ গ্রহণ করিয়াছে আনন্দবর্ধনের ধ্বনি সেই নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিত কি না সন্দেহ। মিলটনের 'Paradise Lost' বা মধুসূদনের 'মেঘনাদ'-এর উদাত্ত গৌরব এই বিধির নিয়মে ব্যাখ্যা করিবার ধারণা তাঁহাদের মনে হয়ত উদয়ই হইত না। ইহার প্রধান কারণ মনে হয় সংস্কৃত কাব্যে দৃষ্টান্ত-বৈচিত্র্যের অভাব। সংস্কৃত সাহিত্য প্রধানতঃ মধুর-রস-প্রধান; অন্যান্য রস ইহাতে গৌণ বা বিরল ব্যতিক্রমের পর্যায়ভুক্ত। আর মধুররস-সৃষ্টিতেও ভাবের চমৎকারিতা ও ভাষার মনোহারিতাই প্রধান উপাদান ছিল, ব্যঞ্জনার উচ্চতম শক্তির প্রয়োগ ক্বচিৎ উদাহৃত হইত। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এক কালিদাসের 'মেঘদূত'-এ বিরহব্যাকুল প্রেমিকের ক্ষুব্ধ আকুতি, তাহার বিচ্ছেদ-পীড়িত মনের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস যেন কবিতাবর্ণিত সমস্ত দৃশ্যাবলীর উপর ভাবকেন্দ্রিকতার এক মায়াময় জ্যোতি-রেখা বিকীর্ণ করিয়াছে। উত্তরচরিত ও শকুন্তলায় কতকটা এই ব্যঞ্জনা-শক্তির সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এক বৈষ্ণব পদাবলীর উৎকৃষ্টতম কয়েকটি পদে ব্যঞ্জনার চরম শক্তি স্ফুরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রেরণা আসিয়াছে

ঠিক বিশুদ্ধ কাব্য-সৌন্দর্য হইতে নহে, ভক্তিবিহ্বলতা ও কাব্যানুভূতির সংমিশ্রণের এক বিরল সার্থকতা হইতে। বৈষ্ণব কবিদের মনের ভাব-কেন্দ্র এত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল, যে তাঁহাদের সৌন্দর্য-বিলাস এই কেন্দ্র-প্রদক্ষিণের দ্বারা নিয়মিত হইয়া এক নিবিড় অখণ্ড রসানুভূতিতে সংহত হইত। সেইজন্য সংস্কৃত অলংকারের আপেক্ষিক অসাফল্যের জন্য রসবেত্তারা দায়ী নন, উপযুক্ত দৃষ্টান্তের অভাবেই তাঁহাদের রসগ্রাহিতা পূর্ণমাত্রায় অনুশীলিত হইবার সুযোগ পায় নাই। আলংকারিক সূত্রগুলি বিধিবদ্ধ হইবার পর এমন কোন মৌলিক প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয় নাই, যিনি ঐ পুরাতন সূত্রসমূহের নব প্রয়োগ বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং পুরাতনের পৌনঃপুনিক ও নিঃসন্দিগ্ধ প্রয়োগে অনুভূতির স্বচ্ছতা যে কতকটা মলিন হইয়া পড়িয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সাধারণীকরণ সংস্কৃত অলংকারের একটি চমকপ্রদ মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া। কাব্যের পাত্র-পাত্রীর প্রতি পাঠকের বাস্তবাতিক্রমী সহানুভূতি বা একাত্মতা-বোধের রহস্য আর কোনও দেশের প্রাচীন সমালোচনা ভেদ করিতে পারে নাই। কিন্তু কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কবি-প্রতিভার দ্বারা এই সাধারণীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না তাহার অভ্রান্ত মানদণ্ড ইঁহাদের আয়ত্তাধীন ছিল কি না সন্দেহ। রামায়ণ-মহাভারতকারদ্বয় তাঁহাদের নৈসর্গিক প্রতিভার বলে তুলিকার কয়েকটি চেষ্টাহীন, বড় বড় রেখায় যে প্রতিকৃতি আঁকিয়াছিলেন তাহা ব্যক্তিগত পরিচয় অতিক্রম করিয়া সার্বভৌমত্বে উন্নীত হইয়াছিল। রাম, রাবণ, দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী, সীতা প্রভৃতি প্রধান চরিত্রসমূহ একাধারে ব্যক্তি ও শ্রেণীর প্রতিনিধি। চরিত্রাঙ্কনের এই সহজ গভীরতা পরবর্তী যুগে ঠিক অক্ষুণ্ণ ছিল না। তবে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি প্রভৃতি উত্তরকালের কবিরা চিত্রাঙ্কনে চরিত্রের সাধারণ লক্ষণগুলিকেই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন; তাহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গৌণ রাখিয়াছিলেন। কাজেই কালিদাসের রঘু বা দুষ্মন্ত, ভবভূতির রাম রাজোচিত আদর্শের প্রতিচ্ছবিরূপেই পাঠক-চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিলেন—ইঁহাদের সাধারণীকরণের পশ্চাতে কবি-প্রতিভার সচেতন প্রয়াস অপেক্ষা যুগপ্রভাব বা দেশসংস্কৃতির মাধ্যমে তাঁহাদের সার্বভৌম পরিচয়ই অধিক কার্যকরী ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যে, সুপরিণত, প্রতি শিরাস্নায়ুতন্ত্রীজালে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ

ব্যক্তিত্বরহস্যের স্বচ্ছ দর্পণে যে সার্বভৌম ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ কোন সার্থক প্রতিবিম্বন দেখা যায় না। এখানে সাধারণী-করণের ভিত্তি অপরিণত ব্যক্তিত্বের উপর শ্রেণীদ্যোতক ব্যঞ্জনার আরোপ।

রসসৃষ্টিতে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব প্রভৃতির ক্রিয়া সম্বন্ধে আনন্দ-বর্ধন ও তাঁহাদের টীকাকার অভিনবগুপ্তের মধ্যে মতানৈক্য খুবই কৌতূহলো-দ্দীপক ও তাঁহাদের রস সম্বন্ধে আলোচনার সূক্ষ্মতার অখণ্ডনীয় নিদর্শন। অভিনবগুপ্ত বিভাব প্রভৃতিকেই প্রাধান্য আরোপ করেন: তাহারাই রসসৃষ্টির হেতুভূত। কিন্তু লৌকিক ভাব কিরূপে অলৌকিক রসে পরিণত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি রসের উপাদানগুলিকে যুগপৎ লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয় প্রকার পরস্পর-বিরোধী লক্ষণান্বিত করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন রসকেই কবির প্রধান উদ্দেশ্যরূপে ও বিভাব, অনুভাব প্রভৃতিকে এই কেন্দ্রীয় রসেরই অনুযায়ীরূপে প্রণিধান করিয়াছেন। রসের অলৌকিকত্ব সৃষ্টি করিতে উপাদানগুলিকেও যথাযোগ্যভাবে সন্নিবেশ ও পরিবর্তন করিতে হইবে—অলৌকিকত্ব নিষ্পন্ন রসেরই গুণ, তাহা উপাদানের স্বভাবধর্ম নহে। রস-প্রকৃতির এই অতি সূক্ষ্ম ও যথার্থ বিশ্লেষণ সত্ত্বেও অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দেশে ও কাব্যরচনায় বস্তুধর্মিত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রসবিশ্লেষণে বিভাব ও অনুভাবই সমালোচকের দৃষ্টির বিশেষ লক্ষ্যীভূত হইয়াছে। স্থায়ী ভাব ও রসের সংখ্যা নয়টি বলিয়া নির্দেশ করায় রসের অপরিমেয় বৈচিত্র্য সংখ্যাতত্ত্বের অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে। শ্রেণী-বিভাগের অতি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রসের অনির্দেশ্যতা, ইহার পারদধর্মী রূপান্তর-প্রবণতা বস্তুতান্ত্রিক স্থূলতায় পর্যবসিত হইয়াছে। মহাকাব্যের বহিরঙ্গমূলক উপাদানের প্রতি অতি-মনো-যোগের, ইহার নায়ক-নায়িকা ও বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে অতি সুস্পষ্ট নির্দেশের যবনিকান্তরালে ইহার অন্তরশায়ী আত্মা আত্মগোপন করিয়াছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এই স্থূল, বাহ্য উপাদানের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা উৎকটভাবে উদাহৃত হইয়াছে। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-আকুতি উৎকণ্ঠা, জাগৃতি প্রভৃতি দশবিধ বিকারে নিজ অসীম সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিয়াছে; হৃদয়গত আকর্ষণের অসংখ্য সূত্র মুরলীদৌত্য সখীদৌত্য ও স্বয়ংদৌত্য এই তিনটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও আবেদনগূঢ়তা হারাইয়াছে। মহাসমুদ্রের প্লাবন, হৃদয়-যমুনার অগণিত ঢেউ, কৃত্রিম অববাহিকার পথে

পরিচালিত হইয়া মন্দীভূত স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। বাহিরের উপকরণে বদ্ধদৃষ্টি সমালোচনা ক্রমশঃ অন্তর-গভীরতার অনুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রসের অলৌকিকত্বের স্বাদবৈচিত্র্য রসনায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে—রন্ধন-সামগ্রী-সমাবেশ রন্ধন-নৈপুণ্যের মর্যাদা খর্ব করিয়াছে। কাব্যের এই অলৌকিকত্বের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ ক্রমশঃ গৌণ হইয়াছে।

বাস্তবিক এই লোকোত্তর চমৎকারিতার মূল হইতেছে রসসংমিশ্রণের এমন একটি কৌশল, যাহার ফলে তিক্ত-কটু-কষায় রসের মধ্যেও মাধুর্যের আস্বাদ অনুভূত হয়। ইহা যেন কীট্‌সের 'intensity of perception in which all disagreeables evaporate'—অনুভূতির সেই তীব্রতা ও বিশুদ্ধি যাহাতে সমস্ত অপ্রীতিকর উপাদান মাধুর্যপ্রধান আস্বাদের মধ্যে বিলীন হয়। কাব্যের বাস্তব-বিস্মৃতিকারী ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ইহাই। যিনি আমাদিগকে তাঁহার অপ্রাকৃত উপাদানের দ্বারা বাস্তব জগৎ হইতে উধাও করিয়া লইয়া যান, তিনি ঠিক কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন না। যিনি পরিচিত ভাব ও অনুভূতিসমূহকে অপরিচয়ের রহস্য ও বিস্ময় মণ্ডিত করিয়া দেখাইতে পারেন, যিনি দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতার স্বাদে অমৃতরসের স্পর্শ পরিবেশণ করিতে পারেন, যিনি সীমাবদ্ধ জগতে অসীমের গবাক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর রং বদলাইতে পারেন, প্রাকৃতের মধ্যে অপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনা প্রবর্তন করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি, তিনিই বিধাতার সহকর্মী, তিনিই সৃষ্টিরহস্যের মূলোদ্ভেদকারী, সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্যঞ্জনার অনেক চমৎকার প্রয়োগ আছে; কিন্তু শব্দের ইন্দ্রজাল-প্রবর্তিত ব্যঞ্জনার সুদূরোৎক্ষিপ্ত বিচ্ছুরণের খুব বেশী দৃষ্টান্ত নাই। কালিদাস সমুদ্রের বাহ্য রূপটি, ইহার 'ধারা-নিবদ্ধ কলঙ্করেখাটি' অপরূপ সুষমা-বন্ধনার মধ্যে শিল্পরেখাংকিত করিয়াছেন; তিনি কীট্‌সের মত ইহার মধ্যে অসীমের সুদূর মায়ামণ্ডিত, অজ্ঞাত প্রত্যাশা-আশঙ্কায় উদ্বেল, তরঙ্গায়িত বিস্ময়-স্পর্শটি অনুভব করেন নাই। কাব্যে দৃষ্টান্তের অভাবে সমালোচনাও উহার পূর্বতন সীমা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয় নাই। আবিষ্ক্রিয়ার অভিযান অনেক নূতন দেশ জয় করিয়া, অনেক অনাবিষ্কৃত রহস্য আমাদের গোচরীভূত করিয়া ইহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্বে অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছে। ভারত-আবিষ্কারব্রতী কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

(৪)

কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নাটক' (বান্ধব, ১২৮৩), চন্দ্রনাথ বসুর 'নভেল বা কথা-গ্রন্থের উদ্দেশ্য' (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭), ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'সমালোচনা সাহিত্য' (পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯১) ; দেবেন্দ্রবিজয় বসুর 'নভেলের শিল্প বা কবিত্ব' (নব্য ভারত, ১২৯২) ও শ্রীকালিদাস রায়ের 'প্রজ্ঞাদৃষ্টি বোধদৃষ্টি ও রসদৃষ্টি'—এই প্রবন্ধনিচয় সমালোচনার প্রকৃতি ও মূলতত্ত্ব ও বিশেষ বিশেষ সাহিত্য-প্রকরণে উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা। এগুলি মোটামুটি বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রবর্তিত পথের অনুসরণ ও তাঁহার আবিষ্কৃত আলোচনা-রীতির বিস্তার। ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'উত্তরচরিত'-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম কেবল নাটকীয় উৎকর্ষ বিশ্লেষণ ছাড়াও কতকগুলি সাধারণ মূলনীতি উত্থাপন করিয়াছিলেন, এবং উপরি-উক্ত সমালোচক গোষ্ঠী যে অনেকটা তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। তবে তাঁহারা নির্বিচারে গুরুর উপদেশ মানিয়া লন নাই। পরবর্তী কালে প্রকাশিত বা লব্ধ পরিচয় অনেক পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থপাঠে তাঁহারা নিজ নিজ অনুভব-শক্তি মার্জিত করিয়া কেহ কেহ বঙ্কিমের উপন্যাসের উপরই আপনাদের নব-লব্ধ শক্তির পরীক্ষা করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও দেবেন্দ্রবিজয় বসু উভয়েই কাব্য ও নাটকে সৃষ্ট চরিত্রাবলীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বৈচিত্র্য, চিন্তা ও কর্মনিয়ামক শক্তিসমূহের অপরিমেয় জটিলতার নির্দেশ ও বিশ্লেষণই গ্রন্থকারের প্রধান কর্তব্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন নাটকের নায়কের চরিত্রে স্বকীয় ও পরকীয় অর্থাৎ বহিঃসংসার হইতে আততায়ীরূপে লব্ধপ্রবেশ আবেগের দ্বন্দ্ব যে ইহার মুখ্য প্রেরণা তাহা বলিয়াছেন ; দেবেন্দ্রবিজয় চরিত্র-সংগঠনী শক্তির অগণিত সংখ্যার উপর জোর দিয়া মানবচরিত্রে জটিলতা ও উহার বিশ্লেষণের দুরূহতার উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ের মতবাদের মধ্যে আর একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়—উভয়েই সাহিত্য-বিচারে সঙ্কীর্ণ নীতিবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত। কালীপ্রসন্ন বিষাদ-পরিণাম নাটকের (tragedy) মর্মান্তিক শোকাবহ পরিণতির অকুণ্ঠিত সমর্থন করিয়াছেন এবং যাঁহারা দুঃখ-প্রধান নাটকেও আনন্দময় মিলনের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের বালসুলভ ভাবপ্রবণতাকে তীব্র শ্লেষে বিদ্ধ

করিয়াছেন। এই ব্যাপারে পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যে খুন' এর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মত-বৈপরীত্য। সংসারে সুবিচার থাক আর না থাক কাব্যে সুবিচার বিধেয় এইরূপ অসঙ্গত প্রত্যাশা যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা গভীর অনুভূতি হৃদয়ে ধারণ করিবার অক্ষমতাই প্রদর্শন করেন। ভবভূতির নাটকে রাম-সীতার পুনর্মিলন-সংঘটনকে তিনি আর্য-চরিত্রের অধঃপতনের নিদর্শন মনে করেন এবং এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার মতের আংশিক মিল আছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য নাটক-পরিণামের অভিনবত্বকে ভবভূতির স্বাধীন-চিত্ততা, বাল্মীকির প্রভাব হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিবার প্রশংসনীয় প্রয়াসরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রামের অত্যধিক বিরহ-ব্যাকুলতা যে আর্য-চরিত্রে রমণীসুলভ রোদন-প্রবণতার আধিক্যেরই ফল তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। দেবেন্দ্রবিজয় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিককে বিষয়-নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতার অধিকার দিয়াছেন ও তৎকালিক আখ্যান-সাহিত্যে ব্যঙ্গ ও নীতিবাদের অনুচিত প্রসারের অবাঞ্ছনীয়তা দেখাইয়াছেন। ক্লিওপ্যাট্রার অন্তিম দৃশ্যের চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া যাঁহারা ইহার মধ্যে অশ্লীলতার আভাস দেখেন, তাঁহাদের রুচির নিন্দা করিয়াছেন—চিত্রের মধ্যে যে মহান্ ভাব-গাম্ভীর্য, ভোগ-বিলাসের যে অনিবার্য পরিণাম আভাসিত হইয়াছে, শ্লীলতা অশ্লীলতার সমস্ত প্রশ্নের ঊর্ধ্বে তাহার রস-আবেদন প্রতিষ্ঠিত, এবং এই আবেদন-স্বীকারেই যথার্থ রুচির পরিচয়। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে যদিও মৌলিক চিন্তার সেরূপ পরিচয় নাই, তথাপি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবের সারাংশ গ্রহণ ও অভিনব ক্ষেত্রে উহার সার্থক প্রয়োগ দুরূহ-তত্ত্ব-প্রতিপাদন-কৌশল ও প্রকাশভঙ্গীর সুষ্ঠুতা ও সরসতার দিক দিয়া ইহারা উচ্চ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত', ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'সমালোচনা সাহিত্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে সমালোচনার আদর্শ ও রীতি সম্বন্ধে উপভোগ্য ও প্রগতিশীল আলোচনা মিলে। 'উত্তরচরিত'-এ বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার যে মূল নীতি নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালী মনীষা পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাকে কত সহজে গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সাহিত্যে উহার প্রয়োগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কাব্যের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের রসাস্বাদনে প্রকৃত সমালোচনা হয় না, উহার সমগ্রতার বিচার করিতে হইবে, জীবদেহের মত

কাব্যদেহেও যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়া একটি অখণ্ড ঐক্য প্রতিবিম্বিত হয় প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক অপরিজ্ঞাত এই সত্য বঙ্কিম প্রথম অনুভব ও প্রচার করেন। তাঁহারই অনুসরণ করিয়া ও জার্মান সমালোচকদের দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেবেন্দ্রবিজয় বসু কাব্যে ও উপন্যাসে একটি আদর্শ কল্পনা, সার্বভৌম সত্তার সার্থক প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রকৃত সমালোচককে কাব্যের বহিঃসৌন্দর্য ভেদ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, কাব্যের মধ্যে কবির মনের, জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর আভাসটি ধরিতে হইবে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে নিগূঢ় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াটি বুঝিতে হইবে। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসকে মাত্র শিল্পরীতির দিক দিয়া সার্থক বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই সাধারণ নীতিগুলি বঙ্কিমের উপন্যাসের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে প্রবন্ধটির উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পাইত।

'উত্তরচরিত'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম শ্রেষ্ঠ কাব্যের আরও কতকগুলি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ও নীতিবাদ স্থূলভাবে প্রচার না করিয়াও কাব্য কিরূপে লোকচিত্তের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহা অতিশয় প্রাঞ্জলভাবে দেখাইয়াছেন। শেলীর "Defence of Poetry"র যুক্তিধারা বঙ্কিমের প্রবন্ধে মোটামুটি অনুসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু আলোচনা-পদ্ধতিটি বঙ্কিমের নিজস্ব শ্রেষ্ঠ কাব্যের গুণের মধ্যে স্বভাবানুযায়ী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত কল্পনা দ্বারা সৌন্দর্য-সৃষ্টিই প্রধান। তাহার উপর চরিত্র-সৃষ্টিতে মৌলিকতা, বিভিন্ন রস-সঞ্চারে নিপুণতা ও বাহ্য-প্রকৃতি-বর্ণনা-কৌশল উত্তরচরিত-এর অতিরিক্ত গুণ। রসের কথা বলিতে গিয়া বঙ্কিম প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যার গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই। সংসারের ক্রমবর্ধমান জটিলতার মধ্যে নানা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট মানস প্রতিক্রিয়া-সমূহ সুপ্রাচীন কালে স্থিরীকৃত কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বঙ্কিমের আধুনিক চেতনা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিল।

সমালোচনা-রীতির আধুনিক প্রকৃতিটি ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে চমৎকার সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভাষা-সৌষ্ঠবের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন

যুগের টীকাকার ও আধুনিক যুগের সমালোচক বিভিন্ন রীতি ও আদর্শের অনুশীলন করেন। নব পদ্ধতির সমালোচক বিচারকের অভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয় ও শ্রেষ্ঠতাবোধ লইয়া সাহিত্যের বিচার করেন না—প্রাক্-নির্ধারিত মানদণ্ডের নির্বিচার প্রয়োগ তাঁহার কার্য নহে। তিনি প্রধানতঃ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লইয়া লেখকের কাব্যের মর্মগ্রহণের চেষ্টা করেন ও তাঁহার রসসত্তার সহিত একাত্মতা লাভের প্রয়াসী হন। দোষগুণ আবিষ্কার অপেক্ষা স্রষ্টার মৌলিক প্রেরণা-উদ্ঘাটনই তাঁহার অধিকতর কাম্য। হয় তিনি আলোচ্য রচনা-প্রভাবে তাঁহার মানস প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্ত করেন—যাহাকে বলা হয় impressionist criticism। কিংবা সমালোচ্য বিষয়ের সৌন্দর্য-সার নিষ্কাশন করিয়া তাঁহার সহিত নিজ মনের মাধুরী মিশাইয়া উহার সহিত অনুরূপ এক নূতন সৌন্দর্য সংশ্লেষণ-বৃত্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেন (aesthetic criticism)। অবশ্য এই নূতন সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে সমালোচক সাহিত্য-রচয়িতার সমকক্ষতা-স্পর্ধী হইয়া লেখনী ধারণ করিবেন না—শ্রদ্ধাপ্রবণ শিষ্যমনোবৃত্তিই তাঁহার প্রধান নিয়ামক হইবে। মূল কবিতার উচ্ছ্বাসময় ভাষা সব সময় সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নহে, যদিও কবির অনুভূতিকে সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিতে গেলে কাব্যগুণসমৃদ্ধ ভাষার প্রয়োগ সময়ে সময়ে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। নব প্রণালীর সমালোচনায় ব্যভিচার প্রমাদের আশঙ্কা প্রবলতর, কিন্তু এই ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনার ভিতর দিয়াই সমালোচনার দুঃসাহসিক অনুসন্ধিৎসা বিজয়-গৌরব-মণ্ডিত হইবে। ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যে Romantic ও Classical criticism-এর পদ্ধতি-পার্থক্যটির মূলতত্ত্ব এই প্রবন্ধে চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর বিহারীলালের সমালোচনায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় নিজ ব্যাখ্যাত পদ্ধতিটির আশ্চর্য নিপুণ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই নূতন সমালোচনা-রীতির মধ্যবর্তিতায় বিহারীলালের মত প্রাচীন রীতি-উল্লংঘনকারী, ভাববিভোর কবির মর্ম-রহস্যের গোপন সুরভিটি নিজে অনুভব করিয়া পাঠককে অনুভব করাইয়াছেন।

নাটক ও উপন্যাসের প্রস্তুতি-বৈশিষ্ট্য লইয়াও কিছুটা আলোচনা হইয়াছে, যদিও এই আলোচনা নিতান্ত ভাসা-ভাসা রকমের। চন্দ্রনাথ বসু উপন্যাসকে কথাগ্রন্থ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য যে কেবল সমাজ কল্যাণ-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য-সৃষ্টি বা সত্যচিত্রণ ইহা তিনি জোরের সহিত অস্বীকার করিয়াছেন। "সামাজিক লাভালাভের বিচার কথা-গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক নয়"—

ইহাই তাঁহার অভিমত। এই অভিমতের সমর্থনে তিনি সারবান্ যুক্তিও প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সত্যচিত্রণের অজুহাতে সমাজ-বিরোধী কার্য-কলাপ-বিবৃতির বিরুদ্ধে তিনি বলিয়াছেন যে উপন্যাসে অসামাজিক আচরণের যে ফলাফল দেখাইয়া উহাকে সমর্থন করা হয় তাহা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। সামাজিক অপরাধের মনোরঞ্জক চিত্র সত্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না। উপন্যাসের যবনিকাপাত জীবনের পরিসমাপ্তি নহে, কাজেই জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি উপন্যাস-নির্দিষ্ট গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া জীবনের উন্মুক্ত, বাধাবন্ধহীন প্রাঙ্গণতল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইহারই সমর্থনে আর একজন লেখক বলিয়াছেন যে সমাজের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদমূলক প্রচার অপেক্ষা কাব্যসাহিত্যের প্রচ্ছন্ন, ভাবানুরঞ্জিত অভিযান অধিকতর পক্ষপাতদুষ্ট ও ক্ষতিকর। কেননা যুক্তির বিরুদ্ধে খণ্ডনকারী যুক্তি প্রয়োগ করা চলে। তাছাড়া, যুক্তি কেবল মস্তিষ্ককে স্পর্শ করে ও চিত্তের উপর ইহার প্রভাব কম। কিন্তু কাব্য-উপন্যাসে সমাজ-দ্রোহিতার মনোরম চিত্র গীতা-বর্ণিত আত্মার ন্যায় অন্য কোনও অস্ত্রে অভেদ্য ও ইহার মাদকতা সমস্ত অনুভূতিকে পরিব্যাপ্ত করে। সুতরাং যদি কোন প্রতিভাবান স্রষ্টা সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেন৷ তাঁহার প্রভাবের অন্যথাচরণ করিতে হইলে অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন, অথচ বিরুদ্ধ মতবাদী শিল্পীর প্রয়োজন। অবশ্য এই আলোচনা সম্বন্ধে যে প্রধান যুক্তি— চিত্রাঙ্কনের পশ্চাতে কতখানি সত্যানুভূতির প্রেরণা আছে ও জীবনের প্রায়শঃ উপেক্ষিত একটা যথার্থ দিক হইতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে কি না—তাহা এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় নাই। শেষ পর্যন্ত সত্যের পরিমাণ ও উপলব্ধির গভীরতার উপরই সাহিত্যাঙ্কিত চিত্রের সার্থকতা ও রস-আবেদন নির্ভর করে। ধর্ম বা দর্শনের মত সাহিত্য একেবারে পারমার্থিক সত্য-প্রতিপাদনের প্রয়াসী নহে।

ইংরেজী উপন্যাসের হুবহু অনুসরণ যে বাঙ্গালা উপন্যাসের পক্ষে প্রকৃষ্ট পন্থা নহে, সে সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু উভয় দেশের সমাজ-রীতি ও আদর্শের প্রভেদ বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকের পথনির্দেশ করিয়াছেন। ইংরেজী সমাজে অর্থোপার্জন-স্পৃহা ও নির্মম প্রতিযোগিতার ফলে জাতীয় চরিত্র পরুষভাব-প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারই প্রতিষেধক রূপে উপন্যাসে কোমল ভাবপ্রবণতার সহানুভূতিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। আর সমাজ-প্রচলিত স্বাধীন প্রেমের রীতি অত্যন্ত সহজ ভাবে সমাজ হইতে সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়াছে। সুতরাং

পাশ্চাত্ত্য দেশেও সাহিত্যের গতি সমাজ-প্রয়োজনের দ্বারা নিয়মিত। বাঙ্গালা দেশে এই উভয় অবস্থারই বৈপরীত্য। সেইজন্য এখানকার সাহিত্যকে সমাজ-প্রয়োজন-নির্দিষ্ট নিজস্ব পথে চলিতে হইবে। বিলাতী আদর্শে সমাজ-অনুশাসনলংঘী স্বাধীন প্রেমের জয়গান আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের ঠিক অনুসরণীয় নহে। এই যুক্তিধারা কতকাংশে সত্য ও লেখকের স্বাধীন-চিন্তার নিদর্শন হইলেও সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নহে। কেননা সমাজ-বিধির অন্তরালে মানুষের হৃদয়াবেগের যে দুর্নিবার শক্তি, মানবসত্তার যে নিগূঢ় সত্য পরিচয় প্রচ্ছন্ন থাকে, সেই অসাধারণ ব্যতিক্রমগুলিও ঔপন্যাসিকের উপজীব্য বিষয়। এখানে স্বাধীন প্রেম লইয়া যিনি লিখিবেন, তাঁহার উপর অবশ্য একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্শায়। সমাজের আবহমান রীতি ও চিরপ্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যদি কোন হৃদয়বৃত্তি বিদ্রোহী হয়, তবে সেই বিদ্রোহের উপযুক্ত শক্তি কেমন করিয়া অর্জিত হইল দেখাইবার ভার লেখককে গ্রহণ করিতে হইবে। বিলাতী সমাজে যাহা স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত, যাহা সমাজশক্তির স্রোতোবাহিত হইয়া চিত্ততটে সংলগ্ন ও অঙ্কুরিত হয়, সামাজিক সমর্থনে যাহা পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, আমাদের সমাজে তাহা সমস্ত ঐতিহ্য ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের বিরুদ্ধে এক গোপন প্রাণশক্তির উৎস হইতে সঞ্জীবনী রস আহরণ করে। সুতরাং উভয় দেশের সাহিত্যে এই প্রেমের উদ্ভব-প্রণালী ও পরিণতি-স্তর বিভিন্ন হইতে বাধ্য। এখানে বিদ্রোহ করিবার ধূমায়িত উত্তেজনাকে অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত করিতে অনেক বেশী শক্তি ও দৃঢ়চিত্ততার প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যটি সাহিত্যে প্রতিফলিত না হইলে আমরা বর্ণিতব্য আবেগের বৈধতা ও অনিবার্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইব না। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের বহুপূর্বে লিখিত এই প্রবন্ধে প্রবন্ধকার এরূপ সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন সচেতনতা দেখান নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের নাটকের উপর প্রবন্ধে সদ্যোপ্রকাশিত কয়েকখানি নাটক-আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি নাটকের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির কোমল ভাব-প্রবণতা ও সুলভ প্রণয়াবেগের প্রতি অতিপক্ষপাত বাঙ্গালা নাটকের রস-গাঢ়তার পক্ষে অন্তরায় ইহাই তাঁহার অভিমত। তিনি বিশেষভাবে নাটক-প্রযুক্ত ভাষার এলায়িত শিথিলতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কিন্তু তিনি যে সাধারণ উক্তিটি করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক। তিনি গভীর-রসাত্মক নাটকে অমিত্রাক্ষর

ছন্দকে একমাত্র ব্যবহারোপযোগী বলিয়া মনে করেন, কেননা একমাত্র এই ছন্দেই ভাষার ওজোগুণ প্রকাশ হইতে পারে। এই মতবাদ যে ভ্রান্ত, সাধারণ ছন্দোহীন গদ্যেও যে হৃদয়ের প্রবলতম আবেগকে উপযুক্ত ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব ইহা এখন সর্বজনস্বীকৃত। কালীপ্রসন্ন ঘোষের মত একজন সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্য-রসিক সমালোচক যে এরূপ একদেশদর্শী অভিমত পোষণ করিতেন, তাহার কারণ বোধ হয় সমসাময়িক নাটকের দৃষ্টান্ত-প্রভাব। হয়ত তাহার ধারণা ছিল যে অনিয়ন্ত্রিত, স্বেচ্ছাচারী বাঙ্গালা গদ্য উচ্চতম ও গভীরতম মনোভাব-প্রকাশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না, হয়ত অমিত্রাক্ষরের কৃত্রিম বিন্যাসই উহার দুর্বল অস্থিমজ্জার মধ্যে যথেষ্ট গতিবেগ ও আবেগস্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পারে। ইংরেজী নাটকে গদ্যের প্রকাশ-ক্ষমতা তাঁহার নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং এ মন্তব্য যে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ প্রবণতাকে লক্ষ্য করিয়াই লেখা তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি—বঙ্কিম-চন্দ্রের আবির্ভাবের পর গদ্য ভাষার শক্তিহীনতায় সন্দেহপ্রকাশ, নাটকের প্রয়োজন-সাধনে ইহার অযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় কতকটা সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির অভাব সূচিত করে।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের প্রবন্ধে কবিকৃতির একটি নূতন দিকের উপর আলোকপাত হইয়াছে। কাব্যে বহিঃপ্রকৃতি বা ভাববর্ণনায় তথ্য-সমাবেশের পিছনে কবির একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল। কবিশেখর এই দৃষ্টিভঙ্গীর তিনটি পৃথক স্তর—যথা প্রজ্ঞাদৃষ্টি, বোধদৃষ্টি ও রসদৃষ্টি—সূক্ষ্মানুভূতির সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে metaphysical vision, বোধদৃষ্টিকে reflective vision ও রসদৃষ্টিকে poetic or aesthetic vision এইরূপ মোটামুটি অনুবাদ করা যায়। প্রজ্ঞাদৃষ্টি সমস্ত জগৎ-বিধানের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য বা ভাবগত ঐক্য আবিষ্কারে উন্মুখ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের Tintern Abbeyতে বহিঃপ্রকৃতি কবির এই ধ্যানদৃষ্টি উন্মেষিত করিয়াছে, যে দৃষ্টির বলে বিশ্বরহস্যের মর্মবাণীটি কবির অনুভূতির নিকট দিবালোকবৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। শেলীর Adonaisএর সমাপ্তিসূচক স্তবকগুলিতেও জীবনের চরম তাৎপর্য অগ্নিগর্ভ জ্বলন্ত অক্ষরে কবির নেত্রসম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই কয়েকটি অসাধারণ ব্যতিক্রমাত্মক দৃষ্টান্তে প্রজ্ঞা ও রসদৃষ্টি উপলব্ধির অখণ্ডতা ও প্রকাশের দ্যুতিভাস্বরতার জন্য অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে—দার্শনিক সত্যাবিষ্কার

রসানন্দের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে অনুভূতির বিদ্যুৎ-ছটা বিভিন্ন উপাদানকে গলাইয়া এক করে নাই, সেখানে অধ্যাত্ম-দৃষ্টির সহিত রসাভিষেকের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Immortality Ode বা Shelleyর Prometheus Unbound-এর কোন কোন অংশে কবির ধ্যান-কল্পনা সম্পূর্ণরূপে রসসৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয় নাই, তত্ত্বের মগ্ন শৈল রসসায়রে নিমজ্জিত হইয়াও ইহার স্বচ্ছতাকে মলিন ও ছায়া-আবিল করিয়াছে। রসসৃষ্টি যেখানে একটি মৌলিক জীবন-সত্যকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হয়, যেখানে অধ্যাত্ম রহস্যের অনুভূতি শিল্পসৌন্দর্যের বর্ণ-সুষমায় লাবণ্যময় লইয়া উঠে, সেইখানেই কাব্যকলার উন্নততম বিকাশ উদাহৃত হয়।

বোধদৃষ্টি প্রজ্ঞাদৃষ্টি অপেক্ষা নিম্নতর পর্যায়ের—ইহা সাধারণতঃ কোন একটি কাব্যানুভূতির ভাব-প্রতিবেশ রচনা করে। ইহা রসদৃষ্টির সহায়ক কি ব্যাঘাতক তাহা নির্ভর করে কবির সন্নিবেশ-কৌশল ও সংশ্লেষ-নৈপুণ্যের উপর। আমার মনে হয় কোন কবিই তাহার বোধদৃষ্টিকে এতদূর প্রসারিত করিতে চাহেন না, যাহাতে ইহা রসের অখণ্ড অনুভূতির অন্তরায় হইবে। অর্বাচীন কবিই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিতে অক্ষম। সময় সময় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিও অর্ধ-পরিণত প্রেরণার তাগিদে ছন্দোবদ্ধ মননশীলতাকে কবিতার ছদ্মবেশে সজ্জিত করিয়া আসরে হাজির করিতে প্রলুব্ধ হন। কিন্তু তথাপি বোধদৃষ্টির সহিত রসদৃষ্টির যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ আছে তাহা ঠিক নয়। বোধ সময় সময় রসের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রচার করে; রসও সব সময় বোধকে দ্রবীভূত করিয়া নিজ সত্তায় বিলীন করিতে পারে না। কিন্তু এই অসাফল্য কবিত্বশক্তির আপেক্ষিক দুর্বলতা-প্রসূত। ইহা হইতে চিরন্তন বিরোধের ধারণা সমর্থিত হয় না। অবশ্য বস্তু-সৌন্দর্য বা হৃদয়াবেগের সহিত কবিত্বের একটি সহজ হৃদ্যতা বা আত্মীয়তা আছে —ইহাদের এমন কোন বিপরীতমুখী আকর্ষণ নাই যাহাতে কাব্য কেন্দ্রচ্যুত হইতে পারে। কিন্তু বোধ বা মননশীলতা এক স্বতন্ত্র কক্ষপথে আবর্তিত হইতে অভ্যস্ত। ইহা সহসা রসপরিধির মধ্যে ধরা দিতে নারাজ। কাব্যের সহিত মননশীলতার সংমিশ্রণ একটি মিশ্র বা যৌগিক প্রক্রিয়া; এই ব্যাপারে দুই বিভিন্ন-গতি ভাবচক্রের সমকেন্দ্রিকতা ঘটাইতে কবির পক্ষে সতর্ক রশ্মি-নিয়ন্ত্রণ-শক্তির প্রয়োজন। কোন বিশেষ কবিতার রস-আবেদন উপলব্ধি

করিতে হইলে ইহার কাব্য-উপাদান ও কবির দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে আলোচ্য। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের প্রবন্ধটি এই সূক্ষ্ম ও সচেতন বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার দিকে অতি মনোজ্ঞভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

(৫)

কয়েকটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর শিল্পকৌশল ও নীতিবাদের আলোচনা হইয়াছে। বঙ্কিমের সাহিত্য-বিচার যেমন উচ্চতর সমালোচনার উন্মেষের সহায়ক, তেমনি তাঁহার রচনাবলীও ঐ সমালোচনার অনুশীলনের বিষয় যোগাইয়াছে। বঙ্কিমকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য শৈশবের অনিশ্চিত পদক্ষেপ হইতে যৌবনের সবল, আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত অগ্রগতির পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' (আর্যদর্শন, ১২৮৪), গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'মনোরমা' (প্রচার, ১২৯৫), বীরেশ্বর পাঁড়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২)—এই তিনটি প্রবন্ধ বঙ্কিমের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক বিচার করিয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর চরিত্র-পার্থক্য উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ ও বহুল উদ্ধৃতির সাহায্যে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বঙ্কিম-আলোচনার প্রথম যুগে এই উচ্ছ্বসিত স্তুতি ও উপন্যাসের ঘটনাবলীর ও লেখকের মন্তব্যের সশ্রদ্ধ, উদ্ধৃতি-বহুল অনুসরণই সাধারণ রীতি ছিল। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার মত বঙ্কিম-অনুরাগী সমালোচকবৃন্দ মুখ্যতঃ বঙ্কিমের ভাষা উদ্ধার করিয়াই তাঁহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও চরিত্র-সৃষ্টিতে সূক্ষ্মদর্শিতা প্রতিপাদন করিতে চাহিতেন। এই প্রবন্ধাবলীর অতিপল্লবিত বিস্তার ও ভাবাতিশয্যই যেন তাঁহাদের ভক্তিগদ্‌গদ মনোভাবের প্রতিবিম্ব ও পরিমাপক ছিল। ভাবানুসরণের মধ্যেই স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য তাঁহাদের সাহিত্য-রসানুভূতির ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করিত। অবশ্য সে যুগে বঙ্কিমসাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না বলিয়াই সমালোচনার মাধ্যমে এই পরিচয় ঘটাইতে হইত; সুতরাং উদ্ধৃতি-প্রবণতা এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যও ব্যবহৃত হইত। সুদীর্ঘ 'বিষবৃক্ষ' প্রবন্ধে বিষবৃক্ষের সমগ্র কাহিনীটির সারাংশ-সঙ্কলনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের যোগসূত্রে সমালোচকের আলোচনা-রীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রণয়ের আত্মবিসর্জন-প্রবণতা দ্বারা সমাজ-

কল্যাণ-সাধন ও চিত্তশুদ্ধি-প্রতিপাদনই লেখকের রচনার প্রধান লক্ষ্য ; এবং সমালোচক বঙ্কিমকে সমাজহিতসাধক নীতিবিদ্‌রূপেই প্রধানতঃ বিচার করিয়াছেন। সূর্যমুখী ও কুন্দের মধ্যে পার্থক্য কেবল তাঁহাদের প্রণয়ের বিশুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের পরিমাণ লইয়া। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ তাঁহার সপত্নী-অসহিষ্ণুতার পরোক্ষ প্রমাণরূপে গৃহীত ও ইহা হইতে তাঁহার সহধর্মিণীর উচ্চতম আদর্শ হইতে স্খলন অনুমিত হইয়াছে। তাহার প্রত্যাবর্তনে তাঁহার প্রণয়ের ভ্রষ্ট আদর্শের পুনরুদ্ধার ঘটিয়াছে ; স্বামীর উপর একাধিপত্য-রক্ষণের দুর্বলতাকে তিনি জয় করিয়াছেন। মানবিক আবেগ ও মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনের বিশেষ কোন প্রয়াস এই দীর্ঘ প্রবন্ধে লক্ষিত হয় না। সূর্যমুখীর চরিত্রে যে ত্রুটিটুকু সমালোচক লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার নৈতিক তাৎপর্য, তাহার আদর্শ-বিচার তাহার বিশুদ্ধ মানবিকতাকে অভিভূত করিয়াছে। সূর্যমুখী যেন মানুষ ন'ন, আদর্শ স্ত্রী মাত্র ও তাঁহার সমস্ত কার্যকলাপ এই আদর্শের মানদণ্ডে বিচার্য —এই আদর্শ-শাসিত মনোভাবই লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুন্দনন্দিনীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তাহার স্বাভাবিক লাজুক, আত্মনিরোধশীল প্রকৃতিই বিশেষ-ভাবে আলোচনার বিষয় হইয়াছে। বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তাহার মানব চরিত্রে অনভিজ্ঞতার একটি মাত্র লক্ষণের আবিষ্কার সমালোচকের সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শন। সূর্যমুখী উদ্যোগী হইয়া স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন, সুতরাং এই ব্যাপারে তাঁহার প্রসন্ন অনুমোদনই আছে—কুন্দের এই সরল বিশ্বাসই তাহার সাংসারিক জ্ঞানের অভাব সূচিত করে। অন্যথা তাহার আত্মোৎসর্গে-উন্মুখ মন দীর্ঘ-পোষিত অভিলাষ-পূরণকে প্রত্যাখ্যান করিত। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক বঙ্কিম-প্রভাবিত ভাষাতেই উভয় নারীর চরিত্র-বৈপরীত্য নানা উপমা ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক যুগে এই জাতীয় সমালোচনা আমাদের নিকট অনেকটা অন্তঃসারহীন উচ্ছ্বাসস্ফীতির মতই ঠেকে। কিন্তু যে যুগে ইহা লিখিত হইয়াছিল তাহার পক্ষে ইহার একটি বিশেষ উপযোগিতা ছিল।

"বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ" প্রবন্ধে বীরেশ্বর পাঁড়ে যে পূর্বোল্লিখিত রীতিই মুখ্যতঃ অনুসরণ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাঁহার প্রবন্ধের নামকরণেই মিলে। প্রণয়-চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিম হিন্দু-সমাজ-প্রচলিত আদর্শের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে লেখক সূর্যমুখী ও

ভ্রমরের যে চরিত্র-পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা মনস্তত্ত্ব-উদ্ঘাটনের দিক দিয়া প্রশংসনীয়। সূর্যমুখীর সহিত তুলনায় ভ্রমর অধিক মাত্রায় অভিমানিনী ও স্বামীর অপরাধ সম্বন্ধে অসহিষ্ণু। ভ্রমরের আচরণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকার-সাম্যের দাবী পরিস্ফুট ; সূর্যমুখী সর্বদাই দাসীভাবে স্বামিসেবাপরায়ণা ও স্বামীর ইচ্ছানুবর্তনে তৎপরা। সেইজন্য উপন্যাসের পরিণতিও উভয় ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ'-এ দাম্পত্য পুনর্মিলন সংঘটিত হইয়াছে ; 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বিচ্ছেদ বিয়োগান্ত পরিণামে পৌঁছিয়াছে। এই বিভিন্ন পরিণতিতে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সহিত তুলনায় হিন্দু দাম্পত্য আদর্শের জয়-ঘোষণার অবসর লেখক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূর্যমুখী-ভ্রমরকে উভয়বিধ আদর্শের প্রতিনিধিরূপে না দেখিয়া বিভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্না পতিপ্রেমসোহাগিনী নায়িকারূপে দেখিলে আদর্শ-বিচারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রচার বঙ্কিমের উদ্দেশ্যরূপে উপন্যাস মধ্যে কোথাও প্রতিভাত হয় না। সূর্যমুখী ও ভ্রমর হিন্দু আদর্শে ও হিন্দু পরিবার-ব্যবস্থার প্রতিবেশে তাহাদের জীবনযাত্রানির্বাহ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের আচরণে ও মনোভাবে স্বতঃই ইহাদের গভীর ও বদ্ধমূল প্রভাব ছায়াপাত করিয়াছে।

উপন্যাসদ্বয়ে বঙ্কিমের চরিত্র-চিত্রণ-পদ্ধতি বাস্তবধর্মী, আদর্শ মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক নহে। পরবর্তী যুগের 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি উপন্যাসে বঙ্কিম যতটা সরল ও খোলাখুলিভাবে প্রচার-পন্থী হইয়াছিলেন, এগুলিতে তিনি ততদূর অগ্রসর না হইয়া শিল্পসম্মত সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। তবে যদি বাস্তব পরিধির প্রান্তদেশে আদর্শ জ্যোতির্মণ্ডলের দীপ্তিরেখা সংলগ্ন হইয়া থাকে, তাহাও স্বভাবানুবর্তনরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। হিন্দু রমণীর স্বভাবানুগামী চিত্র আঁকিলেও তাহা হইতে আদর্শদীপ্তিবিচ্ছুরণ বাদ দেওয়া যায় না, কেননা এই আদর্শ তাহার জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সমালোচকের সপক্ষে এই বলা যায় যে তিনি আদর্শের জয়গান করিলেও মানবিক পরিচয়কে বিকৃত করেন নাই। অবশ্য কপালকুণ্ডলার দুঃখান্ত পরিণামের কারণ-নির্দেশে তিনি কতকটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন—জীবনের অনির্দেশ্য রহস্যময়তাকে প্রধান কারণ না বলিয়া তিনি হিন্দুধর্মের অনুশাসনকে এমনকি গ্রন্থকার কর্তৃক কাপালিকের ধর্মসাধনার পরোক্ষ সমর্থনকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'মনোরমা' প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মৌলিক চিন্তাপ্রসূত। বঙ্কিম-স্পষ্ট নারী-চরিত্রের মধ্যে মনোরমা সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক ও অনেকটা প্রহেলিকার লক্ষণাক্রান্ত। তাহার রহস্যময় ও লেখক কর্তৃক অমীমাংসিত দ্বৈত প্রকৃতি তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রধান উপাদান। বঙ্কিম তাহার পূর্ব ইতিহাস সংক্ষিপ্ত-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন ও তাহার আচরণের অদ্ভুত অসঙ্গতি যে এই পূর্ব ইতিহাসের সহিত জড়িত তাহারও কতকটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু এই দুইএর মধ্যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধটি তিনি পরিস্ফুট করেন নাই। আধুনিক বিশ্লেষণ-প্রধান লেখকের ন্যায় তিনি মনোরমার মানস-পরিণতিটি ব্যাখ্যা না করিয়া ইহার মর্মগ্রহণ অনির্দেশ্য অনুমান ও পাঠকের রহস্যোদ্ভেদী কল্পনা-শক্তির উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তবে লেখকের যে চরিত্র সম্বন্ধে একটা অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার সমস্ত সংলাপ ও আচরণের মধ্যে এই দ্বৈত-সূত্রের অবিচলিত অনুসরণে। গিরিজাপ্রসন্ন অসাধারণ সহানুভূতি ও পুনর্গঠন-শক্তির সহিত উপন্যাসের এই অলিখিত অধ্যায়টির উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আপাত-প্রতীয়মান প্রহেলিকাকে জীবনবিকাশের বিবর্তন-বিধানের অঙ্গীভূত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যা এই যে মনোরমা কিশোরীর বয়ঃসন্ধির সাধারণ অনিশ্চয়তা ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের একটি উদাহরণ মাত্র, জীবনে মোড় ফিরিবার সঙ্গে যে দ্বি-ভাব দেহে মনে প্রকটিত হয় ইহা তাহারই একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপ। এ ব্যাখ্যা ঠিক প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না—মনোরমা ভাবমুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত কিশোরীরূপে আমাদের মানস নেত্রে প্রতিভাত হয় না। সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের সারল্য ও পাণ্ডিত্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ মনোরমার দ্বৈতভাবের সহিত সমজাতীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—এই সাদৃশ্যও আমাদের সংশয়-নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। মনোরমার দৈব-বিড়ম্বিত, পরস্পর-বিরোধী উপাদানে গঠিত, অসাধারণ অতীত ইতিহাসই তাহার দ্বিধা-ভাবের উৎস-মূল। পশুপতির সত্য পরিচয়লাভে তাহার আজন্ম-পোষিত বৈধব্য-সংস্কারের অপনোদন, পশুপতির প্রণয়ের বিহ্বলকারী, আমন্ত্রণ-নিষেধে মিশ্র, দুর্বোধ্য মাদকতা, স্বামী সম্বন্ধে না-গ্রহণ-না বর্জন নীতির উৎকট অস্বাভাবিকতা—সব মিলিয়া তাহার চিত্তে যে আলোড়ন তুলিয়াছিল, তাহার দ্বৈত-প্রকৃতি তাহারই অনিবার্য অভিব্যক্তি। তাহার

কর্তব্য-নির্ণয়ের দুরূহতা, তাহার নিরুদ্ধ আবেগের অগ্রগতিহীন, আত্মকেন্দ্রিক আবর্তন, হৃদয়-অরণ্যে পথ না পাইয়া দোলায়িত মনের অশ্রান্ত, অস্থির পদচারণা—এই সমস্তই তাহার দ্বিধা-বিভক্ত মনের প্রেরণা ও প্রতিচ্ছবি। তাহার অন্তর-নিরুদ্ধ অগ্নিশিখা—কখনও স্তিমিত, কখনও প্রদীপ্ত—একবার তাহার শৈশব-সারল্যে, পরমুহূর্তে তাহার প্রৌঢ়ত্ব-গাম্ভীর্যের জটিল-রেখাঙ্কিত আলো-ছায়ানৃত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। শূন্য প্রাসাদের এক ক্ষুদ্র কোণে বাস ও গাত্রজ্বালা নিবারণার্থ শাল-তমালাচ্ছন্ন গহন-গভীর সরোবরে নিশীথ-অবগাহন—এই দুইটি ক্রিয়াই তাহার মানস বৈশিষ্ট্যের আশ্চর্য সুসংবদ্ধ ব্যঞ্জন গিরিজাপ্রসন্নের প্রবন্ধে মনোরমা-চরিত্রের এই অতি সূক্ষ্মদর্শী মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। তাহার দুর্জ্ঞেয় কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে তাহার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য কিরূপ অভ্রান্ত সুসঙ্গতির সহিত রূপায়িত হইয়াছে লেখক তাহাও অতি মনোজ্ঞভাবে দেখাইয়াছেন। বঙ্কিম-সমালোচনায় এই প্রবন্ধটির স্থান খুব উচ্চ; এবং পরবর্তী আলোচনা যে এই সূত্রের অনুসরণ করিতে পারে নাই, ইহাও ইহার উজ্জ্বল অনন্যসাধারণ মৌলিকতার বিশিষ্ট নিদর্শন। যে যুগে নীতিবাদ ও আদর্শ-প্রচারই বঙ্কিম-সাহিত্যের মূল স্বর বলিয়া গৃহীত হইত, সে যুগে এই বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রগতিশীলতা ও সমসাময়িক মানের অতিক্রমণ আমাদের চমৎকৃতি জাগায়।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী' মুখ্যতঃ দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সমালোচনা; কিন্তু এই উপন্যাসটি বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহাররূপে পরিকল্পিত হওয়ায় ইহাতে বঙ্কিমের তুলনামূলক বিচার অপরিহার্য হইয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'র সহিত তুলনায় মৃন্ময়ীর আপেক্ষিক অপকর্ষ লেখক খুব সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত ধরিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ নবকুমারের চরিত্র-বিকৃতি ও অন্যচারিণী পত্নী পদ্মাবতীকে প্রণয়িনীরূপে পুনর্গ্রহণের অবিশ্বাস্যতাকেই এই অপকর্ষের কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। দামোদর বাবু যে এই উপন্যাসে পাতিব্রত্যের মহিমা খর্ব করিয়াছেন, হিন্দুর শাশ্বত ধর্ম-নীতির মর্যাদা রক্ষা করেন নাই, ইহাই তাঁহার অভিযোগের মূল বিষয়। সুতরাং তাঁহার সমালোচনার অসমর্থনের পশ্চাতে নীতিবিদের মনোভাব প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। 'মৃন্ময়ী'তে 'কপালকুণ্ডলা'র সমস্ত ভাবাবহ (atmosphere) যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ইহার নিবিড় রহস্যময়তা যে দিবালোকের

সুস্পষ্টতায় বিলীন হইয়াছে, ইহার আরণ্য বন্ধুরতার উপর যে সাধারণ জীবনের সমতল সুষমতা আক্ষিপ্ত হইয়াছে, সমালোচক সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সচেতনতা দেখান নাই। রহস্যকণ্টকিত, অজ্ঞাতের আভাস-ইঙ্গিত দুরধিগম্য, অরণ্য-সমুদ্র ও কচ্ছ্রসাধ্য ধর্মসাধনের অসীম ব্যঞ্জনার সহিত এক সুরে বাঁধা জীবন-যাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী দামোদর বাবুর হাতে যে একটি সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের ছবিতে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিচ্ছিন্ন দম্পতির লৌকিক পুনর্মিলনের সুলভ তৃপ্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে, অভিযোগের এই মূল তত্ত্বটি সমালোচকের বিশ্লেষণকে এড়াইয়া গিয়াছে।

(৬)

নূতন সমালোচনা-রীতি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের প্রতি সমালোচক-গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন আলোচনা-পদ্ধতিতে ইহার যে সৌন্দর্য পাঠকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যপুষ্ট আধুনিক সমালোচক তাহাতে তৃপ্তি পাইলেন না। অলঙ্কারের সাধারণ নিয়মে আবদ্ধ না হইয়া, টীকার আক্ষরিক প্রণালীতে রসবোধের স্বাধীন স্ফূরণকে শৃঙ্খলিত না করিয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমগ্র কাব্যে কিরূপ অভিনব সৌন্দর্য আবিষ্কার করা যায় তাহা পরীক্ষা করার প্রেরণা ইহাদের মধ্যে উদগ্র হইয়া উঠিল। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র পথিকৃতের মর্যাদা দাবী করিতে পারেন। তাঁহার 'উত্তরচরিত'-এর সমালোচনা সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনের এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করিল। সমগ্র নাটকের গঠনকৌশল-বিচার ও বিভিন্ন অঙ্কের মধ্যে ভাব ও রসের ক্রমপরিণতির সূত্র-আবিষ্কার তাঁহার প্রথম লক্ষ্য। এইরূপ সমগ্র আঙ্গিকের বিচার সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে অপ্রাপ্য। ইহারই মধ্যে মধ্যে রামচন্দ্রের চরিত্র-বিশ্লেষণ, সীতার অপরিমেয় অথচ অন্তর্গূঢ় ও স্বল্পভাষী প্রেমের পরিচয় দান, পূর্বস্মৃতি-সমাকুল পঞ্চবটীবনস্থলীর অধিষ্ঠাত্রী বনদেবীর অতি সূক্ষ্ম, অশরীরিপ্রায়, ভাব-প্রতিচ্ছায়া-রচিত মূর্তির পরিকল্পনা, রামের অন্তর্নিরুদ্ধ শোকের মর্মভেদী প্রকাশের রসাস্বাদন, সর্বশেষে চিরপ্রসিদ্ধ বিয়োগান্ত পরিণামের মিলনের চিত্তদ্রবকারী শান্তিতে রূপান্তর —ভবভূতির নাটকের সমগ্র বিচিত্র কলাকৌশল, রসোদ্ভাবন নৈপুণ্য, ইহার সর্বদেহব্যাপী, শিরা-উপশিরাসঞ্চারী ভাবসঙ্গতি

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের উপলব্ধির বিষয়ীভূত করিয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতির রসসৃষ্টির তুলনা, রামচন্দ্রের চরিত্রে ভাববিলাসের আতিশয্যে ভারতবর্ষীয় সমাজ-আদর্শের পরিবর্তনের ইঙ্গিত, সবশেষে শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ-বিচার ও ভবভূতির রচনায় তাহাদের দৃষ্টান্ত-উপস্থাপন পাঠকের চিত্তকে রসাস্বাদনের পরিপূর্ণতায় আপ্লুত করিয়া তোলে। বঙ্কিমের সমালোচনা অবিমিশ্র প্রশংসা নহে; ন্যায়-বিচারের অমোঘ তুলাদণ্ডে তিনি লেখকের দোষগুণের বিচার করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের প্রায় সম-সাময়িক। কিন্তু তাঁহার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও গুণ-বিচার প্রায় সম্পূর্ণরূপেই প্রাচীনধর্মী। তাঁহার সহিত বঙ্কিমের সময়ের ব্যবধান স্বল্প, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকে প্রায় বৈপ্লবিক বলা যাইতে পারে। এই উপাদেয় সন্দর্ভের একমাত্র ত্রুটি ইহার সাময়িক-পত্রোচিত আয়তন-সঙ্কোচ ও সীমা-লঙ্ঘনের আশঙ্কায় অতর্কিত পরিসমাপ্তি। কিন্তু তিনি যতটুকু দিয়াছেন তাহা আমাদের পূর্ণতর আলোচনার জন্য আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্রভাবে উদ্রিক্ত করে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'মৃচ্ছকটিক' সংস্কৃত নাটকের আর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনার ন্যায় এত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও মনন-শীলতা-সমৃদ্ধ নহে; ইহার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতায়, গভীর অনুপ্রবেশে নহে। তথাপি ইহার মধ্যে লেখকের তীক্ষ্ণ রসবোধ গুণগ্রাহিতার নিদর্শনের অভাব নাই। নান্দী ও প্রস্তাবনায় নিহিত ঘটনার ভবিষ্যৎ গতি ও পরিণতির আভাসটি, নাটকের মূল সুরের পূর্বসূচনাটি লেখক সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত উদঘাটিত করিয়াছেন। শূদ্রক নামের পিছনে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনা আছে তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। গণিকা বসন্তসেনাকে নায়িকা-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে সহানুভূতির সহিত চিত্রিত করিয়া নাট্যকার যে অসাধারণ উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা আধুনিক যুগের সহিত তাঁহার মানস সাদৃশ্য সূচিত করে। বসন্তসেনার বৃত্তির হেয়তার উপর জোর না দিয়া তাহার কলাবিদ্যানুরাগ ও কোমল, শোভন শিষ্টাচারকেই প্রধান করিয়া দেখাইয়া নাট্যকার যে সংযম ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন সমালোচক তাহারও সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের দোষ-গুণ বিশ্লেষণ ছাড়াও যে হিন্দু আদর্শ ও আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাহা চারুদত্ত ও শর্বিলকের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যের

প্রভাবে সমসাময়িক সমাজের অপক্ষপাত চিত্রাঙ্কন খানিকটা চাপা পড়িয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য প্রাচীন হিন্দু সমাজে বাস্তব অবস্থা আদর্শের দ্বারা এত গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল যে বাস্তবের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া আদর্শের জ্যোতি অনিবার্যভাবে বিচ্ছুরিত হইত। সুতরাং আদর্শের প্রশস্তি বাস্তব-বিমুখতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'কালিদাস ও শেক্‌স্‌পিয়ার' প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য শেক্‌স্‌পিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা খুব স্থূল ও পরিমাণে সামান্য—লেখকের প্রধান উদ্যম কালিদাসের কাব্যের সাধারণ প্রকৃতি-নির্ণয়ের দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ, দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন—সৌন্দর্যানুভূতির বিশেষ উপায় স্বরূপ তিনি রূপেন্দ্রিয় নামে একটি নূতন বৃত্তির কল্পনা করিয়াছেন। বাহির, অন্তর, সত্য, ধর্ম ও রূপ ভেদে অনুভবগম্য পদার্থের পঞ্চবিধ প্রকরণ-ভেদ করা যাইতে পারে ও প্রত্যেকের অনুরূপ ইন্দ্রিয় ও চিৎশক্তি যোগে ইহাদের বিশেষ আবেদন মানবের উপলব্ধির বিষয় হয়। কালিদাসের কাব্যের গভীরতম পরিচয় হইল যে ইহাতে মানব-শক্তির চরম-সীমা-নির্দেশক রূপেন্দ্রিয়ের স্পষ্টতম স্ফুরণ হইয়াছে। প্রথমতঃ বহির্জগতের সুন্দরতম বর্ণনা, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য-ভাণ্ডারের নিপুণতম চিত্রাঙ্কন কালিদাসের কাব্যে সমাবেশ লাভ করিয়াছে। দাবানল, বর্ষাঋতু, মনুষ্য-হস্ত-রচিত সৌন্দর্যের সমৃদ্ধি ও ধ্বংসজীর্ণতা প্রভৃতি বহির্জগতের সর্ববিধ প্রকরণ-বৈচিত্র্য কালিদাসে অবিমিশ্র সৌন্দর্য-সৃষ্টির উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্তর্জগতেও সেই সৌন্দর্যের একাধিপত্য। শোক, দুঃখ, বিরহ, মৃত্যুর মর্মান্তিক বেদনা প্রভৃতি সমস্ত হৃদয়বৃত্তির শান্ত, সুকুমার, সৌন্দর্য-প্রধান রূপটি কালিদাসের কাব্য শরৎপ্রসন্ন নৈশাকাশে ছায়াপথ-বিস্তারের মৃদু রশ্মিজালের ন্যায় সংহত হইয়াছে। যাহা ক্রূর, প্রখর, উন্মত্ত, বিক্ষুব্ধ, মর্মচ্ছেদী তাহাও কালিদাসের প্রশান্ত সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত হইয়া সুকুমার কমনীয়তামণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার সত্যানুভূতি, দার্শনিক উপলব্ধিও সেই একই প্রকারের সরস সৌন্দর্য-চর্চিত হইয়া চন্দনসুরভি, দেবপদে উৎসর্গীকৃত কুসুমস্তবকের সাদৃশ্য ধারণা করিয়াছে। রাজধর্মের আদর্শ, দেবস্তবের নিগূঢ় মহিমা, দুরবগাহ তত্ত্বের অতীন্দ্রিয়তা কালিদাসের সৌন্দর্য-সৃষ্টির ইন্দ্রজালে ধৃত হইয়া অস্তসূর্যের অখণ্ড-

রক্তিম মণ্ডলের ন্যায় এক অনবদ্য সুষমার বেষ্টনীরেখায় তাহাদের অস্পষ্ট ইঙ্গিত-গুঞ্জন বিস্ফুরণ-রশ্মিগুলিকে সংহত করিয়াছে। বোধেন্দ্রিয়ের অনধিগম্য চিন্তা-ভাবনাগুলি রূপেন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট অধিকারে ধরা দিয়াছে। অধ্যাত্ম জগতের তীব্র বিরোধ, পাপপুণ্যের নির্মম দ্বন্দ্বযুদ্ধকে কালিদাস এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি সনাতন নীতির সৌন্দর্য প্রকটিত করিয়াছেন। সংশয়াকুল আত্মার আত্ম-বিক্ষোভ তাঁহার সীমাবহির্ভূত। তাই দুষ্মন্তের তরলমতিত্ব দুর্বাসার অভি-শাপের দৈব আবরণে আত্মগোপন করিয়াছে--সৌন্দর্যের আস্তরণে প্রকৃতির উদ্দাম উচ্ছ্বাস ঢাকা পড়িয়াছে। রামচন্দ্রের নির্বাসন-কাহিনী হইতে কৈকেয়ীর ঈর্ষা এই সৌন্দর্য-প্রবণতার অমোঘ শাসনে বর্জিত হইয়াছে। মোটের উপর তুলনামূলক আলোচনা যতই স্বল্পায়তন ও সংক্ষিপ্ত হউক, কালিদাসের কাব্যের অন্তঃপ্রেরণা হীরেন্দ্রনাথের আলোচনায় অতি মনোজ্ঞভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' তুলনামূলক আলোচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ও তুলনায় যথাযথতার দিক দিয়া ইহার স্থান বোধহয় উচ্চতর। ১২৮৫ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে সে যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের মনে যে তিনজন কবি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই তিন কবি—কালিদাস, বাইরন ও বঙ্কিমচন্দ্র—সম্বন্ধে লেখক এখানে আপেক্ষিক বিচার করিয়াছেন। প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের আধুনিক যুগে অনুপযোগিতা সম্বন্ধে লেখক যে উক্তি করিয়াছেন তাহা তাঁহার সনাতন মত অতিক্রম করিবার অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দেয়। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন মহাকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য সমাজবদ্ধতার পোষকতা, সমাজবদ্ধ মনুষ্যের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ নহে। তাহারা সমাজনির্দিষ্ট বিধির পালন শিখাইয়াছে, প্রগতিশীল সমাজে উপযোগী উন্নয়নের ইঙ্গিত দেয় নাই। আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ আধুনিক যুগে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতে, মহাকাব্যদ্বয়ের চরিত্রের উপর প্রভাব অনেকটা অবাস্তব হইয়া পড়িল। রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে চিরপ্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এরূপ সাহসিক মন্তব্য একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষে যে দুঃসাহসিকতার পর্যায়ভুক্ত তাহা বলাই বাহুল্য। একই কারণে তিনি পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যেরও সামাজিক প্রভাবকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকার করিয়াছেন। এই সাধারণ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম কালিদাস। তাঁহার সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে এমন একটি

আধুনিক বা সর্বকালসাধারণ মনোভাব আছে, যাহাতে ইহার আবেদন ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে বাঙ্গালার যুবককেও প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। কালিদাসের সৌন্দর্য-বর্ণনায় শান্ত, বিশুদ্ধ, সমাজানুমোদিত আনন্দের প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের মনোভাবের মাধ্যমে প্রকৃতি-সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন ও তাঁহার নায়ক-নায়িকার অসামাজিক হৃদয়বৃত্তির কুফল দেখাইয়া পরোক্ষভাবে সমাজনীতির সমর্থন করিয়াছেন। বাইরণ সমাজ-বিরোধী মনোবৃত্তির গুণগান করিয়াছেন ও তাঁহার প্রকৃতি-সৌন্দর্য-বর্ণনা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের দ্বারা তীক্ষ্ণ ও উপভোগ্য। এইরূপে এই তিন কবির কাব্য-বিশ্লেষণ ও সামাজিক প্রভাব স্পষ্টভাবে আলোচনা করিয়া লেখক সে যুগের পক্ষে অতি প্রশংসনীয় সূক্ষ্ম ও যথার্থ মূল্য-নিরূপণের শক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যগুলি এখনকার দিনে খুব মৌলিক ঠেকে না; কিন্তু প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে, যখন বিচারের মানদণ্ড এত অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই, তখন তাঁহার এই সংস্কারমুক্ত, সত্যদর্শী আলোচনা সত্যই হৃদয়গ্রাহী মনে হয়। অবশ্য সে যুগের টেন, ব্রাণ্ডেশ প্রভৃতি সমালোচক-গোষ্ঠীর দ্বারা প্রবর্তিত বাইরণের শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকার পণ্ডিত হরপ্রসাদকে যে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার বাইরণের নির্বাচনেই সুপ্রকট। যে যুগে সমাজের শৃঙ্খল-ছেদনই প্রধান কাম্য, সে যুগে সমাজদুর্গপ্রাচীর-ধ্বংসের উপযোগী বিস্ফোরক শক্তি যাঁহার আয়ত্ত সেই কবিই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ভাঙ্গাচোরার হট্টগোলে, ধ্বংসস্তূপাকীর্ণ আবহাওয়ায় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সূক্ষ্ম সুর কানে প্রবেশ করে না। বিদ্রোহের সংক্রামক উত্তেজনা খাঁটি কাব্যানুভূতিকে অভিভূত করে। তাই সে যুগে বাইরণের অবিসংবাদিত প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী যুগে যখন সমাজের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, তখন সৌন্দর্যরস-প্রধান কবিদের আসর জমিয়া উঠে। সমাজতত্ত্বঘটিত এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকু হরপ্রসাদের প্রবন্ধে নিহিত আছে।

(৭)

সমালোচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়া যায় মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্যের রসাস্বাদনে ও মূল্যনির্ধারণে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' (ভারতী, ১২৯৬), ঠাকুরদাস

মুখোপাধ্যায়ের 'বিহারীলাল চক্রবর্তী' (নব্যভারত, ১৩০১), অজ্ঞাত লেখকের 'প্রাচীন কবি সঙ্গীত' (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২), ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের 'সধবার একাদশী' (এডুকেশন গেজেট) ও প্রিয়নাথ সেনের 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (সাহিত্য, ১৩২০) বাঙ্গালা সমালোচনার ক্রমবর্ধমান পরিধি ও প্রসার সূচিত করে। প্রাচীন অপেক্ষা আধুনিক সাহিত্য-বিচার অধিকতর দুরূহ ও প্রমাদ-সঙ্কুল। যাহা মহাকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিরন্তন মর্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহার মূল্যবিচার-পদ্ধতি যতই মৌলিক হউক, তাহার মূল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর থাকে না। যে আধুনিক সমালোচক কালিদাস বা ভবভূতির কোন অভিনব উৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়া তাহাদের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অনেকটা বিষয়ের অবিসংবাদিত, নিঃসন্দিগ্ধ মর্যাদার দ্বারা স্থিরতা ও গভীর অনুপ্রবেশ লাভে সমর্থ হইয়াছে। নিশ্চল, স্থির লক্ষ্যের কেন্দ্রস্থল ভেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য সন্ধান-পারদর্শিতা। কিন্তু যে সাহিত্য মতভেদের তরঙ্গ-সংঘাতে অস্থির, গ্রহণ ও বর্জনের বিপরীত সীমার মধ্যে আন্দোলিত, যাহার চতুর্দিকে প্রবল বায়ুতাড়িত শীকরজাল একটি দুর্নিরীক্ষ্য, দৃষ্টিবিভ্রমকারী যবনিকা রচনা করিয়াছে, যাহার স্বাদ সম্বন্ধে রুচি এখনও অনিশ্চিত, সেই সাহিত্যের যিনি মর্মভেদ করিতে পারেন, তাঁহার লক্ষ্যবেধশক্তি যে আরও প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে লোকসাহিত্য শিক্ষিত সমাজের নিকট অনাদৃত ও অবজ্ঞাত ছিল, যাহা ইতর রুচির সম্পর্কে ও প্রাকৃত জনের মনোরঞ্জন-প্রয়াসে বিদগ্ধ জনের নিকট অপাংক্তেয় ছিল, তাহার সাহিত্যিক কৌলীন্যের পুনরুদ্ধার, সৎসাহিত্য পর্যায়ে তাহার স্থান-নির্দেশ আরও উচ্চতর শক্তির নিদর্শন। এই সন্দর্ভসমূহে সমালোচনাশক্তির এই উন্নততর বিকাশ উদাহৃত হইয়াছে।

বলেন্দ্রনাথের 'মুকুন্দরাম' আধুনিক দৃষ্টিতে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলকাব্য-রচয়িতার পুনর্বিচার। প্রবন্ধের অধিকাংশ কবিবর্ণিত আখ্যায়িকার সার-সংকলন, কিন্তু এই সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে কবির সহজ রসিকতার সুরটুকু সার্থক ভাবে ধরা পড়িয়াছে এবং এই রসিকতার ব্যাপারে সমালোচক ও কবির মধ্যে যে একটি রুচি-সাম্যের যোগসূত্র আছে তাহাও সমালোচকের বক্র-কুটিল কটাক্ষ-সংযুক্ত মন্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কাব্যের অম্লমধুররস সমালোচকের রসনায় কেমন লাগিয়াছে তাহা এই অনুবৃত্তির মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তারপর, কবি-

গোষ্ঠীতে মুকুন্দরামের প্রকৃত স্থান ও পর্যায় নির্ণয় সম্বন্ধেও খুব সূক্ষ্ম রসগ্রাহিতা ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় মিলে। মুকুন্দরাম যে গভীর ভাব ও উন্নত আদর্শলোকের কবি নহেন, তিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ও ইহার ছোট-খাট হাস্য-পরিহাস, ছিদ্র-অসঙ্গতির কবি ইহাই তাঁহার সত্য পরিচয়। যেখানে তিনি ভাবের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে গিয়াছেন, মনের গভীর আবেগ-আকুতির প্রকাশ-প্রয়াসী হইয়াছেন সেখানেও তাঁহার হাস্যরসিক মনের বাস্তব প্রবণতা উঁকিঝুঁকি মারিয়াছে। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াও প্রকোষ্ঠের কোণে কোণে সঞ্চিত ধূলিজালের দিকে তাঁহার দৃষ্টি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। নায়কের চিরন্তন আভিজাত্য-মহিমার সঙ্গে তিনি ব্যাধকুলোচিত বর্বরতা ও রীতি-নীতির অমার্জিত স্থূলতাটুকু মিশাইয়া দিয়াছেন। ফুল্লরার বারমাস্যায় তাহার জীবনের যে কক্ষাবর্তনটি চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে কাব্য-নায়িকার সৌখীন হৃদয়-বেদনাকে ছাপাইয়া তাহার দারিদ্র্যের গ্লানিই বেশী ফুটিয়াছে। ভাঁড়ু দত্ত কবির মনের মত সৃষ্টি—ইহাতে পৌরাণিকতার কোন গিল্‌টি নাই, সমসাময়িক সমাজ হইতে সে বঁড়শিতে ধরা পুঁটীমাছের মত সোজা কবির লেখনীর সূক্ষ্মাগ্রে গিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি-লহনা-খুল্লনার জীবন-চিত্রেও ঐশ্বর্যের বাড়া-বাড়ি নাই—বণিক সম্প্রদায়ের সচ্ছল, অথচ চোখ-ধাঁধানো—আতিশয্য-বর্জিত মাত্রাটি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার রাজারাও যেন বণিকের উন্নততর সংস্করণ—বণিকের তুলাদণ্ডই যেন ইহাদের ক্ষেত্রে রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিয়াছে। রঘুবংশের ভীমকান্তগুণের সমাবেশে গঠিত রাজন্যবর্গের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন মিল নাই। ইহাদের ভাণ্ডারে ধনরত্নের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের অতি সামান্য, মহিমাহীন দ্রব্যজাত মিশিয়া আছে এবং পাঠকের মনে ধারণা জাগে যে এই ঐশ্বর্য বাণিজ্য-অর্জিত, দিগ্বিজয়-লুণ্ঠিত নহে। রূপকথার মত মুকুন্দরামের কাব্যেও রাজপুত্র-সদাগরপুত্রের একটা অবস্থা-সাম্যসূচক মিতালি পাতান হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্যের মুখবন্ধে ও ঘটনা বিন্যাসে যে একটি ক্ষীণ পৌরাণিক প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে তাহা বলেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু মুকুন্দরামের মত বাস্তবপ্রধান ও পরিহাস-রসিক কবির রচনায় পুরাণ-মহিমা অত্যন্ত অশোভন মনে হয়। বলেন্দ্রনাথ যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে মুকুন্দরামের মানব-চরিত্রের কথা দূরে থাকুক তাঁহার চণ্ডী পর্যন্ত গম্ভীর নহেন। তিনি হাস্যরসিক কবির হাতে পড়িয়া

ব্যাধনন্দনের সহিত কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভ রসিকতা করিতে ছাড়েন নাই। বাস্তবিক, মঙ্গলকাব্যের যুগে বাঙ্গালী লেখক ও পাঠক পুরাণ-রচয়িতাদের মনোবৃত্তি হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়ত প্রায় পূর্বের মতই আছে, কিন্তু ইহার সহিত খানিকটা মূঢ় আতিশয্য, খানিকটা সাংসারিক আবিলতার প্রলেপ মিশিয়াছে। বিশেষতঃ ভক্তির পাত্র পাত্রীর পরিকল্পনায় আদর্শ সমুন্নতি অনেকটা নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে। পূজালোলুপা দেবী নিজ বাসনা-সিদ্ধির অত্যুৎকট আগ্রহে ও তজ্জন্য অবলম্বিত উপায়ের হীনতায় দেব-মহিমার উন্নত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ভক্তের হৃদয়ে তিনি যে আসনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ ভয়ের উপাদানেই গঠিত হইয়াছে। দেবীর আত্মপ্রচার-কামনা ও ভক্তের সকাম ঐশ্বর্যলিপ্সা পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া নৈতিকতার নিম্নস্তরে সম্মিলিত হইয়াছে। এইরূপ প্রতিবেশে পৌরাণিক আদর্শের অনুকরণ প্রায়ই হাস্যকর অসঙ্গতির হেতু হইয়াছে। খুল্লনা-লহনার সপত্নীবিদ্বেষ ও তুচ্ছ সাংসারিক কলহের সঙ্গে সতীধর্মের প্রোজ্জ্বল মহিমা ঠিক মিশিয়া যায় না। সমস্ত মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে এক মনসা-মঙ্গলেই চাঁদ সদাগরের উদাত্ত পৌরুষ ও বেহুলার অসমসাহসিক পাতিব্রত্য পুরাণ-মাহাত্ম্যের অবমাননা করে নাই। ইহার কারণ বোধ হয় দেব-মাহাত্ম্যস্পর্ধী মনসার অকৌলীন্য ও অর্বাচীনতা। চণ্ডী, ধর্মরাজ প্রভৃতি অন্যান্য দেবচরিত্র, লৌকিক হইলেও, পুরাণ-বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে মণ্ডিত—বিষ্ণু ও আদ্যাশক্তির সাদৃশ্য ইঁহাদিগকে খানিকটা অলৌকিক মর্যাদা দান করিয়াছে। বিশেষতঃ ইঁহাদের পূজা পাইবার আগ্রহ কিয়দংশে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবচরিত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী নহে। ইঁহাদের সহিত তুলনায় মনসা একেবারে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের পর্যায়ভুক্ত। ক্রুর, জিঘাংসাপরায়ণ সরীসৃপের দেবমণ্ডলীতে উন্নয়ন—নিছক জোর-জবরদস্তি; তাহার দেবত্ব-স্বীকার অবিমিশ্র পশুবলের নিকট মাথা হেঁট করা। নাগমাতার অতীত ইতিহাসের সহিত কোন গৌরবময় পূর্বস্মৃতি বিজড়িত নাই; তাহার কৃষ্ণ-চিক্কণ, চিত্রবিচিত্র দেহে কোন অধ্যাত্ম জ্যোতিরেখা লগ্ন হয় নাই। তাহার প্রতিহিংসা-কুটিল, ক্ষমাহীন, অতন্দ্র ছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাহার দংশনে যে বিষ শিরা-স্নায়ুতে সংক্রামিত হয়, তাহার সঙ্গে অযোগ্যের নিকট পরাভব স্বীকারের আরও মর্মান্তিক অপমান-জ্বালা মিশ্রিত আছে। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে চাঁদের পৌরুষপূর্ণ প্রতিরোধশক্তি ও বেহুলার উচ্চতর

নীতিবিধানে অপরাজেয় আস্থা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। চণ্ডী ও ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের কোন স্বাভাবিক অনুযোগ নাই, ইঁহাদের পূজাতে তাহার কোন অনতিক্রম্য আপত্তি নাই। এ যেন বৈষ্ণবের শাক্তধর্মগ্রহণের ন্যায় একটা সাম্প্রদায়িক মত-পরিবর্তন। কিন্তু সাপের নিকট পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে মানুষের সমস্ত আত্মমর্যাদাবোধ, তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহের নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা চাঁদ ও বেহুলার দুই বিভিন্নমুখী প্রতিরোধ-প্রয়াসের অসাধারণ দৃঢ়তা ও বাস্তব-ধর্মী আবেগের মধ্যে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যের অতি সাধারণ নরনারীর মধ্যে এই দুইটি চরিত্র প্রখর প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত ও নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

'প্রাচীন কবি-সঙ্গীত'-এর লেখক অজ্ঞাতনামা; কিন্তু তিনি লোক-সাহিত্যের এই বিভাগের যে সূক্ষ্মানুভূতিপূর্ণ, রসানুভবশীল আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী। এই কবি-সঙ্গীত-রচয়িতারা বোধ হয় সচেতন কাব্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন নাই—লোক-মনোরঞ্জনের জন্য গান গাওয়াই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। গান যে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়েও তাঁহা-দের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম অনুভূতি ও রচনার নিরাভরণ সরলতার বলে তাঁহারা যে গান রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অনেক সময় কাব্যগুণসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কবি-সঙ্গীত-রচয়িতা-গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও নীচ-বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁহাদের সম্বলের মধ্যে ছিল যুগযুগান্তর হইতে প্রবাহিত, রাধাকৃষ্ণের অনুপম লীলামাধুরীর ভাবাষঙ্গজড়িত প্রণয়াবেগের সহিত পরিচয় ও কবিতা-রচনার দৈবলব্ধ শক্তি। কিন্তু এই দুইটি মাত্র গুণের সহায়তায় তাঁহারা যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার উপর সরস্বতীর প্রসাদ বর্ষিত হইয়াছে। ইঁহাদের রুচি ঠিক মার্জিত ছিল না, রচনারীতিও অলঙ্কারে ও কষ্টকল্পনার আতিশয্যে দুষ্ট ছিল, ইহা মাত্রাজ্ঞান ও ভ্রমপ্রমাদশূন্যতার দাবী করিতে পারে না। তথাপি মানবহৃদয়ের সহিত সহজজ্ঞানলব্ধ পরিচয় ও প্রকাশভঙ্গীর মর্মস্পর্শী সরলতা ইঁহাদের গানকে সাহিত্যের অমরতা অর্পণ করিয়াছে। সে যুগে কবিওয়ালারা সাহিত্য-সমাজে অপাংক্তেয় ছিল, কুরুচি ও অশ্লীলতার জন্য যাহাদের আলোচনা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, সমালোচক যে সমস্ত পূর্বসংস্কার সবলে বর্জন করিয়া তাহাদের

গুণাবলী আবিষ্কার করিয়া তাহাদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য। আজ যে আমাদের রুচির স্রোত ফিরিয়াছে ও উপেক্ষিত কবিওয়ালাদিগকে সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানিত আসন দিতে আমরা রাজী হইয়াছি, আলোচ্য সন্দর্ভটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুবর্তীরূপে সেই পরিবর্তন-সংঘটনের অনেকটা কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'বিহারীলাল চক্রবর্তী' সমসাময়িক কাব্যের রস গ্রহণ ব্যাপারে বাঙ্গালার সমালোচনা-সাহিত্য কতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহার বিস্ময়কর নিদর্শন। গীতিকবিতা-রচয়িতা হিসাবে বিহারীলালের মৌলিকতা আমাদের সমস্ত পূর্ব ধারণাকে বিপর্যস্ত করে—বাংলা কাব্যের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত ইহা সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্পর্ক। বিষয়-পরিকল্পনা, অনুভূতির অশরীরী সূক্ষ্মতা, বিশ্বসৌন্দর্যের বিবিধ বিকাশের মধ্যে এক মূলীভূত চিৎশক্তির আবিষ্কার, বাস্তববোধহীন ভাবোন্মত্ততা, অপ্রাপণীয়ের জন্য আকুতি, বস্তুসত্তার চারিদিকে এক অতীন্দ্রিয়, সর্বব্যাপী ভাবসত্তার সমাবেশ, সর্বোপরি অন্তরাবেগের বহিঃপ্রকাশরূপ ছন্দঝঙ্কারের করুণ-কোমল ভাব-ব্যঞ্জনা—এই সমস্ত দিক দিয়া বিহারীলাল একেবারে স্বতন্ত্র ও একক। তাঁহার প্রথম আবির্ভাবের সময় তিনি অধিকাংশ পাঠকের নিকট একটি মূর্তিমান প্রলাপ-প্রহেলিকারূপেই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কেবল মাত্র প্রাচীন সাহিত্য পাঠে যাঁহার রুচি ও সৌন্দর্যবোধ গঠিত হইয়াছে, এমন কোন সমালোচক তাঁহার মর্মোদ্‌ঘাটনের রহস্যটি যে আয়ত্ত করিতে পারিতেন না তাহা সুনিশ্চিত। যাঁহারা শেলী প্রভৃতি কবির রচনার সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত, তাঁহাদের সৌন্দর্যমদিরামত্ত, অতীন্দ্রিয়-ভাববিভোর অসংযত আবেশের ঘূর্ণীবায়ুতে বেপথুমান অন্তঃপ্রকৃতিটির রহস্য ভেদ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিহারীলালের কাব্যের মূল প্রেরণাটি ধরিতে পারিবেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বিহারীলাল-প্রহেলিকাকে আমাদের বোধগম্য করিয়াছেন, তাঁহার খাপছাড়া, আত্মভোলা, নানা ভাব ও বস্তুপরম্পরার দ্রুত বিবর্তের মধ্যে এক দুর্নিরীক্ষ্য প্রেরণার প্রতি একনিষ্ঠতায় স্থির-অচঞ্চল কবি-মানসটিকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন ও পাঠকবর্গকে তাঁহার কবিত্বশক্তির মূল উৎসদেশে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বিহারীলালের কবিতায় চিন্তাসূত্রের অসংলগ্নতার কারণটি তিনি অন্তর্দৃষ্টির সহিত অনুভব করিয়াছেন—তাঁহার আপাত-স্বপ্ন-সঞ্চরণের মধ্যে নিগূঢ় চেতনা-শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতাটি ধরিতে পারিয়াছেন।

বিহারীলালের কবিতা যেন "ভিত্তিহীন অট্টালিকার, সৌরভের সৌধ"—কবির বস্তুতঃ অখণ্ড কিন্তু দৃশ্যতঃ বিচ্ছিন্ন-বিসর্পিত সৌন্দর্যানুভূতির গহন বনপথই কবিতার মর্মস্থলে পৌঁছিবার সঙ্কেত-নির্দেশক। কবির গানের মধ্যে ধ্যানের, কবিতার মধ্যে অশরীরী, আকাশ-বিহারী সৌন্দর্যের প্রাদুর্ভাব ও বিভিন্ন সুরের ভাবানুভূতির সংমিশ্রণ, পর্যায়ক্রমে ললিত-মধুর কোমলতা ও মহান্‌, বিরাট গাম্ভীর্যের সমাবেশ, তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতি ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিকল্পনায় মৌলিকতা, তাঁহার আরাধনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও নারীমহিমার অকুণ্ঠিত, আবেগস্পন্দিত শ্রেষ্ঠত্ব-ঘোষণা—বিহারীলালের কাব্যের সম্যক ও পরিপূর্ণ পরিচয় সৌন্দর্যের দার্শনিক স্বরূপ-বিশ্লেষণের সহিত এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিহারীলালের কাব্যের এমন সার্থক রসবিচার, অভিনব কাব্য-সৌন্দর্যের এরূপ স্বচ্ছ উপলব্ধি, কবির প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের এরূপ স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের দৃষ্টান্ত সমালোচনা-সাহিত্যে নিতান্ত সুলভ নয়। এমন কি বিহারীলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটিও ইহার সহিত তুলনায় বহিরঙ্গমূলক ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-নিবেদনাত্মক বলিয়া মনে হয়।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের 'সধবার একাদশী' প্রবন্ধে দীনবন্ধুর অমর সৃষ্টি নিমে দত্তের চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রায় অনুরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দেয়। নিমে দত্ত শেক্‌স্‌পিয়ারের ফলস্টাফের মত ; সে কেবল ব্যক্তিবিশেষ মাত্র নয়, একটা সমগ্র যুগের শীল-বৈশিষ্ট্য, একটি বৃহৎ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য তাহার মধ্যে সংহত হইয়াছে। তাহার অবয়বের মধ্যে এমন একটি আয়তন-বিপুলতা আছে যে কেবল তাহার সম্মুখভাগ দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হই না, তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চারিদিক হইতে দেখিবার ইচ্ছা হয়। নাট্যকার তাহার জীবনের যেটুকু আঁকিয়াছেন, তাহার পিছনে যে অতীত ইতিহাস ক্রিয়াশীল, তাহার মদোন্মত্ত বিকৃতির অন্তরালে যে উজ্জ্বল, ভাস্বর সম্ভাবনা চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে, অন্তঃরুদ্ধ যে বহ্নি-সঞ্চয় হইতে তাহার শ্লেষের মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা, অনুশোচনার ক্ষুব্ধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে অসহ্য উত্তাপ ও দাহ বিকীর্ণ করিয়াছে, তাহার জীবনের সেই অলিখিত অধ্যায়টি কল্পনা-সাহায্যে আমরা পুনরুদ্ধার করিতে চাহি। উচ্চতম শিক্ষা ও রসবোধের সহিত চরিত্রের ঘৃণিত অবনতি, আত্মমর্যাদার প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপের সমন্বয় কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে শুধু মদ্যাসক্তিই পর্যাপ্ত কারণ নহে। তাহার

মনস্বিতা ও সমাজে তাহার যথাযোগ্য সমাদরের মধ্যে যে উৎকট অসামঞ্জস্য সমাজের ন্যায়-বিচারের বিরুদ্ধে তাহার যে নিগূঢ় অভিমান, উপেক্ষিত প্রতিভার আত্মধিক্কার তাহার মনে যে অর্ধ-পরিণত মানস বিকৃতিতে বীজরূপে অঙ্কুরিত করিয়াছিল তাহাই অবিরত সুরানিষেকে, মোসাহেবির মৃত্তিকারসে পরিপু হইয়া বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। সাহিত্যের অমৃত ও সুরার হলাহল তাহার অভিমান-বিকৃত, অসংযত-ভোগপ্রবণ চিত্তে যে অপরিমিত বাষ্পস্ফীতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই আবরণের ভিতর দিয়া তাহার প্রকৃতিটি অতিকায় দৈত্যের মত আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অভ্রভেদী বন্ধুর মহিমায় দাঁড়াইয়াছে ক্ষেত্রনাথ বাবুর প্রবন্ধে নিমে দত্তের এই প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যটি চমৎকার ভাবে দেখান হইয়াছে। তাহার উক্তির মধ্যে যে হাস্যরসিকতা তাহা ক্ষেত্রনাথ বাবু বায়ুবিকৃতিপ্রসূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেবল মাতালের অসংবদ্ধ প্রলাপ ছাড়া প্রকৃতির স্থায়ী বিকারের চিহ্নও পরিস্ফুট। তাহার রসিকতার মধ্যে যে কটুত্বের ঝাঁঝ, যে আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তির পরিচয় মিলে তাহা সমাজের অবিচারজনিত। তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়াসক্তির মধ্যে মহত্ত্বের ধ্বংসাবশেষ অনুশোচনার জ্বালাময় স্মৃতি ও অটলের পারিবারিক শ্লীলতাহানির প্রস্তাবের প্রতিবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঘটিরামের নিকট নিজ মানস আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব-ঘোষণায় অপমানক্ষত হৃদয়ে আত্মশ্লাঘার প্রলেপ লাগানোর একটা ব্যর্থ-করুণ প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। নিমের চরিত্র-পরিকল্পনায় অশ্লীলতার অভিযোগ প্রবন্ধকার অতি নিপুণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এ অশ্লীলতার উদ্ভব বিকৃত রুচির জন্য নহে, যথাযথ চরিত্রাঙ্কনের অনিবার্য প্রয়োজনে। তা ছাড়া চরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষ স্রষ্টার শক্তিপরীক্ষার প্রকৃত মানদণ্ড নহে। রসের উপাদান যাহাই হউক না কেন সার্থক রসসৃষ্টি হইয়াছে কি না সমালোচকের ইহাই বিচার্য বিষয়। "হৃদয়কে আলোকিত করিবার বহ্নি যে কোন উপকরণ হইতে আহৃত হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কাব্যরসের মাহাত্ম্য কেবল ইহার নিজের প্রকৃতি ও নিজের পূর্ণতার উপর নির্ভর করে।......রস নিত্য পবিত্র পদার্থ।" সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে এমন সংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল মনোভাব আধুনিক যুগেও আমরা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিয়াছি কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে।

প্রিয়নাথ সেনের 'সনেট-পঞ্চাশৎ' প্রমথ চৌধুরীর কবিতার উপর লিখিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী আর একটি গোষ্ঠীবিচ্যুত একক আত্মা। বিহারীলাল পরবর্তী যুগে এক নবগোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠার আদি পুরুষরূপে গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহার যুগে যাহা ছিল ব্যতিক্রম তাহা আজ নিয়মে পরিণত হইয়াছে। আজ গীতিকবিতা-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্য বিহারীলালকেই ইহার মূল উৎস বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর নিঃসঙ্গতা আজও ঘোচে নাই। মাসিক পত্রে তাঁহার রচনারীতির বিরল অনুকরণ আজিও একটি বিশিষ্ট ধারার মর্যাদা লাভ করে নাই। বাঙ্গালীর সাহিত্য ও বাঙ্গালীর মনোবৃত্তির অতিমাত্রায় আর্দ্র ভাবপ্রবণতার প্রতিবাদে তিনি যেটুকু চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাম্প্রতিক যুগের ঘটনাবলী হইতে নিঃসৃত নূতন নূতন ভাবপ্লাবনের জোয়ারে তাহা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। আজ বাঙ্গালীর মনোভূমিতে যে পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত স্তর পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহা অতি তুচ্ছতম উপলক্ষেও, অতি বাস্তব প্রেরণার প্রত্যুত্তরেও তাহার প্রকাশভঙ্গীকে বাষ্প-বিহ্বলতার স্খলিত ভাষণে বিড়ম্বিত ও আবিল করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালীর স্বাভাবিক রুচি ও মানস প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। যে সমালোচক চির-প্রচলিত সাহিত্যের অবিমিশ্র মাধুর্যে অভ্যস্ত, যিনি অভিনবত্বের আস্বাদ-বৈচিত্র্য গ্রহণের জন্য রুচিকে সর্ববিধ পূর্বসংস্কার হইতে মুক্ত করেন নাই, তিনি যে প্রমথ চৌধুরীর কাব্যের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না তাহা নিশ্চিত। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে প্রিয়নাথ সেন সেই বিরল শ্রেণীর সমালোচক, যিনি অপরিচিতের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া তাহার অনভ্যস্ত সৌন্দর্যটি সাধারণ পাঠকের গোচরীভূত করিবার শক্তির অধিকারী।

শ্রীযুক্ত সেন মুখবন্ধে সনেটের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য ও অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার আঙ্গিক-রচনার মধ্যে কতকটা শিথিলতার প্রবর্তন করিয়াছেন ও ভাব-পরিণতির উপর ইহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে লেখক তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সনেটে শেক্স্‌পিয়ারের সনেটের অন্ত্য দুইটি চরণের ন্যায় নবম ও দশম চরণে একটি পয়ারানুকারী মিল আছে। ইহাতে অষ্টক ও ষষ্ঠকের ভাব-প্রবাহের মধ্যে একটি বাঁধের বাধা সৃষ্ট করা হইয়াছে এইরূপ ধারণা জন্মে। ভাবস্রোতের

বহুধা-বিভক্তি ভাবপ্রবাহের অবিচ্ছিন্নতার দিক দিয়া একটা বিশেষ ত্রুটি তাহার পর প্রবন্ধে কবির মনোধর্মের বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। সাধারণ কবির মাধুর্যপ্রধান হৃদয়াবেগের পরিবর্তে তিনি এক প্রকারের শুষ্ক, ব্যঙ্গবিদ্রূপের তির্যকদ্যোতনাবিশিষ্ট, বিদগ্ধ মনের পরিচয়বাহী রচনারীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। সাধারণ কাব্যে বিষয়ের লঘু গুরুর যে তারতম্য স্বীকৃত হইয়াছে, তিনি তাহার বিপর্যয় ঘটাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ভক্তিবিহ্বলতার একান্ত আত্মসমর্পণের স্থলে তিনি সংশয়বাদী মনের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা, শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অক্ষমতা, বিশ্বাসের শূন্যা লম্বন-প্রবণ তটস্থতার পরিচয়ই দিয়াছেন। আরাধনার কেন্দ্রস্থলে আত্মবিড়ম্বনার সংশয়-জড়িমা তাঁহার কাব্যে ছায়াপাত করিয়াছে। নানা আভিজাত্যহীন পুষ্প তাঁহার কল্পনার নিকট ইহাদের অম্ল-মধুর, সংশয়কীটদষ্ট, বিশ্বরহস্যের কৌতুক প্রদ অসঙ্গতির সহিত একসূত্রে গাঁথা রসসত্তাটি উদ্‌ঘাটন করিয়াছে—ফুলের পেলব সৌকুমার্য, বিশুদ্ধ পরাগরাগের উপর রঙ্গের দমকা হাওয়াতে উৎক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণার একটা লঘুস্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তীক্ষ্ণ, শাণিত প্রবচন পরম্পরার মাধ্যমে কবিমনের বৈশিষ্ট্যটি স্মরণীয় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে প্রিয়নাথ সেন অনবদ্য বিশ্লেষণের দ্বারা পাঠকের নিকট কবির রচনাভঙ্গীর এই মৌলিকতাটি চমৎকারভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মিলটনের কাব্য সম্বন্ধে প্যাটিসনের যে শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ-নির্দেশক স্মরণীয় উক্তি—ইহা simple (সরল), sensuous (রূপরসবিশিষ্ট) ও passionate (আবেগময়) হইবে তাহা প্রিয়নাথ প্রমথ চৌধুরীর কাব্যে উদাহৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে মিলটনের তত্ত্ব ও আধ্যাত্ম কল্পনাপ্রধান কাব্য হইতে প্যাটিসন এই মূল সূত্রটি নিষ্কাশন করিয়াছেন প্রমথ চৌধুরীর তির্যকভঙ্গীসমন্বিত, বৈদগ্ধ্যপ্রধান কবিতাগুলিতেও এই মান দণ্ডের প্রয়োগ একটু আশ্চর্য ঠেকে, কিন্তু ইহা অযৌক্তিক নহে। মিলটনে পরলোকতত্ত্ব ও নীতিপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া ও চৌধুরী মহাশয়ের ঈষৎ-কষায় মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশকে অনুরঞ্জন করিয়া কাব্যের যে চিরন্তন লক্ষণ—অনুভূতির নিকট উজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান রূপাবয়ব—তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। লঘু ব্যঙ্গপ্রবণতা, মনের অনাসক্ত ঔদাসীন্য ও খেয়ালী বিচরণশীলতা আপনার উপযোগী কাব্যদেহ রচনা করিয়া

লইয়াছে—শাদা কুয়াসার চারিদিকে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে সত্তার অপরূপত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। হাল্‌কা ভাব গভীর অনুভূতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনবদ্য রস-সংহতি ও দেহসৌষ্ঠব অর্জন করিয়াছে। অবশ্য ইহার যে স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম না ঘটিয়াছে তাহা নহে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকের সাফল্য বিস্ময়কর। স্থানে স্থানে গদ্যরীতি ও ব্যঙ্গাত্মক মানসভঙ্গী ঠিক কাব্যরসে দ্রবীভূত হয় নাই ও পাঠকের মনে রসানুভূতির বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু কবিতাগুলির প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য এইখানে যে কবির সমগ্র মনোভাব একটি অখণ্ড কাব্য-প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে ও কবির প্রকাশভঙ্গী এই নূতন রসটিকে সার্থকভাবে পরিবেশন করিয়াছে। প্রিয়নাথ সেন এই কথাটি সুস্পষ্টভাবে না বলিলেও তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধটিতে পরোক্ষভাবে এই সত্যের দ্যোতনা রহিয়াছে।

(৮)

অতি-আধুনিক সমালোচক-গোষ্ঠীর বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইঁহাদের সমালোচনা-ভঙ্গী কোন কোন অংশে যে নূতন পথ ধরিয়া চলিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। পূর্বযুগের উচ্ছ্বাসমূলক মনোবৃত্তি এখন অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া নিরাসক্ত, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইতেছে। এই পরিবর্তন যুগধর্মের অনুগামী। সাহিত্যে উচ্ছ্বাসের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাতেও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। রসোপলব্ধি অপেক্ষা মূল্যানুসন্ধান ও প্রেরণার উৎস আবিষ্কারেই আধুনিক সমালোচনার অধিকতর প্রবণতা। বাঙ্গালা সমালোচনা এই নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে উৎসুক। ইহার চরম সিদ্ধির পরিমাপ করিবার দিন এখনও আসে নাই। তথাপি মনে হয় প্রাচীন যুগের সহিত তুলনায় আধুনিক সমালোচনা যে উন্নততর পর্যায়ভুক্ত এ কথা বলা যায় না। তখনকার অকুণ্ঠ রসোপলব্ধি ও সুস্পষ্ট বিচার এখন অনেকটা সংশয়জড়িত ও সতর্ক হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক সমালোচনার চিরন্তন মূল্য-নির্ধারণ ভবিষ্যতের উপর রাখিয়া এখানে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া বাঙ্গালা সমালোচনার যে বিশাল পরিধি রচিত হইয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালীর সাহিত্য-বিশ্লেষণ-

প্রতিভার জয়স্তম্ভরূপে দাবী করা যাইতে পারে। এবং এই সাহিত্যরস-সচেতনতাই তাহার মনোভূমিকে সিক্ত ও উর্বর করিয়া তাহাকে নূতন ও বিস্ময়কর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। এই সাহিত্যপরাগসুরভি সচল আবহের মধ্যে উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাঙ্গালা সাহিত্য মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

(১)

সাহিত্য সমালোচনার দুইটি পর্যায় অবশ্য স্বীকার্য। একটি প্রাচীন ও অন্যটি আধুনিক। আরব ও চীনকে বাদ দিয়ে যদি শুধু ভারতের কথা ধরা যায় তবে সাহিত্য সমালোচনার অন্ততঃ এই দুটি পর্যায়* স্বীকৃত হয়। হয়ত প্রতীচ্যের বেলায় সেটা সত্য নয়। প্রতীচ্যের সাহিত্য সমালোচনার পর্যায়-বিভাগ কিছুটা অন্য রকম। তবে এক বিষয়ে উভয় মহাদেশের সাহিত্য-সমালোচনার মিল দেখতে পাওয়া যায়,—সে দিকটি হচ্ছে এই যে (১) সমালোচনার কাজ হচ্ছে সাহিত্যের নিন্দা করা (২) নয়ত, প্রশংসা করা, এবং (৩) সাহিত্যের মানদণ্ড ও জাতি গোত্র নির্দেশ করা।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনা মোট পাচটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সম্প্রদায়গুলি যথাক্রমে (১) রস সম্প্রদায়; (২) গুণ সম্প্রদায়; (৩) বক্রোক্তি সম্প্রদায়, (৪) রীতি সম্প্রদায় ও (৫) ধ্বনি সম্প্রদায়।

বেদোত্তর যুগে ছন্দ ও অলঙ্কার নির্ণয় করাই ছিল সাহিত্য-সমালোচকের লক্ষ্য। এর পর হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে শব্দ-শক্তি, রসতত্ত্ব প্রভৃতি সমালোচনার আওতায় এল। "রসো বৈ সঃ", কি—"ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ" প্রভৃতি মন্তব্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত অনুভাব-বিভাব ও ভাব নির্ভর রসতত্ত্ব বিশ্লেষণের পূর্ববর্তী যুগের।

অলঙ্কার ও ছন্দ নির্ণয় যে যুগের সমালোচকদের লক্ষ্য ছিল সে যুগের প্রতিনিধি হচ্ছেন **মেধাবী ও শিলালিন**। বলা বাহুল্য এঁরা হচ্ছেন ভরতের পূর্বসূরী। **ভরতের নাট্যশাস্ত্রে** সবপ্রথম কাব্য ও নাটকের অন্তর্গত ভাব, বিভাব, অনুভাব ও রসের উল্লেখ ও আলোচনা দেখা যায়। সুতরাং এমন কথা ধ'রে নেওয়া চলে যে প্রাচীন ভারতে কাব্য-নাটক কিছু কিছু লেখা হ'লে পর ভরতের আবির্ভাব ঘটেছিল। মহাকবি ভাসের লেখা নাটকগুলি

* প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনার কালক্রমে পঞ্চ শাখা বা সম্প্রদায় রূপ বিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও প্রাচীন ও আধুনিক—এই দুইটি পর্যায় ছাড়া মধ্যবর্তী কোন পর্যায় ধরে নেওয়ার পক্ষে যুক্তির অভাব দেখতে পাওয়া যায়।

যদি সর্বপ্রাচীন দৃষ্টান্ত হয় তবে, সেগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক এবং অশ্বঘোষের লেখা "বুদ্ধ চরিত" ও "সৌন্দরনন্দ" যদি ভারতের প্রাচীনতম কাব্য হয় তবে তাদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক। স্থতরাং এই সময়ের কিছু পরে, নাগাদ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়ে থাকতে পারে। মঙ্গলাচার্য নামক আরেক জন প্রাচীন ছন্দ ও অলঙ্কারবিদের নামও জানতে পারা যায়। ইনি মেধাবী ও শিলালিনের উত্তরসূরী। "**পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র**" কিন্তু বেদোত্তর যুগের রচনা। আচার্য পিঙ্গল সম্ভবতঃ মেধাবী ও শিলালিনের উত্তরসূরী ; তবে কালগত ব্যবধান খুব বেশী না হতেও পারে। এই সব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনায় বেদোক্ত আশী অলঙ্কারের ও অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, ব্যাহৃতি, জগতী ছন্দের উল্লেখ ও আলোচনা দেখা যায়। ষড়্ বেদাঙ্গের মধ্যে ছন্দের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তার প্রতিনিধিত্ব করত বোধ হয় (১) পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র ; (২) ও মেধাবী ও শিলালিনের অলঙ্কার-সঙ্কলন। বলা বাহুল্য যে এই আলঙ্কারিকদ্বয়ের কোন রচনা সাক্ষাতভাবে আমাদের হাতে এসে না পৌছলেও ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে এবং পরবর্তী আলঙ্কারিকদের রচনায় এঁদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনার অঙ্গস্বরূপ হচ্ছে (১) টীকা-টিপ্পনী, (২) বৃত্তি ও কারিকা। টীকা ও টিপ্পনী ছিল অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা এবং বৃত্তি ও কারিকায় থাকত অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা ছাড়াও ছন্দের উল্লেখ, অঙ্গীরসের উল্লেখ এবং অধিকন্তু কোন প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ। এই ভাবে সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনায় বিধৃত ছিল সাহিত্যের শিল্পগত বৈশিষ্ট্যের কথা এবং তার মধ্যে মনস্তত্বের কোন স্থানই ছিল না।

(২)

প্রাচীন ইউরোপের সাহিত্য সমালোচনার জনক হচ্ছেন প্লেটো। তিনি **mimetic theory**-র উদ্গাতা এবং শিল্প-সাহিত্যের নিন্দক পর্যায়ভুক্ত। তাঁর প্রতিভাবান শিষ্য এরিষ্টটল্-এর রচিত **Poetics**-এর ভগ্নাবশেষই হচ্ছে প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার একমাত্র উৎস। তিনি তাঁর গ্রন্থে **tragedy** বা বিরস নাটকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখান যে **Plato** কথিত

mimesis (অনুকরণ বৃত্তি) শুধু শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির কারণ নয়; মানুষের অন্তর্নিহিত Entelecheia (অনুকরণ-নির্ভর সৃজনী শক্তি বা প্রেরণা) শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির কারণ স্বরূপ। Poetics-এর পর তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে Rhetoric। এই গ্রন্থে তিনি বক্তৃতার বর্গীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক কবি ও নাট্যকারদের ব্যবহৃত কিছু কিছু অলঙ্কারের বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা করেন। Plato ও তাঁর শিষ্য Aristotle ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের লোক। Aristotle তাঁর Poetics-এ tragedy-র পাঁচটি আবশ্যকীয় উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এই পাঁচটি উপাদান হচ্ছে, যথাক্রমে, Plot বা কথাবস্তু, Character বা চরিত্র, Diction বা সংলাপ ; Moods and motives বা sentiment বা অভিসন্ধি বা মনোবৃত্তি ; Stage representation বা দৃশ্যসজ্জা ও Musical Accompaniment বা বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। উপরন্তু Aristotle এর মতে আধিদৈবিক চরিত্র tragedy র মধ্যে না আনাই ভাল এবং স্থান, কাল ও পাত্রগত সামঞ্জস্য নাট্যকারের রক্ষা করে চলা উচিত। অযুক্তিযুক্ত বা অবাস্তব ঘটনার অবতারণা নাটকে না করাই উচিত।

এরপর Plato ও Aristotle-এর সাহিত্য সমালোচনার অনুবর্তন দেখা যায়—Horace-এর De Arte Poetica Liber বা Ars Poetica-য় (খ্রীষ্ট জন্মের ১৪ থেকে ১১ বৎসর পূর্বে) এবং Quintilian-এর Institutes-এ। এইসব রচনা আকারে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং এদের মধ্যে লেখকদের মৌলিক চিন্তার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। Julius Caeser-এর সমকালীন Cicero অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের কিছু পূর্বেকার লোক, Art of oration-এর ওপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং Longinus-এর রচনার নাম হচ্ছে On the sublime। Longinus খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে জীবিত ছিলেন এবং Quintilian ছিলেন Cicero-র সমসাময়িক।

(৩)

নাট্যাচার্য ভরতের উর্ধ্বতন কালসীমা খ্রীঃ দ্বিতীয় শতক এবং নিম্নতম কালসীমা খ্রীঃ পঞ্চম শতক। ভরতের পর খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হন আচার্য দণ্ডী। তাঁর গ্রন্থের নাম "কাব্যাদর্শ"। আচার্য দণ্ডী কিন্তু কালিদাসের পরবর্তীকালের লোক। মহাকবির মেঘদূতের পূর্বমেঘ অংশে টীকাকার মল্লিনাথের মতে "নিচুল" নামক একজন রস-সাম্প্রদায়িকের উল্লেখ আছে।

এঁর কোন লেখা কিন্তু আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। একমাত্র অগ্নিপুরাণে উপমা, দীপক, রূপক, যমক প্রভৃতি এমন কতকগুলি অলঙ্কারের উল্লেখ ও আলোচনা চোখে পড়ে যেগুলির যথাযথ উল্লেখ ও আলোচনা দণ্ডীর কাব্যাদর্শে স্থান পেয়েছে। সুতরাং দণ্ডীর কাব্যাদর্শ পূর্ববর্তী কি অগ্নিপুরাণ পূর্ববর্তী তা তর্কের বিষয়। তবে মনে হয় আচার্য ভরত যদি পতঞ্জলির সমকালীন হ'ন কিংবা দু-একশ বছর আরও পরের লোক হ'ন তবে কালিদাসের কিছু পূর্বে অগ্নিপুরাণ রচিত হয়েছিল এবং কালিদাসের সময়ে আচার্য নিচুল বিদ্যমান ছিলেন। এর কারণ হচ্ছে এই যে মহামুনি ভরত ও মহাকবি কালিদাসের মধ্যে এমন যথেষ্ট পরিমাণ কালগত ব্যবধান ছিল যে কালের মধ্যে রসতত্ত্বের দিক থেকে না হোক্, ছন্দ ও অলঙ্কারের দিক থেকে নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। নাট্যতত্ত্বের দিক থেকেও সরস ও মিলনান্ত নাটক লেখার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার অনুসরণ মহাকবি ভাস না করলেও মহাকবি কালিদাস করেছিলেন। কালিদাস তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে ভাস ছাড়া কবিপুত্র ও সোমিল্ল নামক আরও দুজন নাট্যকারের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এঁদের লেখা কোন নাটক আজও পর্যন্ত না পাওয়া যাওয়ায়, তাঁরা ঠিক কোন ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছিলেন একথা বলা যেমন কঠিন, তেমনি তাঁদের রচনার ভিত্তিতে মহামুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের, আচার্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শের ও অগ্নিপুরাণের কাল নির্ণয় করা দুরূহ। যাই হোক আচার্য দণ্ডী ছিলেন রস-সাম্প্রদায়িক এবং তার গ্রন্থে গুণ ও রীতির উল্লেখ ও আলোচনা ভরতের অনুসরণে করা হয়েছে।

আচার্য ভামহকে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক বলে ধরা হয় এবং তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম "কাব্যালঙ্কার"। কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে কাব্যাদর্শের ঐতিহ্যানুসরণ পুরাপুরি দেখতে পাওয়া যায়। যে ছত্রিশটি অর্থালঙ্কারের উল্লেখ ও আলোচনা আচার্য দণ্ডী করেছেন ভামহও সেই ছত্রিশটি অর্থালঙ্কারের উল্লেখ ও আলোচনা তাঁর গ্রন্থে করেছেন। আবার দণ্ডীর স্বীকৃত "হেতু", "সূক্ষ্ম" ও "লেশ" অলঙ্কারকে ভামহ কোন স্বীকৃতিই দেননি। অথচ অষ্টম শতাব্দীর আলঙ্কারিক আচার্য বামন আচার্য দণ্ডীর "লেশ" অলঙ্কারকে স্বীকার করে নিয়ে "ব্যাজোক্তি" নাম দিয়েছেন। অবশ্য আচার্য ভরত ও দণ্ডীর অনুসরণে ভামহ মাধুর্য, প্রসাদ ও ওজঃ গুণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং গৌড়ী ও বৈদর্ভীরীতিকেও স্বীকার করে নিয়েছেন।

আচার্য বামনের রচিত গ্রন্থটির নাম হচ্ছে "কাব্যালঙ্কার-সূত্র-বৃত্তি"। ইনি ছিলেন কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভামন্ত্রী এবং উদ্ভটাচার্য বামনের সমসাময়িক ও জয়াপীড়ের মন্ত্রীসভার সভাপতি ছিলেন। উদ্ভটাচার্যের রচিত গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছিল "কাব্যালঙ্কার-সার-সংগ্রহ"। "কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি ও কাব্যালঙ্কার সার-সংগ্রহে" যেমন সৌসাদৃশ্য তেমনি বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। এইরকম পার্থক্যের কারণ উদ্ভট ছিলেন ভামহের অনুসরণকারী এবং বামন ছিলেন দণ্ডীর অনুসরণকারী। আচার্য উদ্ভটের আরেকখানি রচনার নাম "ভামহ বিবরণ"।

নবম শতাব্দীতে কাশ্মীরেই ধ্বনি-মতবাদের প্রবর্তন হয়, কিন্তু প্রবর্তকের নামটি ঠিক আজও পর্যন্ত জানা যায়নি। অভিনবগুপ্তের "লোচন" টীকা থেকে যে তিনজন পূর্বসূরীর নাম জানতে পাওয়া যায় সেই তিনজন হচ্ছেন মুক্তাকণ, শিবস্বামী ও রত্নাকর। এঁদের মধ্যে কোনজন প্রথমে ঠিক ধ্বনি-মতবাদ শ্লোকবদ্ধ করেন তা আজও জানা যায়নি। ধ্বনি-নির্ভর ব্যঞ্জনা বা ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিই যে কাব্যের প্রাণ, এই সিদ্ধান্তের উদ্গাতা আনন্দবর্ধনাচার্য ন'ন; অন্য কোন ব্যক্তি, এমন কথাই জানতে পারা গেছে। ধ্বনি-মতবাদ বিষয়ক পূর্বসূরীদের শ্লোকবদ্ধ রচনার বৃত্তি বা কারিকামাত্র রচনা করেন কাশ্মীর রাজ অবন্তীবর্মার সভাকবি আনন্দবর্ধন। আচার্য অভিনব গুপ্ত আনন্দবর্ধনের বৃত্তি বা কারিকা "ধ্বন্যালোকের" যে টীকা রচনা করেন, তার নাম রাখেন "লোচন।" "লোচনে"র পরেও ধ্বন্যালোকের যে আরেকটি টীকা লিখিত হয়, তার নাম "চন্দ্রিকা"।

খ্রীঃ নবম-দশম শতকে দুজন ধুরন্ধর আলঙ্কারিক আবির্ভূত হন, একজনের নাম রুদ্রট ও অন্যজনের নাম রাজশেখর। রুদ্রট রচিত গ্রন্থের নাম "কাব্যালঙ্কার" আর রাজশেখরের গ্রন্থের নাম "কাব্যমীমাংসা"। একাধিক কারণে রুদ্রটের "কাব্যালঙ্কার"-গ্রন্থের গুরুত্ব বা মূল্য অত্যধিক। দণ্ডী তাঁর "কাব্যাদর্শে" গৌড়ী ও বৈদর্ভী রীতির উল্লেখ করেন। তাঁর পর আচার্য বামন তাঁর "কাব্যালঙ্কারসূত্র-বৃত্তি" গ্রন্থে তৃতীয় রীতি পাঞ্চালীর উল্লেখ করেন। আচার্য বামনের পর রুদ্রট তাঁর "কাব্যালঙ্কারে" লাটী রীতির উল্লেখ ও আলোচনা করেন। আচার্য বামনের কাল পর্যন্ত নয়টি রস স্বীকৃত ছিল। রুদ্রট দশম রসের সংযোজন করেন এবং রসটির নাম রাখেন "শ্রেয়ান"। এই রসটি বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদের "সখ্য" রসের সমান।

রাজশেখর ছিলেন গুর্জর-প্রতীহার রাজ মহীপালের পিতা মহেন্দ্রপালের সভাকবি। ইনি "কর্পূরমঞ্জরী" নামক প্রাকৃত• নাটক ও "বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা" নামক সংস্কৃত নাটক ছাড়াও "কাব্যমীমাংসা" নামক যে অলঙ্কার গ্রন্থ লেখেন তা আঠারটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এর প্রথম অধ্যায় "কবি-রহস্য" আবার আঠারটি অধ্যায়ে বা উপ-বিভাগে বিভক্ত বিস্তৃত তালিকার মত। ইনিও রস-সাম্প্রদায়িক ছিলেন।

কাশ্মীরের আরেকজন আলঙ্কারিক ভট্টশঙ্কুক আনন্দবর্ধনাচার্যের কিছুটা পরবর্তীকালের এবং রুদ্রটের সমকালবর্তী ছিলেন। নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে ভট্টশঙ্কুকের (১) "অনুমিতিবাদ" খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার ভট্টলোল্লট, যাঁর নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত মতবাদ (২) "উৎপত্তিবাদ" নামে প্রসিদ্ধ তিনি ভট্টশঙ্কুকের পূর্বস্থরী ছিলেন এবং (৩) "ভুক্তিবাদের" প্রতিপাদক ভট্টনায়ক, এঁদের পরবর্তী কিন্তু নিঃসন্দেহে অভিনবগুপ্তের পূর্বস্থরী ছিলেন। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে অভিনবগুপ্তের (৪) অভিব্যক্তিবাদই বোধহয় সর্বশেষ মতবাদ যার মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত দেখতে পাওয়া যায়।

খ্রীঃ দশম শতকে আবির্ভূত হন—মুকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, ধনঞ্জয়, ধনিক ও ভট্টতৌত। মুকুল ছিলেন ইন্দুরাজের গুরু এবং "অভিধাবৃত্তিমাতৃকা"র রচয়িতা। ভট্টতৌতের লেখা "কাব্য-কৌতুক" আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি, শুধু তাঁর শিষ্যের রচনায় এর উদ্দেশ মেলে। ইন্দুরাজের একমাত্র রচনা হচ্ছে উদ্ভটাচার্যের কাব্যালঙ্কার-সার-সংগ্রহের "লঘু বৃত্তি"। ভট্টনায়কের লেখা গ্রন্থের নাম হচ্ছে "হৃদয় দর্পণ"; কিন্তু তাঁর লেখা এই গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি। ভট্টনায়ক ধ্বনি-মতবাদের বিরোধী রস-সাম্প্রদায়িক ছিলেন।

ধনঞ্জয়ের রচিত গ্রন্থের নাম "দশরূপক"। এই গ্রন্থের যিনি বৃত্তি রচনা করেন তাঁর নাম ছিল ধনিক। ধনিকের রচিত বৃত্তির নাম হচ্ছে "অবলোক"। ধনঞ্জয় ছিলেন মালবের অধিপতি মুঞ্জের সভাসদ এবং রস-সাম্প্রদায়িক। বৃত্তিকার ধনিকের রচিত আরেকখানি গ্রন্থের নাম হচ্ছে "কাব্য নির্ণয়"। গ্রন্থ মধ্যে ধ্বনিবাদের খণ্ডন প্রচেষ্টা দেখা যায়।

খ্রীঃ দশম শতাব্দীর আরেকজন শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক হচ্ছেন আচার্য কুন্তক বা কুন্তল। এঁর রচিত গ্রন্থের নাম হচ্ছে "বক্রোক্তিজীবিত"। ভামহ সকল অলঙ্কারকেই বক্রোক্তি বলেছেন এবং অতিশয়োক্তিকে বলেছেন একমাত্র

বক্রোক্তি। কিন্তু কুন্তকের মতে "বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্" অর্থাৎ বক্রোক্তিই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ। কাব্যের প্রতীয়মান অর্থ কাব্যের আত্মা নয়, আত্মা হচ্ছে বক্রোক্তি এবং আপাত প্রতীয়মান অর্থ বহু বিচিত্র বক্রোক্তির একটি অঙ্গ মাত্র। কুন্তকের মতে রীতি হচ্ছে বহুধা এবং কবির স্বভাবে রীতির জন্ম। কুন্তকও কাশ্মীরের অধিবাসী।

অভিনব গুপ্তের কাল খ্রীঃ দশম শতকের শেষভাগ থেকে একাদশ শতকের প্রথমদিক হতে পারে। ইনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের যে সুবৃহৎ ভাষ্য রচনা করেন তার নাম হচ্ছে "অভিনবভারতী"। রসতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইনি ছিলেন অভিব্যক্তিবাদী। আবার আনন্দবর্ধনের বৃত্তি ধ্বন্যালোকের যে টীকা তিনি রচনা করেন তার নাম দেন "লোচন"। তাঁর লোচনটীকা যেমন সার্থক তেমনি প্রসিদ্ধ। ইনি অবশ্যই একজন প্রতিভাবান পণ্ডিত ছিলেন, কারণ অলঙ্কার গ্রন্থ ছাড়াও তিনি অন্য বিষয়ের উপর গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাঁর রচিত "বরিবস্যা প্রকরণম্" শাক্ত তন্ত্রোপাসনা বিষয়ক গ্রন্থ।

ধ্বনি মতবাদের বিরোধিতা করেন যে মহিম ভট্ট—তিনি রসতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ছিলেন অনুমিতিবাদী। ইনি খ্রীঃ একাদশ শতকের মধ্যভাগে রচনা করেন "ব্যক্তি বিবেক"। ইনি ছিলেন একজন নিষ্ণাত নৈয়ায়িক। তাই যেমন আচার্য কুন্তকের বক্রোক্তির স্বতন্ত্র মহিমা তিনি স্বীকার করেননি তেমনি ধ্বন্যালোকের তিন রকম প্রতীয়মান অর্থে, বস্তুধ্বনি, অলঙ্কার ধ্বনি ও রস ধ্বনিকে স্বীকার করেও শাব্দিক ব্যঞ্জনাকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে শব্দের ব্যঙ্গ্য অর্থ বলে কিছু নেই, আছে বাচ্যার্থ আর অনুমেয় অর্থ। কাব্যে অনুমানরূপ বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সাহায্যে অনুমেয়রূপ নানা রস ব্যক্ত করে—এই হচ্ছে তাঁর সিদ্ধান্ত।

খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র, ভোজরাজ, মম্মটভট্ট ও রুদ্রভট্ট আবির্ভূত হন। এঁদের মধ্যে কাশ্মীর-বাসী ক্ষেমেন্দ্রের দু'খানি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ (১) "কবিকণ্ঠাভরণ" ও (২) "ঔচিত্য-বিচার-চর্চা" সমান উল্লেখযোগ্য। তিনি রসবাদী আলঙ্কারিক ছিলেন এবং ঔচিত্যকেই কাব্যের প্রাণ ব'লে মনে করতেন। তিনি এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য আলঙ্কারিকের মত তিন রীতি ও দশ গুণকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। কাশ্মীররাজ অনন্তদেবের রাজত্বকালে ক্ষেমেন্দ্র তাঁর গ্রন্থগুলি লেখেন।

মালবাধিপতি ভোজদেব বা ভোজরাজ কাশ্মীররাজ অনন্তদেবেরই সমসাময়িক ছিলেন। ভোজরাজের একমাত্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" বলা হয়েছে দোষহীন, গুণযুক্ত, অলঙ্কার মণ্ডিত অথচ রসান্বিত কবিকীর্তিই প্রীতির কারণ হয়। তিনি দণ্ডী, বামন, রুদ্রট প্রভৃতির অলঙ্কার, রীতি, ঔচিত্য, গুণ ও রস-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্বকীয় মতের দ্বারা পরিশোধিত ক'রে গ্রহণ করেছেন।

মম্মটভট্ট ক্ষেমেন্দ্রের মত কাশ্মীরবাসী ছিলেন। ইনি আনন্দবর্ধনের অনুসরণকারী ও অভিনবগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁর একমাত্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম "কাব্যপ্রকাশ"। "কাব্যপ্রকাশ" রচনার কাল ১১শ শতকের শেষ থেকে ১২শ শতকের প্রথম ভাগ। ধ্বন্যালোকের অনুসরণে ইনি কাব্যের তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করেন। তাঁর মতে প্রথম শ্রেণীর কাব্য হচ্ছে ধ্বনি কাব্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য হচ্ছে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য এবং গুণালঙ্কার যুক্ত অব্যঙ্গ্যের নাম হচ্ছে চিত্র।

রুদ্রভট্ট একাদশ শতকের শেষ ভাগে রচনা করেন "শৃঙ্গারতিলক।" শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে শৃঙ্গারতিলক থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্লোক উদ্ধৃত করেন। শৃঙ্গারতিলক গতানুগতিক ভাবে লেখা রস সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্যালোচনা শাস্ত্র।

খ্রীঃ দ্বাদশ শতকে রুয্যক, বাগ্‌ভট ও হেমচন্দ্রের অভ্যুদয় ঘটে। রুয্যক কাশ্মীরবাসী ধ্বনিবাদী ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনা "কাব্য প্রকাশ সঙ্কেত।" মম্মট ভট্টের কাব্য প্রকাশের টীকা হচ্ছে "কাব্য প্রকাশ সঙ্কেত।" এর পর তাঁর মৌলিক রচনা যেটি প্রকাশ পায় তার নাম হচ্ছে "অলঙ্কার সর্বস্ব।" এই গ্রন্থ রচনায় তিনি পরোক্ষভাবে ধ্বন্যালোকের এবং প্রত্যক্ষ ভাবে কাব্যপ্রকাশের অনুসরণ করেন। এই গ্রন্থে তিনি কেবলমাত্র শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেন। অর্থালঙ্কারের বিচার করেছেন তিনি প্রধানতঃ লক্ষণামূলাব্যঞ্জনার পথে অর্থাৎ মম্মট ভট্টের ব্যঞ্জনার আলোকে।

বাগ্‌ভটের রচিত "বাগভটালঙ্কার" একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্যালোচনা শাস্ত্র। ইনি রস-সাম্প্রদায়িক হলেও ধ্বনিমতবাদ নিয়ে কিছুটা আলোচনাও করেছেন।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থের নাম "কাব্যানুশাসন।" এই গ্রন্থটিকে অলঙ্কারের কোষ

ন্থ বলা চলে। তিনি এই গ্রন্থে তাঁর পূর্বসূরীদের গুণ, অলঙ্কার, দোষ, রস ও নি সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। ফলে মৌলিকতার অভাব সত্ত্বেও বাচার্যদের মত-সংগ্রহের গ্রন্থ হিসাবে কাব্যানুশাসনের মূল্য অনস্বীকার্য।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে বাগ্‌ভট, জয়দেব, বিদ্যাধর ও বিদ্যানাথ নামক ালঙ্কারিকের অভ্যুদয় হয়। বাগ্‌ভট রচিত অলঙ্কার শাস্ত্রের নাম "কাব্যানু-াসন।"

জয়দেব কৃত গ্রন্থের নাম—"চন্দ্রালোক"। ইনি "প্রসন্ন রাঘব" নামে কখানি উৎকৃষ্ট নাটকেরও রচয়িতা। চন্দ্রালোকের অলঙ্কারাংশের ব্যাখ্যা রেছেন দার্শনিক অপ্পয় দীক্ষিত তাঁর "কুবলয়ানন্দকারিকায়"।

বিদ্যাধরের গ্রন্থের নাম হচ্ছে "একাবলী" এবং বিদ্যানাথের গ্রন্থের নাম প্রতাপরুদ্র যশোভূষণ।" এঁরা দুজনেই ছিলেন ধ্বনিবাদের সমর্থক। দ্যাধরের মতে কাব্যার্থের ভেদ হেতু পাঠকের বিচিত্র আনন্দবোধ থেকেই ঙ্গারাদি বিচিত্র স্বাদের উদ্ভব হয়। "স্বাদ" কথার অর্থ হচ্ছে রসাস্বাদ। বিদ্যানাথ লেছেন কাব্যের দেহই হচ্ছে শব্দার্থ এবং তার প্রাণ হচ্ছে ব্যঙ্গ্য বৈভব।

খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন সিংহভূপাল, ভানুদত্ত ও বিশ্বনাথ বিরাজ। ভানুদত্ত রচনা করেন "রসতরঙ্গিনী" ও "রসমঞ্জরী" আর সিংহভূপাল চনা করেন "রসার্ণবসুধাকর"। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে সার্ণব সুধাকরের অনুসরণেই মনস্তত্ত্ব সম্মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা ৃঙ্গাররসকে পরিস্ফুট করেছিলেন। বিশ্বনাথ (চক্রবর্তী) কবিরাজের "সাহিত্যদর্পণ" একখানি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ। কবিরাজ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য—এই দুয়েরই সমান সমালোচনা করেছেন। প্রথম থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যে নানাপ্রকার শ্রব্যকাব্য যেমন, দীপ্তিকাব্য, দ্রুতিকাব্য, মহাকাব্য প্রভৃতি এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নানাপ্রকার দৃশ্যকাব্যের যেমন প্রকরণ, ব্যায়োগ, ডিম্ব, ভাণ প্রভৃতির দৃষ্টান্তসহ সমালোচনা করেছেন। তিনি "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" বললেও, ধ্বনি এবং গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের প্রচুর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে দোষ যেমন কাব্যের অপকর্ষক তেমনি গুণ, রীতি ও অলঙ্কার কাব্যের উৎকর্ষত্বের হেতু। বিশ্বনাথ তাঁর গ্রন্থে বহু ার ভেদ সমেত ছয়টি শব্দালঙ্কার ও সত্তরটি অর্থালঙ্কারের দৃষ্টান্তসহ মালোচনা করেছেন।

খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক হচ্ছেন মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষ কবি কর্ণপূর ও অপ্পয় দীক্ষিত। তাঁর গ্রন্থ "অলঙ্কারকৌস্তুভ" রচিত হয় আনুমানিক ষোড়শ শতকের সপ্তম দশকে। বলা বাহুল্য কবি কর্ণপূর ছিলেন ধ্বনিবাদী সুতরাং তাঁর গ্রন্থের আলোচ্য বস্তু হচ্ছে দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার ও ধ্বনি। অপ্পয় দীক্ষিতের অলঙ্কার গ্রন্থ দুটির নাম হচ্ছে "কুবলয়ানন্দ" ও "চিত্রমীমাংসা", ইনিও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধ্বনিবাদী। কুবলয়ানন্দ যেমন পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা শাস্ত্র, চিত্রমীমাংসা তেমনি মাত্র কয়েকটি সাদৃশ্য-মূলক অলঙ্কারের গ্রন্থ।

খ্রীঃ ১৭শ শতকে আবির্ভূত হ'ন মদ্রদেশবাসী পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। ইনি ছিলেন একাধারে বৈয়াকরণ, কবি ও আলঙ্কারিক। এঁর লেখা কাব্যের নাম "জগদাভরণ" এবং "ভামিনীবিলাস"। ইনি অল্পবয়সেই সম্রাট শাজাহানের ীস্থিত রাজসভায় চলে যান এবং শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাসুকোর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হ'ন। এঁর রচিত কাব্য সমালোচনা "রসগঙ্গাধর" ভারতীয় কাব্য-নাটক বিচারের ক্ষেত্রে এমন এক অপূর্ব সমাধানমূলক গ্রন্থ যার তুলনা নেই। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন ধ্বনিবাদী। কিন্তু তাঁর যে কাব্যসংজ্ঞা "রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্‌" এবং কাব্য পাঠের ফল—"লোকোত্তরা-হ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা" প্রভৃতি অভিনিবেশপূর্বক অধ্যয়ন করলে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি রসবাদ, ধ্বনিবাদ ও বক্রোক্তিবাদ প্রভৃতি সব কিছুকেই কাব্যের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়ে এমন একখানি অপক্ষপাতসূচক সমালোচনা লিখেছিলেন যা সব সাম্প্রদায়িকের পক্ষেই সন্তোষজনক হয়েছিল। এঁর পরেও গুজরাতের রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের লেখা "নাট্যদর্পণ" দৃশ্যকাব্যের পর্যাপ্ত সমালোচনা পূর্ণ একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

(৩)

Longinus হচ্ছেন ইউরোপের প্রথম Romantic Critic যাঁর লেখা On the Sublime (খ্রীঃ ১ম শতকে) Plotinus ও Porphyry-র সমালোচনার বিষয়ীভূত হলেও Caecilius এঁর জন্য প্রশংসা রেখে গেছেন। Plotinus ও Porphyry ছিলেন Neo-Platonists। সুতরাং তাঁদের কাছে Romantic criticism সমর্থনযোগ্য হবে কি ক'রে?

এর পরে ইউরোপে স্থরু হয় অন্ধকার যুগ। স্থতরাং এই যুগে পুরান সমালোচনার ধারায় গতানুগতিক ভাবে চর্বিতচর্বণ হ'তে থাকে। রেনাসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাই Marco Girolamo Vida-র লাটিন ভাষায় ছন্দযুক্ত কবিতায় লেখা "Poetica"। অবশ্য হোরেসের Liber de Arte Poetica-ও কবিতায় লেখা। Girolamo Vida-র গ্রন্থখানি তুলনামূলক ভাবে বিস্তৃত, বলা যেতে পারে। ১৬৭৯ সালে Sheffield, Earl of Mulgrave লেখেন Essay on Satire, এবং ১৬৮২ সালে তিনি লেখেন Essay on Poetry। এই দু'খানি সমালোচনার গ্রন্থেই ফরাসী সাহিত্য সমালোচক Boileau-র প্রভাব স্থপরিস্ফুট। ১৬৮১ সালে Roscommon-এর Essay on Translated Verse প্রকাশ পায়। ১৫৭৯-৮০ সালে Sir Philip Sidney লেখেন তাঁর Apology for Poetry। ১৬৬৫-৬৬ সালে John Dryden লেখেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Essay of Dramatic Poetry। ইতোপূর্বে Stephen Gosson-এর লেখা School of Abuse-কে পুরাপুরি সাহিত্য সমালোচনা বলা চলেনা; বরং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত তথ্যসংবলিত tragedy ও comedy-র নিন্দাই তাঁর গ্রন্থে করেছেন। Dryden-এর পর সমালোচক হিসাবে Alexander Pope ও Theobold-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের দু'জনের Shakespeare-এর সাহিত্য-সমালোচনা পরস্পর বিরোধীভাব সংবলিত। সামান্য হ'লেও Thomas Fuller (১৬০৮-৬১), Edward Phillips (১৬৩০-৯৬)-এর Shakespeare-এর সাহিত্য-সমালোচনা মোটামুটিভাবে সমালোচনা সাহিত্যের নূতন রুচি ও নূতন ভঙ্গীর পরিচায়ক। Joseph Addison (১৬৭২-১৭১৯) ও Richard Steele (১৬৭২-১৭২৯)-এর বিচ্ছিন্ন ভাবে Spectator পত্রিকায় মুদ্রিত সাহিত্য-সমালোচনা স্বাধীন অভিমত পরিপুষ্ট নূতন ধরণের চিত্তাকর্ষক রচনা বলে গণ্য হবার যোগ্য। এঁরা Dryden প্রবর্তিত Inductive criticism পরিহার করে Aesthetic School of Criticism-এর দিকে পা বাড়িয়েছেন। খ্রীঃ ১৭০০ সালে প্রকাশিত George Granville বা Lord Lansdowne-এর লেখা Essay upon Unnatural Flights in Poetry এবং Henry Home বা Lord Kames-এর লেখা এবং ১৭৬২ সালে প্রকাশিত Elements of Criticism কাব্যের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে

বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ ও দৃষ্টান্তযুক্ত সমালোচনা গ্রন্থ। খ্রীঃ ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদ শতকের মধ্যে ফ্রান্সেও কয়েকজন শক্তিশালী সমালোচকের আবির্ভাব ঘ যাঁরা তাঁদের উত্তরসূরীদের দীর্ঘকাল ধ'রে প্রভাবিত করেছিলেন, এঁরা হচ্ছে Le Bossu, Rapin, Bonhours ও Boileau।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশ পায় Thomas Rymer-এ Short View of Tragedy (১৬৯৩)। এই সমালোচনায় বিশেষভাবে তি Shakespeare-এর নাটকে উল্লিখিত কয়েকটি চরিত্রের অবাস্তব গঠনভঙ্গী কার্যকলাপের বিরূপ সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি Classic literatur বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করেন Romantic literature বিচারের ক্ষেত্রে

Joseph Warton, Lord Lyttelton, A. Pope ও Samuel Johnso প্রমুখ সমালোচক বিপরীতে দেখালেন যে Classics বিচারের মানদণ্ড Roman tic literature বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ভুল। রোমান্টিক সাহিত বিচারের মানদণ্ড পৃথক হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, Shakespeare-এ সাহিত্য এতখানি বাস্তবনিষ্ঠ যে তার সম্বন্ধে বলা চলে যে Shakespear প্রকৃতির সম্মুখে একখানি দর্পণ তুলে ধরেছেন।

অষ্টাদশ শতকের সমালোচনা-সাহিত্য চরিত্রকেন্দ্রিক এবং কাব্যতত্ত্বের সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক্ অভিমুখী। Thomas Whately, Willia Richardson, Maurice Morgann, William Hazlitt ও Charl Lamb প্রভৃতি পূর্বোক্ত তিন-চারটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে সাহিত্য সমালোচ করেন তা যথাক্রমে Romantic School, Aesthetic School ও Realisti School-এর অন্তর্গত।

উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচনা সাহিত্যকে নিজগুণে পরিপুষ্ট করে William Wordsworth ও Samual Taylor Coleridge, প্রথম Lyrical Ballads-এর ভূমিকা স্বরূপ সাহিত্য সমালোচনা লিখে এবং দ্বিতীয় Coleridge তাঁর Biographia Literaria লিখে। একই সময়ে Charl Lamb-এর "On the tragedies of Shakespeare," William Hazlit এর "Characters of Shakespeare's Plays", "Lectures on th English Poets", "Lectures on the Dramatic literature of th Elizabethan age" প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য এসবই হচ্ছে Romant

Criticism এবং এই ধরণের সমালোচনা মূর্ত হয়ে উঠল Thomas De Quincey ও W. S. Landor-এর সমালোচনায়। এই যুগের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সমালোচনক হচ্ছেন (অস্কার ওয়াইল্ড) Oscar Wilde।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে Victorian Age-এ A. C. Swinburne ও Edward Dowden, S. A. Brooke ও George Brandes, Shakespearology বলতে তাঁর Dramaturgy-র চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখান। Dr. Furnivall-Shakespeare-এর কাব্য-কবিতার ছন্দো-বৈশিষ্ট্য মাপজোখ ক'রে দেখিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। Abercrombie, Saintsbury শেক্সপীয়রের এবং Lytton Strachey-এ যুগের আরও ৩ জন ধুরন্ধর সমালোচক।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে A. C. Bradley শেকস্‌পীয়রের ৪ খানি প্রমুখ tragedy-র চরিত্র বিশ্লেষণ করে Substance of Romantic Tragedy প্রমাণিত করেন। H. B. Charlton শেকস্‌পীয়রের Comedy-গুলিও তাদের শিল্পগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তিনি আবার শেকস্‌পীয়রের Tragedy-র গঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা ক'রে তাঁর কবি-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত করেন। কিন্তু এই বিংশশতকের সত্তর বৎসরের মধ্যেই সাহিত্য সমালোচনা এতগুলি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে যে তাদের পরিচয় দান ও ব্যাখ্যা করা ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়েছে।

(৪)

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে এবং বিংশ শতাব্দীর সপ্তমদশক পর্যন্ত চলে আসছে। তার ফলে হিসাব করলে দেখা যায় যে এই সমালোচনা-সাহিত্য মাত্র একশ বিশ-ত্রিশ বৎসর বয়স্ক। সুতরাং শৈশব থেকে এই সাহিত্য এখন বাল্যে পদার্পণ করেছে। সত্য কথা বলতে কি, এখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার কোন রীতি বা দাঁড়া (standard) সৃষ্টি হয়নি, যার বলে Classic-কে Romantic থেকে এবং Romantic-কে Modern literature থেকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সমালোচনায় বাঙালী: সমালোচকেরা যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস

মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি সংস্কৃতের মত প্রৌঢ় সাহিত্যের সমালোচনা বাংলায় করে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটিয়েছেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথও তাঁর যৌবনকালে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে "প্রাচীন সাহিত্য" শীর্ষক গ্রন্থে তাঁর পূর্বসূরীদের ব্যর্থ অনুবর্তন ক'রে সময় ও শক্তির অপব্যয় করেছিলেন। সমালোচক জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেই একই ভুল করেছিলেন।

একমাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ বিভাগ দেখা যায় তাই যেন একমাত্র সাহিত্যগুলির ঐতিহাসিক সমালোচনা-স্বরূপ আমাদের সম্বল। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার মানদণ্ডের অভাবে এখনও পর্যন্ত আমাদের Classic সাহিত্য কি, Pseudo-Classic সাহিত্যই বা কি, Romantic সাহিত্য কি ও Modern সাহিত্যই বা কোনগুলি তা' নির্দিষ্ট হয়নি। নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি শোচনীয় পরিতাপের বিষয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সার্থক সাহিত্য সমালোচনা ব'লতে আমরা কালীপ্রসন্ন ঘোষের "নাটক," পূর্ণচন্দ্র বসুর "সাহিত্যে খুন," ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "সমালোচনা সাহিত্যে"র উল্লেখ করতে পারি, কেননা এগুলির মধ্যে সাহিত্যের শাশ্বত মানদণ্ড অনুযায়ী বিশেষ কতকগুলি দিক আছে। এই দিকগুলি যথাক্রমে নীতির ও মনস্তত্ত্বের। আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের যে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি তা তার বৈজ্ঞানিক দিক এবং এই দিকটি অন্ততঃ প্রাচীন পর্যায়ের সাহিত্য সমালোচনায় অনুপস্থিত। প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার অমোঘ বৈশিষ্ট্য বলতে বুঝি শ্রেণীবিভাগ ও শিল্পরীতি নির্দেশ। আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় Classification ও Stylisation ত' আছেই, উপরন্তু আছে নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের ঘটনা ও ক্ষেত্রবিশেষে মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়ন ও বাস্তবতা-অবাস্তবতা বিচার।

উল্লেখযোগ্য বাংলা সমালোচনা সাহিত্য যা আমরা পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধ-গুলি ছাড়া পাই, সেগুলি হচ্ছে (১৯শ শতাব্দীর) পূর্ণচন্দ্র বসুর "সাহিত্যের সমালোচনা", "সাহিত্যের আদর্শ" ও "সাহিত্যে অভিশাপ"। এই তিনটি প্রবন্ধে তিনি নীতি সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন তা প্রাচীন সাহিত্যের ঔচিত্য ও দোষ-এর সঙ্গে যেমন সম্পর্কিত, তেমনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী Art for life's sake-এর পরিচায়ক। শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর "সমালোচনা"-র মধ্যে সমালোচনা-

সাহিত্যের মানদণ্ডের কিছুটা উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "সংগীত ও কবিতা", "বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা" ও "কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন" বাংলা কাব্য-কবিতার সমালোচনায় নব দিগন্তের উদ্ভাসক। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু ও কবি প্রিয়নাথ সেনের "কাব্য কথা" রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা সমালোচনার Supplement বা পরিশিষ্টরূপে গণ্য হবার যোগ্য। প্রিয়নাথ সেনের "মানসী", রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কবিতা গ্রন্থের সমালোচনা। এরূপ সমালোচনার অবশ্যই কিছু মূল্য আছে। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের "নাটক ও উপন্যাস" এবং "বঙ্গসুন্দরী" কাব্যের সমালোচনা খুবই মূল্যবান। বিহারীলাল চক্রবর্তীর "বঙ্গসুন্দরী" কাব্য জাতীয়ভাব প্রণোদিত খণ্ড কাব্যেরই সুষ্ঠু নিদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্রের "মানস বিকাশ" এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের সম্মিলিত রচনা "বৃত্র সংহার" সমালোচনা Expressionistic criticism-এর নিদর্শন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "পলাসির যুদ্ধ" ঐতিহাসিক কাব্যের কালীপ্রসন্ন ঘোষের লেখা সমালোচনা সমান উপভোগ্য ও মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের যৌবন-কালের রচনা "মেঘনাদ বধ কাব্য" damaging criticism হলেও যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তব-দিকদর্শন পূর্ণ। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-কবিতার সমালোচনার যেমন তাঁর রসাস্বাদনের পরিচায়ক তেমনি বিশ্লেষণমূলক। বীরেশ্বর গোস্বামীর "বীরাঙ্গনা" সমালোচনা, সিদ্ধেশ্বর রায়ের লেখা (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের) "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" কাব্য সমালোচনা, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা কবি নবীনচন্দ্র সেনের "কুরুক্ষেত্র" কাব্যালোচনা থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে যে কাব্য সমালোচনার মানদণ্ড ও দৃষ্টিভঙ্গী ক্রম-বিকশিত হচ্ছিল তার থেকে বাংলা কাব্য-সমালোচনার দাঁড়া বা standard কি হবে তা স্থির করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর যে নাটকগুলির সমালোচনা হয়েছিল সেই নাটকগুলি রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন-কুল-সর্বস্ব", "বেণী সংহার", "রত্নাবলী" ও "অভিজ্ঞান শকুন্তল"-এর, দীনবন্ধু মিত্রের "নবীন তপস্বিনী", "নীল দর্পণ", "বিয়ে পাগলা বুড়ো" তা যেমন ইংরেজী সমালোচনার দ্বারা তেমনি সংস্কৃত সমালোচনার দ্বারা প্রভাবিত। তা সত্ত্বেও এগুলি থেকে বাংলা নাটক সমালোচনার মানদণ্ড স্থিরীকৃত হ'তে পারে। বাংলা উপন্যাসের চরিত্র সমালোচনার নিদর্শন হচ্ছে পূর্ণচন্দ্র বসুর "শৈবলিনী", পাঁচকড়ি ঘোষের

"জয়ন্তী", গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর "গিরিজায়া", জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "দেবী চৌধুরাণী", নক্ষত্রনাথ দেবের "প্রমীলা ও ইন্দুবালা", সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী", ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মডেল ভগিনী" (যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু রচিত) এবং চন্দ্রনাথ বসুর "দামিনী" ও "রামেশ্বরের অদৃষ্ট।" এই চরিত্র সমালোচনাগুলি অল্পবিস্তর ইংরাজীর Analytical, Expressionistic Inductive, Historical ও Romantic criticism দ্বারা প্রভাবিত হলেও এইগুলিই পরবর্তী যুগের সাহিত্য সমালোচনার দিক্‌দর্শনকারী বা পথিপ্রদর্শক হিসাবে উপযোগী বলে গণ্য হবার যোগ্য।

বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য সমালোচনার নূতন মানদণ্ড সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই। তাঁর "সাহিত্যের স্বরূপ", "সাহিত্যের পথে", "সাহিত্য" ও "আধুনিক সাহিত্য" যেমন মূল্যবান, তেমনি প্রয়োজনীয়। তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যকে লক্ষ্য করে তাদের যে শিল্প-শৈলীগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তা আজ আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের স্থিরীকৃত মানদণ্ড। রবীন্দ্রনাথের পর মোহিতলাল মজুমদারের, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের, দেবেন্দ্র বিজয় বসুর, ডঃ শশিভূষণ দাশ-গুপ্তের, ডঃ সুশীলকুমার দে-র স্থান নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্তমান সমালোচনা-সঙ্কলনে চন্দ্রনাথ বসুর (ঊনবিংশ শতকের) "নভেল বা কথা গ্রন্থের উদ্দেশ্য" ছাড়াও দেবেন্দ্র বিজয় বসুর "নভেলের শিল্প বা কবিত্ব" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি ইংরাজী প্রভাবিত হলেও যথেষ্ট মূল্যবান। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের "রিয়ালিজম্‌" শীর্ষক প্রবন্ধটি গৃহীত হয়েছে, কারণ এই প্রবন্ধ মধ্যে তিনি Realism-কে Romanticism থেকে সুন্দর ও সহজভাবে পৃথক করে ব্যাখ্যাত করেছেন। কবিশেখর কালিদাস রায়ের স্থান সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের পরেই নির্দিষ্ট হতে পারে। তাই আমরা তাঁর লেখা "প্রজ্ঞাদৃষ্টি-বোধদৃষ্টি ও রসদৃষ্টি" প্রবন্ধকে নিয়েছি। কবিশেখর কালিদাস রায়ের "প্রজ্ঞাদৃষ্টি-বোধদৃষ্টি-রসদৃষ্টি" মৌলিকতায় ভাস্বর না হলেও সাহিত্য বিচারের জন্য আধুনিক যুগে প্রয়োজনীয় যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুকুন্দরাম চক্রবর্তী" একটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সমালোচনা বলে গণ্য হ'তে পারে; যেহেতু মুকুন্দরামের কবি-কঙ্কণচণ্ডী স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন কক্ষের পাঠ্য সেই

হেতু তাঁর এই ব্যাখ্যানমূলক কাব্য সমালোচনা অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের কিছুটা সহায়তা করতে পারে। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের "সধবার একাদশী" দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের আলোচনা হিসাবে বিশেষ উপযোগী। বিশেষভাবে নায়কের চরিত্র সমালোচনাই লেখকের লক্ষ্য ছিল, বলে মনে হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষের উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। তাঁর লেখা "নাটক" প্রবন্ধটি যেমন উপযোগী তেমনই মূল্যবান। এই প্রবন্ধে তিনি যে আধুনিক বাংলা নাটকের শ্রেণী বিভাজন করেছেন তা হচ্ছে (১) দেশহিতৈষিতা প্রাসঙ্গিক, (২) অনুবাদমূলক ও (৩) প্রণয়জীবন নাটক। এই একাঙ্কীর যুগে এই রকম শ্রেণী বিভাগ স্বপ্নের মত মনে হ'লেও তাঁর যুগে এই ক'টি ধরণের নাটকই প্রচলিত ছিল। বোধহয় (১) ঐতিহাসিক, (২) সামাজিক, (৩) পারিবারিক বা গার্হস্থ্য (৪) প্রণয়মূলক ও (৫) অনূদিত—সরস ও বিরস বা মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক ব'লে শ্রেণী বিভাজন করলে তিনি ঠিক করতেন।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "মৃন্ময়ী" প্রকৃতপক্ষে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের রচিত "মৃন্ময়ী" উপন্যাসের সমালোচনা। মৃন্ময়ী বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলারই Supplement। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা যেমন Romantic উপন্যাস, "মৃন্ময়ী"ও তেমন দামোদর মুখোপাধ্যায়ের Romantic উপন্যাস, কিংবা শুধু তাই নয়, ঘটনাবলী ও চরিত্রের দিক্ দিয়ে অবাধ, অগাধ, অকূলস্পর্শ Romantic Imagination-এর পরিচায়ক উপন্যাস—এমনি কথাই চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় প্রতিপাদিত করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের আলোচনা প্রকৃতপক্ষে চরিত্রালোচনাই। প্রবন্ধমধ্যে তিনি নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখী, নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী এবং সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী বিভাগক্রমে-নায়ক-নায়িকার চরিত্র সমালোচনা করেছেন। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর "মনোরমা" প্রবন্ধও ঔপন্যাসিক চরিত্রালোচনামূলক। বঙ্কিমের "মৃণালিনী" উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্র ও নায়িকা মৃণালিনী, পার্শ্ব-চরিত্র হচ্ছে মনোরমা ও পশুপতি। লেখক গিরিজাপ্রসন্নবাবু উপন্যাস থেকে বিস্তৃত অংশ উৎকলিত ক'রে মনোরমার চরিত্রালেখ্য সুন্দর, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুরূপে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী" প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", "দেবীচৌধুরাণী"ও "সীতারামে"র মধ্যে জার্মান মনীষী

Fichte-এর Individual and Communal Culture-তত্ত্বকে 'অনুশীলন তত্ত্ব' নাম দিয়ে কেমন সুন্দর ও সুসমঞ্জসভাবে দেশ প্রেমের অনুশীলনে ব্রতী কয়েকজন নায়ক, নায়িকার স্বার্থত্যাগের জ্বলন্তরূপ পরিস্ফুটিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাই প্রমাণিত করেছেন। তাঁর এই জাতীয় Constructive criticism Quintessential বটেই। বীরেশ্বর পাঁড়ের "বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ"—একটি প্রায় অনুরূপ আলোচনাই – যার মধ্যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ থেকে উৎপন্ন জাতীয় ভাব প্রণোদিত উপন্যাসগুলির সারবস্তু আমাদের চোখের সামনে তুলে ধ'রেছেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "কবি বিহারীলাল" শীর্ষক বাংলার কবি ও বাংলা কাব্যের সমালোচনার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর "সারদামঙ্গল" ও "বঙ্গ সুন্দরী" প্রাক্-রবীন্দ্র-যুগের দু'খানি জনপ্রিয় ও সমধিক আলোচিত কাব্য। উদ্ধৃতাংশে লেখকের সমালোচনার কলেবর গুরুভার হ'লেও এমন একটি Aesthetic সমালোচনা উনবিংশ শতাব্দীতে বিরল।

বিংশ শতাব্দীর একজন শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ন্যূনপক্ষে মোহিতলাল মজুমদারের সমস্তরের সমালোচক ছিলেন। তাঁর এক জন ভক্ত ও শিষ্য তাঁকে Romantic critic বলেছেন। Romantic critic যে বিষয় বস্তুর আলোচনা করতে সুরু করেন তার মধ্যে তিনি character ও situations-কে romanticise করেন। শ্রীকুমার বাবু তাঁর সমালোচনার মধ্যে কোথায়ও এরকম করেছেন কিনা বলতে পারি না। এখানে তাঁর "ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" শীর্ষক যে সমালোচনা গৃহীত হয়েছে তা পড়লে যে কোন পাঠক তাঁকে Expressionisic critic ব'লেই মনে করবেন।

বর্তমান সংস্করণে বাংলা লোক সাহিত্য সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মূল্যবান প্রবন্ধ "বাংলার লোক সংগীত"।

প্রথম খণ্ড

সমালোচনার মূলসূত্র-বিচার

সমালোচনা-সাহিত্য

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

(১)

সমালোচকগণ সাহিত্য-সংসারে একদিকে প্রহরী ও অপর দিকে পুরোহিত স্বরূপ। অশুদ্ধ মিলন ও অপবিত্র পদার্থ পতিত হইয়া সাহিত্যের নির্মল ক্ষেত্র যাহাতে কলুষিত ও অশুচি না হয়, অনুপযুক্ত, অনাবশ্যকীয় দ্রব্যে সাহিত্যের সুন্দর শরীর যাহাতে ভারাক্রান্ত না হয়, ইঁহারা সর্বদা সতর্ক হইয়া তাহার প্রহরা দেন। পক্ষান্তরে, উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তি মূল্যবান দ্রব্যজাত লইয়া সে ক্ষেত্রে সহজে যাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে আদরে আহ্বান ও সম্মান করিয়া উপযুক্ত আসন দেন এবং তাঁহার আনীত দ্রব্য তাহার উচ্চ বা নিম্ন মূল্য অনুসারে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া উৎসর্গ করতঃ সাহিত্যের একাঙ্গীভূত করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত নূতন আলোকে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদিগের গুণাগুণও ইঁহারা বিচার-বিবেচনা করেন। গ্রন্থের ভাষা, ভাব, রুচি, রস, ছন্দ, অর্থ, অলঙ্কার, মৌলিকতা, সহৃদয়তা, কল্পনা, আলোচনা, গবেষণা ও ভাব-উদ্দেশ্যের উপকারিতা এবং সফলতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়েরই বিচার-বিবেচনা সংক্ষেপে করিবার চেষ্টা করেন ; পরন্তু গ্রন্থকারের শক্তি-সামর্থ্য, নিপুণতা ও প্রতিভার পরিমাণও করেন। কিন্তু এই বিচার-বিবেচনা পরখ-পরীক্ষা ইঁহারা কিরূপে করেন,—তাহা করিবার কি কি উপায় ও অবলম্বন? যুক্তি-তর্ক, সাহিত্যের নির্ধারিত নিয়ম, পূর্ববর্তী পণ্ডিতমণ্ডলীর বিধি, সর্ববাদিসম্মত ও চিরপ্রচলিত রীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি বিবিধ উপায়-প্রয়োগ দ্বারা, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া সমালোচ্য গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন। সকল স্থলেই যে, সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় বা করা হইয়া থাকে তাহা নয়। পরীক্ষা-উপযোগী উপায়-নিচয়ের যখন যেটি বা যেগুলি প্রযোজ্য, প্রয়োজন অনুসারে সেইটি বা সেগুলি ব্যবহৃত হয়। বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণও বটে,—এ প্রণালীর

সমালোচনায়, সকল প্রকার প্রণালীর সমালোচনাতেই অস্ত্র বা যন্ত্র স্বরূপ ; ইহা অতিরিক্ত মাত্র।

এই সমালোচকদিগের বিচার-বিষয়ক বক্তব্য-কথা প্রবন্ধ-আকারে প্রকটিত হয় এবং প্রবন্ধ, সমালোচ্য গ্রন্থের সহিত একত্র বা পৃথকভাবে, যাহাতে সাধারণের পাঠোপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী হয়, তজ্জন্য সমালোচক বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন। ইদানীন্তন সমালোচনা পত্রিকানিচয়ের প্রসাদাৎ সমালোচ্য গ্রন্থ পাঠ করার পূর্বেই লোকে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকে। অনেক লোক মূল গ্রন্থ পাঠও করেন না ; তৎসম্বন্ধে সমালোচনা-প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন ; অতএব সমালোচকদিগের প্রবন্ধ ভাবে এবং রচনা-নৈপুণ্যে বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। পরন্তু আর একদিক দিয়া দেখিলে,—এই সমালোচকগণ কতক পরিমাণে সাহিত্যের সংবাদদাতাও বটে। পূর্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না এবং সাধারণ শিক্ষার এতটা বিস্তারও হয় নাই ; সুতরাং গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল এবং সেই অল্পসংখ্যক গ্রন্থ পণ্ডিতবর্গেই পাঠ করিতেন এবং তাহা পণ্ডিত-মণ্ডলীর পাঠোপযোগী করিয়া প্রণীত হইত। পণ্ডিতের জন্য পণ্ডিত-কৃত গ্রন্থ (বিশেষতঃ সেই সকল গ্রন্থ যখন সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন—প্রাচীন ও "পণ্ডিতী" ভাষায় লিখিত হইত) স্বভাবতঃই বড় কঠিন ও গভীর-ভাবসম্পন্ন হইত। কাজেই তখনকার সমালোচক দেখা দিয়াছিলেন টীকাকাররূপে। তখনকার "টীকাকারে" এবং এখনকার "সমালোচকে" পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে, তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হয় না। "টীকাকার" প্রত্যেক শ্লোকের দুরূহ পদমাত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা করেন। সমালোচক গ্রন্থটি মোটের উপর লইয়া বা তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল লইয়া তাহার "সমালোচনা" করেন। "সমালোচনা" শব্দ বিস্তৃতার্থ-বোধক। অতএব ব্যাখ্যাও উহার অন্যতম অংশ। তবে টীকাকারের ব্যাখ্যার ন্যায় সে ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ নহে। পুঙ্খানুপুঙ্খ হইবার প্রয়োজনও হয় না। কারণ এখন টীকাকার ও সমালোচক এক ব্যক্তি নহেন,—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু পূর্বকালে এরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এ কালে মুদ্রাযন্ত্র ও সাধারণ শিক্ষার প্রভাবে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংখ্যা প্রায় অসংখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গ্রন্থনিচয়ের অধিকাংশই আবার খুব হাল্‌কা পাতলা হইতেছে। সকল লোকে, চলিত সাহিত্যের সব পুস্তক পড়িয়া

উঠিতে পারে না ; কাজেই সমালোচকদিগকে সে সকলের একটা সংবাদ, একটা খেশড়া হিসাব সাধারণকে দিতে হয় এবং সাহিত্যের ভবিষ্য ইতিহাস-লেখকের "ব্যবহার" জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে হয়।

এখন এই একটা কথা হইতে পারে যে, প্রাগুক্ত প্রণালীর সমালোচনা যখন পুরাতন রীতি-পদ্ধতির বিধি, নিয়ম, আইন, কানুন অনুসরণ করিয়া, সেই সমস্তের অনুমোদিত বিধান অনুসারে গ্রন্থের গুণাগুণ নির্ধারণ করে, তখন মৌলিকতার আদর কদাচিৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে গ্রন্থকার, পূর্ববর্তী-দিগের পুরাতন প্রণালী অনুসরণ করিয়া সর্ব বিষয়ে বা অধিকাংশ বিষয়ে চর্বিত-চর্বণ না করেন, নূতন পথে গমন করেন বা পুরাতন পথে নূতন উপাদান সংস্কার করিয়া তাহার মূর্তি অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্তিত বা স্বতন্ত্রীকৃত করেন, এই সমালোচকদিগের হস্তে তাঁহার নিষ্কৃতি কোথায় ? এই সমালোচকদিগের মধ্যে যাঁহারা লঘুচেতা, অত্যন্ত রক্ষণশীল, অভিনবমাত্রেই যাঁহাদের ঘৃণা অপরিসীম, যাঁহাদের রসানুভব-শক্তি নেহাত সঙ্কীর্ণ (এরূপ লোক সমালোচক-দলের মধ্যে বিরলও নহে) তাঁহাদের হস্তে অবশ্য মৌলিকতা মারা পড়ে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যে গ্রন্থ সর্বতোভাবে পূর্বপদ্ধতি-অনুকারী নহে, তাহাকে চণ্ডালের দ্বারা পোড়াইয়া কর্মনাশা-জলে নিক্ষেপ করিতে প্রায়ই ইঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু কেবল ইঁহাদিগকে লইয়াই সমালোচক-সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই। সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সূক্ষ্মদর্শী, সুনিপুণ, শিল্পী লোক থাকেন, এমন উদার, বিচক্ষণ ব্যক্তি থাকেন, যাঁহারা মৌলিকতার অত্যন্ত পক্ষপাতী। প্রকৃত মৌলিকতা যদ্দ্বারা উৎসাহ পাইয়া বিকশিত হয়, মাননীয় আসন প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে, তাঁহারা তাহার বিহিত করেন। অতএব উপরোক্ত সমালোচনা-প্রণালীর মূল অভিপ্রায় মৌলিকতার গতি-শক্তি রোধ করা নহে ; মৌলিকতার গতি-শক্তি সুশৃঙ্খল, সুনিয়মিত ও সংরক্ষণ করাই উহার অভিপ্রায়। রক্ষণশীলতা উন্নতিশীলতার বিরোধী নহে, উচ্ছৃঙ্খলতারই বিরোধী। উচ্ছৃঙ্খলতা উন্নতি নয়। রক্ষণশীলতা রক্ষা করে শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা উন্নতির উত্তেজক। অভিনব হইলেই "মৌলিক" হয় না, উচ্ছৃঙ্খলতায়ও অভিনবত্ব থাকে। উচ্ছৃঙ্খলতা মৌলিকতা নয়। যাহা শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম সংরক্ষণ করিয়া নিজের অভিনবত্ব দেখায়,—দেখাইতে সক্ষম হয়, তাহাই মৌলিক (Original)। এ প্রকৃতির মৌলিকতা রক্ষণশীলা

"সমালোচনা"-প্রণালীর দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না। প্রত্যুত তাহার পক্ষ সর্বথা উহা সমর্থন করে।

অভিনবে আসক্তি স্বভাবতই লোকের আছে। অথচ যাহা অভিনব, অল্লাধিক পরিমাণে যাহা প্রচলিতের বিপরীত, সাধারণ রুচির সহিত তাহা সহজে খাপে না, কেন না তাহাতে লোকে অনভ্যস্ত। অভিনব "অভিনব" হইলেও অনভ্যস্ত। অভিনবে লোকের আসক্তি থাকিলেও তাহারা সহজে অনভ্যস্তকে অভ্যাস করিতে চাহে না। অনভ্যস্তকে লোকের অভ্যস্ত করিবার জন্য অভিনবকে লোকের নিকট পরিচিত করিবার জন্য, এ ওকালতী। আদালতমাত্রেই সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যা উভয় পক্ষেরই ওকালতী চলে। সাহিত্যের আদালতে বা স্থলে সেরূপ চলে না, চলিতে দেওয়া হয় না, ইহা কেমনে বলিতে পারি ?

সমালোচক সাধারণের রুচির পরিচালক। সুরুচি কুরুচি উভয় দিকেই সাধারণ লোককে পরিচালনা তিনি করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার কার্যবিশেষের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সংসারে অনেকেই বুঝেন না ; কাজেই যিনি সকল কার্যে অক্ষম, তিনিও সমালোচক, সম্পাদকের কাযে ব্রতী।

(২)

নূতন প্রণালীর সমালোচনা

কাব্যশাস্ত্রের প্রসূতি কল্পনা। কল্পনা অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডবিহারিণী। তাই কবিতাশক্তিও সৌন্দর্যশালিনী। অসীম গগনের শীতল স্বাধীন বায়ু সর্বদা সমভাবে না পাইলে কল্পনা জীবিত থাকে না ; কবিতাও থাকে না। সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ স্থানে কল্পনার মৃত্যু, কবিতারও মৃত্যু। অনন্তের মহামধ্যস্থলে কল্পনার জন্ম, অসীমতা, উধাও আকাশ তাহার কর্মভূমি এবং ক্রীড়াস্থল। কবিতার আদ্য, মধ্য ও অন্ত তিনই অসীমতার সহিত মিশ্রিত। মায়ের স্বাধীনতায় মেয়ের পুষ্টি, মায়ের ধাতে মেয়ের ধাত। যদি কল্পনাকে ব্যাকরণ-অলঙ্কারের বিধি-বিধানে, সমালোচনা-শাস্ত্রের বিবিধ বন্ধনে আষ্টপৃষ্ঠে ললাটে পিটে-পিটে মোড়া দিয়া বাঁধা যায়, তাহা হইলে তাঁহার কোমলাঙ্গী কবিতা-কন্যার কি বিষম অপমৃত্যু ঘটে, তাহা বারেক অনুমানই করুন। অতিনিয়মে অনেকবার

অপমৃত্যু কবিতার যে ঘটিয়াছে, তাহার উদাহরণ-স্থল সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নহে। অতিনিয়মই কবিতার পক্ষে অনিয়ম।

কবিতার আকার-অবয়ব ও বহিঃমূর্তির সৌষ্ঠব সম্বন্ধে বিধি-বিধান চালাইলেও চালাইতে পার,—তাহাও অতিরিক্ত হইলে অনিষ্টকর,—কিন্তু যাহা কবিতার আভ্যন্তরিক অংশ, যেটুকুতে তাহার জীবন, জীবনের স্ফূর্তি ও সজীবতা, যাহা জননী কল্পনার অনন্তস্পর্শী ধরণীর সহিত একসূত্রে গ্রথিত, তাহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম খাটে না,—নিয়ম করিলেও তাহা বহুদিন টেকে না, নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা কাব্যের সে অংশের সমালোচনা চলে না। সে অংশ বিচার-বিতর্কের বিষয় নহে, বুঝিবার এবং ব্যাখ্যা করিবারই বিষয়; তাহা নিন্দা-প্রশংসার বিষয় নহে, ধ্যান-ধারণার বিষয়। কাব্যের এই ধ্যান-ধারণা, ভাবনা ও ব্যাখ্যা করিবার জন্যই নব প্রণালীর সমালোচনার আবির্ভাব। এই প্রণালীর মতে, কাব্য প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে হইলে, তাহার যথার্থ বিচার ও ব্যাখ্যা করিতে কবির সহিত একীভূত হইয়া কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করা আবশ্যক। ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশের ন্যায় কাব্যেরও আধ্যাত্মিক অংশ আছে, এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ ও সার অংশ। সেই আধ্যাত্মিক অংশ আধ্যাত্মিক ভাবেই অনুভবনীয়, অন্যভাবে নয়। নব প্রণালীর সমালোচনা এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক। পুরাতন প্রণালীর সমালোচনার সহিত তাহার পার্থক্য এই যে, নব প্রণালী অনুধাবন করে, প্রতিবাদ করে না, ব্যাখ্যা করে, বিচার করিয়া "রায়" লিখে না।

কালিদাসের কবিত্বের কথা পড়িয়া তুমি আমি যে সে লোকেই একটা মতামত প্রকাশ করিতে পারি, এবং সে মত আমাদের মত লোকের মধ্যে গ্রাহ্যও হয়। কিন্তু কালিদাস কি, ইহা পূর্ণমাত্রায় বুঝাইতে গেলে কালিদাসের সমালোচকে কালিদাসের শক্তি-সহানুভূতির অন্ততঃ কতক অংশ থাকা চাই, নতুবা কালিদাসের কাব্যের ও কবিত্বের প্রকৃত সমালোচনা সম্ভবে না। এই প্রকৃতির সমালোচনা আদর্শ সমালোচনা। নব প্রণালীর সমালোচক বলেন যে, এই আদর্শ সমালোচনা সম্যক্‌রূপে সাধনীয় না হইলেও ইহাকে দৃষ্টির বহির্ভূত করা উচিত নহে।

নব প্রণালীর সমালোচকদিগের আদর্শ যাহাই হউক, তাঁহারা তাঁহাদের সমালোচ্য কাব্য ও কবিতার দোষগুণ-বিচার, বিচারকের চক্ষে, বড় একটা

করেন না। সমালোচ্য কবিতা-স্পৃষ্ট হইয়া সমালোচকের হৃদয়-মনে যে সদ্ভাবনিচয় উদিত ও উত্তেজিত হয় তাহাই ব্যক্ত করেন। সংক্ষেপতঃ কবি ও কাব্য সম্বন্ধে সমালোচক তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া কবি ও কাব্যের ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করেন। সমালোচকের সেই হৃদয়োচ্ছ্বাস কখন কখন স্বতন্ত্র আকারে কাব্যময়ী রচনা এবং সমালোচ্য কবির সহিত আত্যন্তিক সহানুভূতিমূলক। তবে এই সহানুভূতি সমালোচককে কবির সহিত তাদৃশ একীভূত করে না, যদ্দ্বারা কাব্যের আধ্যাত্মিক চিত্র অবিকল প্রতিবিম্বিত হইয়া কবি ও সমালোচককে সম্পূর্ণ অভিন্ন করিয়া ফেলে। ফলতঃ এই শ্রেণীর সমালোচক সমালোচকরূপে সমালোচ্য বিষয়ের দোষগুণ কীর্তন করেন না; পরন্তু সমালোচক শিল্পীর সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ হইয়া শিল্পের অপরিদৃষ্ট ও প্রচ্ছন্ন অংশ আবিষ্কার করিতেও ইঁহারা অগ্রসর হয়েন না। ইঁহারা গ্রন্থকারের অনেক নিম্নে বসিয়া তাঁহার মানসপট নিজে নিজে যেরূপ নিরীক্ষণ ও অনুভব করেন, তাহারই প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন এবং সে নিরীক্ষণে ও অঙ্কনে শিল্পের সমস্তই নিরাক্ষিত ও অঙ্কিত হইল এরূপ বিবেচনা করেন না;—বিবেচনা প্রায়ই এইরূপ করেন যে, চিত্রের যতটুকু দেখিতে ও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা তথায় দেখিবার ও অনুভব করিবার এখনও অনেক আছে। নব প্রণালীর প্রকৃতি এই—এইরূপই হওয়া উচিত।

প্রকৃতি এবং প্রণালীতে এই সমালোচকদিগের কায, প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পীর কার্যেরই মত। ইঁহাদের সৌসাদৃশ্য সমালোচক অপেক্ষা শিল্পীর সঙ্গেই অধিক। ইঁহারা সমালোচনা ততটা করেন না, যতটা "সৃষ্টি" করেন। এই সমালোচনা সময়ে সময়ে প্রকারান্তরে "নূতন সৃষ্টি" বা তাহার সমতুল্য। উহা বিশ্লেষণমূলক না হইয়া সংশ্লেষণমূলক, উহা সমালোচ্য বিষয়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার পরমাণু বাহির করে না; সমালোচ্য বিষয়ের সৌন্দর্য সাবধানে অতি সন্তর্পণে গ্রহণ করিয়া, অন্য রকম সুন্দর বস্তু মিশাইয়া, রঙের উপর রঙ ফলাইয়া এক নূতনতর স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

মূল গ্রন্থকার, কবি বা শিল্পী, প্রকৃতির বা পুরাবৃত্তের যে দৃশ্যবিশেষ বা স্থল-বিশেষ গ্রহণ করেন, তাহার ধ্যান-ধারণা করিয়া কল্পনায় বর্ণনার রঙ্ ফলাইয়া (অবশ্য প্রকৃতত্ত্ব রক্ষা করিয়া) অভিনব চিত্র অঙ্কিত করেন। এক সৃষ্টি

অবলম্বন করিয়া আর এক নূতন "সৃষ্টি" প্রস্তুত করেন। নবপ্রণালীর সমালোচকও ঠিক প্রায় তাহাই করেন। তবে মূল গ্রন্থকার প্রকৃতির বা পুরাবৃত্তের দৃশ্য গ্রহণ করেন; আর এই সমালোচক পুস্তকের বা প্রকৃতির, কবিত্বের বা সাহিত্যের বা শিল্পের বা তাহাদের অংশবিশেষের কোন মূর্তির বা ভাবের ধ্যান-ধারণা করিয়া নূতন চিত্র রচনা করেন। এইমাত্র প্রভেদ।

এখন পুরাতন ও নূতন প্রণালীর সমালোচনার পুনরায় সংক্ষেপে একটু তুলনা করুন। পুরাতন প্রণালীতে, সমালোচ্য বিষয়ের বিচার বিবৃতি, নূতন প্রণালীতে, তাহার সৌন্দর্যের প্রতিকৃতি; প্রথমে—প্রবন্ধ; দ্বিতীয়ে—চিত্র; একে—বিচারকের ছত্রদণ্ড; অপরে—ভাবুকের কুসুম-মালা। পুরাতন প্রণালী বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে চায়, নূতন প্রণালী সম্ভোগ করিয়া সম্ভোগ করায়। বস্তুতঃ সমালোচনায় সুকুমার সাহিত্যের সৌন্দর্য-সম্ভোগ করিতে নূতন প্রণালীরই প্রাধান্য। তবে নূতন প্রণালীর পাণ্ডারা যে বলেন পুরাতন প্রণালীর সমালোচনায় সমালোচ্য বিষয়ের বহিঃপ্রকৃতি মাত্র দৃষ্ট হয়, অন্তঃপ্রকৃতি আদৌ বিকশিত হয় না, তাহা কেবল নূতন প্রণালী দ্বারাই হয়, এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

(৩)

দার্শনিক সমালোচনা ইংরাজী সাহিত্যে এখন আর বড় বিরল নহে। ইহার জন্য ইংরেজ—জার্মাণের নিকট ঋণী। কোলরিজ প্রথমতঃ ইংরেজী সাহিত্য-ক্ষেত্রে উহা প্রবর্তিত করেন। তবে দোকানদারের দেশে দর্শনের শ্রীবৃদ্ধিটা বড় হয় না। ইংরেজী সাহিত্যে দার্শনিক সমালোচনা (Philosophic criticism) তাদৃশ পুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই; অন্ততঃ যতটা করা উচিত ছিল, ততটা করে নাই। দর্শনে হিন্দুর ন্যায় জার্মাণও মজবুত। সে যাহা হউক, 'দার্শনিক' সমালোচনায় সমালোচ্য বিষয়ের অন্তঃপ্রকৃতি, আধ্যাত্মিক অংশ অন্বেষণ করে না, এ কথা কেমনে বলা যাইতে পারে? কিন্তু সমালোচনার নূতনতর ও আধুনিক অন্যমত অভিব্যক্তি "বৈজ্ঞানিক প্রণালী"। ঐ প্রণালী সর্বপ্রকার সমালোচনাতেই বিচারকের বিচার ও শিল্পীর শিল্প উপেক্ষা করে। এই প্রণালীর সমালোচকদিগের মতে উভয় প্রণালীই ভ্রমসঙ্কুল;—ভালমন্দের বিচার করা সমালোচকের কার্য নহে; ভাবের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হওয়াও

তাঁহার কর্তব্য নহে, সমালোচ্য বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিবৃতিই মাত্র সমালোচক করিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় সমালোচনা-সাহিত্য যেমন বিরল তেমনি দুর্বল। তবুও আমাদের 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' কালিদাসের অতুল কীর্তি "শকুন্তলা" নাটকের অন্তঃপ্রকৃতি আদৌ উদ্ঘাটিত করে নাই, কে এমন কথা বলিতে পারেন? "শকুন্তলা-তত্ত্ব" তাহার সমালোচ্য কবির সম্পূর্ণ সহানুভূতিমূলক, উহা মোটের উপর অংশতঃ পুরাতন ও কিয়ং পরিমাণে নূতন প্রণালীর সমালোচনার উত্তম দৃষ্টান্ত।

নূতন প্রণালীর সমালোচনায় ভবিষ্যতে আশা আশঙ্কা দুইই আছে। আশার ন্যায় আশঙ্কাও অল্প নহে। আমাদের সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় আপাততঃ সে আশার ও আশঙ্কার কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। একটা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আশা যাহাই থাকুক, আশঙ্কার আপদটা অগ্রেই আমাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, অতএব আশঙ্কার কথাটা উল্লেখ করা ভাল। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক আবশ্যকীয় আর আর দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন।

বাঙ্গালা সাহিত্য পুরাতন কি নূতন প্রণালীর সমালোচনা অনুসরণ করিতেছে, এ মুহূর্তে তাহা ঠিক করিয়া বলা ভার। বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহারা বিচক্ষণ ও গণনীয় সমালোচক, তাঁহারা পুরাতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বা খুব সাবধানে তাহার একটু আধটু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় 'সমালোচনা' সৃষ্টি করিতেছিলেন। উহার কৃতকার্যে উক্ত প্রকৃতির সাহিত্যের যেরূপ সূত্রপাত দেখা যাইতেছিল, তাহা তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে; পরন্তু তাহা ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরবস্থল হইবে এমনও আশা ছিল। কিন্তু কিছু কাল হইতে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল বিভাগেই কেমন একটা বেতর ভাব বিদ্যমান। লেখক, সমালোচক, সম্পাদক এখন আমাদিগের যাঁহারা, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি বোধহয় স্ব স্ব কার্যে উপযুক্ত নহেন। নতুবা আমাদের সাহিত্যে চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্যের এমন অভাব হইতেছে কেন? আমাদের সংবাদ ও সাময়িক পত্রে সাহিত্য ও তদানুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা খুব কমই হয়, যাহা এক আধটু হয়, তাহা আমাদের প্রশংসা ও গৌরবের বিষয় নহে, তাহা আশু উপাদেয়ও নয়, ভবিষ্যতেও তদ্দ্বারা আমাদিগের কোন উপকারের সম্ভাবনা

নাই। পরন্তু উপরি উল্লিখিত "নবপ্রণালী"-অনুকারী কাব্য ও কবিতা সমালোচকও মধ্যে মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে ও পত্রে দেখা দিতেছেন; নব-প্রণালী-অনুকারী আমরা লিখিলাম বটে কিন্তু কথাটা ঠিক হইল না। কারণ ইঁহারা প্রকৃত কোন্ প্রণালীর অনুকরণ করেন, স্থির করা কঠিন। কেননা, ইঁহাদের রচনায় বা সমালোচনায় আদৌ প্রণালীর অভাব। ইঁহারা বিশ্লেষক কি বিচারক কি উপাসক কিম্বা ভাবুক কি নিন্দুক, কি এই সমুদয়ের সব অথবা কিছুই নয়, তাহা তাঁহারা বোধ করি নিজে নিজেই জানেন না। ইঁহাদের লক্ষণ নির্ণয় করিতে আমরা সমর্থও নহি, সাহসীও নহি। তবে সময়ে সময়ে এই শ্রেণীর লেখক কবিতা ও ভাবুকতার উৎস খুলিয়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কাব্য উপন্যাসের 'চরিত্র-চিত্রের' 'মানব-প্রকৃতি উদ্ঘাটিত' করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের নিজের কোনও কথা নাই। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মে কোন কবির কাব্যের সমালোচনা-পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের জনৈক মহিলা বন্ধু বলিতেছিলেন যে, সে পুস্তক এত উত্তম যে কবির কাব্য গ্রাস করিয়াছেন। তাহাতে কবি ও সমালোচক কাহাকেও দেখা যায় না; দেখা যায় কেবল সমালোচ্য অংশ হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি করিয়া লাইন মধ্যে মধ্যে। গ্রন্থ সেগুলিকে গিলিয়াছে, তবে একবারে হজম করিতে পারে নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

সে যাহা হউক, সমালোচনায় কবিত্ব ও ভাবুকতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের ইঙ্গিতে একটি বক্তব্য আছে। কবিতা, ভাবগ্রাহিতা বা ভাবুকতা অতি উত্তম দ্রব্য এবং তদ্দ্বারা কাব্য সম্ভোগ বা সমালোচনা যারপরনাই প্রশংসনীয়। কিন্তু এ পদ্ধতির যেমন মহৎ গুণ-গৌরব আছে, তেমনি উহার অন্তর্নিহিত ভয়ানক দোষ-দুর্বলতাও আছে। সে দোষ-দুবলতা হইতে শ্রেষ্ঠতর সমালোচককেও বিশেষ সাবধান হইতে হয়। স্বয়ং স্যুইনবরণ সুকবি হইয়াও সময়ে সময়ে উহা হইতে অধিক দূরে থাকিতে পারেন নাই। অতএব দুর্বল অনুকরণ-কারীদিগের পক্ষে কতটা সাবধান-সতর্ক হওয়া দরকার, তাহা বলাই বাহুল্য। এই 'দোষ-দুর্বলতা' প্রধানতঃ প্রকাশার্থে ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে।

চিন্তার ভাষা ও কল্পনার ভাষা পরস্পর স্বতন্ত্র। বিচার-বিতর্ক, যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগের ভাষা এক, ভাব-অনুভূতি, ভাব-উচ্ছ্বাস-প্রকাশের ভাষা অন্যবিধ। ভাব-প্রকাশের ভাষা, ভাব-অনুভূতি-প্রকাশের ভাষাও এক নহে।

কাব্যের ভাষা ও কাব্যের কবিতাময়ী সমালোচনার ভাষাও ঠিক এক হইতে পারে না।

কোন বিষয়-প্রকাশের পূর্বে অবশ্য তাহার অনুভূতি সর্বত্র সকল বিষয়েই হইয়া থাকে। কোন বিষয়ে অনুভূতি ব্যতীত, তাহা আর প্রকাশিত হইবে কিরূপে? তাহা প্রকাশিত হইবেই বা কেন? বিচার-বিবেচনা, তর্ক-যুক্তিতেও অনুভূতি সর্বাগ্রে। তথাচ উপরে যে কথাটা বলা হইয়াছে তাহা যে সত্য, একটু সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে।

ভাবের তীক্ষ্ণানুভূতি ও উচ্ছ্বাসের ভাষা প্রধানতঃ কবিতাময়ী। সুতরাং নবপ্রণালীর সমালোচনা—গদ্যে কবিতাময়ী রচনা। এখন কথা হইতেছে এই যে, গদ্যে কবিতাময়ী বা কবিতাপ্রবণ ভাষা বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে না পারিলে, তাহা বড়ই হাস্যাস্পদ হয়, তাহা ভাবের বা কল্পনার কেন্দ্রে স্থায়ী হইয়া সারত্ব ও সৎসৌন্দর্য প্রকাশের পরিবর্তে কেবল বেতালা ও বিদ্রূপজনক আওয়াজ করে। গদ্যে ভাবুকতাপ্রবণ ভাষা-প্রয়োগ উপযুক্তরূপে করিতে না পারা বড়ই বিপদজনক; উহা, অস্পষ্ট অপরিমিত আলস্য ও আবাল্যময়, (?) অবোধগম্য রচনা হইয়া পড়ে। এবং তজ্জন্যই কেহ কেহ উপরোক্ত প্রণালীকেই নেহাত অসার পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। ফলতঃ উহাতে শক্তি ও সৌন্দর্যের অভাব বলিয়া অনেকেই বিবেচনা করেন। উহার সৌন্দর্য (সৌন্দর্য অবশ্য উহাতে আছে) যেন বড় ক্ষণস্থায়ী ও কষ্টকল্পিত, মুহূর্তের জন্য মনের উপরিভাগমাত্র স্পর্শ করে, মর্মে প্রবেশ করে না। তারপর উহা বিকৃত হইলে ত কথাই নাই। তাহাতে কেবল বাক্য আর বাক্য; বাক্যের বাষ্পে ও বার্ণিসে, তথায় কেবল একটা কুৎসিত কুয়াসা মাত্র উৎপাদিত হয়; অতএব নবপ্রণালীর সমালোচনায় ব্যভিচারের আশঙ্কা পদে পদে। কিন্তু আশঙ্কার মধ্য দিয়াই অনেক বিষয়ে অভীষ্টস্থলে উপস্থিত হইতে হয়। এই কাব্যানুভূতিমূলক, কবিতাময়ী সমালোচনা মধ্যম শ্রেণীর লেখকদিগের সাধনীয়া নয়। উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য কেবল তাঁহারাই হইতে পারেন, যাঁহাদিগের শক্তি কবি-শক্তির সহিত দৌড়িয়া কুলাইতে পারে; যাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতঃই কবিতা-প্রবণ ও বুদ্ধি সম্যকরূপে সুশিক্ষা-ও-সুরুচি-মার্জিত এবং ভাষার উপর যাঁহাদের অপরিসীম অধিকার ও আধিপত্য আছে।

কাব্যের আলোচনা করিতে হইবে স্বতন্ত্র কবিতা দ্বারা, আধ্যাত্মিকতার উদ্বোধন করিতে হইবে তদনুরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে। ব্যাপার সহজ নয়; উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তবে উপাস্য দেবতাকে আহ্বান করিতে হয়, নতুবা উপাস্য আগমন করেন না, উপাসনা লয়েন না, অবমানিত হয়েন—ভাষার উপর অধিকার থাকা চাই, সে কেমন?—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অনুভূতির অতি সূক্ষ্মতম অংশ, বাক্য-যোজনায় বর্ণিত, শব্দশক্তি দ্বারা সজীব ও শৌর্যশীল করিতে হয়, রচনা-লীলার উচ্চতম গ্রামে না উঠিতে পারিলে উহা সম্পাদিত হয় না।

সমালোচকের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দৃষ্টি সমালোচ্য বিষয়ের নিগূঢ় মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া, সূক্ষ্ম শিরা-ধমনীতে প্রবেশ করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবমাত্রই স্পর্শ করিবে, সুপ্ত সৌন্দর্যমাত্রই আকর্ষণ করিবে, তাঁহার ভাষা তাহাদিগকে উজ্জ্বল বর্ণে দেদীপ্যমান করিবে এবং বিচক্ষণতা তাহাদের প্রত্যেকের অতি সূক্ষ্ম অংশের বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব (তাহা যতই সূক্ষ্ম ও সাদৃশ্যমূলক হউক না) বুঝাইয়া দিবে। সমালোচককে সূক্ষ্ম অংশেরই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়; স্থূল অংশ সকলেরই চক্ষে সুস্পষ্ট। শিল্পই হউক আর সাহিত্যই হউক, কাব্যই হউক আর চিত্রই হউক, আলোচ্য বিষয় যে আনন্দ উৎপাদিত বা উত্তেজিত করে, তাহার গতি, প্রকৃতি, বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব কি এবং তাহা অন্যত্র প্রাপ্তব্য কি না প্রধানতঃ এই একই প্রশ্ন সমালোচককে উঠাইয়া তাহার যথোচিত উত্তর করিতে হয়।

ইত্যগ্রে উল্লেখ করিয়াছি যে নবপ্রণালী-প্রমুখ সমালোচক আমাদিগের সাহিত্যে যদি কেহ দেখা দিয়া থাকেন, তাঁহার শক্তি তদুপযুক্ত নহে। কিন্তু পুরাতন প্রণালীর (যদি এরূপ বলা অপ্রকৃত না হয়) সমালোচকদিগের মধ্যে এমনতর দুই একটি দেখা যায়, যাঁহাদের রচনায় "পূর্ব ও পর" উভয় প্রণালীরই উজ্জ্বল আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে আভাসই মাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যে, সমালোচনা• সাহিত্য অদ্যাপি প্রকৃত বাস্তবে প্রস্তুতই হয় নাই। সুতরাং তাহাতে কোনও প্রণালীর অনুসন্ধান করা বৃথা। সে পক্ষেও ইংরেজী সাহিত্য আমাদের অবলম্বন।

(৪)

সাহিত্য-সমালোচনার বৈজ্ঞানিক ভূমি

প্রশ্ন এই যে, সাহিত্য-সমালোচনা বৈজ্ঞানিক ভূমিতে অবস্থিত কিনা, অবস্থিতি করিতে পারে কি না? সমালোচনা সাধারণকল্পে জ্ঞান-বিজ্ঞান মাত্রেরই মূল; যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান-মাত্রেরই মূল অর্থাৎ যদ্দ্বারা জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হয় এবং শৃঙ্খলা-শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞান নামে অভিহিত হয়, তাহা সেই মূল পদার্থ এবং সম্যকরূপে "বিজ্ঞান"-পদবী-লাভের উপযুক্ত, একথা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের জনয়িতা যদি বিজ্ঞান নয়, তবে কি? আর বিজ্ঞানই বা কি? বিজ্ঞান কি তবে অবিজ্ঞানমূলক? যদ্দ্বারা নিয়মমাত্রই নিয়মিত ও উৎপাদিত তাহা অনিয়ম দ্বারা চালিত, একথা বাতুলের ভিন্ন আর কাহার? অতএব সমালোচনাকে সাধারণতঃ বিজ্ঞান কেন, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

পরন্তু সাহিত্য-সমালোচনা প্রামাণিক অবস্থা হইতে বৈজ্ঞানিক ভূমি অবলম্বনপূর্বক বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপক্ক ও পূর্ণ করিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্য-সমালোচনা সেই দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অদ্যাবধি অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান আছে; সম্ভবতঃ চিরকালই থাকিবে। অতএব সাহিত্য-সমালোচনা সম্যকরূপে বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানমূলক, ইহাও আর বাহুল্যরূপে বলিতে হইবে না।

তবে কথাটা হইতেছে কেবল ইদানীন্তন কালের শিল্পসাহিত্যাদি সমালোচনা সম্বন্ধে। প্রশ্ন এই যে, আধুনিক কালের উক্তবিধ সাহিত্য-শিল্পাদি-সমালোচনা বিজ্ঞানভিত্তিমূলক কি না এবং হইতে পারে কি না?

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্বে পূর্ব-পক্ষের আপত্তি এবং সে আপত্তির যুক্তিতর্কনিচয় উপস্থিত করিয়া তবে তাহার বিচার করা প্রয়োজন। অগ্রে তাহাই করা যাউক।

পূর্বপক্ষের কথার সারমর্ম সংক্ষেপতঃ এই যে, সমালোচনা বিজ্ঞান নহে, উহা শিল্প। উহা বিজ্ঞান নয় কেন সে বিষয়ে পূর্বপক্ষের প্রথম তর্ক এই যে, আধুনিক সমালোচনা সম্পাদনার্থে কোনও নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। প্রস্তুত করিলেও তাহা খাটে না, টিকে না। টিকিবে

যে তাহা সম্ভাবিত নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর নিয়ম অষ্টাদশে পরিবর্তিত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর নিয়ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাই। রুচি-পরিবর্তনের প্রত্যেক বায়ুর প্রবাহে সমালোচনার আদর্শ পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। যে নিয়ম ক্রমাগত এমন পরিবর্তনশীল ও এত অচিরস্থায়ী তাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলিতে পারি না এবং একই নিয়মে যাহা নিয়মিত ও পরিচালিত না হয় তাহা বিজ্ঞান-পদের বাচ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় তর্ক, ইহা প্রথমেরই অন্যতম অংশ; তাহা এই যে কাব্যশাস্ত্র আর শিল্পবিদ্যার ন্যায় কল্পনা-কল্পিত, কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট। উহা দৃশ্যের বা চিন্তার বা ভাবের কাল্পনিক চিত্র—হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আলেখ্য। অতএব কোনও নির্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা উহা পরিমিত বা সমালোচিত হইতে পারে না। নিয়মমাত্রই উহার অত্যন্ত অনুপযুক্ত পরিমাপক, কেন না কল্পনা কোনও নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলে না, অতএব সমালোচনার কোনও প্রণালীতে বিজ্ঞানে বাঁধা নিয়ম করা স্বভাবতঃই চলে না, করিলে তাহা অস্বাভাবিক হয়। সমালোচনাকে এতকাল নির্দিষ্ট-নিয়ম-নিবদ্ধ করিয়া অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত বিদ্রূপকর বিজ্ঞান-পদবীতে রাখিবার চেষ্টা করিয়া বড়ই ভ্রম করা হইয়াছে।

তৃতীয় তর্কের সার সংগ্রহ এই যে, সমালোচনায় বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, শিল্পের যদিও বিবিধ প্রণালী আছে, তথাচ সূক্ষ্মশিল্পমাত্রেরই একই বিশ্বব্যাপক উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য এক কথায় সুখ বা আনন্দ। বিজ্ঞানবাদীর মতে সমালোচকের কর্তব্য এই সুখকর উদ্দেশ্য, তাহার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক গতি-প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা। পরীক্ষা দ্বারা মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্যের পরিমাণ করিয়া গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করা। যে সমালোচনা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন না করে, তাহা প্রকৃত সমালোচনাই নহে।

শিল্পবাদীর মতে বিজ্ঞানবাদীর প্রাগুক্ত যুক্তি অত্যন্ত হাস্যজনক। সূক্ষ্ম শিল্পমাত্রেরই উদ্দেশ্য মানসিক সুখ, একথা সম্পূর্ণ সত্য। সত্য বলিয়াই সমালোচনা বৈজ্ঞানিক-সূত্রবদ্ধ হইতে পারে না। বিজ্ঞান কেবল সেই পদার্থে প্রযোজ্য যাহা অনতিপরিবর্তনশীল বা অপরিবর্তনীয়, যাহা নির্দিষ্ট, পরিমাপ্য ও স্থির। পদার্থের এই সকল স্বরূপের সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নিয়ম একবার আবিষ্কৃত হইলে তাহার আর পরিবর্তন হয় না, তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি

মাত্রেই সমভাবে সর্বত্র প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু এই যে মানসিক সুখের বা আনন্দের কথা বলিতেছি, ইহা অপরিবর্তনীয়ও নয়, নির্দিষ্টও নয়, অপরিমাপ্যও নয়, আবার অপর পক্ষে উহা অনির্দিষ্ট, অপরিমাপ্য ও অত্যন্ত চঞ্চল। উহার আকার নাই, নাম নাই। মনোবিজ্ঞান বহু পরিশ্রমে উহাকে আধ্যাত্মিক সূত্রে আবদ্ধ করিলেও উহার প্রত্যেক অনুভূতি, প্রতি আবেগই অনির্বচনীয়, যাহা কেবল ইঙ্গিতেই প্রকাশিত হইতে পারে, কোনও ক্রমে সংজ্ঞায় বা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু উহা স্বপ্নবৎ, মরীচিকাবৎ, বিদ্যুৎবৎ। দ্রুতগণনা করিয়া হিসাব-নিকাশের অঙ্কের দ্বারা উহাকে ধৃত করা যায় না। কালিদাসের কবিতা পড়িয়া, কুমুদিনীর কোমল কণ্ঠ শুনিয়া, রাফেলের চিত্র দেখিয়া মনে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহার হিসাব দিয়া কে উঠিতে পারেন? পক্ষান্তরে হরিদ্রা ও চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে রক্তবর্ণ হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক বিবরণ বালকেও বিবৃত করিতে পারে। সমালোচনা যদি বিজ্ঞান হইত ও বিজ্ঞানবৎ শিক্ষণীয় হইত, তাহা হইলে রসায়নাদি শাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা শুনিয়া বা শিক্ষানবিশী করিয়া লোকে সমালোচক হইয়া উঠিতে পারিত।

বঙ্কিমবাবুর কবিতাময় গদ্য, মধুসূদনের সসার কবিতা, হেমচন্দ্রের গগন-ভেদী ঝঙ্কার, রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ-সঙ্গীত কিরূপে অনুভবনীয়, তাহা কি সূত্র করিয়া মন্ত্র পড়াইয়া কাহাকেও শিখাইয়া দেওয়া যায়? ইহাত আর স্কুল পাঠ্যের সাদৃশ্য-পার্থক্য নয় যে, শিক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে? ভাব স্রোতের মৃদু-চঞ্চল, স্ফুট অর্ধস্ফুট লীলালহরী, আবেগ-আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট-প্রচ্ছন্ন, অসংখ্য, ক্ষুদ্র-বৃহৎ শ্বাস-প্রশ্বাস, যাহা সিন্ধু সৈকতে বালুকণার ন্যায় সুকুমার সাহিত্যে নিক্ষিপ্ত, তাহা কি বিজ্ঞানসূত্রে সমালোচনা করা যায়? পরন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী শ্রেণী নির্বাচন করে। এখন বল দেখি, শিল্পসম্ভোগ-জনিত মানসিক আনন্দের কিরূপ শ্রেণী নির্বাচন করা যায়? কালিদাসের কবিতায় এক আনন্দ ভবভূতিতে আর এক প্রকার, ভারবিতে ভিন্ন প্রকার—এইরূপে আনন্দের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে বৈজ্ঞানিক টিকিট আঁটিয়া দিয়া কি তাহার ভাগবিভাগ করিবে? তাহা করা কি সম্ভব, আর সম্ভব হইলেও কি সত্য ও সভ্যতা-অনুমোদিত?

শিল্পবাদী নবপ্রণালীর সমালোচনার বিশিষ্টরূপে সমর্থন করিয়া বলেন যে,

উহার আবির্ভাবে সমালোচনা শিল্পে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার খাঁটি বিজ্ঞানত্ব লোপ হইতেছে। বিজ্ঞানবাদীর সহিত শিল্পবাদীর উপরিউক্ত তর্কযুদ্ধে আমরা প্রবেশ করিব না। মোটের উপর আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিয়া ইহাদের নিকট হইতে বিদায় লইব। শিল্পবাদীর অনেক কথা যথার্থ এবং অনেক কথা অযথার্থ। যেগুলি যথার্থ, তাহা হৃদয়গ্রাহী, যেগুলি অযথার্থ, তাহা কূট তর্কের যুক্তি-তুফানযুক্ত হইলেও অযথার্থ। তুঁষ হইতে তণ্ডুল চিনিয়া লইতে আমাদের পাঠকগণ পারিবেন, অতএব শিল্পবাদীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা করিব না। বিজ্ঞানবাদীও নিজ পক্ষ সমর্থনার্থে তর্ক তুলিয়া শিল্পবাদীর সহিত সজোরে সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারেন। যেখানে সংগ্রাম, সেইখানেই সত্য ও সামঞ্জস্যের অভাব, অশান্তি, অসিদ্ধান্ত; তর্ক-তরঙ্গে তুফান উঠে, তাহাতে তৈল নিক্ষেপ করাই কর্তব্য। এত কথার মধ্যে যেটা উচিত কথা, সেটা কিন্তু এক কথাতেই বলা যাইতে পারে। ফল কথা এই যে, সে দেশেই হউক আর এ দেশেই হউক, আধুনিক সমালোচনা-প্রণালীর এখনও খুব শৈশব অবস্থা। আজও ইহার অস্তিত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা এতাবৎকাল ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তি-অনুসারে আপন অবয়ব গঠন করিতেছে দেখা যায়। যিনি বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, তিনি ইহাকে বৈজ্ঞানিক গঠন প্রদান করেন। উপযুক্ত হস্তপরিচালিত হইলে, ইহা উভয় স্বরূপেই উপাদেয় হয়।

এখনকার অবস্থা এই। ফলতঃ ইহার শৈশব, অপরিপক্ক অবস্থা, অতএব এখনও ইহার ফলাফল, গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত মত-প্রকাশ হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে মত দিতে হইলে তাহার বিকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, তাহার পরিপক্ক অবস্থা দেখিতে হয়, নতুবা কোন মত টিকে না। শিল্পেরই হউক, সাহিত্যেরই হউক আর বিজ্ঞানেরই হউক, কোনও একটা প্রণালী সুপরিপক্ক হইয়া স্থায়ীভাব ধারণ করিতে বহুকাল লাগে। সেই কালের মধ্য দিয়া অনেক গঠন-পরিবর্তন পার হইয়া তাহার চলিতে হয়। একবার ভাঙ্গে, একবার গড়ে, আবার ভাঙ্গে, পুনরায় গঠিত হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। আধুনিক কালের সমালোচনা এই স্বাভাবিক নিয়মেই চলিয়াছে, ইহার ভাঙ্গাগড়া শেষ হইবার অবশ্য এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অতএব অগ্রেই ইহার সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করা যাইতে

পারে? তবে শিল্পবাদী যে সমালোচনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি একেবারে উঠাইয়া দেন, সে কেবল তাঁহার চিত্তচাপল্য। এ সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল যুক্তি তাহা বিজ্ঞান-অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। সমালোচনার এক সময়ে নিয়মাবলী অন্য সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং হইয়া থাকে, অতএব শিল্পবাদীর মতে সমালোচনা বিজ্ঞানমূলক হইতে পারে না। ইহা আশ্চর্য যুক্তি। বিশেষতঃ যখন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-শিষ্য একথা বলিতেছেন, ইহা অধিকতর আশ্চর্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নিজে কি পরিবর্তনশীল নহে? এক সময়ে বৈজ্ঞানিক নিয়ম অন্য সময়ে পরিবর্তন হয় নাই, হইতেছে না? ধ্রুব-ফলপ্রদ গণিত, বিজ্ঞানমূলক শাস্ত্র, জড়বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় নব আবিষ্কারের আবির্ভাব এবং আরও অন্যান্য অনেক কারণে নিয়মাবলীর পরিবর্তন হইতে দেখা যাইয়া থাকে, তাহা বলিয়া কি বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব লোপ পায়? যদি না হয়, তবে সমালোচনার নিয়মাবলী পরিবর্তন হয় বলিয়া তাহাকে বিজ্ঞান-ভূমি পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন?

শিল্পবাদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তর্ক এই যে, কাব্যাদি কল্পনামূলক, অতএব তৎজাতীয় বিষয়ের সমালোচনা বিজ্ঞানমূলক হইতে পারে না, যেহেতু সেই পদার্থই কেবল বিজ্ঞানের বিচার্য যাহা নিশ্চিত, নির্দিষ্ট এবং পরিপক্ক অর্থাৎ কিনা স্থূল বস্তুই কেবল বিজ্ঞানের বিচার্য। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু সূক্ষ্ম, তাহাতে বিজ্ঞানের কোনও অধিকার নাই। জড়বাদীর মুখে বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা বিস্ময়কর নহে।

(পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯১)

প্রজ্ঞা-দৃষ্টি, বোধ-দৃষ্টি ও রস-দৃষ্টি

শ্রীকালিদাস রায়

(১)

এই সৃষ্টির মধ্যে বহু দৈন্য, বহু ত্রুটি, বহু প্রকারের অসম্পূর্ণতা ও জঘন্যতা সত্ত্বেও জ্ঞানী যে দৃষ্টিতে ইহাকে দেখিয়া শোভনসুন্দর ও সুসমঞ্জস মনে করেন, তাহাই প্রজ্ঞা-দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতেই রুদ্রানন্দে নৃত্যরত নটরাজ এত সুন্দর, এই দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে রুদ্রের দক্ষিণ মুখ, এই দৃষ্টিতেই সেই মহাকালী মূর্তি—

"ডান হাতে যার খড়্গ জলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,"

তাহাও সুন্দর। এই দৃষ্টিতেই শঙ্খ ও পদ্মের সহিত চক্র ও গদার সমন্বয় হইতে পারিয়াছে। এই দৃষ্টিতে যে-বসন্ত শুধু ফোটা ফুলের মেলা নয়—ঝরাফুলেরও শ্মশান, সেই বসন্তও সুন্দর হইতে পারিয়াছে। কবি যখন বলিয়াছেন—

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত,
খড়্গ তোমার হে দেব বজ্রপাণি চরম শোভায় রচিত।

তখন এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই বলিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে দেখিলে যে নদী এক কূল গড়ে—আর এক কূল ভাঙ্গে, সেই ভৈরবী মহানদীও সুন্দর—পরস্পর-বিরোধী ঋতুর বৈচিত্র্য লইয়া বৎসর-চক্রের আবর্তনও সুন্দর—একাধারে নির্মমা ও মমতাময়ী বিশ্বপ্রকৃতিও মাতৃরূপা। এই দৃষ্টিতে দেখার ফলকে কবি ছন্দিত করিয়া বলেন—

মাতা আমাদের অন্নপূর্ণা পিতা যে মোদের চন্দ্রচূড়,
সংসার হ'তে পৃথক হইয়া কেমনে শ্মশান রহিবে দূর?
রুদ্র যেমন শিবরূপ ধরি মিলে একদেহে গৌরীহর,
শ্মশানে এবং সংসারে মিলে তেমনি অর্ধনারীশ্বর।

এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি, রসদৃষ্টি ও বোধদৃষ্টির উচ্চতর স্তরে সমন্বয় (Synthesis)। এ দৃষ্টি উপভোগের দৃষ্টি নয়, ইহা শিল্পীর দৃষ্টি নয়, ইহা সর্ববিধ দ্বিধা, সংশয়, অসামঞ্জস্যের সমাধানের তৃপ্তিদান করে। তাহাতে আনন্দ আছে। কিন্তু সে আনন্দ আর রসানন্দ—শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ—এক নহে।

(২)

বোধদৃষ্টি ও রসদৃষ্টি যেন পরস্পরবিরোধী। জগতের অধিকাংশ লোক সৃষ্টিকে বোধদৃষ্টিতেই দেখে। তাহাতে বেদনাও আছে—আনন্দও আছে। তাহাতে যে আনন্দ আছে, তাহা বোধানন্দমাত্র। শিল্পী সৃষ্টিকে দেখে রস-দৃষ্টিতে—এবং পায় সৃষ্টির প্রেরণা ও রসানন্দ। বোধদৃষ্টি প্রবল হইয়া উঠিলে রসদৃষ্টিকে ক্ষীণ ও স্তিমিত করিয়া দেয়। রসদৃষ্টি যেমনই উপভোগ্যের আবিষ্কার করে—বোধদৃষ্টি তাহার চারিপাশের ও অতীত ভবিষ্যতের খবর দেয় (সে looks before and after and pines for what is not)। সে উপভোগ্যের অন্তস্তলের কথা,—তাহার উপাদান উপকরণের কথা তুলে—তাহার মূল্য-মর্যাদার, স্থায়িত্বের ও সারবত্তার পরিমাণাদি নির্ণয় করে—ফলে উপভোগ্য আর উপভোগ্য থাকে না।

বোধদৃষ্টির শক্তির সীমা আছে—তাহা দেশে ও কালে উপভোগ্যের উপরে নীচে ও চারিপাশে খানিক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে। সে যদি দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত—যদি সৃষ্টির অন্তস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিত—তবে তাহা প্রজ্ঞাদৃষ্টি হইয়া পড়িত এবং সকল বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে পারিত। কিন্তু সে খানিকটা মাত্র যায় বলিয়া বিরোধ, অসামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব-বৈষম্যেরই সৃষ্টি করে। ফলে, চিত্তের অপ্রসন্নতা অস্বচ্ছন্দতা ঘটায়—উপভোগের সকল মাধুর্য হরণ করিয়া লয়। শিল্পিমন তাই বোধদৃষ্টিকে যতদূর-সম্ভব সংহরণ করিয়া সৃষ্টির পানে রসদৃষ্টিতে চাহে—তাই শিল্পিমন বোধ-দৃষ্টির রজ্জুদাম ছিন্ন করিয়া উপভোগ্যকে স্বতন্ত্র করে। সৃষ্টির পানে তাকাইতে হইলে অনেক কিছু ভুলিতে হয়, মন হইতে অনেককে বাহির করিয়া দিতে হয়, উপভোগ্যের অতীত, ভবিষ্যৎ, উপকরণ, পারিপার্শ্বিকতা সমস্তই কিছুকালের জন্য ভুলিতে হয়—রসানন্দ-লাভে জীবনের কতকগুলি মুহূর্তও যে মধুময় হইল, রসিক তাহাকেই যথেষ্ট মনে করে।

রসদৃষ্টি যখন পঙ্কজকে উপভোগ করিতে চায়, তখন যদি বোধদৃষ্টি তাহার চোখে পঙ্ক মাখাইয়া দেয় অথবা গলিত শৈবালে ক্লিন্ন জলাঞ্জলি ছড়াইয়া দেয় —তবে পঙ্কজের উপভোগ্যতা কোথায় থাকে?

রমণী-সৌন্দর্যে যে মুগ্ধতা, তাহা কোন শিল্পীই অভিব্যক্ত করিতে পারিত

না, যদি বোধদৃষ্টি তাহার দেহকে অস্থিরক্তমাংসে বিশ্লেষণ করিত অথবা তাহার পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া হরিনাম করিতে বলিত।

ইন্দ্রধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা মনে হইলে ইন্দ্রধনুর মাধুর্য বা সৌন্দর্য কিছুই থাকিতে পারে না।

পল্লীশ্রীর মাধুর্য উপভোগ কিছুতেই সম্ভব নয়—যদি সেই সঙ্গে বোধদৃষ্টি পল্লীর ম্যালেরিয়া, দৈন্য, দুঃখ, ইতরতা ইত্যাদির কথা মনে পড়াইয়া রসভঙ্গ করিয়া দেয়।

রসিক তাহার উপভোগ্যকে সৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখে—মহাকাল হইতে কতকগুলি মুহূর্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপভোগ করে। নিজের চিত্তকে এই পাপ-তাপ-দুঃখ-দৈন্যময় ধূলিমাটির ধরা হইতে অনেকটা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরে—নিজের জীবনের অন্তরের ও বাহিরের রসবিরোধী যাহা কিছু সমস্তকেই ভুলিয়া যায়,—এই বিশ্বে যেন উপভোক্তা আর উপভোগ্য ছাড়া আর কিছু নাই। সে কেমন? কবির কথায়—

সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জন চারিধার,
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

বোধ-দৃষ্টির চক্ষুকে মুদ্রিত না করিতে পারিলে, "জগতে কেহ যেন নাহি আর"—এই ভাবটুকু ত আসিতে পারে না।

শিল্পী এইভাবে সৃষ্টিকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া উপভোগ করেন। তাঁহার সৃষ্টিও তাই 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির' মত। যিনি উহা উপভোগ করিবেন—তাঁহাকেও ঐ সৃষ্টিকেই 'আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া' পুনর্গঠন করিয়া লইতে হইবে। শিল্পী যেমন করিয়া বোধদৃষ্টির চক্ষুকে মুদ্রিত করিয়া রসরচনা করিয়াছেন—উপভোক্তাকেও তেমনি বোধদৃষ্টির নয়ন রুদ্ধ করিয়া উপভোগ করিতে হইবে—নতুবা রসাভাস ঘটিবে, উপভোক্তা রসানন্দে বঞ্চিত হইবে।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠে। বোধ-দৃষ্টি কি সকল সময়েই রসদৃষ্টির উপভোগ্যতা নষ্ট করিয়া দেয়? রসদৃষ্টি ও বোধদৃষ্টির যে পরস্পর-প্রতিকূলতার

কথা বলা হইল, তাহা সাধারণভাবে। বোধদৃষ্টি সাধারণতঃ রসদৃষ্টির বিরুদ্ধে যায়, তাই বলিয়া কখনও রসসৃষ্টির সহায়তা করে না তাহাও ত নয়। বোধদৃষ্টি যদি আমাদের চিত্তকে পঙ্কজ হইতে মৃণালে লইয়া যায়—তবে সে ক্ষতি করে না, আরও নীচে নামাইলেই রসভঙ্গ ঘটাইয়া দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রসভঙ্গ না ঘটে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেশে ও কালে উপভোগ্যের অনুকূল আবেষ্টনী বা পটভূমিকার মধ্যে ঘুরিতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রসদৃষ্টির সহিত মৈত্রী ও সহযোগিতা রাখিয়া চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত রসানন্দ-সৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সে কি সীমা বা মাত্রার মর্যাদা রাখিয়া চলিতে চায়? তাই মনে হয়,—রসদৃষ্টি যখন বোধদৃষ্টির স্বাধীন সত্তাকে হরণ করিয়া সম্পূর্ণ আপনার বশীভূত করিয়া লইতে পারে—আজ্ঞাবহ করিয়া তুলিতে পারে—তখনই তাহা বোধ-দৃষ্টির সহযোগিতাতেই রসানন্দের সৃষ্টি করিতে পারে।

বোধদৃষ্টিকে বশীভূত করিতে না পারিয়া অনেক সময় শিল্পী ভাবেন—রসদৃষ্টির সহিত বোধদৃষ্টির একটা সন্ধি সামঞ্জস্য সাধন করা যাক। কিন্তু হায়, তাহাতে রসসৃষ্টি হয় না, বোধদৃষ্টিতে লব্ধ ভাবানুভূতির শোভন বিবৃতিমাত্র হয়—অথবা প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখার ভাণমাত্র প্রকাশ পায়। শিল্পী যে সৃষ্টিকে উপভোগ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। বোধদৃষ্টির সহিত রসদৃষ্টির সামঞ্জস্য-সাধনের একটি প্রয়াসের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

শ্মশান তোমারে কত না যত্নে সংসার মাঝে বরণ করি,
নানাভাবে তুমি কল্যাণই রচ, কে বলে তোমায় কেবলি ডরি !
দিনে শতবার তোমা সনে দেখা বিভীষিকা তব গিয়াছি ভুলি,
দেবতা-পূজার অর্ঘ্যোপচার যোগায় তোমার কাঁথার ঝুলি।
কুঞ্চিত কেশে সুন্দর কর অভিনেত্রীর পলিতরূপ,
চামর-সমীরে দেবমন্দিরে বিলাও গন্ধ, জ্বালাও ধূপ।
কীর্তনে তুমি দিলে মৃদঙ্গ, বিষাণে ঘোষিছ বীরের জয়,
দূরিছ শঙ্খকঙ্কালমুখে মাভৈঃ নিনাদে দৈব-ভয়।
সব সঙ্গীতে তুমি দাও তাল, সব সঙ্গতে তুমিই প্রাণ,
যোগীর আসন রচেছ অজিনে, গায়িছ দেবীর বোধন গান।
দুলাও শিশুর গলে বাঘনখ, পরাও সতীর শ্রীকরে শাঁখা,
চিত্রশালার বিচিত্রতাও তোমার সরল ভুরুতে আঁকা।

কীটের জীবনতন্তুতে তুমি রচ কৌষেয় দুকূল-খানি,
তাহারি শোণিতে পেশল চরণ রাঙায় তোমার কুশলপাণি।
নবযৌবনে কর চিত্রিত আঁকি গোরোচনা-পত্রলেখা,
দেহে দেহে তুমি বিলসিছ নিতি গেহে গেহে তব পাই যে দেখা।
রস-সম্ভোগে সব মঙ্গলে জীবমমতায় তোমায় হেরি,
এ কী বিধাতার ক্রূর পরিহাস জীবনের সাথে মরণে বেড়ি'।
গজদন্তের চারুপালঙ্কে রঙ্কুলোমের শয্যাস্তূপে,
রাজার দুলালী ঘুমায় অঘোরে, প্রাসাদে? না—তব স্নেহের বুকে?
লক্ষ্মীর করে কড়ির ঝাঁপিটি পূর্ণ তোমারি আশীর্বাদে,
শ্যামের চূড়ার ময়ূরপাখাটি তুমি গুঁজে দিলে মোহন ছাঁদে
বিলাসিনীদের কণ্ঠ জড়ায়ে ধরেছ প্রবালমুক্তাদামে,
তব কৌটার কস্তুরীরস জিয়ায় আবার দগ্ধ কামে।

এখানে সংসারের শ্রীসৌষ্ঠবের উপকরণগুলির পানে চাহিয়া শিল্পীর কেবলি মনে হইয়াছে—এইগুলি মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ অথবা বৃক্ষলতা, ইহাদের কাহারও না কাহারও শ্মশান হইতে আহৃত। এই কথা মনে পড়াতেই কোনটিই শিল্পীর উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে না। তখন শিল্পী শ্মশানের সঙ্গে সংসারের একটা সন্ধি চাহিয়াছেন। সন্ধিস্থাপন একটা দেখানো হইয়াছে বটে। কিন্তু তাহা রসের দিক হইতে উপভোগ্য হইয়া উঠে নাই। শিল্পীর বোধদৃষ্টির গতি বেশী দূর যায় নাই—কাজেই প্রজ্ঞাদৃষ্টিতেও উহা পৌঁছায় নাই। আর একটি উদাহরণ ধরা যাউক—

যে বলে তোমার ধর্ম ধ্বংসমাত্র, বুঝে সেত স্থূল
হুঙ্কৃত শাসনে, বজ্র, প্রতিকূলে কর অনুকূল।
তব জয় বশীভূত সে যে হয় সৃষ্টির সহায়
মোরা তারে ধ্বংস ভাবি মূঢ়কণ্ঠে করি হায় হায়।
শক্তি লভে রূপান্তর তব তেজে। সৃষ্টির বাধক
তোমার মঙ্গলব্রতে হয় তব উত্তরসাধক।
মঙ্গলার হাতে খড়্গ, মঙ্গলের হাতে তুমি শূল,
আপনাকে বৃত্র ভাবি, বজ্র মোরা নিত্য করি ভুল।

ইহা কেবল প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে দেখার ফলকে ছন্দে বিবৃতি মাত্র। এই কথাগুলিকে সরস করিয়া বিবৃত করিলেই রসসৃষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়া উঠিবে না।

(৩)

মিথ্যা আমি তোমায় ডরি মিথ্যা কাঁপি মৃত্যু স্মরি
কর-করোটি অমৃতে তব পূর্ণ,
মরণে তুমি করেছ জয় শরণে তব কিসের ভয় ?
শঙ্কর এ শঙ্কা কর চূর্ণ।
ঈশান তব বিষাণ-রবে প্রলয় আসে ভীষণ, তবে
বিশ্ব নব তাহাতে লভে সৃষ্টি ;
মাভৈঃ বাণী গর্জি কহ শুনিতে শুধু শঙ্কাবহ
বজ্র-ছলে জীবনই করে বৃষ্টি।
তৃতীয় আঁখে বহ্নিছটা বিথারে জলদর্চিঘটা,
গঙ্গা পুনঃ তোমারি জটাপুঞ্জে।
ইন্দু তব ললাটে জলে জনম দেয় প্রসূন-ফলে,
ওষধি-মধু-ভেষজে গিরিকুঞ্জে।
অট্ট-রবে শঙ্কা বটে তবুও তা'ত হাস্য বটে,
অভ্রভরা শুভ্র যেন কম্বু,
উরগ শত অঙ্গে ধরি ঘুরিছ প্রেত সঙ্গে করি,
বৎসলতা লুকাবে কোথা শম্ভু ?
অধ্রুব যে তাহারি তরে রুদ্রশূল তোমার করে,
কাঁপুড় ডরে ত্রিপুর, হেমলঙ্কা,
তোমার যারা শরণ লভে লভেছে তারা মরণ কবে ?
ধ্রুবের ছায়া, মোদের কিসে শঙ্কা ?
করুণা তব লভিল অহি, ধন্য বিষ, কণ্ঠে রহি,
হৃদয় তব পাবে না প্রেম অঙ্ক ?
মৃতেরো হেয় অস্থিগুলি আপন দেহে লইলে তুলি,
জীবন কি গো হবে না নিঃশঙ্ক ?

প্রমথ পশু পিশাচগণ হইল তব আপন জন,
পাবে না ঠাঁই মানুষ তব সঙ্গে ?
বিষ-ধুতুরা চরণে তব লভিল চির শরণ, প্রভো,
নেবে না তুমি মোদের হৃদি-পদ্মে ?
মরণ লভি বনের দ্বীপী বহিয়া জয়-কীর্তি-লিপি,
কৃত্তিপটে শোভিছে তব অঙ্গে।
দগ্ধ হয়ে ভস্ম হ'ব, তবু ত তব অঙ্গে র'ব,
ডরি না তাই তোমার রোষ রঙ্গে।
যা কিছু ভবে ত্যাজ্য হেয় তোমার ভয়া ভোজ্য পেয় .
অধম আমি নিরাশ নহি তাই গো,
আমাতে তব অংশ যাহা পাবে না প্রভু ধ্বংস তাহা,
হাড়ের চেয়ে লভিবে উঁচু ঠাঁই গো।
চির অমৃত উষার লাগি রয়েছি পিতঃ আশায় জাগি,
নাশ হে মম জীবন-তমোরাত্রি,
ক্ষুদ্র আমি রুদ্রে র'ব, চূর্ণ হয়ে পূর্ণ হ'ব,
বিশ্ব হতে বিশ্বনাথে যাত্রী।

এই কবিতাটি প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখার ফলে বিবৃতিমাত্র নহে, ইহাতে ঐ ফলটিকে একটি প্রতীকের মধ্যে পৃথক করিয়া লইয়া রসদৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

এখানে একটি কথা বলার প্রয়োজন হইতেছে। কবির নিজস্বই হউক, আর অন্য কোন দ্রষ্টারই হউক, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখার ফলকে শিল্পী একটি প্রতীক-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রসদৃষ্টিতে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন। কেবল তাহার বিবৃতি, ব্যাখ্যা বা পরিচয়ই রসানন্দ দান করিবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও রসানন্দ-সৃষ্টি পূরামাত্রাতেই চাই। এইভাবে রসানন্দ-সৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে অজস্র। এ সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন আছে।

এই রসদৃষ্টিতে দেখিয়া জীবনের কতকগুলি মুহূর্তকে মধুময় করিয়া তোলা —ইহাকে প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হয়ত বলিবেন—মায়া, অবিদ্যা, ভ্রান্তি, অশাশ্বত, ক্ষণিক ইত্যাদি—বোধদৃষ্টি যাঁহাদের প্রখর, তাঁহারা হয়ত বলিবেন এটা বাতুলের স্বপ্ন-বিলাস।

প্রজ্ঞাদৃষ্টি অনেক সাধনার ধন—তাহা মানি। বোধদৃষ্টি মানব-সভ্যতাকে গড়িয়াছে—ইহাকেও বহু আয়াসে শাণিত করিয়া তুলিতে হইয়াছে। আর এই রসদৃষ্টি সহজ স্বাভাবিক। বিনা আয়াসে মানুষ স্বভাবতই ইহা বিধাতার কাছে লাভ করিয়াছে। যাহা সম্পূর্ণ সহজ—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহাই তবে মিথ্যা?—এ মিথ্যার জন্য স্বয়ং বিধাতাই দায়ী। তা ছাড়া, শিল্পীর বোধদৃষ্টির অভাব আছে—তাহা ত নয়, সে বোধদৃষ্টিকে সংহরণ করিয়া রসদৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টিকে সম্ভোগ করে এবং সম্ভোগ্য করিয়া তুলে—সে চিরসুন্দরের এই সৃষ্টির সৌন্দর্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপভোগ করে। ইহাতে অপরাধ কি? সে এই জীবনের কতগুলি মুহূর্তকে মধুময় করিয়া তুলিতে চায়—সবগুলিকে সে মাধুরী-মণ্ডিত করিতে পারে না বটে। ইহার মধ্যে মিথ্যা কোথায়?

শিল্পী ত স্পষ্টই বলিতেছেন,—

দুদিন বাদে ফুরিয়ে যাবে জাগল এ বোধ যবে,
সুখের মোহে গল্‌লনা এই বুক।
ফুরিয়ে যখন যাবে তখন সেই সুখে কি হবে?
এমনি করে গেল কতই সুখ।
ফুরিয়ে যাবে জেনেই এবে সুখকে টানি কোলে,
ফুরিয়ে গেলেও বয় না চোখে জল,
সান্ত্বনা পাই, সফল হলো সরস হলো ব'লে,
এই জীবনের কতকগুলি পল।

এই বিশ্বের সৃষ্টি আমাদের কাছে মূলতঃ খণ্ড খণ্ড, জীবনের কালও আমাদের অখণ্ড নহে—আমাদের বোধশক্তিই খণ্ড-সৃষ্টি ও খণ্ডকালকে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। দার্শনিক এই কালপ্রবাহ ও সৃষ্টিধারা লইয়া অনেক জল্পনা করিতে পারেন—কবি কিন্তু বোধশক্তির সূত্র ছিন্ন করিয়া খণ্ডসৃষ্টি ও মুহূর্তগুলিকে রসমণ্ডিত ও উপভোগ্য করিয়া তুলেন। তাই কবি ক্ষণিকের গান গাহেন—সে গানকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয় না—হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়। কবি তাই গাহিয়াছেন—

ওরে থাক থাক কাঁদনি
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে,
আজিকার মত যাক্ যাক্ চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি,
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি
ওরে থাক থাক কাঁদনি।

সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া খণ্ড জীবনকে যে উপভোগ তাহাই রসসৃষ্টির উপভোগ —কবির উপভোগ।

ইহা স্থূল বাস্তব সম্ভোগ নয়—ইহা অতীন্দ্রিয় মানস সম্ভোগ। ইহাদের উপরেও যে তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি—যাহা ব্রহ্মজ্ঞের পরা দৃষ্টি—সেই দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া যে "স্বাদ" সুখ লাভ করেন,—যাঁহাদের বলিবার অধিকার আছে, তাঁহারা বলেন—সেই স্বাদ সুখের পূর্বাভাস আছে ঐ রসানন্দে।

নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য

চন্দ্রনাথ বসু

(১)

উপাখ্যান লিখিবার তিনটি প্রধান প্রণালী প্রচলিত আছে, যথা—নাটক, আখ্যায়িকা ও কথাগ্রন্থ। নাটকে শুদ্ধ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্তা কহেন। সমস্ত ভাব, সমস্ত কার্য এই ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার অন্তরালে থাকিয়া, এই সকল ব্যক্তিদিগকে পরিচালিত করেন। আখ্যায়িকায় গ্রন্থকর্তা স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের প্রায় সাক্ষাৎ হয় না। কথাগ্রন্থ এই উভয়ের মধ্য-স্থলবর্তী। ইহার কিয়দংশে গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্তা কহেন, কিন্তু অন্যান্য অংশে গ্রন্থকর্তা স্বয়ং আমাদিগের সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। নাটক লেখা যত শক্ত হউক, বা না হউক, নাটক সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া উঠা অতি কঠিন। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কে কি চরিত্রের লোক, কি জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কার্য করেন, সে সমস্ত বুঝিবার জন্য অনেক জ্ঞান, অনেক চিন্তার প্রয়োজন। কথাগ্রন্থ-লেখক এই জ্ঞান ও এই চিন্তার সম্বন্ধে আমাদের অনেক সাহায্য করেন। গ্রন্থের যে যে অংশ আমরা বুঝিতে পারিব না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তিনি সেই সেই অংশগুলি আমাদের নিকট অতি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। সুতরাং নাটক বুঝা অপেক্ষা কথাগ্রন্থ বুঝা অধিকতর সহজ হইয়া উঠে। যাহা সহজে বুঝা যায়, তাহাতে অধিকতর আমোদ অনুভব করিতে পারা যায়। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল দেশেই কথাগ্রন্থের সৃষ্টি হইলে আর নাটক বা আখ্যায়িকার সমধিক আদর থাকে না। আখ্যায়িকায় সমস্ত বস্তুই গ্রন্থকর্তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন। সুতরাং নাটকে যেরূপ নাট্যোল্লিখিত ক্রিয়ার বা ব্যক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আখ্যায়িকায় তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য আখ্যায়িকা অপেক্ষা নাটকে অধিকতর আমোদ আছে।

কথাগ্রন্থ নূতন সৃষ্টি। সংস্কৃতে অধিকাংশ-গ্রন্থই কবিতায় লিখিত হইত। যে কয়খানি গদ্য গ্রন্থ আছে, তাহার অধিকাংশই আখ্যায়িকা। কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। সংস্কৃত নাটকও অনেক ছিল। কিন্তু,

নাটক ও আখ্যায়িকামিশ্রিত কোন কাব্যগ্রন্থ সংস্কৃতে ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ইংলণ্ডেও কথাগ্রন্থের অতি অল্পদিন মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে ইংলণ্ডের উপাখ্যান সমস্ত আখ্যায়িকার প্রণালীতে লিখিত হইত। এই সকল আখ্যায়িকায় বড় বড় রাজার ও বীরপুরুষের বীরকীর্তি সমস্ত বর্ণিত হইত। ইংলণ্ডে নাটকও অনেক ছিল। কিন্তু কেবল ডিফোর (Defoe) সময় হইতে বর্তমান প্রকারের কথাগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে মনে করেন যে, নাটক লিখিবার জন্য যেরূপ প্রতিভা বা ক্ষমতার প্রয়োজন এক্ষণে মনুষ্যের আর সেরূপ ক্ষমতা বা প্রতিভা নাই। কথাগ্রন্থে প্রতিভার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা অপেক্ষা এই প্রতিভা অনেক অংশে ন্যূন। এইজন্যই এক্ষণে আর নাটক লিখিত হয় না। মনুষ্যের প্রতিভা দিন দিন কমিতেছে, এক্ষণে ইহা কথাগ্রন্থ পর্যন্ত যাইতে পারে, নাটক পর্যন্ত যাইবার ক্ষমতা আর ইহার নাই। এই মতটি আমার সত্য বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সেক্সপীয়রকে ছাড়িয়া দিলে যে সকল নাটককার অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহারা যে প্রতিভা সম্বন্ধে ফিল্ডিং, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট তাহা আমাদের বোধ হয় না। ফলতঃ কথাগ্রন্থ নাটকের ন্যায় সমান আমোদ প্রদান করে। নাটকে যে যে উপদেশ পাওয়া সম্ভব, কথাগ্রন্থে সেই সেই উপদেশ পাওয়া যায়। তবে এক কথা এই যে, নাটক সকলে সহজে বুঝিতে পারে না। কথাগ্রন্থ সকলে সহজে বুঝিতে পারে। এজন্য লোকে নাটকের আদর না করিয়া কথাগ্রন্থের আদর করিয়া থাকে। যে কারণেই হউক, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যতদিন কথাগ্রন্থের প্রকাশ ছিল না, ততদিন নাটকের অতি সমাদর ছিল। কিন্তু কথাগ্রন্থের প্রকাশ হওয়া অবধি নাটক ক্রমশঃ হতাদরই হইতেছে।

আমাদের দেশে বঙ্কিমবাবু হইতে কথাগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগ্রন্থ ইংরেজী কথাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ। ইহাতে অনেক স্থলে ইংরেজী চরিত্র, ইংরেজী ভাব, এমন কি ইংরেজী ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করা হইয়াছে।* বঙ্কিমবাবুর প্রতিভাগুণে এই অনুকরণের মধ্যেও

* দুর্গেশনন্দিনী—"যদি সেই সময়ে মন্দিরমধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর চমকিত হইতেন না।" ইংরেজী অনেক নভেলে ঠিক এই ভাবটি এই ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

নানাপ্রকার সৌন্দর্য অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার পর হইতেই বাঙ্গালায় নভেলের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে।

কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের নাম ইংরেজীতে রোমান্স। ইহা বীররসপ্রধান। ইহাতে যুদ্ধ, বিগ্রহ, রাজা, বীরপুরুষ, রাজকীর্তি, বীরকীর্তি প্রভৃতি বর্ণিত হয়। বাংলায় দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্গাধিপপরাজয়, শতবর্ষ প্রভৃতি কথাগ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থে প্রকৃত ঘটনা সমস্ত বর্ণিত হয়। যে সকল ঘটনা আমরা আমাদের মধ্যে নিত্য দেখিতে পাই, সেইগুলি এইরূপ কথাগ্রন্থে আমাদের নিকট সুন্দররূপে প্রতিভাসিত হয়। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, স্বর্ণলতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।

পাঠকের মনোরঞ্জন করা এই মাত্র পূর্বে উপাখ্যান লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপীয়েরা পূর্বে অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। এজন্য তাহাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত যুদ্ধসম্বন্ধীয় ঘটনা সমস্ত বিবৃত হইত। এখনও ইউরোপে যুদ্ধপ্রিয়তা কমে নাই। সুতরাং যুদ্ধ-বর্ণনা ইউরোপীয় কথাগ্রন্থের প্রধান উপাদান। বাঙ্গালা কথাগ্রন্থ ইউরোপীয় কথাগ্রন্থের অনুকরণ। সুতরাং বাঙ্গালা কথাগ্রন্থেও যুদ্ধাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এই লাভ হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে ডন্ কুইক্সটের প্রণালীর যুদ্ধপ্রিয়তা অত্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে। শীর্ণ বঙ্গীয় যুবক আপনাকে জগৎসিংহ বা হেমচন্দ্রের অবস্থায় উপস্থাপিত করে, এবং এইরূপে লোকের নিকট অতীব উপহাসাস্পদ হয়। "ভারত-উদ্ধার" লেখক এ বিষয়ের সাক্ষী। পাঠকের মনে পড়িতে পারে—

"বঁটাইয়া দিব আজি পাষণ্ড ইংরেজে।"

কিন্তু রোমান্স পাঠে যে এককালেই কিছুমাত্র লাভ হয় নাই তাহা নয়। ইহাতে কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনাবশতঃ একরূপ অদ্ভুত আনন্দ জন্মে। যুবকেরা যে কি আনন্দের সহিত স্কটের "আইভ্যানহো" বা বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠ করে, তাহা মনে হইলে, বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কিন্তু এই আনন্দ ক্ষণিক। ইহার ফলবত্তা অতি অল্পই আছে। যাহা কিছু ফলবত্তা আছে, তাহাও বোধহয়, অনিষ্টের দিকে। কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনা হওয়াতে বিবেচনাশক্তির কিঞ্চিৎ হ্রাসতা হয়, এবং বস্তুর যথার্থ ব্যবহার না দেখিয়া, কেবল তাহার সৌন্দর্য, মনোহারিত্ব প্রভৃতি দেখিতে ইচ্ছা হয়। সাংসারিক অনেক কার্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। মানুষ আপনাকে

অত্যন্ত উন্নত করিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে মাত্র, কিন্তু সেই পর্যন্ত তাহার নিজের বা তাহার সংসারের কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, উপকার হয় না, কেবল পদে পদে মনস্তাপ পায়।

(২)

কথাগ্রন্থের আলোচনায় লাভালাভের বিচার দেখিয়া হয় ত অনেকে বলিয়া উঠিবেন, নভেল শিল্পের বই। নদীর স্রোতের মতো উহাতে গড়াইয়া যাইব। ইহাতে আবার লাভালাভ দেখিব কি? ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি হইবে, তাহাতে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থিত করিলে, ধান ভানিতে শিবের গীত করা হয়। যদি এই মতটি সত্য হয়, তাহা হইলে নভেলের সংখ্যা যে এত বর্ধিত হইতেছে, ইহা পৃথিবীর পক্ষে অনিষ্টকর বলিতে হইবে। নৃত্য, গীত প্রভৃতি যে কলায় শুদ্ধ আমোদানুভব হয়, সংসারে তাহাদের নভেলের মত আদর নাই। প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা নৃত্য গীতে অতি অল্প সময় ব্যয়িত করেন। কিন্তু নভেল লেখায় বা নভেল পড়ায় অনেক মহা মহা পণ্ডিত আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। যদি নভেল শুদ্ধ আমোদের বস্তু হয়, তাহা হইলে ইহার এত আদর কেন? এক্ষণে "ব্যবহারোপযোগিতা" লইয়া ইংলণ্ড একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। সেখানে আমোদের বস্তুর এত আদর কেন? ফলতঃ যদিও অনেক নভেল কেবল মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সারবত্তা না থাকিলে নভেল কখনই শিক্ষাবিষয়ে এত উচ্চ স্থান পাইত না। নভেল ফুলের ন্যায় সুন্দর বটে, কিন্তু ফলই ইহার পরিণাম।

ইহাতে কেহ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, "সত্য বর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য। লাভালাভ-বিচার তাহার উদ্দেশ্য নহে। এই পৃথিবীতে আমরা যে বস্তু যেরূপ দেখিতে পাই, সেই বস্তুটি যথাযথরূপে বর্ণিত করিলেই উপন্যাস-লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ফিল্ডিং-এর টম্ জোন্স এইরূপ নভেলের দৃষ্টান্ত। টম্ জোন্স যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, গ্রন্থকর্তা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। নভেল লিখিতে হইলে, এইরূপেই লেখা উচিত।" কিন্তু সত্য দুই প্রকার, আংশিক সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য। কোন উকিল যে কখন স্পষ্ট মিথ্যা কথা কহেন, এমন নহে। তিনি যতদূর বলেন ততদূর সত্য। কিন্তু তিনি সমস্ত কথা বলেন না। মনে করুন, আপনি বলিলেন, "চোর সিঁদ দিল, ধরা পড়িল না, বাড়ী

ফিরিয়া আসিল, পথে কোন বিপদ ঘটিল না, বাড়ীতে আসিয়া অপহৃত ধন লইয়া সে গাড়ী ঘোড়া করিল, সকলের নিকট সম্মানিত হইল।" যদি এই পর্যন্ত বলিয়াই আপনি ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে আপনি সত্যের আংশিক বর্ণনা করিলেন। কারণ চোর অনেক সময় ধৃত হয়, জেলে যায়, বহুতর কষ্ট পায় এবং কখন কখন দ্বীপান্তরিত হয়। যেখানে সত্যের আংশিক বর্ণনা সেখানে নানাবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা। কারণ সত্য মিথ্যা নির্বাচন করিয়া লওয়া অতাব কঠিন। মিথ্যা বর্ণন সকল সময়েই অবিধেয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যায় প্রায় কাহারও অনিষ্ট হয় না। কারণ লোকে অক্লেশে তাহার মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারে। প্রণয় নভেলের পরম পদার্থ। এই প্রণয়ের বর্ণনা নভেলে নিম্নরূপে প্রকটিত হয়—"যুবক যুবতী উভয়ে অতীব রূপবান্, অতীব গুণবান্। যুবক পুরুষদিগের সর্বোৎকৃষ্ট, নারী যুবতীদিগের সর্বোৎকৃষ্টা। উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। যে কারণেই হউক উভয়ে উভয়কে ভালবাসিল। তাহার পর উভয়ে সংসারের সমস্ত বস্তু উপেক্ষা করিতেছেন, পিতামাতার আজ্ঞা অবহেলা করিতেছেন, হয় ত কোন সময়ে উভয়ে কোন কোন অসৎ কর্মও করিয়া ফেলিতেছেন। তাহার পরে উভয়ের বিবাহ হইল।" এইখানেই অনেক নভেলের সমাপ্তি হয়। যতদূর ইহাতে বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু ইহাতে সকল কথা বলা হয় নাই। বিবাহের পর যুবক যুবতী অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে, সংসারের অনেক প্রলোভন, অনেক বিঘ্ন বিপদ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তাহারা আপন আপন পূর্ব চরিত্র অনুসারে সুখী বা দুঃখী হইয়া জীবন অতিপাত করে। সুতরাং যাঁহারা যুবক যুবতীর বিবাহ দিয়াই নভেলের সমাপ্তি করেন, তাঁহারা মনুষ্য-হৃদয়ের একমাত্র অংশ উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অপর সমস্ত অংশের মনোহারিত্ব কমাইয়া দেন।

আর এক কথা, কোন্‌টি মিথ্যা তাহা কি কোথাও নির্বিবাদে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তুমি যাহাকে সত্য বল, আমি তাহাকে মিথ্যা বলি, তুমি যাহা স্বাভাবিক বল, আমি তাহা কাল্পনিক বলি।* তবে তুমি যাহাকে সত্য বলিয়া

* **শিজউইক লাভালাভ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—তুমি যাহাকে লাভ বল, আমি তাহাকে অলাভ বলি, আবার তুমি যাহাকে অলাভ বল, আমি তাহাকে পরম লাভ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সত্যাসত্য বুঝিতে মনুষ্যের মধ্যে যেরূপ বিসম্বাদিতা, লাভালাভ সম্বন্ধে বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম।**

মনে কর, শুদ্ধ সেইরূপ অনিশ্চিত সত্যের জন্য আমার সুখের আশা কেন হারাইব ?

আর এক কথা, সত্য বলিতে হইবে কেন ? সত্য বলায় লাভ আছে, অসত্য বলায় অনিষ্ট আছে। সুতরাং সত্যাসত্যের বিচার প্রকারান্তরে লাভালাভের বিচার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

আর এক দল আছেন, তাঁহারা বলেন যে, স্বভাব-বর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য। রুশো এই স্বভাব-বর্ণনার প্রবর্তক। মনুষ্য স্বভাবতঃ অতি সুন্দর ; সুতরাং স্বভাবের ব্যত্যয় করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। সুতরাং এস্থলেও লাভালাভের প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে নানারূপ আপত্তি আছে। আমরা স্বভাবতঃ সুন্দর-স্বভাব কি না তাহার সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। সে সকল তর্কের এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই। এখানে এই পর্যন্ত বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে লাভালাভের বিচার কথাগ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, রোমান্স-পাঠে অধিক লাভ হয় না। ইহাতে কেবল কল্পনাশক্তির সম্যক্ পরিচালনা হয় মাত্র। আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে যে কিছু পরিবর্তন জন্মে, তাহার অধিকাংশই অনিষ্টের দিকে। এ জন্যই এক্ষণে আর রোমান্সের সহিত সাধারণতঃ মনুষ্যের সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৩)

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ পাঠে কোনরূপ লাভ হয় কি না। আমাদের দেশের কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ ইংরেজী কথাগ্রন্থের অনুকরণ। সুতরাং আমাদের কথাগ্রন্থের লাভালাভ বিচার করিতে হইলে ইংরেজী কথাগ্রন্থ পর্যন্ত অনুসন্ধান করা কর্তব্য। দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ (আমরা ইহার নাম গার্হস্থ্য কথাগ্রন্থ রাখিলাম) পূর্বোক্ত প্রণালীতে আলোচনা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজের অবস্থা অনুসারে মনুষ্যের চিন্তাস্রোতও পরিবর্তিত হয়। যখন সমাজ ধর্মপরায়ণ, তখন মনুষ্যের রচনায় ধর্মের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন সমাজ অধঃপতিত হইতে আরম্ভ হয় তখন মনুষ্যের রচনাতেও এই অধঃপাতের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড যখন ধর্ম লইয়া উন্মত্ত তখন "মিল্টন" তাঁহার "প্যারাডাইস লষ্ট" লিখেন। আবার যখন নীচ-প্রকৃতি

দ্বিতীয় চার্লস ফ্রান্সের উচ্ছৃঙ্খলতা ইংলণ্ডে প্রবর্তিত করেন, তখন ড্রাইডেন তাঁহার "All For Love" প্রভৃতি জঘন্য অপাঠ্য নাটক লিখেন। যাঁহারা এই সমাজস্রোতে গড়াইয়া যান, তাঁহারা পরবংশীয়দিগের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন না। কিন্তু যাঁহারা সমাজের অবনতি দেখিয়া সমাজস্রোতের বিপরীতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজকে সুপথে পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই সর্বসাধারণের যথার্থ ধন্যবাদের পাত্র। যখন ড্রাইডেন, উইচারলি, কনগ্রিভ প্রভৃতি জঘন্য গ্রন্থ লিখিয়া সমাজকে উৎসন্ন দিতেছিলেন, সেই সময়ে জেরিমি কলিয়ার এইরূপ সমাজ-পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

এক্ষণে ইংলণ্ডে অর্থোপার্জনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। গাড়ী, ঘোড়া, ঘরবাড়ী, অলঙ্কার, পোষাক প্রভৃতি ভোগবিলাস সকলের একমাত্র ধ্যেয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অর্থোপার্জন করিতে হইলে অনেকটা কঠোর-হৃদয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে চলতি কথায় বলে, "চক্ষুলজ্জা যাঁর অর্থনাশ তাঁর।" ইংলণ্ড অনেকদিন হইতে এই চক্ষুলজ্জার মাথা খাইতেছেন। কর্তব্য-কার্যের জন্য (অর্থাৎ অর্থোপার্জনের জন্য) ইংলণ্ড সকলপ্রকার চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ইংলণ্ডে কঠোরহৃদয়তার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে এই কঠোরহৃদয়তার হ্রাস হয়, ইংলণ্ডের নভেলিষ্টগণ সেই চেষ্টাই করিতেছেন। ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে অন্ততঃ একজন কঠোর-হৃদয় অর্থপিশাচ আছে। ইহারা সকলেই নানারূপ কষ্টে পড়িয়া শেষ দশায় অত্যন্ত যাতনা পাইয়া, সকল লোকের নিকট অবমানিত হইয়া, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া, কেহ বা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ চরিত্র বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্য কঠোরহৃদয়তার এই সকল ফল দেখিতে পাইয়া আর কঠোরহৃদয় হইতে চাহিবেন না। ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে আর একটি চরিত্র বর্ণিত আছে।* ইঁহাদের অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ অনাদর। ইঁহারা স্বকীয় সহৃদয়তার বলে নানারূপ সুখ সম্ভোগ করতঃ অবশেষে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থের প্রতি অনাদর হইবে এবং কঠোরহৃদয়তার স্থলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহৃদয়তা আসিবে। ডিকেন্সের উপদেশ এই—"অর্থের লোভে কঠোর-

* "নিকোলাস্ নিকল্‌বির" "র‍্যাল্‌ফ নিকল্‌বি" ও "নিকোলাস নিকল্‌বির" কথা পাঠক মহাশয়ের মনে পড়িতে পারে।

হৃদয় হইও না, কারণ তাহাতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। অর্থের লোভ ত্যাগ করিয়া সহৃদয় হও, কারণ তাহাতে পরিণামে অনেক সুখ পাওয়া যায়।” ইংলণ্ডের এক্ষণে যেরূপ সমাজের অবস্থা, তাহাতে ডিকেন্সের নভেল যে সেখানকার পক্ষে নিতান্ত উপযোগ্য তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু বঙ্গ-সমাজের অবস্থা, ইংলণ্ডীয় সমাজের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইংলণ্ডে যাহা অতীব উপকারী, এখানেও যে তাহা উপকারী হইবে এরূপ আশা করা যায় না। ইংলণ্ড এক্ষণে লক্ষ্মীদেবীর বিলাসভূমি। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রায় বিনিময়-কার্য সম্পাদিত হয়। রাশি রাশি ধনের উপর বসিয়া ইংলণ্ড ধনের স্পৃহা একটু ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডের দেখাদেখি যদি তুমি আমি ধনস্পৃহা ত্যাগ করি, তাহাতে সংসারের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। কঠোরহৃদয়তা আমাদের দেশে প্রবল নয়। অর্থার্জন-চেষ্টা আমাদের দেশে বড় নাই। বৈরাগ্য আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষা, সুতরাং আমাদের দেশে সহৃদয়তা কিছু কমাইয়া অর্থার্জন-চেষ্টা কিঞ্চিৎ বর্ধিত করা উচিত। সুতরাং ইংলণ্ড যে পথে চলিতেছেন, এ বিষয়ে আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলা উচিত। অর্থার্জনস্পৃহা ও সহৃদয়তা উভয়েরই দোষগুণ আছে। সমাজের অবস্থা অনুসারে কাহারও বা বৃদ্ধি কাহারও বা হ্রাস হওয়া উচিত।

পূর্বের দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইংলণ্ডের যে প্রবৃত্তিটি পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক, এদেশে সেই প্রবৃত্তিটি দমিত হওয়া প্রয়োজনীয়। আবার ইংলণ্ডে যে প্রবৃত্তিটি দমিত হওয়া আবশ্যক, আমাদের এখানে সেইটি পরিবর্ধিত করা উচিত। সুতরাং ইংলণ্ডের অনুকরণে আমাদের ইষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা এ বিষয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রণয় কবিমাত্রেরই বড় আদরের বস্তু। প্রণয় লইয়াই নভেল-লেখকদের ব্যবসা। কিন্তু এই প্রণয়ের ভাব ইংলণ্ডে একরূপ ও আমাদের দেশে অন্যরূপ। ইংলণ্ডীয়দের মতে প্রণয় হৃদয়ের কার্য ; হৃদয় বলিল, অমুককে ভালবাস, অমনি তাহাকে ভালবাসিলাম। হৃদয় বলিল, অমুককে ভালবাসিও না, অমনি আমারও ভালবাসা বন্ধ হইল। আমার একজন স্বামী আছেন। কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। কেন ? আমার হৃদয় আমাকে এ বিষয়ে সম্মতি দেয় না। হৃদয়ের কথা যে সকল সময়ে আমাকে শুনিতে হইবে তাহা নয়। হৃদয়

আমাকে অনেক সময় অনেক অন্যায় কার্য করিতে বলে। জরের সময় হৃদয় জল খাইতে বলে, অপরের টাকা ধার লইলে হৃদয় আর তাহা শোধ করিতে দিতে চায় না ইত্যাদি। এ সকল সময়ে হৃদয়কে দমিত করিতে হইবে। কিন্তু প্রণয়ের বেলা হৃদয় যাহা বলিবে তাহাই শিরোধার্য। শৈবলিনীর স্বামী উদার, মহান্ এবং সর্বগুণান্বিত। শৈবলিনী তাঁহাকে অগ্নিসাক্ষী করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি? শৈবলিনীর হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে সম্মতি দিল না। শৈবলিনী অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল, কিন্তু হৃদয় রাজি হইল না। সুতরাং শৈবলিনী বিবাহের পরেও প্রতাপকে পূর্বের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল। ইহাতে শৈবলিনীর দোষ হইল বটে, কিন্তু সে দোষ অতি অল্প। কেন অল্প? শৈবলিনীর হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে বলে নাই। কুন্দ বেচারাও হৃদয়কে অনেক বুঝাইল। শুধু কুন্দ কেন? কুন্দ বুঝাইল, কমল বুঝাইল, সূর্যমুখী বুঝাইল। কিন্তু কুন্দের হৃদয় বুঝিল না।* ইহাতে যে কুন্দের দোষ হইল না, তাহা নয়। কিন্তু সে দোষকে যদি তুমি দোষ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি নিষ্ঠুরহৃদয় পাষণ্ড। কেন কুন্দের হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিল?

পূর্বের ভাবগুলি ইংরেজের। ইংরেজের দেশে ইহা সম্ভব। কারণ বালিকা-কাল হইতেই যুবতী প্রণয় সম্বন্ধে আপনাকে স্বাধীন দেখিতে পায়। তাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে পায়। উহাতে তাহার সমাজে নিন্দা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহের পর হইতে প্রণয়ের অঙ্কুর আরম্ভ হয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র কন্যা কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। আমাদের প্রণয় সমাজ-প্রথার অধীন মাত্র। তোমার হৃদয়কে ইহাতে সমাজের বশে চলিতে হইবে। যেমন অন্য অন্য স্থলে, তুমি হৃদয়কে সমাজের বশবর্তী করিতে চেষ্টা কর, প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। হৃদয় তোমাকে আইনের বশবর্তী হইয়া চলিতে নিষেধ করে, হৃদয় তোমাকে অন্যের উপার্জিত অর্থ বলপূর্বক লইতে বলে। তুমি এ সকল স্থলে হৃদয়ের আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সমাজের উপদেশ মত চলিয়া থাক। প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। পিতা-মাতা যাঁহাকে স্বামী কি স্ত্রী বলিয়া আমার সম্মুখে উপনীত

* নগেন্দ্র নিজেই বলিয়াছিল, "আমি নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি কিন্তু আমার হৃদয় বশ হইল না।"

করিলেন, আমি তাঁহাকে যাবজ্জীবন ভালবাসিব, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিব। যদি হৃদয় ইহাতে কোনরূপ অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করে, আমি সেই পাপিষ্ঠ হৃদয়কে পদতলে মর্দিত করিব, প্রয়োজন হইলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব, কিন্তু আমার হৃদয়-মন্দিরের দেব বা দেবীকে সিংহাসনচ্যুত করিব না। রোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে, দুঃখে সুখে ছায়ার ন্যায় উহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। সম্মুখে কি আছে দেখিব না, পার্শ্বে কি আছে দেখিব না। যদি স্বামী হই, স্ত্রীকে বক্ষে করিয়া যাবজ্জীবন কাটাইব। যদি স্ত্রী হই, স্বামিপদে মস্তক রাখিয়া জীবন কাটাইব।

ইহাই বঙ্গদেশের প্রণয়-লক্ষণ। যাঁহারা হৃদয়ের প্রলোভনে মোহিত হইয়া অন্যথাচরণ করেন, তাঁহারা আমাদের দেশে ঘৃণ্য। ইংরেজদের মত তাঁহাদের দেশে সত্য হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাকে প্রাণ ধরিয়া আমাদের দেশে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিকেরা সতীত্বকে মনের ভ্রম বলিয়া বুঝাইতে পারেন, দার্শনিকেরা সতীত্বকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের একমাত্র উজ্জ্বল মণি। ইংলণ্ডে কি জন্য পূর্বোক্ত মতের আদর দিন দিন বাড়িতেছে, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। জর্জ ইলিয়ট হইতে সামান্য নভেল-লেখক পর্যন্ত কি জন্য প্রণয়কে এই অপবিত্র আকারে চিত্রিত করেন, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। ইংরেজরা স্বাধীনতাপ্রিয়। বোধ হয় প্রণয় সম্বন্ধেও স্বাধীনতা আনিতে ইঁহারা ইচ্ছা করেন। আমরা অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতার ইচ্ছুক হইলে হইতে পারি, কিন্তু আমরা প্রণয়ের স্বাধীনতা চাই না। ড্রাইডেন বলিতে পারেন—"One to one was cursedly confined." আমরা বলিব—"One to one was blessedly confined."

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল যে, ইংলণ্ডীয়েরা প্রণয়কে যে আকারে চিত্রিত করেন, আমাদের দেশে তাহা লাম্পট্যসূচক এবং অতীব ঘৃণাজনক। সতীত্বের বৃদ্ধিতে যে সমাজের সুখবৃদ্ধি হয় তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি প্রণয় হইতে এই সতীত্বটুকু বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পশুভাব ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে প্রণয় সম্বন্ধে ইংলণ্ড আজিও সভ্যপদবীতে আরূঢ় হন নাই। কারণ যে দেশ যত সভ্য হইবে, সে

দেশে সমাজের আজ্ঞা ততই সম্মানার্হ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং যদি ইংলণ্ডীয় প্রণয়ভাব আমরা অবিকল অনুকরণ করি, তাহাতে আমাদের এই লাভ হইবে যে আমরা স্বদেশীয় সতীত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রণয়কে কেবল পশুভাবপূর্ণ বলিয়া মনে করিব।

যাঁহারা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমাদের দেশের অভাবসমস্ত হৃদয়ঙ্গম করতঃ, এই সমস্ত অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় নভেল লিখিবার প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাদের আমরা আমাদের যথার্থ হিতৈষী বলিয়া সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিব। আর যাঁহারা শুদ্ধ মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাবসমস্তের অবিকল 'তরজমা' করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন, তাঁহারা প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনই দেশের ধন্যবাদার্হ বলিয়া মনে করিতে পারিব না।

(বঙ্গদর্শন, ১২৮৭

নভেলের শিল্প বা কবিত্ব

দেবেন্দ্রবিজয় বসু

(১)

চরিত্র অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে। বলিতে কি, যেমন প্রত্যেকের মুখাবয়ব ও আকৃতি বিভিন্ন, তদ্রূপ প্রত্যেকের চরিত্র বা প্রকৃতিও বিভিন্ন। চরিত্র যে এত বিভিন্ন হয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে, চরিত্র-সংগঠনী শক্তি-গুলি নানা প্রকার। মনে কর, যদি চরিত্র-সংগঠনী শক্তির সংখ্যা বিংশতি হয়, আর তন্মধ্যে দশটি মাত্র শক্তি দ্বারা প্রত্যেক চরিত্র সংগঠিত হয়, তাহা হইলে বীজগণিতের সংমিশ্রণী (Combination) নিয়মানুসারে প্রায় বিংশতি লক্ষ বিভিন্ন চরিত্র সংগঠিত হইতে পারে। তবে যদি চরিত্র-সংগঠনী শক্তির সংখ্যা আরও অধিক হয়, (এবং তাহাদেরও ন্যূনাধিক পরিমাণ থাকে, বিবেচনা করা যায়) তবে অসংখ্য বিভিন্ন চরিত্র সংগঠিত হইবার কারণ আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। সে যাহা হউক, এই সমস্ত চরিত্র-সংগঠনী শক্তি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক বাহ্যিক বা আধিভৌতিক শক্তি, আর এক আন্তরিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি। এই আধ্যাত্মিক শক্তিই চরিত্র স্ফূর্তি করে, আধিভৌতিক শক্তি সেই স্ফূর্তির সাহায্য করে মাত্র। অতএব চরিত্রের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিমাণ অনুসারে, আমরা চরিত্রের সমষ্টি-শক্তির পরিমাণ করিতে পারি।

উল্লিখিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবার প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভাগ করিতে পারা যায়। মনোবিজ্ঞান বলে যে, আমাদের মন তিন প্রকার বৃত্তির সমষ্টি মাত্র। প্রথমতঃ, বুদ্ধি ও চিন্তাবৃত্তি, ইংরেজীতে ইহাকে Intellect বলে। ইহার সহিত আমরা কল্পনাবৃত্তিকে (Imagination) একশ্রেণীভূক্ত করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি (Feeling), ইহাকে প্রকৃত চিত্তবৃত্তি বলা উচিত। তৃতীয়তঃ, ইচ্ছা-বৃত্তি, বাসনা (Willing), ইহার দ্বারা আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই। প্রথমগুলি আমাদের জ্ঞান ও চিন্তাবৃত্তি, দ্বিতীয়-গুলি আমাদের চিত্তবৃত্তি, আর শেষগুলি কার্যকারিণী বৃত্তি। যাহার এই

বৃত্তিগুলির পূর্ণ মাত্রায় স্ফূর্তি হয়, সেই সর্বপ্রধান চরিত্র। চিত্র-বৃত্তিগুলিকেও আবার সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, কতকগুলি আমাদের আত্মপর (Selfish বা Egoistic) বৃত্তি। ইহাতেই আমাদিগকে স্বার্থপর করে—সংসারকে তাচ্ছিল্য করিয়া, অন্য লোকের ক্লেশ বা দুঃখ অবহেলা করিয়া, আমরা এই বৃত্তি-বলেই স্বকার্য সাধনের জন্য যত্ন করি। অন্যগুলি অনাত্মপর বৃত্তি ; ইহা দ্বারাই আমরা পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করি এবং পরহিতব্রতে জীবন বিসর্জন করিতে শিক্ষা করি।

অতএব যে চরিত্রের জ্ঞান-বৃত্তি ও কার্যকারিণী বৃত্তির চরম উন্নতির সহিত অনাত্মপর বৃত্তিগুলির বিশেষ স্ফূর্তি হয়, তাহাই আমাদের আদর্শ চরিত্র। কিন্তু যাঁহাদের অনাত্মপর বৃত্তির পরিবর্তে আত্মপর বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্তি হয়, তাঁহারা প্রধান চরিত্র হইলেও, সর্বাপেক্ষা সংসারে অধম ও অত্যন্ত ভয়ানক চরিত্র। সাধারণ চরিত্র এই দুই সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে—কখনও অতিক্রম করিতে পারে না। মনোবিজ্ঞান্‌বিদ্‌ পণ্ডিতগণ বলেন, চিত্তবৃত্তিই আমাদের কার্যকারিণী বৃত্তির উত্তেজক। সুতরাং এই চিত্তবৃত্তি যত প্রবল হয়,—সেই পরিমাণে আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিগুলির কার্যস্ফূর্তি হইতে থাকে। চিত্তবৃত্তি আত্মপর হইলে, সে চরিত্রের কার্যও অত্যন্ত অসৎ ও সমাজের অমঙ্গলকর হইবে।

সে যাহা হউক, মহাপুরুষদের বা আদর্শ চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, যেমন, সমাজের ও জগতের উন্নতিকল্পে তাঁহারা যে পরিমাণে শক্তির স্ফূর্তি করিয়াছিলেন, তাহার পর্যালোচনা করি—যে পরিমাণে সংসারের উন্নতির জন্য কার্য করিয়াছেন, তাহার শক্তি (Momentum) পরিমাণ করি, চরিত্র উপলব্ধি করিতে আমরা সেরূপ শুধু কাযের পরিমাণ না করিয়া, তাহার সমুদায় বৃত্তিরই শক্তি স্থির করিয়া থাকি। অতএব নভেল-লেখকের চরিত্র-চিত্র সম্বন্ধে কর্তব্য কি ? তিনি চরিত্র-সংগঠনী শক্তিগুলি যতদূর পারেন, বুঝাইয়া দিবেন। সংগঠিত চরিত্রের শক্তি, তাহার জ্ঞানবুদ্ধির পরিমাণ, তাহার আত্মপর ও অনাত্মপর চিত্তবৃত্তির পরিমাণ, এবং কার্যকারিণী শক্তিগুলির পরিমাণ বুঝাইয়া দিবেন। কি করিয়া শক্তিগুলির এরূপ স্ফূর্তি হয়, তাহা যতদূর পারেন দেখাইয়া দিবেন। তাহার পর তিনি এরূপ চরিত্রের কার্যপ্রণালী বুঝাইয়া দিবেন। অতএব নভেল-লেখকের প্রধান কর্তব্য, মনোবিজ্ঞান সহজে পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া,—মনোবৃত্তিগুলির গতি,

শক্তি ও ক্রিয়া দেখাইয়া দেওয়া, কোন্ বৃত্তি ভাল, কোন্ বৃত্তি মন্দ, কোন্ কার্য সৎ, কোন্ কার্য অসৎ—কোন্ চরিত্র উত্তম, কোন্ চরিত্র অধম, তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই! তাঁহার নীতিশাস্ত্র বুঝাইবার তত প্রয়োজন নাই, মনোবিজ্ঞান বুঝানই প্রধান কর্তব্য। পণ্ডিত টেন সাহেব বলিয়াছেন,—

"What is a novelist? In my opinion he is a psychologist who naturally and involuntarily sets psychology at work; he is nothing else, nor more. He loves to picture feelings, to perceive their connections, their precedents, their consequences: and he indulges in this pleasure. In his eyes they are forces, having various directions and magnitudes. About their justice or injustice he troubles himself little."

—History of English Literature, Vol. II, p. 390

সুতরাং নভেল-লেখকের কাজ বড় সহজ নহে। এই চরিত্র-চিত্রেই তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প-নৈপুণ্য বা প্রকৃত কবিত্ব কি? যেমন চিত্রকর প্রকৃত ঘটনা অনুকরণ করিয়া তাহার প্রতিচিত্র অঙ্কিত করেন,—যেমন ভাস্কর একখণ্ড শিলা খোদিত করিয়া তাহাকে জীবিত-কল্প মনুষ্যে পরিণত করিতে পারেন, সেইরূপ সাহিত্য-জগতে যথার্থ শিল্পকর যিনি, তিনি স্বভাব অনুকরণ করিয়া চরিত্রের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। এই স্বভাবের অনুকরণই শিল্পের প্রাণ। যেখানে একটু মাত্র অস্বাভাবিক হইল, সেইখানেই শিল্প-কৌশল সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। চিত্রকরের কাজ সহজ, কেন না তিনি কোন বিশেষ অবস্থার, বিশেষ সময়ের বা বিশেষ ঘটনার চিত্রমাত্র অঙ্কিত করেন। তাঁহার চিত্রে যাহা অঙ্কিত থাকে, তাহা অতি পরিষ্কাররূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় সত্য, কিন্তু সে চিত্র দেশ কাল বা পাত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রকৃত কবি-শিল্পীর কাজ বড়ই গুরুতর। তিনি কোন বিশেষ অবস্থা, বিশেষ ঘটনা বা নির্দিষ্ট সময়ের কার্য অঙ্কিত করেন না, দেশকালপাত্র সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ নহে তাঁহাকে এরূপ অনেক ঘটনা চিত্র করিতে হয়,—তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইতে হয়,—তাহাদের ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পী যিনি, তিনি

সর্বকালিক, সর্বদেশীয় এবং সর্বজনীন এক নূতন সংসার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৃষ্ট এই নূতন জগৎ, প্রকৃত সংসারের সম্পূর্ণ অনুকরণে হওয়া আবশ্যক। সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, সুনীতি দুর্নীতি তিনি কিছুই দেখিবেন না, সংসারে যাহা পাইবেন, তাহাই চিত্রিত করিবেন। চিত্রের ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা করিতে পাইবেন না। শুধু তাহাই নহে, তিনি বাহ্য জগতের শুধু উপরিভাগ—শুধু আচরণ দেখিয়া তাহাই চিত্র করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। জগতের মূল কারণ মধ্যে—তাহার মূল সত্য মধ্যে—অন্তর্জগতের গূঢ়তম স্থানে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। সাধারণে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা দৈবশক্তিবলে কেবল কবির জ্ঞান-চক্ষে প্রকাশ পায়,—তাহা সাধারণকে দেখাইতে হইবে—তাহার যথার্থ মর্ম বুঝাইতে হইবে। যাহা লোকে দেখিয়াও দেখে না—বুঝিয়াও বোঝে না—তাহাই প্রকৃত কবিকে দেখাইতে হইবে। মুহূর্তের বাহ্যিক ভঙ্গিতে আমাদের মনের যে গূঢ়তর লুক্কায়িত ভাবসকল প্রকাশ পায়, তাহা চিত্রকর কেমন সুন্দররূপে আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। স্বভাবের রত্নভাণ্ডারের মধ্যে চারিদিকে কত অপূর্ব শোভা বিরাজিত রহিয়াছে—সংসারের কঠোর তাড়নায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না, বুঝি সে শোভা দেখিবার বৃত্তিগুলিই আমাদের শুকাইয়া গিয়াছে। শিল্পী যিনি, তিনি তাহা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দেন। অতএব শিল্পী যিনি তাঁহার কাজ বড়ই কঠিন। তিনি সাধারণের শিক্ষক, সাধারণের নেতা। তিনি সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেন—তাহার গূঢ় ব্যাপারসকল স্বয়ং বুঝিতে পারেন—চরিত্রের কার্য, তাহার মনের ভাব, তাহার চিন্তার গতি, জগৎ ও অন্যান্য চরিত্রের সহিত সংস্রবে তাহার মনের ঘাত-প্রতিঘাত,—সেরূপ চরিত্র-সংগঠনী শক্তিগুলি সমস্তই শিল্পী দেখিতে পান। দেখিয়া, সে সকল সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কারলাইল এক স্থানে বলিয়াছেন, শিল্প ও সত্যে প্রভেদ নাই। যেখানে সত্যের অপলাপ, সেইখানেই শিল্পের হানি। সত্যই শিল্পের প্রাণ। তবে কি সকলে বুঝিতে পারে?—তাহা হইলে ত পৃথিবী স্বর্গ হইত! যতই জগতের উন্নতি হইতেছে, ততই সত্যগুলি ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে—ততই লোকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে। যাহা থাকিবে তাহাই সত্য, যাহাতে জগৎকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে, মানুষকে নিজ উদ্দেশ্য-পথ দেখাইয়া দিবে, তাহাই সত্য। যাহা সৎ, অথবা যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই

সত্য। নতুবা ত আর সবই অসৎ। এই সত্যগুলি জগতে যাঁহারা প্রচার করেন, যাঁহারা এই সত্য প্রথমে দেখিতে পান—এবং দেখিয়া তাহা জগৎকে দেখাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত কবি, প্রকৃত শিল্পী। ইংরাজীতে একটা গ্রিক কথা আছে—Prophet; প্রফেট বলিলে এখন আমরা ভবিষ্যৎ-বক্তা বুঝি, যে অনুগৃহীত ব্যক্তি ঈশ্বরের সত্য সংসারে প্রচার করেন, আমরা তাঁহাকেই প্রফেট বলিয়া থাকি। এই প্রফেট আর পোয়েট একই কথা। কবি যিনি - তিনিই ত অনুগৃহীত ব্যক্তি—তিনিই ত সর্বাগ্রে ঈশ্বরের সত্য দেখিতে পান,—আর সে সত্য পাইয়া জগতে তাহা প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং তিনিই ত প্রকৃত ভবিষ্যৎবক্তা - সত্য-প্রচারক। অতএব কবি-শিল্পীর কাজ বড়ই গুরুতর। তিনি সকলের আগে যে সত্য দেখিতে পাইলেন, তাহাই প্রচার করা তাঁহার কায, এই প্রচারেই তাঁহার শিল্পকৌশল নির্ভর করে। সত্য যেন এরূপভাবে প্রচারিত না হয় যে তাহাতে সত্যের রূপান্তর হয়। সে সত্য পরিষ্কার করিয়া সাধারণে বুঝাইতে হইবে - যেন কোন কথা অতিরঞ্জিত না হয়, কোন কথা অপ্রকাশিত না থাকে। তাহা হইলেই সত্যের অপলাপ হইল। কবির শিল্পচাতুর্য সকলই বিফল হইল।

পূর্বে বলিয়াছি ত, এই সত্য প্রচার করিতে গিয়া, কবিকে সৎ অসৎ, ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ, কিছুই দেখিতে হইবে না, তাঁহাকে সে সব কিছুই ভাবিতে হইবে না। যে সত্য তিনি বুঝিবেন, তাহাই জগতে প্রচার করিবেন, সৎ অসৎ ভাল মন্দ বাছিয়া লইবার ভার জগৎকে দিবেন। এই সংসারই ত সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সুনীতি কুনীতি প্রভৃতি দ্বৈতভাবে জড়িত, এইরূপ দ্বন্দ্ব দ্বারাই গঠিত। তোমার কাছে ন্যায় অন্যায়, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু সংসারে সেরূপ নহে। সংসারের কাছে সবই ভাল, কেননা সবই ত সংসারের কায। এই দুইরূপ পদার্থে মিলিয়াই ত সংসার গঠিত। কবি যিনি, তিনিও ত সংসারকে অনুকরণ করেন, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সত্যগুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লন। সে সত্য মধ্যে ভাল মন্দ থাকিতে পারে, সৎ অসৎ থাকিতে পারে, তাহাতে কবির কি? তিনি ত সমানরূপে অপক্ষপাতের সহিত উভয় হইতেই সত্য দেখাইবেন—জগতের কাজ, ভাল মন্দ বাছিয়া লইবে। আর এক কথা, মন্দ না দেখিলে ভালর মর্ম কে বুঝে বল দেখি? কবি যদি মন্দ ছাড়িয়া শুধুই ভাল দেখান, তবে

মন্দ দেখাইবে কে ?—তবে ভালর আদর বুঝাইয়া দিবে কে ? যিনি সত্য-পথের পথিক, তিনি জগৎরূপ সমুদ্রে ডুবিয়া প্রকৃততত্ত্বরূপ সত্যরত্ন উত্তোলনে ব্যস্ত, ভালমন্দ বুঝিতে গেলে তাঁহার সত্যপথ অনুসরণ করা হয় কই ? সেই জন্য কবি শিল্পীর ভালমন্দ দেখার আবশ্যক নাই, সত্যই দেখিবেন, সত্যই দেখাইবেন। পণ্ডিত টেন এক স্থানে বলিয়াছেন, –

"A genuine painter sees with pleasure, a well-drawn arm, and vigorous muscles, even if they be employed in slaying a man. A genuine novelist enjoys the contemplation of the greatness of a harmful sentiment or the organised mechanism of a pernicious character * * * * He represents them (faculties) to us as they are whole, not blaming, not punishing, not mutilating ; he transfers them to us intact and separate and leaves to us the right of judging if we desire it."

—*History of English Literature*, p. 390

অতএব সত্যের উপরই শিল্প নির্ভর করে। প্রকৃত শিল্পী যিনি, তিনি সত্য ব্যতীত আর কিছু চিত্র করিতে চেষ্টা করেন না। কবিবর গেটে একথা একস্থানে অতি সুন্দররূপে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে,

"In Art's wide Kingdoms ranges
One sole meaning, still the same,
This is truth, eternal Reason,
Which from beauty takes its dress.

কারলাইল বলেন,— কবি "is a new Instructor and Preacher of Truth to all men."

সুপ্রসিদ্ধ জার্মান কবি সিলরের মতে, শিল্পীর কর্তব্য জগতে সত্য প্রচার করা। শিল্পীই প্রকৃতপক্ষে জগতের শিক্ষক। কেন না প্রকৃত সত্য যাহা, তাহা তিনিই প্রথমে দেখিতে পান। তিনি বলিয়াছেন, কবির চিদাকাশের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে সৌন্দর্য-প্রস্রবণ বহির্গত হয়, তাহা চিরকাল স্বচ্ছ নির্মলভাবেই প্রবাহিত হইবে, ইহাই জগতের মালিন্য অপনীত করিবে, সংসারকে উন্নতির পথে চালিত করিবে।* বাস্তবিক শিল্পীরা জগতের

* "From the pure aether of his spiritual essence flows down the Fountain of Beauty uncontaminated by the pollutions of ages and generations"...etc.—*Schiller : Aesthetic Education of Men.*

মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার বাহ্যিক অসৎ, পরিবর্তনশীল, এবং ধ্বংসপ্রবণ অবয়ব-মধ্যে যে এক অনন্ত, নিত্য সত্তার উপলব্ধি করেন—যে সৌন্দর্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে বিভোর হইয়া যান, শিল্প বা কবিত্ব সেই যোগাবস্থা, সেই উৎকট সাধনাবস্থায় প্রসূত। সংসারের এই বাহ্যিক জড় প্রকৃতি মধ্যে, শম্বুকের উপরে কঠিন আবরণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, যে জীবন, যে আত্মা, যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহা মহাপুরুষেরা দেখিতে পান—তাহা কবি-শিল্পীও উপলব্ধি করেন। শুধু উপলব্ধি নহে—শিল্পী আশ্চর্য কৌশলের সহিত, স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিয়া, তাহা জগৎকে দেখাইয়া দেন, এইখানেই তাঁহার কবিত্ব, এইখানেই তাঁহার শিল্প।

প্রসিদ্ধ জার্মাণ দার্শনিক ফিক্‌ক্তে (Fichte) শিল্প সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—"There is a divine idea pervading the visible universe, which visible universe is indeed but its symbol and sensible manifestation, having in itself no meaning or even true existence independent of it. To the mass of men this divine idea of the world lies hidden * * Literary men are the appointed interpreters of this divine Idea ; a perpetual priesthood, we might say, standing forth, generation after generation, as dispensers and leaving types of God's everlasting wisdom—to shut it in their writings and actions... He may lay hold of the whole divine Idea, in so far as it can be comprehended by man, or perhaps a special portion of this its comprehensible part." —*Carlyle's Essays, Vol. I, p.* 49

Emerson এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"So in Art that aims at beauty, must be parts be subordinated to Ideal Nature and everything individual abstracted, so that it shall be the production of the universal soul."

অতএব কবি যে পরিমাণে এই মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন, সেই পরিমাণেই তিনি প্রকৃত কবি। পণ্ডিত এমারসন বলিয়াছেন—"The Universal soul is alone the Creator of the useful, and the beautiful ; therefore to make anything useful or beautiful, the individual must be submitted to the universal mind."

আরও বলি—এ সংসারের উন্নতি কিরূপে সাধিত হয়? জগৎ যে অনন্ত-গতিতে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার গূঢ় অর্থ কি? জড়জগতে শক্তি কোথায় যে, তাহা হইতে কার্য হইবে, তাহা হইতে গতি হইবে—বা তাহা হইতে স্বতঃই জগতের উন্নতি হইবে? এই জড়ের মধ্যে যে আত্মা আছে—তাহা হইতে যেমন জগতের পরিণতি, প্রকর্ষ পর্যন্ত, আদর্শ কল্পনাকে কার্যে পরিণত করিয়াই, সেইরূপ সংসারের উন্নতি। এই আদর্শ কল্পনার পথ-প্রদর্শক হইয়া, অনন্ত জগতের জ্যোতি হইতে ঈষৎ মাত্র প্রতিফলিত ক্ষীণালোক দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইয়া থাকে—সংসার সেই কল্পনার রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে—তাহাকে কার্যে পরিণত করিতে করিতে, অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাতেই ত আমাদের উন্নতি। অনন্ত আত্মা হইতে যেমন জড়জগৎ, শক্তি হইতে যেমন গতি, তেমনি আদর্শ কল্পনা হইতে উন্নতি। এই কল্পনা ও জড়ে যে আশ্চর্য ক্রিয়া (rhythm), এই কল্পনা হইতে যে কার্যের প্রসব, তাহাই সংসারকে ত তাহার উন্নতির পথে লইয়া যায়। মহাপুরুষেরা ও প্রকৃত কবিরাই এই কল্পনারাজ্যের অধিকারী। তাহারা এই কল্পনাকে "A local habitation and a name" দিয়া, তাহাকে কার্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা দেখাইয়া দেন,—পরবর্তী লোকে তাহাকে যতদূর পারে, কার্যে পরিণত করে।

সে যাহা হউক, শিল্পীর এই আদর্শ কল্পনা, এক মহান সত্তা। ইহা এক ক্ষুদ্র জগৎ,—ইহা এক প্রকাণ্ড জৈবনিক (organisation)। যিনি ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া, ইহার অংশ মাত্র দেখিতে পান, বা অংশ করিয়া দেখিতে চান, তিনি ইহার মধ্যে যে জীবন, যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা দেখিতে পান না—তাহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি অস্থিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হইতে পারেন—বড় জোর মৃত পশুশালার (museum) বৃত্তান্ত বুঝিতে পারেন—কিন্তু জীব-জগতের কিছুই বুঝিবেন না। সেইরূপ, শিল্পীকে যিনি এইরূপ এক মহারাজ্য বলিয়া না বুঝেন—যিনি তাহার এখানের অলঙ্কার, সেখানের সৌন্দর্য দেখিয়া ক্ষান্ত থাকেন,—তিনি কবিত্ব বুঝেন না—শিল্প-রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হয়েন নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, কবি-শিল্পীর মহান্ চিত্রের মধ্যে বড় অধিক লোক প্রবেশ করিতে পারে না। সেক্সপীয়রের অনন্ত সৃষ্ট রাজ্যের মহত্ত্ব সে দিন

মাত্র জার্মাণ পণ্ডিতেরা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালিদাসের আশ্চর্য কবিত্ব,—তাহার উচ্চতম শিল্প-চাতুর্য প্রথমে গেটে বুঝিয়াছিলেন - আমাদের দেশশুদ্ধ পণ্ডিত বড় জোর বুঝিতেন "উপমা কালিদাসস্য"। তাই বলি, কবির সৃষ্ট রাজ্যে প্রবেশ করা বড় সহজ নহে। সেইজন্য কারলাইল্ বলিয়াছেন—

"To take in the fair relations of the whole, to see the building as one object, to estimate its purpose, the adjustment of its parts and their harmonious co-operation towards that purpose will require the eyes and the mind of a Vitruvious or a Palladio."

— *Essays, Vol. I., p.* 219

এইখানেই আমরা প্রকৃত সমালোচকের কাজ জলন্তভাবে দেখিতে পাই। প্রকৃত সমালোচক যিনি, তিনি কবির সৃষ্ট রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিবেন—তাহার সৌন্দর্য দেখিবেন,—দেখিয়া তাহা সাধারণকে দেখাইতে চেষ্টা করিবেন। সকলে কিন্তু কবির সৃষ্ট জগৎ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারা উপরিভাগ দেখে মাত্র - বাহ্যিক কঠিন আবরণ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে মাত্র। সমালোচকই তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া—তাহার সৌন্দর্য,— তাহার মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্য,—তাহার চমৎকার (organisation) সৃষ্টি-কৌশল, — সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। কারলাইল্ বলিয়াছেন,—

"Criticism stands like an interpreter between the inspired and the uninspired."

অতএব সমালোচকের কাজও বড় সহজ নহে। যিনি শুধু শব্দের মাধুর্য, উপমার মাধুর্য বা ভাবের গাম্ভীর্য দেখাইয়া ক্ষান্ত হন, তিনি প্রকৃত সমালোচক নহেন—তিনি কাব্যের উপরের আবরণ—তাহার বাহ্য 'পোষাক' (garment) দেখেন মাত্র। যিনি কাব্য মধ্যে কবির মন বুঝিতে চান, প্রকৃত কবি-শিল্পীর সৃষ্টিতে তিনি তাহা দেখিতে পাইবেন না। কারণ,

—* * "As hard to discover in his writings what sort of spiritual construction he has, what are his temper, his affections. For all lives freely within him. All characters are alike indifferent or alike dear to him ; he is of no sect or caste, he seems neither this man nor that man, but a man."

—*Carlyle on Goethe, p.* 212

কারণ বলিয়াছি ত, প্রকৃত কবি-শিল্পীর সৃষ্টি সর্বকালীন, সর্বদেশীয় ও সর্বজনীন। যাঁহারা এরূপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা শিল্পের বাহ্য আবরণ (body) দেখেন। অতএব প্রকৃত সমালোচককে কবির সৃষ্টির অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত কবি নহেন—যাঁহারা প্রকৃত শিল্পী নহেন—সমালোচকেরা তাঁহাদের সমালোচনা করিবেন না। অথবা যে সকল শিল্পী শুধু জীবিকার জন্য তাঁহাদের শক্তির অপব্যবহার করেন (ইংরাজীতে যাঁহাদিগকে Bread-artist বলে) তাঁহাদের বিকৃত শিল্পও সমালোচকের দেখিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা এরূপে শক্তির অপব্যবহার করেন—সমালোচক তাঁহাদের জন্য তাঁহার লেখনী কলুষিত করিবেন না। কারলাইল্ বলেন,—তাঁহারা "Lie without the limits of criticisrn, being subject not for the Judge of art but for the Judge of Police"

(২)

সে যাহা হউক, আমরা এ স্থলে শিল্প সম্বন্ধে যে এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, শিল্পই নভেলের প্রাণ। যে নভেলের শিল্প নাই, তাহার আর সব গুণ থাকিলেও তাহা নভেল নহে। লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ভাস্কর যদি উৎকৃষ্ট জীবিত-কল্প মনুষ্য খোদিত করেন—এবং তাহাকে মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করেন—তাহা যতই কেন জীবিত মনুষ্যের মত বোধ হউক না কেন—তাহা কখনই মনুষ্য নহে। তাহাতে প্রাণ নাই। তাহার সহিত প্রস্তরের যতদূর সম্বন্ধ আছে জীবিত মনুষ্যের সহিত তাহার কিছু সম্বন্ধ নাই। অতএব নভেলের আর সমস্ত গুণ থাকিলেও যদি তাহাতে শিল্প না থাকে—যদি সে কবি-সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ না থাকে—যদি তাহা জীবনীযুক্ত structure না হয়, তবে তাহাকে নভেল বলা যায় না।

সংসারে যেমন জড় ও জীবন, দুই দেখিতে পাই, কবি-সৃষ্টিতেও সেইরূপ বাহ্য জগতের চিত্র—মনুষ্য চরিত্রের চিত্র, দুইই থাকিবে। নভেলের এই দুইটি অঙ্গ। তবে কেহ জীবন ও সংসার উভয়কেই এক অনন্ত আত্মার মধ্য দিয়া দেখেন, কেহ বা বাহ্য জগতে চরিত্রকে ডুবাইয়া দেন—যেন তাহার সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যেন বাহ্য-জগৎ হইতে তাহার অন্য অস্তিত্ব নাই। আবার অনেকে চরিত্রগুলিকে অনন্ত আত্মার ছায়ায় অঙ্কিত করিয়া

তাহারই মধ্যে সমস্ত বাহ্য জগৎ ডুবাইয়া রাখেন। শুধু স্বভাব-বর্ণনা, সাধারণ কবির কাজ। শুধু চরিত্র-বর্ণনা, নাটক-লেখকের কাজ। কিন্তু যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি কাব্যেই হউক আর নাটকেই হউক, বাহ্য ও অন্তর্জগতের যে মাখামাখি, মিশামিশি ভাব—উভয়ের সম্মিলনে যে অদ্ভুত সৃষ্টি তাহারই গূঢ় রহস্য দেখাইয়া দেন। নাটক অপেক্ষা নভেলে শিল্পীর কার্যক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত। ইহাতে যেমন বাহ্য ও অন্তর্জগৎ, স্বভাব ও চরিত্রে পরস্পরের সম্বন্ধ, ঘাত-প্রতিঘাত, মিশামিশি দেখান যায়, নাটকে তত সুবিধা নাই—কারণ নাটকে বাহ্যজগৎ প্রবেশ করাইতে গেটের মত শিল্পীর কৌশল আবশ্যক, সেক্সপীয়রের মত কবিত্বের প্রয়োজন। নতুবা একখানি "ফষ্ট" বা একখানি "হ্যামলেট" রচিত হইত না। অনন্তের ভীষণভাব—অনন্তের অজ্ঞাত-ভাব—অনন্তের মহান্‌ভাবে, বাহ্য ও অন্তর্জগতের সম্মিলনে—ফষ্টের সৃষ্টি। অনন্তের কাছে ইহাদের ক্ষুদ্রতা দেখাইতে গিয়াই বুঝি হ্যামলেটের সৃষ্টি। আর মধুরিমা ও সৌন্দর্যের অনন্ত ভাণ্ডারের বাহ্য ও অন্তর্জগৎকে ডুবাইয়া বুঝি কালিদাসের শকুন্তলার সৃষ্টি। কিন্তু কি বলিতেছিলাম :—

আজকাল নভেলই কবির শিল্পচাতুর্য দেখাইবার প্রধান অবলম্বন। এখন কাব্য-নাটকের সময় গিয়াছে। কঠোর বিজ্ঞানের সময় আসিয়া (age of analysis) কল্পনার রাজ্য তাড়াইয়া দিতে বসিয়াছে,—জগৎকে, মনুষ্যকে এখন জড়ভাবাকৃষ্ট (material) করিয়া তুলিতেছে। এই কল্পনা ও জড়ের কতকটা সংমিশ্রণে, এই জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের সংযোগে কবি-শিল্পীর নভেল সৃষ্টি। আমরা পূর্বে দেখাইযাছি, তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রে ইহার পূর্ণ প্রচার। সে যাহা হউক, শিল্পই নভেলের প্রাণ। শিল্প-কৌশল না থাকিলে নভেলের নভেলত্ব কোথায়? কারলাইল্‌ বলিয়াছেন, "Novels * * * * * * * are entities. They must leave on us the impression of a perfect homogeneous, indivisible whole, * * * (Being a) true work of art, it requires to be fused in the mind of its creator, and as it were poured forth from his imagination at one simultaneous gush." —*Carlyle's Essays, p.* 18

অতএব নভেল লেখা বড় সহজ নহে। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে সেইজন্য বোধ হয়, প্রকৃত কবি-শিল্পীর সৃষ্টি হয় নাই। শিল্পাংশে বঙ্কিমবাবুর 'কপাল-কুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষ' ব্যতীত আর একখানি নভেলও নাই। নাটক ও কাব্যে

শিল্পের কথাই নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে আজিও প্রকৃত কবি-শিল্পী জন্মায় নাই; নতুবা বাঙ্গালীর এত দুর্দশা কেন? বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলির মধ্যে প্রথমকার দুই এক খানিতে অনেকটা শিল্পচাতুর্য আছে,—তাই বঙ্কিমবাবুর নভেল বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ নভেল;—শুধু নভেল নহে, কি নাটক, কি কাব্য, কি নভেল, প্রকৃত সাহিত্য মধ্যে সেইগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালায় আর একখানি প্রকৃত শিল্প-প্রসূত কাব্য আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা কর্তব্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বাল্মীকির জয়" কাব্যাংশে ও শিল্পাংশে এত উৎকৃষ্ট যে, বাঙ্গালায় তাহার তুলনা মিলে না। ফিক্তে যাহাকে Divine Idea বলেন,—অন্তর্জগতের যে সত্য শক্তি দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত—উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহার কতদূর এই ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ কাব্যে প্রচার করা হইয়াছে। হেমবাবুর 'বৃত্রসংহার'-এ এবং কতক পরিমাণে 'দশমহাবিদ্যা'য় শিল্পের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

অতএব প্রকৃত শিল্পী মিলে না। নভেলের সৃষ্টি শিল্পের উপর নির্ভর করে, তাই প্রকৃত নভেল মিলে না। আবার অনেক সময়ে প্রকৃত নভেল-লেখকগণও নভেলকে ব্যঙ্গাত্মক করিতে গিয়া, অথবা তাহা নীতি-শাস্ত্রে পরিণত করিতে গিয়া, শিল্পকে বিকৃত করিয়া দেন। তাই তাঁহাদের নভেল—আর প্রকৃত নভেল থাকে না। ইংলণ্ডের দুইজন প্রধান নভেল-লেখক, থেকারে ও ডিকেন্স, নভেলে ব্যঙ্গ ও নীতি মিশাইয়াই তাঁহাদের নভেলের প্রকৃত নভেলত্ব নষ্ট করিয়াছেন। টেন সাহেব এই পরমসত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন -"To transform novel is to deform it , he, who like Thackeray, gives to the novel satire for its object, ceases to give it art for its rule, and all the force of the satirist is the weakness of the novelist."

আর এক স্থানে আছে,—

'The studied presence of a moral intention spoils the novel as well as the novelist."

-- *History of English Literature, Vol. II, pp.* 390-91

থেকারে ও ডিকেন্সের রোগ বাঙ্গালী নভেল-লেখকের মধ্যে বড় অধিক প্রবেশ করে নাই, সুতরাং সে বিষয়ের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যক নাই। যাঁহাদের নভেলে শিল্পের আভাস আছে, তাঁহাদের নভেলে আজিও ব্যঙ্গ প্রবেশ করে নাই। কেবল ইন্দ্রবাবুর 'কল্পতরু'তে, থেকারের অনুকরণে অনেকটা ব্যঙ্গের অবতারণা আছে—কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন শিল্প-চাতুর্য দেখান নাই।

তবে আজকাল নভেলে নীতি কিছু অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকে নীতির অনুরোধে চরিত্রের দোষগুলি এত অধিক অতিরঞ্জিত করেন যে, তাহা স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। যেন ব্যঙ্গ-চিত্রে (caricature) আমাদের গঠনের দোষগুলি সম্যক্ প্রকারে বর্ধিতাকারে অঙ্কিত এবং অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হয়, কিন্তু চিত্র আদৌ স্বাভাবিক হয় না—তাহাতে প্রকৃত শিল্পের কোন পরিচয় থাকে না; সেইরূপ নভেলেও চরিত্রের দোষগুলি অতিরঞ্জিত করিলে—অথবা তাহার কেবল গুণের অংশ অধিক পরিমাণে দেখাইলে সে চরিত্রের প্রকৃত চিত্র হয় না—তাতে প্রকৃত শিল্পের কোনই আভাস থাকে না। পূর্বে বলিয়াছি ত' নভেল-লেখক ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ কিছুই দেখিবেন না, যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত জগতের প্রতিকৃতি—সংসারে আধ্যাত্মিকতার যাহা মূল তত্ত্ব, তাহাই তিনি দেখাইবেন মাত্র। ভালমন্দ বিবেচনা করিবার ভার পাঠকের। অতএব যাঁহারা সৎ, অসৎ দেখাইতে যান, নভেলের মধ্যে গ্রন্থকারের আমিত্ব প্রবেশ করাইয়া দিয়া—পাঠকবর্গকে ভালমন্দ বাছিয়া দেন—পাঠকদের উপদেশ দেন, সৎ চরিত্রের উপর সহানুভূতি, মন্দ চরিত্রের উপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতে বসেন, তিনি শিল্পকে নষ্ট করেন। তাঁহার নভেল প্রকৃত শিল্পীর সৃষ্টি নহে—তিনি ত সাধারণ সমালোচক—সাধারণ উপদেষ্টা মাত্র।

এই জন্য বঙ্কিমবাবুর আধুনিক নভেলগুলি শিল্পাংশে বড় সুন্দর হইতেছে না। 'আনন্দমঠ' সুন্দর উদ্দেশ্যমূলক নভেল হইলেও, তাহাতে প্রকৃত শিল্পের বড় অভাব। 'দেবী চৌধুরাণী'তে অপেক্ষাকৃত শিল্পের অভাব থাকিলেও—তাহাতে নীতি ও উদ্দেশ্য এত অধিক পরিমাণে মিশাইয়াছেন, Art-এর সহিত এত artificial মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে শিল্প বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

নভেলের উদ্দেশ্য ও নীতির কথা বলিলাম—উপসংহার-কালে কবির রুচি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে রুচি কথাটা আজকাল সাম্প্রদায়িক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নহে—অথবা বিশেষ সাবধানে তাহার উল্লেখ করিতে হয়। নীতিবেত্তাগণ সাধারণতঃ যাহাকে রুচি বলেন—যাহা obscene কথার বিপরীত—ঠিক সে অর্থে প্রকৃত শিল্পী রুচি বুঝেন না। শিল্পিগণ জগতের সত্য মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা আর

কিছুই দেখেন না, আর কিছুর অনুরোধে শিল্পকে বিকৃত করেন না। কিন্তু পূর্বে দেখাইয়াছি ত' মহাপুরুষগণ, প্রকৃত নীতিবেত্তাগণ বা শিল্পিগণের মধ্যে প্রকৃত রুচি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রভেদ থাকা উচিত নহে। "Greatness of a harmful sentiment" অথবা "organised mechanism of a pernicious character"এর মধ্যে যে সত্য আছে—তাহা দেখান যেমন শিল্পীর কার্য তেমনি নীতিবেত্তারও কর্তব্য হওয়া উচিত, সত্য পরিহার করা কোথাও উচিত নহে। কেন না সত্য হইতেই জগতের উন্নতি। দেখ, একজন উচ্চদরের চিত্রকর মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, নগ্নদেহ, এলায়িত-বেণী, মৃত্যু-যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত—মৃত্যুশয্যার চারিপার্শ্বে স্বভাবের গম্ভীরভাবে পরিবেষ্টিত, হস্তে স্থিত বিষধর দ্বারা বক্ষোপরি দষ্ট ক্লিওপেট্রার ছবি আঁকিয়াছেন।* মৃত্যুর কি ভয়ানক দৃশ্য—মৃত্যু-সময়ে মুখের কি আশ্চর্য ভাব-বিকাশ, ঐশ্বর্যক্রোড়ে লালিত বিলাসিনীর কি ভীষণ পরিণাম—চিত্রকর কেমন সুন্দর কৌশলের সহিত দেখাইয়াছেন। চিত্রে কি অসীম ভাব-সাগরের বিকাশ, উচ্চ কল্পনার কেমন চিত্রে পরিণতি, চিত্র-মধ্যে কি এক নূতন জগতের ভাবময় বিকাশ,—যিনি দেখিয়াছেন, তিনি যদি চিত্রের প্রকৃত শিল্প মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, তাহাতে নিহিত সত্য মধ্যে না ডুবিয়া, রুচির নিন্দা করেন—তবে তিনি এখনও জগৎ বুঝেন নাই—সত্যকে আদর করিতে শিখেন নাই—তিনি কখনও নীতিবেত্তা হইতে পারেন না। নভেল সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যায়। পণ্ডিতবর কারলাইল্ রুচি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"Taste, if the word means anything but a paltry connoisseurship, must mean a general susceptibility to truth and nobleness, a sense to discern and a heart to love and reverence, all beauty, order, goodness, wheresoever or in whatsoever forms and accompaniments they are to be seen."

—*Carlyle's Essays, Vol. I., p. 34.*

(নব্য ভারত, ১২৯২)

* কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির হলের পার্শ্বে পাঠকগণ এই উৎকৃষ্ট ছবি দেখিতে পাইবেন

বাংলার লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাঙ্গালী চিরদিনই গীতি-প্রাণ জাতি। বাঙ্গালীর সাধনার সর্বাপেক্ষা সার্থক পরিচয়ই গীতি ; জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার সর্বোত্তম ফলই তাহার গীতি বা গীতি-কবিতা। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ গীতি-কবি রূপেই জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। লিখিত কিংবা উচ্চতর সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া বাংলার গীতি-কাব্য যে বিশ্বের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, ইহার সংস্কার বাঙ্গালী জাতির সর্বস্তরের সমাজকেই সমান ভাবে অধিকার করিয়াছিল। উচ্চতর শিক্ষিত সমাজ লিখিত সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া ইহার যে শক্তি ও রূপের বৈচিত্র্য প্রকাশ করুক না কেন, নিরক্ষর সমাজের মধ্য দিয়াও ইহার গীতি-সংস্কার তেমনই সক্রিয় হইয়াছিল, তাহাই জাতির মৌখিক কিংবা লোক-সঙ্গীত ধারার মধ্য দিয়া যুগে যুগে উৎসারিত হইয়া আসিতেছে। এই লোক-সঙ্গীতের মধ্যেই বাঙ্গালীর উচ্চতর গীতি-কবিতা রচনার ধারা জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহার মধ্যে এই শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার মূল্য বিচার করিবার কালে নিরক্ষর সমাজের মধ্যে প্রচলিত লোক-সঙ্গীত ধারারও পরিচয় উদ্ধার করিবার প্রয়োজন হয়।

বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ যে চর্যা-গীতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাও কয়েকটি গীতি। যদিও ইহাদের মধ্যে বিশেষ এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের নিগূঢ় তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি ইহাদের বহিরঙ্গে যে একটি সহজ গীতির আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহাদের সর্বজনীন আকর্ষণের কারণ। তত্ত্বকথাও সরস গীতির মধ্য দিয়া পরিবেষণ করিবার নিপুণতা একমাত্র বাঙ্গালীরই আছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে জীবন-জিজ্ঞাসা দর্শন শাস্ত্রের নীরস সূত্রের রূপ লাভ করে, বাঙ্গালীর মধ্যে তাহা অতি সহজেই কাব্য ও গীতি হইয়া উঠে। তাহার নিদর্শন বাংলার ধর্ম-সঙ্গীতের সর্বত্রই পাওয়া যায়। বৌদ্ধগানগুলিও সহজ-সাধনা সম্পর্কিত কতকগুলি

গূঢ় তত্ত্বের নির্দেশ মাত্র ; কিন্তু বাঙ্গালী ভাবুকের জীবন-দৃষ্টি ও অধ্যাত্ম চিন্তার বিশেষত্বের গুণে ইহারা অতি সহজেই সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছে। গীতির মাধ্যমে চিরকালই বাঙ্গালী তাহার সকল চিন্তাধারাকে প্রকাশ করিয়াছে ; সুতরাং বাঙ্গালীর বিচিত্র লোক-গীতির পরিচয়েই বাঙ্গালী জাতির সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশ পায়। ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গালী জাতির পরিচয়কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্য দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়া জাতির একটি সামগ্রিক পরিচয় কোন দিনই প্রকাশ পাইতে পারে নাই ; কিন্তু যে লোক-সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর ধ্যান-মানস একটি অখণ্ড পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া জাতির একটি সামগ্রিক পরিচয়ের প্রকাশ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। চর্যাপদের একটি মাত্র সঙ্গীতের ভিতর দিয়া যেমন সমগ্র বাঙ্গালীর চিরকালীন অধ্যাত্ম-পরিচয়টি অখণ্ড হইয়া ধরা দিয়াছে, তেমনই একটি মাত্র বাউল গানের ভিতর দিয়া একটি সমগ্র জাতির অধ্যাত্ম-হৃদয় স্পন্দিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর লোক-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর ভাব-জগতের যে অখণ্ডতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কোথাও সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য বাঙ্গালীর ভাব-সাধনার ক্রম-পরিণতির সূত্র অনুসরণ করিবার জন্যও বাংলার লোক-সঙ্গীতগুলির অনুশীলন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। কেবল মাত্র ভাব-সাধনা ও রসোপলব্ধির ক্ষেত্রেই নহে, নানা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বাংলার লোক-সঙ্গীত বাঙ্গালীর দৈনন্দিন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নানা দিক দিয়া অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। সুতরাং ইহার অনুশীলন ব্যতীত বাঙ্গালী সমাজের সামগ্রিক পরিচয় কোন দিক দিয়াই লাভ করা যাইতে পারে না।

লোক-সঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা "মুখে মুখে" রচিত হইয়া প্রচার লাভ করে, সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করিলেও কোন দিনই ইহা লিখিয়া রাখিবার সংস্কার গড়িয়া উঠে না। লিখিত হইবামাত্রই সাহিত্য একটি বিশেষ অনমনীয় (rigid) রূপ লাভ করে ; কিন্তু যাহা কেবল মাত্র সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন করিয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে, তাহার মধ্যে কখনও একটি সুনির্দিষ্ট (rigid) রূপ গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রবহমানতার মধ্য দিয়াই লোক-সঙ্গীতের প্রাণশক্তি রক্ষা পায়। নূতন-নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে নূতন-নূতন উপকরণ সংগৃহীত হয় এবং তাহার ফলেই ইহার কোন অংশেই

জীর্ণতা স্পর্শ করিতে পারে না। সেইজন্য যতদিন কোন সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে লোক-সঙ্গীতের কোনও সুনির্দিষ্ট রূপ প্রচারিত থাকে, ততদিনই ইহা নিজের শক্তিতেই আত্মরক্ষা করিতে পারে; তারপর সমাজ-জীবনের বিবর্তনের অনিবার্য ধারায় যখন ইহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন আপনা হইতেই তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কেহ ইচ্ছা করিলেও ইহাকে আর সমাজ-দেহে রক্ষা করিতে পারে না। এই ভাবেই পল্লী-সঙ্গীত অতি সহজেই পল্লীর সমাজ-জীবনের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়; সমাজের প্রয়োজনেই ইহার যেমন বিকাশ, সমাজের প্রয়োজনে তেমনই ইহার বিনাশ। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিনাশ কদাচ সম্ভব হয় না; কারণ, যে ভাবেই হউক, সমাজ ইহার একটি নিজস্ব রূপ সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলে; নাগরিক জীবনে তাহা নানা ভাবে বিপর্যস্ত হইলেও পল্লী-জীবনের সংস্কার তাহা হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় না। সুতরাং ইহার শক্তি ইহার মধ্যে যত ক্ষীণই হউক না কেন, তাহা কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ পাইবার নহে। সেইজন্য নাগরিক জীবনের মধ্যে বাস করিয়াও আমরা লোক-সঙ্গীতের কথা বিস্মৃত হইতে পারি না; যে কোন ভাবেই হউক ইহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করি। আধুনিক কালে নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেও লোক-সঙ্গীতের প্রতি যে প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইহাই কারণ। ইহা কেবল আমাদের দেশের পক্ষেই সত্য নহে, মার্কিন দেশের মত আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার প্রতিনিধিও লোক-সঙ্গীত অনুশীলনের জন্য সুগভীর প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকে। অথচ গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, মার্কিন দেশ পল্লী-জীবনের সংস্কার হইতে বহুদিন হইল মুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেকের মধ্যেই পল্লীর সংহত সমাজ-জীবনের প্রেরণা যে কোন কালেই লুপ্ত হইতে পারে না, ইহা তাহারই প্রমাণ। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির সঙ্গীত-সংস্কার অত্যন্ত প্রাচীন, তদুপরি ইহা জাতীয় সংস্কারেরও পরিচয় লাভ করিয়াছে; অতএব সেই বাঙ্গালী জাতির মধ্য হইতে তাহার লোক-সঙ্গীতের প্রতি প্রেরণা কোন দিনই সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে পারে না—সাময়িক ভাবে বিপর্যস্ত হইতে পারে মাত্র। বাংলার লোক-সঙ্গীতের অনুশীলনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের পুনর্জাগরণ যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের ভিতর তাহা তত সহজ নহে; কারণ, ইহার ভিতর দিয়া তাহার নিগূঢ় অন্তরের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কোন দেশে কোন কালেই লোক-সঙ্গীত অনুশীলনের কোন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকে না। কি ভাবে ইহা রচনা করিতে হয়, কি ভাবে ইহাকে স্মৃতিপথে রক্ষা করিতে হয়, কিংবা কি ভাবে ইহার সুর ও তাল শিক্ষা করিতে হয়, তাহার কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালী নাই। যাহারা ইহা আয়ত্ত করে, স্বভাব-দত্ত ক্ষমতার গুণে কেবল মাত্র কানে শুনিয়াই তাহারা আয়ত্ত করিয়া থাকে। লোক-সমাজের মধ্যে এই প্রণালীতেই ইহা চিরকাল ধরিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য পল্লী-সমাজ হইতে যখন আমরা আজ এক নূতন সমাজ-জীবনের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলাম, তখন ইহাকে রক্ষা করিবার কোন বহির্মুখী প্রণালীও অনুসরণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত অনুশীলনের যে সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহা নূতন নূতন সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়াও রক্ষা পাইয়া আসিতেছে; সেইজন্য কয়েক শতাব্দী ধরিয়াও উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত অনুশীলনের রীতি অনুসরণ করিয়া লোক-সঙ্গীতের অনুশীলন সম্ভব হয় না; কারণ, উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। তথাপি এই বিষয়ে অন্য কোন প্রণালীর সন্ধান কাহারও বিদিত নাই বলিয়া এই ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি অনুসরণ করিবার প্রয়াস প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু সহজ ভাবে সমাজের মধ্য দিয়া ইহার যে অনুশীলন সম্ভব হইত, তাহার অভাবে ইহার বিষয়ে আজ যাহা হইতেছে, তাহা দ্বারা ইহার যথার্থ পরিচয় লাভ কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।

এ কথা সত্য যে, লোক-সঙ্গীত সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকেরই নিজস্ব রস-বস্তু। তথাপি একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর মধ্যে বয়সের মত জীবনের আচরণেও পার্থক্য আছে। সেই অনুসারে তাহাদের সঙ্গীতও পৃথক্ হইয়া থাকে। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন বিশেষ প্রকৃতির গীতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষ গোষ্ঠী অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পায়। যেমন, কতকগুলি লোক-সঙ্গীত নারী-সমাজের জীবনাচরণের সঙ্গে:সম্পর্ক-যুক্ত, তাহা পুরুষ কদাচ গান করে না; নারী-সমাজই ইহার রচয়িতা. ইহাই তাহার রক্ষক ও প্রতিপালক; তথাপি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিচয় ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া পুরুষের সমাজও তাহার রস উপভোগ করিয়া থাকে— বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে যে জীবনের কথাই থাকে, সেই জীবন নারীর হইলেও সেই নারী একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাহার অতিরিক্ত কিছু নহে—তথাপি

ইহাদের মধ্যে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এই ভাবে দেখা যায়, মেয়েলী লোক-সঙ্গীত পুরুষ কদাচ গান করে না; এমন কি, কুমারী মেয়েদিগের ব্রত-গীতিও বিবাহিতা মেয়েরা গান করে না, অনেক সময় ইহা তাহাদের নিষিদ্ধ (taboo); যাহাদের আজ বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা যখন অবিবাহিত ছিল, তখন ইহা স্বচ্ছন্দে গাহিয়াছে, কিন্তু বিবাহের পর ইহা তাহাদের নিষিদ্ধ হইয়াছে—সেই জন্য কেবল মাত্র কুমারী-সমাজের স্মৃতিপথ বাহিয়া তাহা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে এবং সমাজের অনন্ত কুমারী-জীবনের মধ্যে তাহা কদাচ নিরাশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে না। তেমনই পটুয়ার গান পটুয়া ব্যতীত, কিংবা বেদের গান বেদে ব্যতীত আর কেহ গাহিবে না; এই বিষয়ে কোন সামাজিক বিধি-নিষেধ (taboo) না থাকিলেও সমাজের মনে এই সংস্কার অত্যন্ত দৃঢ় যে, যথার্থ অধিকারী ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে কোন-বিষয় গ্রহণ করিতে নাই। এই ভাবে বাংলার লোক-সঙ্গীতের বিশেষ কোন কোন রূপ এক-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার ফল এই হয় যে, পটুয়ার ব্যবসায় লুপ্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে পটুয়ার গানও সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, কিংবা বেদের গানের মধ্যে যে সর্বকালীন এবং সর্বজনীন আবেদনই থাকুক না কেন, ব্যবসায়ী বেদে ভিন্ন তাহা আর কাহারও পক্ষে পরিবেষণ করা সম্ভব হয় না। এই জন্যই বৃদ্ধ যত সুকণ্ঠই হউক না কেন, কদাচ প্রেম-সঙ্গীত গাহিবে না; আধ্যাত্মিক সঙ্গীতই তাহার সেই বয়সের অবলম্বন হইবে মাত্র, হিন্দু-বিধবাগণও কুমারী ও সধবাদিগের মত ঐহিক আকাঙ্ক্ষামূলক কোন গান গাহিবে না। এই ভাবে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অবলম্বন করিয়া বিশেষ-বিশেষ প্রকৃতির লোক-সঙ্গীত গীত হইলেও সাহিত্যের সর্বজনীন আবেদন হইতে ইহারা বঞ্চিত হয় না বলিয়া ইহারা গোষ্ঠীর হইয়াও সমগ্র সমাজের এবং সেই সূত্রেই ব্যষ্টিরও বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গোষ্ঠী লইয়াই সমাজ-দেহ গঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই সমগ্র সমাজ-দেহের শিরা কিংবা উপশিরার মত; বিভিন্ন দিক হইতে রস-সংগ্রহ করিয়া ইহারা একই দেহের পুষ্টি সাধন করিতেছে। সেই সূত্রেই ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়াও পরস্পর এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

একাগ্র সাধনা দ্বারা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে যেমন অধিকার লাভ করা যায়, লোক-সঙ্গীতে তেমন সম্ভব হয় না। অন্ততঃ পল্লী-সমাজে সুদীর্ঘ অনুশীলন দ্বারা

কেহই লোক-সঙ্গীতে দক্ষতা লাভ করে না। একাগ্র ব্যক্তি-প্রতিভা দ্বারা লোক-সঙ্গীতে অনুশীলন করিবার কিছু নাই। যাহার ভগবৎ-প্রদত্ত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং প্রখর স্মৃতি-শক্তি আছে, সে অতি সহজেই লোক-সঙ্গীত পরিবেষণ বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। যাঁহার মধ্যে এই দুইটি বিষয়ের অভাব আছে, তিনি শত চেষ্টা করিয়াও এই বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারেন না। ইহার কারণ, লোক-সঙ্গীতের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুশীলনের বিষয় কিছু নাই। ইহার সুর-রূপ ঐতিহ্যের অনুসারী এবং অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও সহজবোধ্য, সুতরাং ইহা সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব। কিন্তু সহজাত উক্ত দুইটি গুণ না থাকিলে তাহা অন্যের নিকট আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা লোক-সঙ্গীতের গীত-রীতির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। নাগরিক সমাজে ইহা আমাদের শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়; কারণ, ইহার ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের এখানে কোন পরিচয় নাই, এমন কি, এই প্রকার শিক্ষা দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাও সকল সময় সম্ভব হয় না। প্রাদেশিক ভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি দ্বারা লোক-সঙ্গীতের গীতি-সুর গঠিত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসীর পক্ষে বিশিষ্ট কোন প্রাদেশিক উচ্চারণ-রীতি সম্পূর্ণ অধিকার করা সকল সময় সম্ভব হয় না; সুদীর্ঘ অনুশীলন ও একাগ্র সাধনা দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিতে হয়। নাগরিক সমাজ দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক অধিবাসী লইয়াই গঠিত। সুতরাং নাগরিক সমাজে বাস করিয়াও প্রত্যেক অঞ্চলেরই পূর্বতন অধিবাসী যদি উপযুক্ত শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার নিজস্ব অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতগুলি অনুশীলন করিতে পারেন, তবে তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার পল্লী-জীবনের একটি রস-সংস্কারের সঙ্গে যোগ অব্যাহত থাকিতে পারে। বর্তমান কালে 'গ্রামোদ্যোগ' 'গোষ্ঠী-পরিকল্পনা' 'আঞ্চলিক উন্নয়ন' (Block Development) ইত্যাদি নামে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় পল্লী-উন্নয়নের যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে পল্লী-সঙ্গীত অনুশীলনেরও একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন। কারণ, বাংলার পল্লী-সঙ্গীত চিরকালই বাংলার পল্লী-জীবনের সংহতি রক্ষা করিয়াছে। যন্ত্রের শাসনে সমাজের বিকাশ হয় না, বরং বিনাশ হয়; কিন্তু হৃদয়ের শাসনে সমাজের বিকাশ হয়, পল্লী সঙ্গীত পল্লীর হৃদয় হইতে উৎসারিত বলিয়া ইহা দ্বারাই বাংলার

সামাজিক জীবনের সকল বিষয়, যেমন ধর্ম, আচার, উৎসব প্রভৃতি শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পল্লীর রূপের সঙ্গে ইহার পরিচয় অচ্ছেদ্য। সুতরাং যন্ত্রের সাহায্যে পল্লীর উন্নয়ন যে স্তরেই গিয়া পৌছাক, ইহার মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন না থাকিলে তাহা শিথিল হইয়া পড়িবে, সমাজ-জীবন বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং যান্ত্রিক উপকরণ দ্বারা পল্লী-জীবনকে আমরা যতই সমৃদ্ধ করি না কেন, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ইহার উপর হৃদয়ের শাসনকে স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনেই পল্লী-সঙ্গীতের অনুশীলন বর্তমান যুগেও একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ভাব, তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার জগতে যেমন আমরা গুরুবাদ স্বীকার করি, রসোপলব্ধির জগতে তেমন গুরুবাদ স্বীকার করি না। রস সহজাত গুণ, গুরু-প্রদত্ত বিদ্যা নহে। পল্লীর অধিবাসী মাত্রই পল্লী-সঙ্গীতের রসিক ; সেইজন্য লোক-সঙ্গীত গুরু-প্রদত্ত শিক্ষা ব্যতীতই সর্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে।

যে জাতির সামাজিক জীবন যত বিচিত্র, তাহার লোক-সঙ্গীতও বিষয়ের দিক দিয়া তত বিচিত্র হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশের একটি পার্থক্য আছে ; ইহার গুণেই বাঙ্গালীর লোক-সঙ্গীত বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া যেমন বিচিত্র, তেমনই রসের দিক দিয়াও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলার লোক-সঙ্গীতের বৈচিত্র্য যেমন বিষয়গত, তেমনই ভাবগত। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

বাংলার বিশেষ কতকগুলি লোক-সঙ্গীত দেশের বিশেষ কতকগুলি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—ইহাদিগকে আঞ্চলিক কিংবা regional সঙ্গীত বলা যায়। গীতি রূপে ইহাদের মধ্যে এক একটি শাশ্বত আবেদন প্রকাশ পাইলেও, বাংলার এক-একটি আঞ্চলিক জীবন আশ্রয় করিয়াই এই শ্রেণীর সঙ্গীত বিকাশ লাভ করিয়াছে—অন্যান্য অঞ্চলে ইহারা প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম বঙ্গের পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর ; উত্তর বঙ্গের গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া ; পূর্ববঙ্গে জারি, সারি, ঘাটু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপিয়া এই সকল সঙ্গীত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই ; অথচ একথা সত্য, ইহাদের মধ্য দিয়া যে বিষয় পরিবেষণ করা হইয়া থাকে, সমগ্র বাঙ্গালীর উপরই তাহাদের আবেদন সার্থক হইবার যোগ্য। পটুয়ার গানের

ভিতর দিয়া ভাবগত, রামায়ণ মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের বিশেষতঃ মনসা-মঙ্গলের কাহিনীই পরিবেষণ করা হইয়া থাকে। সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয়াই ইহাদের আবেদন প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যবস্থা বা প্রণালীর ভিতর দিয়া ইহা পরিবেষণ করা হইয়া থাকে, তাহার বিশিষ্টতার জন্য ইহা দেশের নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল ব্যতীত প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। পটুয়ার গানের সঙ্গে পটচিত্রাঙ্কন ও ইহার ব্যবসায়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; বিশেষ একটি ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াই ইহা বিকাশ লাভ করিয়াছে; সেই ঐতিহ্য এই অঞ্চলের সমাজের মধ্যেই বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, অন্য অঞ্চলে নানা ঐতিহাসিক কারণেই তাহা প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই সঙ্গীতও অন্যত্র প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। পশ্চিম বাংলার প্রান্তবর্তী বিশিষ্ট প্রকৃতি ইহার ভাদু-সঙ্গীতের জন্মদাত্রী, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের প্রকৃতি বা নিজস্ব রূপ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহা অন্যত্র প্রচার লাভ করিতে পারিল না। অথচ এ'কথা সত্য যে, ইহার মধ্যে যে গার্হস্থ্য জীবন-রসের আবেদন আছে, তাহা বাঙ্গালীর জীবনে সর্বত্র সত্য। সেইজন্য এই বিষয়ক সঙ্গীতগুলি আঞ্চলিক হইয়াও সামগ্রিক বাঙ্গালী জাতির লোক-সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই ভাবে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের মধ্যে যে বহির্মুখী বিশিষ্টতাই প্রকাশ পাক না কেন, ইহাদের মধ্য দিয়া শাশ্বত বাঙ্গালীর নিত্য জীবনের যে প্রতিফলন দেখা যায়, তাহার গুণেই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় লোক-সঙ্গীত রূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। Unity in diversity যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক্, ইহাদের মধ্য দিয়াও বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতিতে তাহারই পরিচয় প্রকাশ পায়। সেইজন্য একদিক দিয়া যেমন ইহারা আঞ্চলিক, অপর দিক দিয়া তেমনই সমগ্র বাংলার অখণ্ড লোক-সঙ্গীতের অবিভাজ্য অঙ্গ হইয়া আছে।

প্রেম-সঙ্গীত বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ। এক দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, বাংলা লোক-সঙ্গীতের ইহাই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বিষয়। বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের কয়েকটি প্রধান বিভাগ; যথা, প্রথমতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। এই রাধা কিংবা কৃষ্ণ কেহই ভাগবত হইতে আসেন নাই, ইঁহারা বাংলারই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের ধারে বাঙ্গালীর জীর্ণ কুটিরে জন্মলাভ করিয়াছেন। একটি প্রচলিত কথা এই যে, এদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'।

অর্থাৎ এ' দেশের সঙ্গীত মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত। ইহা প্রেম-সঙ্গীতের উপরই প্রযোজ্য। এ'কথা সত্য যে, বাংলার যে অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের কিছু প্রভাব স্থাপিত হইয়াছে, সেই অঞ্চলেই কেবল মাত্র রাধাকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করিয়াছে, অন্যত্র তাহা হইতে পারে নাই। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গই প্রধানতঃ বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে ; সেইজন্য এই দুই অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম যত শুনিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন অঞ্চলে তাহা তত শুনিতে পাওয়া যায় না। উত্তর বঙ্গের প্রেম-সঙ্গীতে ভাওয়াইয়া গান প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক হইতে মুক্ত। রাধাকৃষ্ণের নাম যে কোন সাম্প্রদায়িকতার সূত্রে বাংলার লোক-সঙ্গীতে প্রবেশ করে নাই, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, মুসলমান কৃষক-সমাজে প্রচলিত লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও নায়ক-নায়িকার নাম রূপে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ইহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইঁহারা ভাগবত পুরাণের পবিত্র ক্ষেত্র হইতে বাংলার লোক-সঙ্গীতে প্রবেশ করেন নাই ; বরং বাংলার গৃহাঙ্গিনার ধূলি মলিন ক্ষেত্র হইতেই তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। বাংলার লোক-সঙ্গীতে যেখানে স্বাধীন প্রেমের কথা আছে, সেখানে রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া গেলেও দাম্পত্য জীবনের মধ্যেও যে প্রেমের অধিষ্ঠান আছে, সেখানে রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে রামসীতার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রামসীতার প্রসঙ্গ বাঙ্গালীর হিন্দু জীবনকেই মাত্র আশ্রয় করিয়াছে, রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মত সমাজের সকল স্তরে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য তাহা সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

হর-গৌরীর প্রসঙ্গও বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর চিরন্তন বাৎসল্য রসেরই বিকাশ হইয়াছে। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতই ইহার প্রধান বিষয়, ইহাও রামসীতা প্রসঙ্গের মত হিন্দু-সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের মত আর কোন প্রসঙ্গ সম্প্রদায় নির্বিশেষে এমন সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই।

লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে বিরহ বা নৈরাশ্যের দিকটি যত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মিলনের কথা তত জীবন্ত হইতে পারে নাই। প্রেম-সঙ্গীতে মিলনের চরিতার্থতা নাই ; বরং তাহার পরিবর্তে বিচ্ছেদের বেদনা

অতলস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার লোক-সঙ্গীতের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ব্যবহারিক সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহাকে ইংরেজিতে (functional song) বলা হয়। ইহার সুনির্দিষ্ট কতকগুলি প্রয়োগ-ক্ষেত্র আছে, তাহা ব্যতীত ইহাদের ব্যবহার হয় না। বিবাহের গীত ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পরিবারে বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যতীত ইহা কদাচ গীত হয় না, কেবল মাত্র বিবাহ উপলক্ষেই ইহারা গীত হইয়া থাকে। সুদীর্ঘকালের মধ্যেও যদি বিবাহের অনুষ্ঠান না হয়, তথাপি কেবল মাত্র স্মৃতিচর্চার জন্যও ইহারা গীত হয় না। ইহাদের প্রয়োগ-ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলেও ইহারা বিশেষ বলিষ্ঠ রচনা। পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের বিচিত্র সুখ ও আশা ইহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে। হিন্দু পরিবারের এই শ্রেণীর সঙ্গীতের সঙ্গে রামসীতার চিত্র প্রবেশ করিলেও মুসলমান পরিবারের অনুরূপ সঙ্গীত মানবিক জীবন রসে পরিপুষ্ট। নারী-সমাজ এই সঙ্গীতের প্রতিপালক, সেইজন্য সুনিবিড় গার্হস্থ্য জীবনের রসে ইহারা সমুজ্জ্বল।

আর এক শ্রেণীর বাংলার লোক-সঙ্গীতকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলা যায়, ইংরেজীতে ইহাদিগকে calendric song অথবা ritual song বলা হয়। ইহারা বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট তারিখ কিংবা উপলক্ষ ব্যতীত কদাচ গীত হয় না। যেমন, গাজনের গান গাজনোৎসব ব্যতীত বৎসরের আর কোন সময় শুনিতে পাওয়া যাইবে না। অনেক আঞ্চলিক গীতিও আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত হইতে পারে, তবে আনুষ্ঠানিক গীতি যেমন বাংলার সর্বত্র প্রচলিত, আঞ্চলিক গীতি তেমন নহে, তাহা একই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কর্ম-সঙ্গীত বা work songও লোক-সঙ্গীতের একটি বিশেষ অংশ। পূর্ব বাংলার সারিগান বা নৌকা বাইচের গান ইহার বিশেষ নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত, ধান কাটার গান, ধান ভানার গান, পাট কাটার গান ইত্যাদিও ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ ধর্ম-সঙ্গীত। অনেকে ধর্মসঙ্গীতকে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না; কারণ, ধর্ম বাংলার লোক-সমাজের উপর সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। এই

দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচার বিভিন্ন ; সুতরাং একান্তভাবে একটি ধর্মের মতবাদ আশ্রয় করিয়া যে সঙ্গীত রচিত হয়, তাহা সামগ্রিক ভাবে লোক-সমাজের নিকট আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং ইহার মধ্যে যে আবেদন সৃষ্টি হয়, তাহা সম্প্রদায়গত বা Sectarian। ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব, নীতি কিংবা দর্শন সাহিত্য নহে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব হিংসা পাপ ; সদা সত্য কথা কহিবে—ইহা সাহিত্য নহে, অথচ ধর্মের ভিতর দিয়া চিরকাল এই সকল বাণী প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বাংলার পল্লীর সহজিয়া তত্ত্বের গান, নাথ ধর্মতত্ত্বের গান, দেহতত্ত্ব, বাউল, মুর্শীদ্যা, মারফতী, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি যে বাংলার লোক-সঙ্গীতের এক একটি বিরাট অংশ, ইহাদের মধ্য দিয়াও এক একটি তত্ত্বকথাই প্রচারিত হইতেছে ; কিন্তু বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের তত্ত্বকথাগুলি নীরস সূত্র কিংবা সংক্ষিপ্তসারের মত প্রকাশ পায় না—বিচিত্র রসমণ্ডিত হইয়া সঙ্গীতের আকারে পরিবেষিত হয়। ধর্মের তত্ত্ব কিংবা দর্শন জীবনকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, সাহিত্যও জীবনেরই প্রকাশ ; সুতরাং যেখানে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সূত্রের পথ পরিত্যাগ করিয়া রসাশ্রিত হইয়া সঙ্গীতের রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে তাহা নিঃসন্দেহে সাহিত্য পদবাচ্য হইবার যোগ্য। হাজার বছরের পুরাণো বৌদ্ধগানগুলি যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও সাধন-ভজনের কথাই আছে ; সেই সাধন-ভজনের নিগূঢ় রহস্য আজ ইহাদের মধ্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা যায় না ; তথাপি ইহারা সরস সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া ইহাদের সাহিত্যিক আবেদন এই সুদীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই। বাংলার বাউল গানের ভিতরও যে সুগভীর তত্ত্ব এবং দর্শনের কথা আছে, তাহা বাদ দিলেও ইহার নৃত্য ও সঙ্গীত জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালীর মনে যে রস-আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তাহাতেই ইহার সাহিত্যিক পরিচয় প্রকাশ পায়। বাংলার বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদ্যার গানে যে তত্ত্বকথাই থাকুক, তাহা বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত পরিচিত গণ্ডীর মধ্য দিয়াই রূপায়িত হইয়া থাকে। সুতরাং বাউলের তত্ত্ব না বুঝিয়াও বাউলের সঙ্গীতের মধ্য হইতে রসাস্বাদন করিতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। বিশেষতঃ বাংলার ধর্মসঙ্গীতের ভিতর দিয়া যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাও বাঙ্গালীর জীবন-চেতনা হইতে জাত। উচ্চতর

ধর্ম, যথা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান ধর্ম—তাহাদের অন্তরালেও বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব ধর্মবোধ আছে, এখানে প্রায় সকল বাঙ্গালীই একাকার হইয়া আছে ; সেইসূত্রে ইহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী মাত্রই এক অখণ্ড ঐক্য অনুভব করিয়া থাকে। যে ধর্মচেতনা ভিত্তি করিয়া বাংলার পল্লীর ধর্ম-সঙ্গীতগুলি প্রধানতঃ রচিত হইয়াছে, তাহা বাংলাদেশের জলবায়ুতেই পুষ্টিলাভ করিয়াছে ; সুতরাং এই সূত্রেই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় রসচেতনার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই গুণে বাংলার ধর্মসঙ্গীতগুলি যেমন জাতীয় চেতনার বাহন, তেমনি সাহিত্যিক মর্যাদা লাভেরও অধিকারী। ইহাদের রচনার মধ্য দিয়া তত্ত্বকথা কিংবা দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করিবার নীরস রীতি অনুসরণ করা হয় না ; বাংলা সঙ্গীত রচনার যাহা বৈশিষ্ট্য, আনুপূর্বিক তাহাই ইহাদের রচনার ভিতর দিয়াও প্রকাশ পায়। কিন্তু একটি বিষয়ে সাধারণ লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করাই লোক-সঙ্গীতের ধর্ম। পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ইহার প্রাণশক্তি রক্ষা পায়, কখনও ইহা নির্জীব হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় না। বিশেষতঃ ইহাতে যুগোচিত পরিমার্জনা স্বীকৃত হয় বলিয়াই ইহা লোক-সমাজের নিকট কখনও প্রাচীন কিংবা অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু ধর্ম-সঙ্গীতগুলি লোক-সঙ্গীতের পরিবর্তনের এই নিয়ম কিছুতেই স্বীকার করে না। ইহাদের একটি আচারগত (ritual) মূল্য থাকে বলিয়া ইহাদিগকে কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না। যে সকল ধর্ম-সঙ্গীতের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহা প্রায় সকলই গুরুর নিকট হইতে শিষ্য শিক্ষা লাভ করে এবং কেবল মাত্র গুরুশিষ্য-পরম্পরায় অগ্রসর হইয়া থাকে। গুরুর শিক্ষা শিষ্য সতর্ক হইয়া রক্ষা করে, কাজেই তাহা পরিবর্তিত কিংবা বিকৃত করিতে পারে না। সুতরাং লিখিত সাহিত্যের মত তাহা অচিরেই অপরিবর্তনীয় (rigid) হইয়া যায়। সেইজন্য লোক-সঙ্গীত ক্রমবিকাশ লাভ করিলেও ধর্ম-সঙ্গীত কদাচ ক্রমবিকাশ লাভ করে না, ইহার একটি অবিচল আদর্শ ভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট স্থির হইয়া থাকে ; ক্রমবিকাশ লাভ না করিবার ফলেই তাহা ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোক-সঙ্গীত ক্রমবিকাশের ধারায় যুক্ত হইয়া লোক-সমাজের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তারপর পল্লীর সমাজ-ব্যবস্থা যখন শিথিল হইয়া যায়, তখনই তাহার বিনাশ অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু যতদিন

পল্লী সমাজের সংহতি বিনষ্ট না হয়, ততদিন লোক সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ অব্যাহত থাকে।

যাহাই হউক, তথাপি এ' কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাংলার ধর্ম-সঙ্গীত বাংলার লোক-মানসের (folk mind) একটি বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করে। ইহা ক্রমপরিবর্তনের ধারার সঙ্গে যুক্ত না হইলেও ইহাদের বহিরঙ্গ যে রস-পরিচয় ব্যক্ত করে, তাহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর লোক জীবনের সংস্কার অস্পষ্ট হইয়া থাকে না। সুতরাং ইহাদিগকে বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় লোক-সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়াও লোক-সঙ্গীত রচিত হইয়া থাকে, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যের মতে ইহাদের মূল্যও সাময়িক মাত্র। সেইজন্য ইহারা কতটা আঞ্চলিক লোক-গীতির রূপ লাভ করে। কিন্তু আঞ্চলিক গীতির মধ্যে যে সাহিত্যগুণ প্রকাশ পায়, সাময়িক ঘটনামূলক গীতির মধ্যে সেইগুণ প্রায়ই থাকে না। সাময়িক ঘটনার স্মৃতি সমাজ-মানসে যতই অস্পষ্ট হইয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত সঙ্গীতগুলিও ততই অপ্রচলিত হইয়া থাকে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের স্মৃতি স্পষ্ট হইয়া থাকে, ততদিন ইহাদের মত জনপ্রিয়তা আর কোন সঙ্গীতই লাভ করিতে পারে না।

রিয়ালিজ্‌ম্

শশিভূষণ দাসগুপ্ত

(১)

বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ দেশে কতকগুলি জনপ্রবাদকে আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। এগুলি যে ঠিক কখন ঘটে এবং কখন রটে তাহা ধরা কঠিন, সাধারণতঃ রটনার প্রাবল্যই আমাদের দৃষ্টিকে ঘটনার সম্ভাবনার দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এই জাতীয় জনপ্রবাদ কখনই একেবারে মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে না, পাহাড়ের স্তূপীকৃত কালো মাটির ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মতন সত্যের সোনালি মিশ্রণে তাহারা বহুমূল্যত্ব লাভ করে।

আমাদের বর্তমান কালের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কতকগুলি জনপ্রবাদ প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের ভিতরে প্রধান একটি হইল, সাহিত্যের আধুনিক যুগটা 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর যুগ। কথাটাকে প্রথমে কিছুদিন বিজ্ঞজনোচিত অবজ্ঞায় কোণঠাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা গিয়াছে, অজ্ঞ-জনোচিত উপহাসও ইহা কম লাভ করে নাই; কিন্তু এসব সত্ত্বেও রটনাটা যখন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে তখন পিছনকার ঘটনার কথাও আবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইতেছে।

প্রথমেই ভাবিতে হইবে 'আধুনিক যুগ'টার কথা। আমাদের মনের ভিতরে সাধারণভাবে 'আধুনিক যুগ' সম্বন্ধে যে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে তাহা একটি সন-তারিখের চৌহদ্দিযুক্ত বিশেষ রঙে রঞ্জিত কালখণ্ড-বিশেষ। আপাততঃ ইহার এক সীমানায় দাঁড়াইয়া আছে ১৩৫৭ সাল, তর্ক অপর সীমানার বিস্তৃতি সম্বন্ধে। উগ্রবাদীরা হয়ত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি হইতে আর পশ্চাৎপদ হইতে চাহিবেন না; কাহারও ঝোঁক হয়ত হইবে কবিগুরুর জন্মক্ষণের পুণ্যলগ্নের প্রতি; কেহ হয়ত পিছাইয়া যাইবেন মধু-বঙ্কিমের আবির্ভাবকালে; কাহারও বিস্তৃতি রাজা রামমোহনের রাজত্বে; আবার যিনি সাবধানী তিনি হয়ত বলিবেন, সন্ধানী দীপবর্তিকা লইয়া সুড়ঙ্গপথে চলিয়া যাওয়া যাক্ ভারতচন্দ্রেরই মাঙ্গলিক কাব্যে। এই সীমানা-সমিতির সুপারিশ গৃহীত হইলেই দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে—এই সীমানাটি যথার্থ রিয়ালিজ্‌ম্-এর সীমানা কি না।

আমার মনে হয় আধুনিকতা সম্বন্ধে আমাদের উপরি-উক্ত ধারণাটি ভুল, এবং 'রিয়ালিজম'-এর যথার্থ স্বরূপটি বুঝিতে হইলে প্রথমে আমাদের এই আধুনিকতার ধারণাটি বদলাইয়া লইতে হইবে। আমাদের বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন, জীবনের বিভিন্ন যুগভেদে শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা রহিয়াছে, যেমন, বাল্য-লীলা, কৈশোর-লীলা, প্রৌঢ়-লীলা প্রভৃতি ; কিন্তু এই সব লীলারই আবার একটা নিত্যত্ব রহিয়াছে। 'বাল্য' একটি নিত্য-স্বরূপযুক্ত নিত্যতত্ত্ব। ঠিক সেই ভাবেই বলিতে পারি, একটা জাতির সমগ্র জীবন জুড়িয়া মহাকালের যে বিভিন্ন লীলাচাঞ্চল্য তাহার প্রত্যেকটিরই আবার একটি নিত্যত্ব রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, আধুনিকতারও একটা নিত্য-স্বরূপতা আছে। কালের পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিস্তীর্ণ সমাজ-জীবনে আসে নানা প্রকারের পরিবর্তন। সমাজ-জীবনের এই পরিবর্তন জাতীয় জীবনে গড়িয়া তোলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রুচি-প্রবণতা ; এই রুচি-প্রবণতাযুক্ত যে বিশেষ যুগধর্ম, তাহা অতীত ধর্ম হইতে স্বভাবতঃই অনেকখানি পৃথক্‌। এই যুগধর্মের পার্থক্যের চেতনাটাই বার বার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়া দেখা দেয় 'আধুনিকতা'র রূপ লইয়া।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'আধুনিকতা' কথাটার কোন নিরপেক্ষ মান বা মূল্য নাই ; ইহার ধর্ম এবং মূল্য সবটাই আপেক্ষিক। আমরা যে অর্থে ১৩৫৭ সালটিকে আধুনিক যুগ আখ্যা প্রদান করিয়া তাহাকে যে বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করিতে উৎসুক, বৈদিক যুগের অগ্নিপ্রদক্ষিণকারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলবসন কোন উগ্রযুগচেতনাসম্পন্ন মানুষ যদি সেই যুগটিকেই এই জাতীয় আখ্যা এবং মর্যাদা দান করিতে উৎসুক হইতেন তাহাতেও আপত্তি করিবার কোন ন্যায়-সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। অতীত যুগের অপেক্ষা তাঁহার যুগটিই তাঁহার নিকটে আধুনিক ছিল। তফাৎ শুধু হয়ত এইটুকু, তখনকার জীবনের গতিতে একটা আপেক্ষিক মন্থরতা ছিল, সুতরাং পরিবর্তনের প্রকার এবং পরিমাণ এবং তাহার ফলে পূর্ব যুগের সহিত পার্থক্যও হয়ত এ-কালের অনুপাতে অনেক কম ছিল। আমাদের কালে জীবনের যে গতি তাহার ভিতরে শুধু প্রাথমিক গতিই (initial velocity) বড় কথা নয়, নিরন্তর বর্ধমানতা (acceleration) এই প্রাথমিক গতির সহিত যুক্ত হইয়া বেগ এবং আবর্ত সবই অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া দিয়াছে ; ফলে অল্পকালের ব্যবধানও পার্থক্যের চেতনাকে তীব্র করিয়া দিতেছে।

আধুনিকতার আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম সে সম্বন্ধে হয়ত বিতর্কের অবকাশ কম, কিন্তু এই আধুনিকতার আপেক্ষিকতাকে অবলম্বন করিয়াই আমি আর একটি কথা বলিতে চাই, তাহাই বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। আমার মনে হয়, সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকতা কথাটার যেমন কোন নিরপেক্ষ অর্থ নাই, রিয়ালিজ্‌ম্‌ বা বাস্তববাদ কথাটারও তেমনই কোন নিরপেক্ষ অর্থ নাই; ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, রিয়ালিজ্‌ম্‌ বলিয়া আমরা সাহিত্যে এবং শিল্পে যে কথাটা বলি তাহাও সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের একটা যুগোচিত আপেক্ষিক ধর্ম। বৈদিক যুগটাই বৈদিক যুগের মানুষের নিকট যেমন আধুনিক কাল ছিল, তেমনিই, আমার বিশ্বাস, বৈদিক সাহিত্যও তৎকালীন মানুষের নিকট 'রিয়াল্‌' ছিল। ত্রেতা যুগে বৈদিক সাহিত্যের এই 'রিয়ালিজ্‌ম্‌' অনেকখানি ঘুচিয়া গিয়াছিল, বাল্মীকিকৃত রামায়ণই বোধ হয় তখন ছিল 'রিয়াল্‌'। কালিদাসের কাব্যধর্ম সম্বন্ধে আমরা আজ যত উচ্ছ্বাসপ্রাবল্য দর্শাই না কেন, তাহার সাহিত্যকে রিয়ালিষ্টিক সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে এখন আমরা কেহই রাজী হইব না; কিন্তু আমার মনে এ সংশয় আছে, আমি যদি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক জন বিদগ্ধ সদস্য হইতাম তাহা হইলে কালিদাসের সাহিত্যই আমার নিকট 'রিয়াল্‌' বলিয়া মনে হইত। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সশ্রদ্ধভাবেই রোম্যাণ্টিকতামিশ্রিত আইডিয়ালিষ্ট্‌ বলিয়া দূর হইতে নমস্কার করিতে শিখিয়াছি; কিন্তু তাঁহার নিজের যুগের পাঠকগণের নিকটে তিনি যে উগ্র রিয়ালিষ্ট্‌ বলিয়া নিন্দার্হ হইয়াছেন তাহারও প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও শরৎচন্দ্র উগ্র বাস্তব-পন্থী বলিয়া অভ্যর্থনা ও ভৎর্সনা উভয়ই লাভ করিয়াছেন, এখন আবার বোধ হয় আমরা ভোল বদলাইয়াছি—শরৎচন্দ্রকেও আদর্শবাদী বলিয়া কড়ি ও কোমলের সুর লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন আবার দেখিতেছি, এ-যুগে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে মোটের মাথায় তাহা সবই 'রিয়াল্‌' বলিয়া পরিগণিত হইতেছে অথবা 'রিয়াল্‌' বলিয়া ধাঁধা লাগাই-তেছে, এবং মোটের মাথায় যুগটাকে আমরা রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর যুগ বলিয়াই অভিহিত করিতেছি। এই ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর সংজ্ঞা দাঁড়ায় কি? কবির বা শিল্পীর যুগানুগত্য-হেতু তাঁহার রচিত সাহিত্য বা শিল্পের তৎতৎকালে একটা সহজ-গ্রাহ্যত্ব। এই সহজ-গ্রাহ্যত্বের পিছনে

যুগ-মনের একটা 'সায়' দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য বা শিল্পের যে বিশেষ ধর্ম এই যুগমনের 'সায়'টি আদায় করিতে পারে সব চেয়ে বেশী, তাহাই সাহিত্য বা শিল্পকে 'রিয়ালিষ্টিক' রূপ দান করে।

শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা যখন আধুনিক যুগটাকে রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর যুগ বলি তখন যে কথাটা আমাদের মনে থাকে তাহা হইল এই, অধুনাপূর্ব শিল্পিগণের দৃষ্টি জীবনের নিরেট কেন্দ্রবিন্দুটির প্রতিই স্থিরবদ্ধ ছিল না, জীবনের আশ-পাশেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বেশী। মর্ত্যলোক অপেক্ষা স্বর্গলোক এবং অন্তরিক্ষ লোকেই আমরা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি অধিক, পাতাল লোকেও আমাদের গতিবিধি ছিল অবাধ। ইহা ত গেল অনেক আগেকার কথা; প্রাক্-রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর যুগে আমাদের মন আবার শুধু 'কি জানি, কি জানি' করিয়াই ঘুরিয়া মরিয়াছে; জীবনকে দেখিয়াও দেখি নাই—কেবল অজানা রহস্যের গোধূলিতে হেঁয়ালীর জাল বুনিয়া নিজেকেও ঢাকিয়া রাখিয়াছি—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেও ঢাকিয়া রাখিয়াছি। হেঁয়ালীতে হেঁয়ালীতে গোটা সংসারই শেষ পর্যন্ত বাষ্পাকারে উবিয়া গিয়াছে, নীচে পড়িয়া রহিয়াছে একটা কল্পনা-বিলাসের স্নায়বিক উত্তেজনা। শিল্পের এই সমস্ত বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া এখন আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি এমন স্থানে যেখানে শিল্পীকে কাদামাটির পৃথিবীটা এবং তাহার উপরে প্রতিমুহূর্তে জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত জীবনটার একেবারে মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং দাঁড়াইতে হয় বীরের বলিষ্ঠ দৃষ্টি লইয়া,—পলায়নের সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া। শিল্পে তাই মণি-কুট্টিম, কুঞ্জ-কুটির বা ফুলের বাসরের স্থানে জল-কাদা-মাটির মাঠঘাট, কারখানার তপ্ত লোহার ছাউনি, বস্তির পঙ্কিলতা দেখা দিয়াছে; প্রেমের জ্বালা অপেক্ষা বুভুক্ষার জ্বালা তীব্রতর হইয়া দেখা দিয়াছে, বিলাসের দীর্ঘশ্বাস অপেক্ষা শ্রমক্লান্ত পাঁজরার ভিতর হইতে উদ্‌গত হাপরের ঘন-শ্বাস অধিক শ্রুতিগোচর হইয়া উঠিতেছে, ধ্যানের স্তব্ধতা অপেক্ষা কর্মের কোলাহল অধিকতর মহিমা লাভ করিতেছে। জীবনের সহিত এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই বলিব, শিল্পে এই রিয়ালিজ্‌ম্‌ জিনিসটি হইতেছে আধুনিক জিনিস; জীবন সম্বন্ধে এমন জাগ্রত বোধ, এমন সজাগ দৃষ্টিই আমাদের পূর্বে কখনও ছিল না—বর্তমান যুগই এই বোধ, এই দৃষ্টিকে বহন করিয়া আনিয়াছে। শিল্প এবং জীবন যে আধুনিক কালে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, অথবা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে সে কথা অস্বীকার না

করিয়াও এ-বিষয়ে অন্য যে-সকল ভাবিবার কথা রহিয়াছে তাহারই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি।

প্রথমতঃ, বর্তমান যুগের পূর্বে সাহিত্যের সহিত জীবনের যোগ কোথাও ঘনিষ্ঠ হইয়া দেখা দেয় নাই—এ-কথা ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিব না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রামায়ণ—এবং তাহা হইতেও বিশেষ করিয়া মহাভারত—এমনতর একটি কথার লক্ষশ্লোকে-রচিত বিপুলকায় প্রতিবাদ। জীবন-সত্যই ত এ-কাব্যদ্বয়ের মূল উপজীব্য; তৎকালে প্রচলিত সত্যকারের সমাজ-জীবনের একেবারে ফোটোগ্রাফ্‌ও যদি পাইতে চাই, রামায়ণ-মহাভারতে তাহার কোথাও কোন অপ্রতুলতা ঘটিবে না। সুদূর অতীতকালের রামায়ণ-মহাভারতের কথাও না হয় ছাড়িয়া দিলাম; চারি পাঁচ শতাব্দী পূর্বে রচিত আমাদের মঙ্গল-কাব্যগুলিকে এক সংস্কারবর্জিত দৃষ্টিতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে সেখানেও দেখিব সকল দেব-দেবীর ভিড়, সকল অলৌকিকতার আবরণ ছিন্ন করিয়া সমাজ-জীবনের সহিত সাহিত্যের বহুস্থানে ফুটিয়াছে নিবিড় যোগ—কি ঘটনার বর্ণনে, কি চরিত্রাঙ্কনে। এমন কি আমি বলিব, বৈষ্ণব কবিগণের অঙ্কিত রাধাও বহুস্থানে চিত্রে ও চরিত্রে আশ্চর্যভাবে রিয়াল্‌ হইয়া উঠিয়াছে—বাঙলাদেশের গ্রাম্য সরলা 'অবোলা' নারীরূপে। সাহিত্যের ভিতরে আমরা যে একান্ত অবান্তর আকাশ-বিহারী কল্পনা-বিলাসের কথা বলি—যে রহস্য-নিদ্রালুতা—হেঁয়ালীর যবনিকান্তরালে জীবনের চরম 'বাষ্পায়নে'র কথা বলি—তাহা কতদিনের? তাহার চরম প্রকাশ প্রায় 'আজি হ'তে শতবর্ষে'র মধ্যেই। আমরা খুব জোর করিয়া যখন এই কথাটি বলি যে, পূর্ববর্তী শিল্পে বাস্তব জীবনের তেমন কোন স্থান ছিল না তখন আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের অব্যবহিতপূর্ববর্তী সাহিত্য এবং শিল্পের কথাই আমাদের মন জুড়িয়া থাকে।

কিন্তু এ-সকল তর্কও ছাড়িয়া দিতেছি। স্বীকার করিয়া লইতেছি, আজিকার দিনের সার্থক শিল্পিগণের সমস্তখানি মন যেমন করিয়া জীবনের প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে ইহার পূর্বে আর যেমন কোনদিন ছিল না—ইহাই হইল আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য—ইহাই হইল আধুনিক শিল্পের রিয়ালিজ্‌ম্‌। কিন্তু আধুনিক শিল্পের এই বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি আলোচনা করিতে গিয়া মনে হইয়াছে, ইহা যুগেরই ধর্ম, কালের আবর্তনই এ ধর্মকে বহন করিয়া

আনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও দেখিলাম, জীবনের সীমানা পৃথিবীগাত্রের উপরে কয়েক শত হাতের ভিতরেই কষাকষিভাবে নির্দিষ্ট হইয়া যায় নাই ; তখন পর্যন্তও আমরা মানুষের ইতিহাসের যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিলাম তাহাতে জীবনের ডাইনে-বাঁয়ে উর্দ্ধে-অধে অনেকখানি আশ-পাশ ছিল, এবং সেই আশ-পাশের দিকে তাকাইবার অবকাশ ছিল। তখন পর্যন্ত উর্দ্ধে আকাশ ছিল—তাহাতে জ্যোৎস্নারাত্রে শুভ্র মেঘখণ্ড ছিল ; সেই শুভ্র মেঘের 'অমল ধবল পালে' আসিয়া 'মন্দ মধুর হাওয়া' লাগিতে পারিত, এবং তাহার দিকে তাকাইয়া নিম্নবাসীদের কাহারও কাহারও মন হয়ত কোন্ সুদূরে ভাসিয়া যাইতেও চাহিতে পারিত। কিন্তু আজ আমাদের মাথার উপরের সেই আকাশ বিমানে বিমানে ছাইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা বহন করে যে সকল অণু-পরমাণু তাহা যে-কোন মুহূর্তে নিম্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে এবং বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার একটি পরমাণু একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে ধ্বংসস্তূপের ভিতরে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। জীবনের ডাইনে-বাঁয়ে উর্দ্ধে-অধে সর্বত্রই দেখিতেছি কেবল যেন ঝুলিতেছে 'গুরুতর পরিস্থিতি'র সম্পাদকীয় স্তম্ভ—তাহারা প্রতি মুহূর্তে খালি স্মরণ করাইয়া দিতেছে, নিছক বাঁচিয়া থাকা জিনিসটাকেই বা কি করিয়া সম্ভব করিয়া তোলা যায়! সকল দৃষ্টি ক্রমে যেন স্থিরবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে জীবনের ঐ একটি দিকে—কোনও রকমে নিছক টিকিয়া থাকিবার দিকে। পারিপার্শ্বিক এই আবেষ্টনীর ভিতরে যুগমনেরও ঔৎসুক্য স্বভাবতঃ ঐ বাঁচিয়া থাকিবার দিকে ; যে সেই বাঁচিয়া থাকিবার কথা বলে, তাহার সহিতই মনের বেশী সায়, যে তদতিরিক্ত কথা বলিতে যায় বাহুল্যবোধে সে হয়ত বিরক্তি-সহকারে বর্জিত। তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, মহাকালেরই আবর্তন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া যুগমনের ভিতরে আনিয়াছে কতগুলি বিশেষ প্রবণতা ; যেখানেই সেই প্রবণতার পরিতৃপ্তি সেখানেই আসে একটা সানন্দ-গ্রাহ্যত্ব, আর বৃহত্তর সমাজ-জীবনে যে জিনিসটি সানন্দ-গ্রাহ্য তাহাই তৎকালে প্রতিভাত হয় জীবনের সত্যরূপে, সেই সত্যকে লইয়াই জাগে শিল্পের রিয়ালিজ্‌ম্। আজিকার দিনে আমাদের আকাশ-গাঙে কোনও দিনই যে আর 'অমল ধবল পালে' 'মন্দ মধুর হাওয়া' লাগে না এমন নহে ; সে যে বাস্তবে এখন আর কোনও দিন ঘটে না বলিয়াই অসত্য হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, ঘটিলেও শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিব্রত মনটির কাছে সে বিরক্তিকরভাবে অবাস্তর,

এই জন্যই সে যেন অসত্য বলিয়া মনে হইতেছে ; তাহার চেয়ে আকাশের মেঘের বর্ণনায় যদি শুনিতে পাই,—

কান পেতে শোন্ দেখি
গগন-অরণ্যে কি
গর্জে শাবক-হারা বাঘিনী !—

তখন তাহাকে অনেকখানি 'রিয়াল্' বলিয়া মনে হয় ; কারণ সেখানে আকাশের মেঘের গর্জনের সহিত নিম্নের জীবন-গর্জনের অনেকটা সঙ্গতি স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। যুগধর্মের প্রভাবে এই যে চিত্ত-সঙ্গতি তাহাই শিল্পের ক্ষেত্রে 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর নিয়ামক হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। কথাটা হয়ত অনেকখানি আমাদের প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী হইল ; সুতরাং ইহার যাথার্থ্য যাচাই করিয়া দেখিতে হইলে 'রিয়ালিজ্‌ম্' বিষয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন।

(২)

আমাদের প্রচলিত মতে রিয়ালিজ্‌ম্ কাহাকে বলি ? কথাটা যত স্পষ্ট করিয়া আমরা বলি, তত স্পষ্ট করিয়া বোধহয় ভাবিও না, জানিও না। এ সম্বন্ধে চলতি কথা যাহা দু'-একটা আছে, আসলে তাহা অচল। 'বস্তু বা ঘটনা যেমন, ঠিক তেমনই তাহার রূপ দিব'—প্রভৃতি জাতীয় কথা অর্থহীন ; কারণ, প্রথমতঃ, এই 'যেমন' এবং 'তেমন' কথা দুইটিরই কোন স্পষ্ট অর্থ নাই ; দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের যদি কোন অর্থ নির্দিষ্ট করিয়াও লওয়া যায়, তবে 'যেমন'-এর ঠিক 'তেমন'-এর সহিত হুবহু যোগ ঘটান কাহারও পক্ষে আদৌ সম্ভব কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় বর্তমান। এই প্রসঙ্গে 'যথাস্থিতবাদ' কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন বস্তু বা ঘটনার মানুষের মনোনিরপেক্ষ কোন যথাস্থিত রূপ আদৌ আছে কি না, থাকিলে মানুষের মনের পক্ষে এই জাতীয় কোন যথাস্থিত রূপ গ্রহণ করা সম্ভব কি না। শেষ পর্যন্ত আমরা হয়ত এই একটা রফায় উপস্থিত হই যে, বস্তু বা ঘটনার একেবারে যথাস্থিত কোন রূপ নাই, বা থাকিলেও কোন জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রেই সেই বিশুদ্ধ যথাস্থিত সত্যের রূপায়ণ সম্ভব নহে বটে, কিন্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রহীতা মনের প্রাধান্য বেশী না বস্তু বা ঘটনার স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বাহিরের রূপ-গুণেরই প্রাধান্য বেশী, ইহা লইয়াই রিয়ালিজ্‌ম্-এর বিচার।

আসলে রিয়ালিজ্‌ম্ কথাটাকে আমরা স্পষ্ট ইতি-বাচক রূপ অপেক্ষা নেতি-বাচক রূপে হয়ত বুঝি ভাল। এই নেতি-বাচক রূপে রিয়ালিজ্‌ম্ হইল রোম্যান্টিক্‌বাদের বিরোধী ধর্ম এবং ভাববাদ বা আদর্শবাদেরও বিরোধী ধর্ম। প্রথমে রোম্যান্টিক্‌বাদের কথাই আলোচনা করা যাক্। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রোম্যান্টিক্‌বাদ এবং রিয়ালিজ্‌ম্ শিল্পিমনের দুইটি পরস্পরবিরোধী ধর্মপ্রসূত। একজাতীয় শিল্পীর সহজাত মনোধর্মই এইরূপ যে, তাঁহারা কোন বস্তু বা ঘটনার বাহিরের রূপটিতেই আকৃষ্ট হন বেশী; রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সেই দিক্‌টাই প্রধান হইয়া ওঠে। আর এক জাতীয় শিল্পীর সহজাত মনোধর্ম তাঁহাকে স্বভাবতঃই বহির্বিমুখ করিয়া তোলে, তিনি বাহিরের বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ফিরিয়া আসেন তাঁহার অন্তর্জগতে—আন্তর অনুভূতির ক্ষেত্রে। মোটের উপরে মনোধর্মের এই বহির্মুখিতাই রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রবর্তক; বহির্বিমুখ অন্তর্মুখিতাই দান করে রোম্যান্টিক্‌বাদের প্রবর্তনা। সূর্যরশ্মি যেমন চতুষ্পার্শ্বস্থ শূন্যপরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া সপ্তবর্ণের বৈচিত্র্য লাভ করে, এই এক মনোধর্মই সেইরূপ শিল্পের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র ধর্ম গ্রহণ করে।

সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে—এই সকল কথাকে আমার মনে হইয়াছে ইতিহাসনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্ব মাত্র। এই বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবলম্বনে কতগুলি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌছান খুব সহজ; কিন্তু মাঝখান হইতে ইতিহাস আসিয়া মুস্কিল বাধায়; সে তাহার প্রচণ্ড আলোড়নে—নিরন্তর ঘূর্ণ্যাবর্তে—বিশুদ্ধ তত্ত্বের ভিতরে খানিকটা কাদা-মাটির সংযোগ ঘটাইয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করিয়া দিয়া যায়। আধুনিক যুগটা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম, আধুনিক যুগ লইয়াই কথা বলি। আধুনিক যুগটা রিয়ালিজ্‌ম্-এর যুগ বলিয়া একটা সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; এই স্বীকৃতি আবার সব চেয়ে বেশী উপন্যাস-ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। এ-যুগের কথা-সাহিত্যকে তাই একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। এ-যুগের কথা-সাহিত্যিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন, এরূপ একজন কোন লেখকের নাম করা শক্ত; তথাপি জনপ্রিয়তার দিক হইতে বিচার করিয়া আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উল্লেখ করিতেছি। লেখক হিসাবে তারাশঙ্করের ধর্ম কি? তাঁহার লেখার ভিতরে বাঙলা দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের এমন নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়, এই অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানব-জীবনের সহিত তাঁহার হৃদয়ের এমন

গভীর সংযোগের পরিচয় ছড়াইয়া আছে তাঁহার সকল লেখার ভিতরে যে, তিনি রিয়ালিষ্ট লেখক নন এমন অপবাদ তাঁহাকে কিছুতেই দিতে ইচ্ছা হয় না। বাঙলা দেশের সাধারণ পাঠক হিসাবে তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস পাঠ করিয়া মনে যে ফলশ্রুতি লাভ করিয়াছি তাহার একটা মিশ্রধর্ম সর্বদা লক্ষ্য করিয়াছি এবং এ-সম্বন্ধে নিজের অনুভূতিকে যখন নিজেই নানা ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, তখন নিজের মনের মধ্যেই অনেক সংশয় উপলব্ধি করিয়াছি।

তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস পাঠ করিয়া এই প্রশ্ন মনে আসিয়াছে যে, নাগরিক জীবনে নিরন্তর সংগ্রামলিপ্ত ঘর্মসিক্ত আমাদের তথাকথিত শিক্ষা-সংস্কৃতি-সম্পন্ন মনের কাছে এই সব সাহিত্যের যে আবেদন, বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ জনসমাজে তার সেই আবেদন আছে কি না। আমাদের নিকটে এই সাহিত্যের যে ভাল লাগা তাহার ভিতরে মনে হয় অনেক কারণ যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এখানে বাঙলা দেশের একটা বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি ও জীবনের একটা নিখুঁত ছবি পাইয়াছি, অবজ্ঞাত সাঁওতাল, হাড়ী, বাগ্‌দী, বাউরী জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতি পাইয়াছি, ক্ষয়িষ্ণু পরগাছা মধ্যবিত্ত জীবনের ক্রম-অন্তর্ধানের ছবি ও নূতন সমাজ-জীবনের আবির্ভাবের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছি; আমাদের ভাল লাগার ভিতরে এ উপাদানগুলির প্রভাব যথেষ্ট। কিন্তু ইহাই কি সম্ভব? এই ভাল লাগার ভিতরে অনেকখানি হয়ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে একটা দূরত্বের ব্যবধান, পরিচয়-অপরিচয়ের আলো-আঁধারি রহস্য—সংগ্রামক্ষত নাগরিক জীবনের শ্রান্তি ও তিক্ততা হইতে মুক্তি ও বিশ্রান্তির আনন্দ। নাগরিক জীবনের অনেক দূর হইতে হাজা-মজা নদীর বাঁকে ঘনবিন্যস্ত শালবন-বাঁশবনের আড়ালে ভাঙা মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাউনির নীচে কতগুলি জীবনধারা দেখিতেছি—সে ধারা উৎসহীন নদীর মতন খরতাপে চট করিয়া শুকাইয়া যায়—বর্ষার বানের মতন আচমকা দুর্বার হইয়া ওঠে। তাহারই আশে-পাশে আস্তে আস্তে খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবন—আগাছায়-ভরা কত কালের পুরানো ভাঙা-চোরা পোড়ো বাড়ির মতন। এখান হইতে জাগিয়া উঠিতেছে একটা অখ্যাত-অজ্ঞাত আদিম জীবনের গন্ধ—তাহার খানিকটা ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে পাই—অনেকখানি পাই না। এই পাওয়া-না-পাওয়ায়, বোঝা না-বোঝায় মিলিয়া-মিশিয়া সব জিনিসটাই কেমন একটা অজ্ঞাত রহস্যে মণ্ডিত হইয়া ওঠে। তবে কি লেখক রোম্যাণ্টিক্?

শুধু রোম্যাণ্টিকতা নয়, এখানে একটা মুক্তির—একটা বিশ্রান্তির—আনন্দও রহিয়াছে—গাল দিবার ভাষায় যাহাকে বলা যাইতে পারে 'পলায়নী বৃত্তি'। যে একটা আদিমতাগন্ধী সহজ সরল মন্থর জীবনে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাই তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যে, তাহা সাময়িক ভাবে আমাকে আমার অস্বস্তিকর বর্তমান জীবনের পরিবেশ হইতে অনেক দূরে টানিয়া লয়। এই দূরত্বের ব্যবধান-রহস্য—এই মুক্তি বা বিশ্রান্তির আনন্দকে—আমি অযথা বড় করিয়া দেখাইতে চাহিতেছি না; আমি শুধু দেখাইতে চাহিতেছি যে, আমাদের সমগ্র 'ভাল লাগা'র ভিতরে এই সকল উপাদানের স্থানও একান্ত অবজ্ঞেয় নয়। এখানে অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে, তারাশঙ্করের সৃষ্ট সাহিত্যের এই রোম্যাণ্টিক্ রূপটা আমার পাঠক-চিত্তের বিকারজনিত কি না। এ বিষয়ে নিজে অভ্রান্ত বিচারক নই; কিন্তু যতখানি বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব তাহা দ্বারা এই প্রত্যয় লাভ হইয়াছে যে, এ ধর্ম শুধুমাত্র আমার পাঠক-চিত্তগত নহে, ইহা তাঁহার রচিত সাহিত্য-গতও বটে।

এখানে তাহা হইলে দেখিতেছি, রিয়ালিজম্ এবং রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্, হরি-হরাত্মা; অহি-নকুলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ত নয়ই, বরঞ্চ উভয়ে উভয়ের পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছে। শুধু এইটুকুই নয়; আরও লক্ষ্য করিবার বস্তু রহিয়াছে। পূর্বে তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যে যে সকল উপাদানের উল্লেখ করিলাম তাহার অনেক উপাদানই রোম্যাণ্টিক্, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার কিছু কিছু উপন্যাসের ভিতরে যে ভাবে রোম্যাণ্টিক্ বলি, বা রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে রোম্যাণ্টিক্ বলি, তারাশঙ্করকে ঠিক সেইভাবে রোম্যাণ্টিক্ বলিতে ইচ্ছা হয় না। বরঞ্চ এই সকল রোম্যাণ্টিক্ উপাদান সত্ত্বেও সাধারণ পাঠক-সমাজে তারাশঙ্করকে রিয়ালিষ্টিক্ লেখক বলিয়া গ্রহণ করিবার ঝোঁক একেবারে অবজ্ঞেয় নয়। আমার বিশ্বাস, ইহার পশ্চাতে একটা গভীর কারণ নিহিত থাকে।

তারাশঙ্করকে এইভাবে রিয়ালিষ্ট্ বলিয়া গ্রহণ করিবার ঝোঁক কেন? আমার মনে হয়, তাহার কারণ—লেখকের সহজ এবং অকৃত্রিম যুগানুগত্য এবং তজ্জনিত তাঁহার সাহিত্যের সহজ ও সানন্দ-গ্রাহ্যত্ব। লেখক যুগধর্মকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। যুগের যেটা রোম্যাণ্টিকতা তাহা বৃহত্তর সমাজ-চৈতন্যের নিকট সহজ-গ্রাহ্য—সানন্দ-গ্রাহ্য; তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক

মনের একটা সাধারণ সায় রহিয়াছে, মোটামুটি ভাবে তাহা বর্তমান-জীবনের সহিত একটা সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে—এই জন্যই যুগের পক্ষে তাহা 'রিয়াল্'—তাহা সত্য। সমাজের নিম্নস্তরের অখ্যাত অবজ্ঞাত এবং শোষিত জীবন সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য, একটা গভীর সহানুভূতি, তাহাকে জানিবার বুঝিবার আত্মীয় করিয়া লইবার একটা প্রবৃত্তি—আমাদের যুগেরই ধর্ম; সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের জীবনেরও যে একটা মূল্য আছে—মহিমা আছে—মানুষের 'অধিকারে তাহারাও বঞ্চিত হইবার নয়—সমাজ-জীবনের অন্তস্তলে নানা দুর্বার শক্তির আলোড়নের আঘাতে প্রত্যাঘাতে তাহাদের জীবনেও যে নূতন দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে একটা নূতনতর সমাজ-জীবনের আবির্ভাবের ইঙ্গিত জাগিয়া উঠিতেছে—এই সকল জিনিসের সহিত বর্তমান যুগে আমরা আমাদের হৃদয়ের একটা গভীর যোগ অনুভব করি, আর এই সকলের বাহনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ তাহার সহিতও আমরা অনুভব করি আমাদের হৃদয়ের এক নিবিড় যোগ; তাই তাহা মারাত্মক ভাবে আধুনিক রিয়ালিজ্‌ম্-এর বিরোধী রূপে দেখা দেয় না, দেখা দেয় রিয়ালিজ্‌ম্-এর অঙ্গীভূত রূপে। এ কথা শুধু তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, কম বেশী এ যুগের অনেক কথা-সাহিত্যিকের রচনা সম্বন্ধেই সত্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', 'পথের পাঁচালী'; মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি'; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর ভাবে এই এক কথাই প্রযোজ্য মনে হয়। যুগোপযোগী হইলে রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ যে কত সহজ এবং সানন্দ-গ্রাহ্য হইয়া রিয়ালিজ্‌ম্-এর রূপ ধারণ করিতে পারে সেই কথাটিই এ-সব স্থলে লক্ষণীয়।

শুধু কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, এ যুগের কবিতার ক্ষেত্রেও এই কথাটা আমার সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের উল্লেখ করিতেছি। করিতেছি এই জন্য যে, যতীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িলে মনে হয় তাঁহার কবিতার একটা স্পষ্ট সুর আছে। সে সুরটিকে আমি শুধু দুঃখবাদের সুর বলিব না, বলিব যে সেখানে আছে একটি রোম্যাণ্টিকতা-বিরোধী সুর। রোম্যাণ্টিক্ কল্পনাবিলাস এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এতদিন ধরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি যে বহু-বিচিত্র মন-ভুলান

ভাবের সৌধ, তিনি তাহার ভিত্তি-ভূমিতে অনেক স্থানে বলিষ্ঠ আঘাত করিয়া তাহাকে নাড়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই রোম্যান্টিক্ ভাবালুতার বিরোধিতা এ-যুগে আমাদের ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কবিতা কি সত্যই রোম্যান্টিক্ ভাবালুতার বিরোধী? একটু দীর্ঘ হইলেও তাঁহার রচিত 'বেদিনী' কবিতাটি নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

ফাগুন আকাশে নামে কাল-সাঁঝ ঝোড়ো মেঘে দিক্ ঘেরা,
ওঠ্ রে বেদিনী মোট বেঁধে নিই তুলিতে হইবে ডেরা।
দখিনার লোভে খোলা মাঠে তুই বসালি তাঁবুর খোঁটা,
ভাঙা ফাটা ফুটো তৈজস্ গুটো, সাপের ঝাঁপিটে ওঠা।
ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদিনী, দখিন হাওয়া এ নয়,
ঈশান কোণের ফণীর ফণায় বিষের নিশাস বয়।
ওই আসে সেই ঝড়,—
ওঠ্ রে বেদিনী মোট তুলে নিয়ে বেদিয়ার হাত ধর।

কি হ'ল বেদিনী তোর?
উড়ো মেঘে রাখি' নিশ্চল আঁখি কোন্ বেদনায় ভোর?
এবার সহসা উঠাইতে বাসা কেমন করে কি মন?
মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে ক্লান্ত কি এ জীবন?
বেদিয়ার বালা সাধিয়া দি'লি যে বেদিয়ার গলে মালা,
জানিতিস্ তুই এদের বংশে নাই যে ঘরের জ্বালা।
বেদের ধারা ত বুঝিস্ বেদিনী,—যে ঘর বাঁধে সে দিনে,
রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার ঢেকে যায় শ্যাম তৃণে।

তবে বা কিসের লাগি
এত কাল পরে হ'লি তুই আজ সেই ঘরে অনুরাগী?
বেলায় বেলায় পথের খেলায় বেদিনী রে কাটে দিন,
আমাদের 'পরে পথের কুকুরও নহে কভু উদাসীন।
সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে, মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি বেদিনী, ভরা বুকে বুক চাপি।

তুই আর আমি পথে পথে ভ্রমি সাথে শত তালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কালভুজঙ্গী চির-সাথী শির 'পর।

এ সবে কি রুচি নাই?

ঘরের মায়ায় ঝড়ের আকাশে নয়ন মেলিলি তাই?
বেদের আদরে বেদিনী রে তোর চুলে বাঁধিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙ্গনে ভেঙেছে শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন পবনে ঘুরি বনে বনে হাতে ছাগলের দড়ি,
বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস্ ফুলে ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপান হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া রঙিন ফালি
চির-হাঘোরের ঘরণী রে তুই ঘাঘরায় দিস্ তালি।
তবু যে বেদিনী বেদেরি ভক্ত—বিস্ময় সবে মানে,
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায় মোহিনী মন্ত্র জানে।

শোন্ রে বেদিনী শোন্

সুরু হ'ল ওই অদূর আঁধারে গুরু গুরু গর্জন!
ঘরের মায়া সে থাকে ত এখনও কেটে দে তাঁবুর রশি,
না হয় কাটাব এ কালরাত্রি খোলা মাঠে খাড়া বসি'।
আকাশ জুড়িয়া কোন্ সাপুড়িয়া বাজায়ে চলেছে তূরী,
ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ, নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রশির ফাঁসে ওই ত্যাখ ঘন ঘন পড়ে টান।
কেন উদাসীন আন্‌মনা হেন বেদিনী, বেদের মেয়ে?
দূরের বাঁশীর সুরে তুইও কি রে উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে?

*　　*　　*

অকালে এল যে কালবৈশাখী কাছে আয় কাছে আয়,
যাহা নাই তারি মায়ায় বেদিনী যা ছিল তাও যে যায়।
ছুটে যায় খুঁটো, উড়ে ছেঁড়া তাঁবু, টুটে যায় দড়াদড়ি,
ফুটো ভাঁড় আর কাণা-ভাঙা হাঁড়ি, দূরে দূরে গড়াগড়ি।

অকালের এই কালবৈশাখী ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে বেদিনী রে হাত ধর।
ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না—ভয় নাই ভয় নাই,
এ মাঠ ছাড়িয়া চল্ রে বেদিনী আর কোন মাঠে যাই।
হাওয়ার উজানে দিক্ ঠিক রেখে আঁধারে আঁধারে চল্—
আকাশে খেলায় লম্বা লম্বা সাপ পারের সাপুড়ে দল।
কি ভাবিস্ মিছে, আয় পিছে পিছে, যা হবার তাই হোক—
বেদে-বেদিনীরা ভয় পায় যদি—হাসিবে গাঁয়ের লোক।

—সায়ম্—

এটা কি-জাতীয় কবিতা? 'উত্তররামচরিতে' যেমন দেখিতে পাই, বাল্মীকির আশ্রমে একটা নূতন জন্তুর আবির্ভাব দেখিয়া লব-কুশ জীববিদ্যা-শাস্ত্রের লক্ষণ মিলাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—'অশ্বোঽয়ম্ অশ্বোঽয়ম্', তেমনই আমাদের কাব্যবিদ্যা-শাস্ত্রের লক্ষণ মিলাইয়া আমাদেরও বলিতে হয়, ইহা রোম্যান্টিক্ কবিতা। কিন্তু মজা এই, এত রোম্যান্টিক্ ধর্মোপেত হইয়াও ইহা আমাদের নিকট রোম্যান্টিক্ বলিয়া ধিক্কৃত ত নয়ই বরং অভ্যর্থিত। ইহার কারণ এখানকার সকল রোম্যান্টিক্ ধর্ম যুগধর্মের সহিত একটা আশ্চর্য সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছে; ফলে খুব অবহিত হইয়া বিচার করিতে না বসিলে মোটের উপরে সমস্ত কবিতাটাকে রোম্যান্টিক্ বলিয়া সহসা গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা হয় না। বেদে-বেদেনীর অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত জীবনকেও আগাইয়া আসিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবার একটা আকুল আগ্রহ দেখা দিয়াছে আমাদের ভিতরে; তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বেদে-বেদেনীর বাস্তব জীবনের সকল খুঁটিনাটি বর্ণনা, সব জুড়িয়া তাই জাগে যেন একটা রিয়ালিজ্‌ম্-এর আমেজ। কল্পনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে মৃদু আঘাত করিতে থাকে অজ্ঞাত জীবনের লীলা-চাঞ্চল্য—তাহার জটিল রহস্যময় পরিবেশ—অসীম অনিশ্চয়তা—অব্যবস্থিততা—আদিমতা—রিক্ততা ও রুক্ষতার মাঝখানে প্রেমবৈচিত্র্যের বিস্ময়কর মহিমা। কিন্তু যুগানুগত্যের ফলে তাহা মনে কোন বেসুরা আঘাত তোলে না; বৃহত্তর জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহিত অন্তরঙ্গ যোগে তাহাও সানন্দ-গ্রাহ্য—এইখানেই তাহাতে রিয়ালিজ্‌ম্-এর আমেজ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রোম্যান্টিসিজ্‌ম্-এর বিরুদ্ধে বর্তমান কালে আমাদের মনে যে বিরূপতা উহা

নিছক রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে নয়, যে রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্‌ যুগ-মনের সহিত সুর রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না অভিযোগটা তাহারই বিরুদ্ধে। এই যুগ-মনের সহিত অমিলটাই তাহা হইলে দেখিতেছি সকল বিরোধ-অপ্রীতির মূলীভূত কারণ। রাজপুত্র-রাজকন্যাকে লইয়া সাত-সমুদ্র তের-নদীর পারে যে প্রেমের কল্পনা-বিলাস—সেই নিদ্রিত স্বপ্নপুরী—সেই পুষ্পপেলব শয্যা, সুরভি-বিহ্বলতা—তাহার ভিতরে সোনার কাঠি রূপার কাঠির স্পর্শজনিত ঘুম ও জাগরণ—যত সুন্দর ভাষা ও ছন্দে যত বিচিত্র করিয়াই তাহাকে লেখা যাক্‌ সে আর আজকের দিনের মনে সায় পাইবে না—যেখানে সে তাহার সেই সানন্দ-গ্রাহ্যত্ব হারাইয়া ফেলিল সেইখানে সে স্ব-ধিক্কৃত। কিন্তু সেই যে সাতসমুদ্র তেরনদী পারের স্বপ্নপুরীর প্রেম সে ত মানুষের জীবনে মরিবার নহে—সে ক্রম-রূপান্তর লাভ করিতেছে এবং আমার সন্দেহ, আজ সে ঐ বেদে-বেদেনীর ভিতরেই অনেকখানি আত্মগোপন করিয়া আছে। আমাদের যে মনোবৃত্তি একদিন আমাদের ঘরের প্রেমকে সাতসমুদ্র তেরনদীর পারের স্বপ্নপুরীতে নির্বাসিত করিয়া একটা গোপন তৃপ্তি লাভ করিতেছিল, সেই মনোবৃত্তির যুগানুগ সূক্ষ্ম রূপান্তরই কি আজ আমাদের প্রেমকে কালবৈশাখীর অখ্যাত অজ্ঞাত ঘাটে-মাঠে সরাইয়া দিয়া, বনে-বাদাড়ে—বিরল-বসতি পাহাড়ি মহুয়া-বনে—অথবা মর্ত্যলোক হইতে প্রায়-বিচ্ছিন্ন পদ্মার চরের আগাছার আড়ালে জলে-ভেজা খড়ের ঘরে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া বিচিত্র রহস্যের সন্ধান করিতেছে? 'তেপান্তরের মাঠ' আজ ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া নাই ত?

কিছুদিন পূর্বে একজন উগ্র আধুনিকতা-পন্থী এবং বাস্তববাদী কবি-লেখকের সঙ্গে কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, সব সময় তাঁহার কবিতার স্ফূর্তি হয় না, তাহার জন্য একটা অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজন। মনে করা যাক্‌, কলিকাতা শহরের একটি স্যাঁতসেঁতে অন্ধ গলি—তাহার ভিতরে একটি ছ্যাত্‌লা-পড়া ফাটা দেয়ালের পোড়ো বাড়ির ভিতরে একটি প্রেস—পায়ে ঠেলা একটা বহু পুরাতন যন্ত্রে ঘড়ড়্‌ ঘড়ড়্‌ শব্দে দেওয়াল কাঁপাইয়া রাজচক্ষুর অন্তরালে ছাপা হইতেছে নিষিদ্ধ পুস্তিকা—প্রতি মুহূর্তে রাজপুরুষের শুধু আগমন নয়, দস্তুরমত আবির্ভাবের আশঙ্কা—ঠিক যেন একটা 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্‌'-এর ভাব! ইহার ভিতরে কেরোসিনের ডিবি জ্বালাইয়া একটা হাত-ভাঙা বা খোঁড়া চেয়ারে বসিয়া চারিদিকের বদ্ধ

খাওয়া ও সোঁদা গন্ধের ভিতরে কলম ধরিতে পারিলেই তাঁহার কবি-মন জাগ্রত হইয়া যথার্থ সক্রিয় হইয়া উঠে। তাঁহার সাধনায় কৃচ্ছ্রতার প্রতি সকল শ্রদ্ধা-সহানুভূতি সত্ত্বেও আমার মনে একটা কথা উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, সম্প্রদায় বিচারে ইনিও একজন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' ন'ন্ কি?

(৩)

রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রসঙ্গে এতক্ষণ রোম্যান্টিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম; এইবারে আদর্শবাদের কথা আলোচনা করা যাক্। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের রিয়ালিজ্‌ম্-এর ধারণার সহিত যুক্ত হইয়া ছিল একটা পরম আসক্তির ভিতরে পরম নিরাসক্তির প্রশ্ন;—বাহিরের জগৎ বা জীবনের প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ, অথচ তাহাকে গ্রহণ এবং প্রকাশ করিবার চেষ্টার ভিতরে নিজেকে যথাসম্ভব লুপ্ত করিয়া রাখা। এই জাতীয় রিয়ালিজ্‌ম্-এর বিরুদ্ধে এত দিন আমাদের যেটা তর্ক ছিল, সেটা সামাজিক জীব মানুষের চিত্তধর্মের পক্ষে ইহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এখন প্রশ্ন শুধু সম্ভাব্যতার নহে, সম্ভব হইলেও এখন প্রশ্ন যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার ঔচিত্য সম্বন্ধে। অথবা বলা যাইতে পারে, নিরাসক্তির প্রশ্নটাকে আজকাল আমরা অস্বীকার করি না, অস্বীকার করি তাহার প্রাচীন ব্যাখ্যাটাকে। নিরাসক্তির অর্থ 'শুধু অকারণ পুলকে' দেখার আনন্দে দেখা এবং প্রকাশের আনন্দে প্রকাশ নয়; নিরাসক্তির অর্থ বৃহত্তম সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ আসক্তিতে সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত বিস্তীর্ণ আসক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করিয়া দেওয়া। সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতার আধুনিক যুগে ইহাই গূঢ় তাৎপর্য। ব্যক্তিচেতনা সেখানে লুপ্ত হয় নাই, সমাজ-চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া সে নিঃসীম বিস্তারের ভিতরে প্রায় নিরুপাধিক হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর সমাজবোধের উপরেই যেখানে রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রতিষ্ঠা, সেখানে আদর্শনিষ্ঠার সহিত রিয়ালিজ্‌ম্-এর কোন বিরোধের প্রশ্নই উঠিতে পারে না; বরঞ্চ গভীর আদর্শনিষ্ঠাই সেখানে রিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রাণ। আদর্শবাদের সঙ্গে যেখানে রিয়ালিজ্‌ম্-এর বিরোধিতা, বুঝিতে হইবে, আদর্শ সেখানে সত্য-জীবনেরই পরিপন্থী। সমাজ-জীবন হইতে আমরা যেখানে 'যোগভ্রষ্ট', আসলে আমরা সেখানে আদর্শভ্রষ্ট; সেই ভ্রষ্ট আদর্শকেই সাহিত্য ও সাধারণ শিল্পের মারফতে আমরা যদি সমাজ-জীবনের উপরে জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চাই,

সেখানেই আসে বিরোধিতা ; সেই বিরোধিতাকে আমরা ভুল করিয়া বলি সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর সহিত আইডিয়ালিজ্‌ম্‌-এর বিরোধিতা। আসল জিনিসটা তাহা হইলে মোটামুটি গিয়া দাঁড়ায় এই, কোন একটি বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের সত্য আদর্শ লইয়া এবং সর্বতোভাবে সেই আদর্শ প্রচার করিতে, সেই আদর্শে সমগ্র জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে যে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি তাহাই রিয়ালিষ্টিক্ ; আর যে সাহিত্য বা শিল্প যুগবিরোধী, অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের সত্য জীবনের পরিপন্থী তাহাই তথাকথিত আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ বলিয়া ধিক্কৃত।

কথাটা একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আলোচনা করা যাক্। কথাশিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র একান্ত ভাবেই পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, এমন একটা কথার 'বহুল প্রচার' বাঙলা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়ান রহিয়াছে। কথাটাকে প্রচলিত ভাষায় রূপ দিতে গেলে বলিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র খানিকটা ছিলেন রোম্যাণ্টিক্, আর অনেক অংশেই ছিলেন অসহ্য ভাবে আইডিয়ালিষ্ট্, অপর পক্ষে শরৎচন্দ্রে এই উভয়বিধ রাহুর কোনটারই কোন স্পর্শ ঘটে নাই, তিনি তাই শুভ্র সমুজ্জ্বল অকলঙ্ক রিয়ালিষ্ট্। আসলে কিন্তু কথাগুলি সর্বৈব মিথ্যা। শরৎচন্দ্র রোম্যাণ্টিক্ ছিলেন না এ কথাও সত্য নয়, আই-ডিয়ালিষ্ট্ ছিলেন না এ কথাও সত্য নয়। তবে এই জনশ্রুতিগুলির পিছনকার সত্য কি? সত্য এই, বঙ্কিমী ঢঙের রোম্যান্স্‌টাও আজকাল আর তেমন ভাল লাগে না, তাঁহার আইডিয়াগুলিও এখন আর তেমন ভাল লাগে না ; অপর পক্ষে শরৎচন্দ্রের রোম্যান্সটাও একটু বেশী ধাতসহ ; আইডিয়াগুলির সঙ্গেও মনের সায় মেলে অনেক বেশী ; ইহারই গলিতার্থে গিয়া সংক্ষেপে দাঁড়াইল, এক জন অসহ্য আইডিয়ালিষ্ট্, অপর জন অসম্ভব রকমে রিয়ালিষ্ট্। জীবনের রোম্যান্স্‌কে শরৎচন্দ্র জীবনের আরও অনেক কাছে আনিয়া দিলেন,—শরৎ-সাহিত্যে তাই জীবনের রোম্যান্স্ আর বাস্তবতা পরস্পরে সর্বদাই পরস্পরের অনুপূরক হইয়া উঠিয়াছে। আর শরৎচন্দ্র আমার মতে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশী আইডিয়ালিষ্ট্। 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী এবং 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মীকে লইয়া আদর্শনিষ্ঠার যে বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সূর্যমুখী ভ্রমর প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া আদর্শনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি তাহা অপেক্ষা অনেক কম বলিয়া মনে করি।

আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তিনিই ছিলেন রিয়ালিষ্ট্‌। তাঁহার রোমান্স্‌ ধর্মের ভিতরে ছিল যুগানুকূলতা; আর তৎকালীন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে কাজ করিতেছিল যে শক্তিসমূহ তিনি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন; সেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অন্তঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয়-জীবনের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিবার অকৃত্রিম সাধনা করিয়াছেন তিনি তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া। তিনি জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন; সেই আদর্শের প্রতি তাঁহার অটল নিষ্ঠা ছিল; কল্যাণময় সেই আদর্শে তিনি যে জাতীয় জীবনকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাই ত যথার্থ রিয়ালিষ্ট্‌ শিল্পীর কাজ। তাঁহার সাহিত্য যথাসম্ভব সব দিক হইতে যুগ-জীবনের সত্যকে বহন করিয়া আনিতেছিল; এই যুগ-জীবনের সত্যকে বহন করিয়া আনারই অর্থ হইল রিয়ালিজ্‌ম্‌।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের যে জীবন পঞ্চাশ বৎসর পরেও সে ঠিক তেমন ভাবেই অচল হইয়া থাকে নাই, থাকা উচিতও হইত না। নূতন সমাজ-জীবনের প্রবাহ নূতন নূতন সত্যকে—নূতন নূতন সমাজাদর্শকে বহন করিয়া আনিয়াছে; সেই নূতন সত্যের বাণী বহন করিয়াই শরৎ-সাহিত্য একদিন রিয়াল্‌ হইয়া উঠিয়াছিল। জীবন-যাত্রার পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গেই আদর্শও বদলায়; সেই আদর্শের যে যুগোচিত পরিবর্তন তাহারই আমরা নাম দিয়াছি রিয়ালিষ্ট্‌ শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহের সুর।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজ-বিদ্রোহী; ইহাকে মিথ্যা ভাষণ না বলিলেও বলিব অসতর্ক ভাষণ। সমাজ-বিদ্রোহী শিল্পী কখনও রিয়ালিষ্ট্‌ হইতে পারেন না। বিদ্রোহ আসলে সমাজের সেই অংশটার বিরুদ্ধে, যে অংশ জীবনের পক্ষে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে অথচ জীবনকে তাহার কবলমুক্ত করিতে চাহিতেছে না। শরৎচন্দ্র সমাজকে যথার্থ কোন দিন ভাঙিতে চাহেন নাই; যে নূতন সত্যকে সমাজ-জীবন বহন করিয়া আনিয়াছে—যাহার সন্ধান তাঁহার সূক্ষ্ম তীব্র সংবেদনশীল হৃদয়ের কাছেই ধরা পড়িয়াছে, তখন পর্যন্ত জনসাধারণের নিকটে গ্রাহ্য হইবার মতন রূপ পরিগ্রহ করে নাই—সেই সত্যের উপরে সমাজ-জীবনকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। একটা বৃহৎ জাতির জীবনে প্রবাহের ঘূর্ণ্যাবর্তে কি সত্যের সঞ্চারণ হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন্‌ সত্যের

সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা প্রথমে আসিয়া সংবেদনের স্পন্দন তোলে যথার্থ শিল্পিচিত্তে। গণচেতনা হয়ত তখনও উদ্‌বুদ্ধ হয় না, জনগণ অস্পষ্ট অন্তর্বেদনাকে নিজেরাই ততক্ষণে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই অবস্থায় যখন ঘটে একজন যথার্থ শিল্পীর আবির্ভাব, তখন সেই আবির্ভাব স্বভাবতঃই বহন করে একটা বিদ্রোহের সুর। সেই বিদ্রোহের সুরের ভিতরেই আছে রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর পদধ্বনি।

হালে কিন্তু আবার শরৎচন্দ্রও ঠিক হালে পানি পাইতেছেন না। সমাজ-জীবনের আরও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রিয়ালিজ্‌ম্‌-ও একটু একটু করিয়া উবিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য হইয়া দেখা দিতেছে তাঁহার রোম্যান্স্‌-ধর্ম এবং আদর্শবাদিতা। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের লেখক-ধর্মের সহিত আমাদের মনোধর্মের যে সায়টা তাহাতেও ক্রমে ভাটা পড়িতেছে।

রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর যে ধর্মের কথা পূর্বে আলোচনা করিলাম, তাহাই একটি স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে আমাদের প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে। প্রগতিবাদী কথাটা অবশ্য আমাদের সাহিত্যে অতি শিথিল-প্রযুক্ত, সুতরাং শুধু 'দ্ব্যর্থক' নয়, 'বহ্বর্থক'। আমাদের দেশে কথাটার একটা মোটামুটি পারিভাষিক অর্থ আছে ; সেই পারিভাষিক অর্থে প্রগতি-সাহিত্য বা প্রগতি-শিল্প অর্থ গণ-সাহিত্য বা গণ-শিল্প। জানি, রেহাই পাইবার উপায় নাই, খরতর প্রশ্নবাণ উদ্যত হইয়া আছে। বাঙলা দেশে গণ-সাহিত্য কথাটার অর্থ কি? ইহা কি গণের জন্য রচিত সাহিত্য, না গণকর্তৃক রচিত সাহিত্য, না গণ-অবলম্বনে রচিত সাহিত্য? এ ক্ষেত্রে তর্কের অবকাশ প্রচুর ; কিন্তু সেই পথ অবলম্বন না করিয়া সহজ সিদ্ধান্তের পথ গ্রহণ করিতেছি। সহজ সিদ্ধান্ত মতে গণ-সাহিত্যের সংজ্ঞা আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই, এখানে সাহিত্যিক এবং সাধারণ শিল্পীর মনে জনগণের পরম কল্যাণের একটি জীবনাদর্শ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ; এই জীবনাদর্শে অটল বিশ্বাস লইয়া সাহিত্য এবং সাধারণ শিল্পের মারফতে জনগণকে এই জীবনাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করিবার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই গণ-সাহিত্যিক বা গণ-শিল্পী। এই আদর্শটিকে হয়ত একটু উগ্ররূপে দেখিতে পাইতেছি আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে, সেই জন্য আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, জিনিসটা আর কিছুই নয়, সাহিত্যের শাশ্বত ধর্মের উপরে একটা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক

উগ্রচেতনার প্রতিক্রিয়া। খাঁটি গণ-সাহিত্যিক বা গণ-শিল্পীর পক্ষে কিন্তু এই আদর্শ শুধু একটি রাজনৈতিক আদর্শ নয়—সমগ্র জীবনাদর্শ। সাহিত্য বা শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিছক রাজনৈতিক আদর্শ বলিয়া আজিকার দিনে কোন জিনিস হইতে পারে না; রাজনীতি সমগ্র জীবন-নীতিরই একটি বিশেষ দিক্ মাত্র।

কিন্তু আদর্শ যাহাই হোক, এ ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে বা শিল্পে খাঁটি উপাদানের অপ্রাচুর্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার কারণ এই, প্রগতিবাদী লেখক ও শিল্পি-গোষ্ঠীর ভিতরে যে পরম কল্যাণের আদর্শটি প্রচারিত আছে, একটা বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বানের মুখেই যেন আমরা তাহার অনেকখানি কুড়াইয়া পাইয়াছি; সেই বানের জল ঘাটের পুকুরে এবং চারিদিকের খানা-ডোবায় এখন পর্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। প্রগতি-বাদিগণের এই কল্যাণের পরমাদর্শটি হইল মুখ্যতঃ মার্ক্‌স্-প্রদর্শিত আদর্শ; পরে অবশ্য লেনিন্ এবং ষ্ট্যালিন্ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং আচরিত হইয়া তাহা ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। এই যে মার্ক্‌স্-পন্থা ইহাকে শুধু মাত্র একটি রাজ-নৈতিক পন্থা মনে করিলে ভুল হইবে; ইহা একটি বিশিষ্ট জীবন-পন্থা। কিন্তু আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই, রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহাকে হয়ত গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইহাকে গভীর করিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ঠিক গ্রহণ করিতে পারিয়াছি বলা যায় না, অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনের একটা ঝোঁক আসিয়াছে। এই যে রাজনৈতিক-বোধ এবং জীবন-বোধের বিরোধ তাহার ফল সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও বেশ সহজবোধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই সাহিত্য এবং শিল্পের আদর্শ সম্বন্ধে সভা-সমিতিতে আমরা গাল ভরিয়া যাহা বলি, সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাণ ভরিয়া তাহা করি না। 'অর্থাৎ করিয়া' বলিলে বলিতে হয়—আমরা নিজেরা হয়ত মার্ক্‌স্-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি, 'অন্তর্যামী'কে এখনও দীক্ষিত করিতে পারি নাই।

ফলে, এখন পর্যন্ত মার্ক্‌স্‌বাদে প্রতিষ্ঠিত রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্য বা শিল্প আমাদের দেশে খুব বেশী গড়িয়া ওঠে নাই। কিন্তু অল্প গড়িয়া উঠুক আর বেশী গড়িয়া উঠুক্, মার্ক্‌স্‌বাদে প্রতিষ্ঠিত রিয়ালিজ্‌ম্ কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই মতে সাহিত্য বা সাধারণ শিল্প সৃষ্ট হইবে জীবন

লইয়া; কোন ব্যক্তি-জীবন নহে,—সমাজ-জীবন লইয়া; কারণ ব্যক্তি-জীবনের সমাজ-নিরপেক্ষ কোন স্ব-তন্ত্র বা স্ব-ধর্ম নাই: উভয়ে জড়িত একান্ত অঙ্গাঙ্গিরূপে। এই সমাজ-জীবন লইয়া সাহিত্য রচনা করিতে হইলে প্রথমে বুঝিতে হইবে, চারি পাশের এই সমাজ জীবন কি ভাবে রচিত হইতেছে। শিল্পীর পক্ষে এই 'বোঝা' জিনিসটির অর্থ হইল সহজাত অসীম শ্রদ্ধা ও দরদের ভিতর দিয়া প্রবহমাণ সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে নিজের সূক্ষ্ম গভীর সংবেদনশীল চিত্তে অনুভব করা। এই সমাজ-জীবনকে নিরন্তর গড়িয়া-পিটিয়া একটি বিশেষ রূপ এবং ধর্ম দান করিতেছে কতগুলি অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই শক্তি সৃষ্ট হয় কতগুলি পারিপার্শ্বিক হেতু-প্রত্যয়ের সমাবেশে, মার্ক্‌স্-এর মতে ইহার ভিতরে মুখ্য হইল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতি। সাহিত্যিক এবং সাধারণ শিল্পীর কাজ শুধুমাত্র কল্পনা-বিলাস নহে; তাঁহাকে দরদ ও শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিতে এবং বুঝিতে হইবে. একটি সমাজ-জীবনের আবর্তের ভিতর প্রাচীন ধারার কি কি শক্তি কাজ করিতেছে, সেই প্রাচীন ধারার উপরে বিভিন্ন পরিবর্তমান পারিপার্শ্বিকতার সমাবেশে নিরন্তর কি নব নব শক্তির উৎসারণ হইতেছে, এবং ইতিহাস-উৎসারিত এই সকল শক্তির দুর্বার প্রবাহ সমাজ-জীবনকে কোন্ পরিণতির দিকে টানিয়া লইতেছে; আর এই সঙ্গেই মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বজীবনের এতদিনকার ইতিহাসের আবর্তন এবং তজ্জনিত সমাজ-বিবর্তন কোন্ মঙ্গলময় আদর্শের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। নব নব সৃষ্ট সমাজশক্তিগুলির ক্রিয়াভি-মুখিতাকে এই সর্বজনীন মঙ্গলের যে আদর্শ তাহারই দিকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া একাভিমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। এই কাজ সমাজের কোন বিশেষ স্তরের বা বিশেষ বিভাগীয় লোকের নয়; এই কাজ মাঠের চাষীর, কলের মজুরের, পদস্থ রাষ্ট্রসেবকের—যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গীনধারী প্রতিটি সৈন্যের এবং তাহারই সঙ্গে ঠিক সমভাবে লেখনীধারী প্রতিটি লেখকের—তূলিকাধারী প্রতিটি শিল্পীর। সুতরাং সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিজ্‌ম্-এর তাৎপর্য হইল, সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়মাণ সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির যথার্থ পরিচয় চিত্ত-সংবেদনের ভিতর দিয়া গ্রহণ করা এবং সমস্ত প্রতিভার প্রয়োগে তাহাদিগকে সর্বজনীন পরমাদর্শের অভিমুখ করিয়া তোলা। ইহাই চরম যুগানুবর্তিতা—ইহাই রিয়ালিজ্‌ম্-এর পরম আদর্শ।

এইখানেই একটি নূতন সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। দেখা যাইতেছে, একটা চরম 'অনুবর্তিতা'ই তাহা হইলে রিয়ালিজ্‌ম্-এর মূল কথা; আর প্রগতিবাদীদের মতে এই রিয়ালিজ্‌ম্-ই হইল সকল শিল্প এবং সাহিত্যের প্রাণ। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত সমাজ-জীবনপ্রবাহের একটা চরম অনুবর্তিতাই গিয়া দাঁড়ায় শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণবস্তুরূপে। কিন্তু এত দিন আমরা জানিতাম, মুক্তি—স্বাধীনতাই শিল্পের প্রাণ। আমরা জানিতাম, শিল্প ও সাহিত্য শিল্পী-লেখকের স্বচ্ছন্দ আনন্দ-লীলারই অবাধ রূপায়ণ, শিল্পের কারখানায় শিল্পী অসঙ্গ ও একক।

মার্ক্‌স-পন্থিগণের মতে শিল্পের ক্ষেত্রে এই অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের ধারণাটাই একান্ত স্ববিরোধী। এই স্ববিরোধের অর্থ এই নয় যে, এই স্ববিরোধের ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্রেই ইহা কোনদিন সম্ভব হইয়া উঠে নাই; ইতিহাসের ক্ষেত্রে এতদিন এই অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের সম্ভাবনা এবং সংঘটনাই বেশী দেখা গিয়াছে; কিন্তু যুগে যুগে তাহাকে আমরা যতই রঙীন জমকালো করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি, সেখানে যে শিল্পের আদর্শচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই জাতীয় সাহিত্য এবং শিল্প যতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহাকে নিপুণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, সেই সার্থকতার মূলে রহিয়াছে সাহিত্যিক বা শিল্পীর নিজের অজ্ঞাতেই সহজ শিল্পধর্মের প্রবর্তনাতেই যুগ-জীবনের প্রতি অনেকখানি অনুবর্তিতা; সেই কারণেই সে হইয়াছে সেই যুগের পক্ষে সহজ ও সানন্দগ্রাহ্য।

প্রগতিবাদিগণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই মুক্তি বা স্বাধীনতার পরিপন্থী নহেন; তাঁহাদের পরিপন্থিতা এই মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতে আমাদের শিল্পবোধ বা শিল্পশক্তিই একটা গূঢ় সামাজিক বোধ-প্রসূত। শিল্পের মূল কথা প্রকাশ। সমাজবোধ ব্যতীত কখনও প্রকাশের তাগিদ আসে না। আদিযুগ হইতে বিভিন্ন শিল্পের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলেই এই সত্যটি ধরা পড়িবে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়াটিই মূলে সমাজধর্ম-জাত। যেখানে আমরা একাকী সেইখানেই আমরা অসামাজিক; বহুর যোগে শিল্পজগতেই আমরা হইয়া উঠি যথার্থ সামাজিক। আজ আত্মপ্রকাশের সকল তাৎপর্যকে যেখানে আত্ম-রতির ভিতরেই আমরা নিবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছি সেখানে সে পরিচয় দিতেছে আমাদের বিকাশের নয়, বিকারের; কারণ এই আত্ম-রতির

বাসনা এবং তৎপ্রণোদিত অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের মহিমা-কীর্তন আমাদিগকে আমাদের মূল অর্থ—আমাদের সমাজ-সত্তা হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিতেছে। তাহা হইলে শিল্পের ক্ষেত্রে আসল মুক্তি কি? সমাজ-প্রবাহের অনুবর্তিতাই বন্ধন নয়, অন্ধ অনুবর্তিতাই হইল বন্ধন। যাঁহারা সমাজ-জীবনকে ঠিক জানেন না—তাহার গতি-প্রকৃতির সহিত যাঁহাদের কোনও পরিচয়ও নাই, অন্তরের যোগও নাই,—অথচ দুর্বার সমাজ-স্রোত অন্ধ নিয়তির মতন তাঁহাদিগকে সকল সচেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেগে টানিয়া লইতেছে—অসহায় ক্রীড়নকের মতন পরিবর্তনের প্রতিটি বাত্যাবিক্ষোভের দ্বারা দোলাইয়া মারিতেছে—শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁহারাই যথার্থ বদ্ধ—পরাধীন। মুক্তি সমাজ-জীবনের প্রতি সচেতন অনুবর্তিতাই। সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি-লীলার প্রতিটি স্পন্দনকে যে নিজের অন্তরে ধারণ করিতে পারিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অনুভব করিতে পারিয়াছে নিজের জীবন-ধারার সহিত সেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অখণ্ড যোগ—সে বুঝিতে পারিয়াছে এই ঘোলাটে জটিল প্রবাহের ভিতরে কোথায় তাহার স্থান—কি তাহার শক্তি—সেই শক্তি লইয়া কি তাহার করণীয়। সমস্ত জিনিস জানিয়া-বুঝিয়া স্বেচ্ছায়. সানন্দে শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়াই বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে যে যোগ তাহাই হইল শিল্পীর স্বচ্ছন্দ বিহার—ইহাই স্বাধীনতা—ইহাই মুক্তি। শিল্পীর সমগ্র জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় সত্য—ইহাই রিয়াল্—ইহারই অনুবর্তনায় রচিত যে শিল্প তাহাই বহন করে রিয়ালিজ্ম্।

রিয়ালিজ্ম্ কথাটিকে নানা দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। কিছু কিছু মতবাদকে অনেকে হয়ত নিছক 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া বর্জনের সদুপদেশ দিবেন। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রের সকল সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করিয়াও সকল আলোচনার ভিতরে একটা জিনিস প্রধান হইয়া উঠিতেছে, তাহা এই যে, রিয়ালিজ্ম্-এর গোড়ার কথা যুগ-সত্য। ইংরেজী 'রিয়াল্' কথাটার বাঙলা 'বাস্তব' অর্থ অতিমাত্রায় স্থূল, 'রিয়াল' কথাটার আসল অর্থ সত্য। যাহা সমগ্র যুগ-জীবনের সহিত গভীর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বৃহত্তর যুগ-মানসে 'সত্য' রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই রিয়াল্,—সে নিখুঁত বর্ণনাই হোক্—রঙীন কল্পনাই হোক্—বা গভীর আদর্শনিষ্ঠাই হোক্। পাশ্চাত্ত্য জগতে আজকাল এই অর্থে আর একটি কথার ব্যবহার দেখিতেছি, তাহা 'সিগ্‌নি-

ফিক্যাণ্ট্‌' (significant)। সব দিক হইতে যে শিল্প-রচনা যুগ-জীবনের পক্ষে সার্থক তাহাই রিয়ালিষ্টিক্‌। রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর তাই আমি অর্থ করিতে চাই—যুগ-সত্যবাদ।

কিন্তু এই 'যুগ-সত্যবাদ' কথাটা আসলে যাহাই হোক্‌ শুনিতে কেমন ছোট লাগে; সুতরাং কথাটায় হয়ত অনেকেরই মন উঠিবে না; সংশোধন প্রস্তাব আসিবে, 'রিয়ালিজ্‌ম্‌' 'যুগ-সত্যবাদ' নয়—ওটা 'জীবন-সত্যবাদ'। কথাটাকে আমি ঠিক ধরিতে পারি না। জীবন-সত্যবাদ কথাটাকে আমরা যদি ইহার অধুনা-প্রচলিত অর্থে—অর্থাৎ শিল্পীর দৃষ্টি জীবনের সকল আশপাশ হইতে সংহৃত হইয়া জীবনের অতিবাস্তব রূঢ় সমস্যাগুলির দিকেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে—এই সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিতে চাই তবে তাহার প্রতিষ্ঠা যে কি করিয়া যুগ-সত্যেরই উপরে, পূর্বে আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আর যদি কোনও বিশেষ অর্থে গ্রহণ না করিয়া কথাটিকে তাহার সাধারণ অর্থে গ্রহণ করি তবে আরও ধাঁধার ভিতরে পড়িয়া যাইতে হয়। জীবন সত্যেই তাঁহার শিল্পের প্রতিষ্ঠা, এ দাবী জানাইবেন সব শিল্পী—সব যুগেই। কাহার দাবী সত্য—কাহার দাবী মিথ্যা—কে বিচার করিবে? আমরা এ যুগের মানুষ যখন সে বিচার করিতে বসি তখন যুগের পক্ষপাতিত্ব লইয়াই ত' বিচার করিতে বসি! জীবনের সত্য কি তাহা কে বলিবে? তাহা একটি বিশেষ কালের শিল্পি-বিশেষের সৃষ্টিতেই আসিয়া ধরা পড়িয়াছে সে কথাই বা কি করিয়া গ্রহণ করিব? জীবন যে মহাকাল জুড়িয়া, আর এই মহাকালের ক্রমাবর্তনের মধ্যে জীবনের সত্য ত' শুধু পলে পলে 'হইয়া' উঠিতেছে। জীবনটা শুধু অনন্ত 'হওয়া'র পথে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর তাহার সত্যটা আসিয়া সমগ্রভাবে বিশেষ কোনও শিল্পীর ধ্যানে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এ কথাই বা কি করিয়া গ্রহণ করিব? মহাকালের খণ্ড খণ্ড অংশে জীবন-সত্যের তাই অনন্ত ক্রমাভিব্যক্তি। প্রতি যুগ বহন করিয়া আনে সত্যের এই ক্রমাভিব্যক্তিকে; যুগাবর্তে অভিব্যক্ত সেই সত্যটিকেই ত' আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে বড় করিয়া নাম দিতে গিয়া যে রিয়ালিজ্‌ম্‌কে জীবন-সত্যবাদ বলিয়া অভিহিত করি তাহা হয়ত যুগ-সত্যেরই মহিমান্বিত নাম-রূপ।

সাহিত্যে খুন

পূর্ণচন্দ্র বসু

(১)

সকলেই, বোধ হয়, জানেন, আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য। যাহার শ্রবণ এবং অধ্যয়ন পর্যন্তই শেষ হয়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য বলে, এবং যাহার সেই পর্যন্তই শেষ নহে, যাহাকে অভিনয়ে পরিণত এবং জীবনদান করিয়া কাব্যকল্পনাকে কার্যে এবং ব্যবহারে আবার প্রতিফলিত এবং দশজনের চক্ষুর সমক্ষে প্রদর্শিত করা হয়, তাহাকেই দৃশ্য কাব্য কহে। এজন্য দৃশ্য-কাব্যের অন্যতম নাম রূপক —যাহাতে কাব্যে রূপ আরোপিত করে, তাহাই রূপক। বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য ; যাহা দ্বারা মনের প্রীতি ও আনন্দ না জন্মে, তাহা রসই নহে। সহৃদয় জনগণের চিত্তে করুণাদি স্থায়ী ভাব, বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে, তাহাকেই রস বলে। কাব্যশরীরকে এরূপে গড়িতে হইবে, যদ্দ্বারা সহৃদয় লোকের চিত্তে আনন্দ জন্মিতে পারে, এবং সেই কাব্য অধীত বা অভিনীত হইলে কোন বিশেষপ্রকার ফলোদয় ঘটে। যদ্দ্বারা কোন বিশেষ প্রকার ফলোদয় না ঘটে, তাহা কাব্যই নহে। দণ্ডী কাব্য-শরীরের এইরূপ লক্ষণ দেন :—

শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।

যে পদাবলীর কোন বিশেষ ইষ্টার্থ আছে, তদ্দ্বারা কাব্যশরীর গঠিত হয়। ইষ্টার্থ কি ? না—

সহৃদয়বেদ্যোঽর্থঃ।

তবেই দেখা যাইতেছে, কাব্য প্রীতিপদ হওয়া চাই, এবং তদ্দ্বারা কোন ইষ্টার্থ-সাধন (desired effect) চাই। কাহাদের ইষ্টার্থ ?—সহৃদয় জন-গণের। যাঁহারা সুরুচিসম্পন্ন এবং কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ, এরূপ লোককেই

সহৃদয় বলা যাইতে পারে। শ্রব্য কাব্যই হউক, বা দৃশ্য কাব্যই হউক, সকল কাব্যই উক্তরূপ রসাত্মক হওয়া চাই। লোকের রুচি নানাবিধ হওয়াতে, শ্রব্য কাব্য নানা মূর্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রব্য কাব্য কেবল অধ্যয়ন বা শ্রবণ মাত্রেই শেষ হয় বলিয়া, তাহাতে সুরুচিকে বজায় রাখিয়া যতদূর স্বাধীনতা চলে, দৃশ্য কাব্যে ততদূর চলে না, যেহেতু দৃশ্য কাব্যকে আবার অভিনয়ে জীবিতমূর্তিতে দেখাইতে হইবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্য-বিপ্লব, মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি প্রভৃতি শ্রব্য কাব্যে চলিতে পারে, কিন্তু দৃশ্য কাব্যে তাহা মূর্তিমান করিয়া অভিনয়ে দেখাইতে হইলে, তাহা সহৃদয় জনগণের প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে। এজন্য দৃশ্য কাব্যের নিয়মাদি অনেক পরিমাণে আরও বিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

কেবলমাত্র পড়িয়া যাহাতে আনন্দলাভ করা যায়, বাস্তবিক কার্যক্ষেত্রে অভিনয় দ্বারা তাহাকে মূর্তিমান করিলে হয়ত তদ্দ্বারা ততদূর আনন্দ না জন্মিতে পারে। যাহাতে সেই আনন্দের ব্যাঘাত হয়, নাট্যকারগণ তাহা অতি সাবধানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, যাহা সহৃদয় জনগণের রুচির প্রতিবিরোধী হয়, যাহা বাহ্যদৃশ্যে ও ব্যবহারে লজ্জাকর, এমন সকল অনুষ্ঠান কাজেই দৃশ্য কাব্যে সংযোজিত হইতে পারে না। এজন্য 'সাহিত্যদর্পণ'কার বলিতেছেন :—

দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতিস্তথা॥
দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্ ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্॥
স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জিতো নাতিবিস্তরঃ।

নাটকে কি কি পরিবর্জনীয়, আলঙ্কারিক তাহা বলিতেছেন—দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্যদেশাদিবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপ, উপসর্গ, মৃত্যু, রতি, দন্তচ্ছেদ এবং নখচ্ছেদ প্রভৃতি ব্রীড়াকর ব্যাপার, শয়ন এবং অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ এবং স্নান ও শরীরে অনুলেপন।

তবেই দেখা যাইতেছে, আমাদের আলঙ্কারিকেরা নাটকে হত্যা ব্যাপার নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। কারণ, বাস্তবিক কার্যক্ষেত্রে হত্যা ব্যাপারে লোকের প্রীতি উৎপাদন করা দূরে থাক, তদ্দ্বারা সহৃদয় জনগণের মনে অত্যন্ত ঘৃণার উৎপাদন হয়, এবং সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে। হত্যাকাণ্ড কার্যক্ষেত্রে

দেখিতে কাহারও ভাল লাগে না। সময়ে সময়ে তদ্দ্বারা অসহ্য ক্রোধ-সঞ্চারেরও সম্ভাবনা। সেরূপ ক্রোধোদ্রেক্ হইলে লোকে এতদূর উত্তেজিত হইতে পারে যে, রঙ্গভূমে হয়ত সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ সেই অভিনীত হত্যাকাণ্ডের উপর আর একটা হত্যাকাণ্ড বাধাইতে পারেন। রক্তমাংসশরীরে এরূপ একটি হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া স্থিরভাবে বসিয়া কে সহ্য করিতে পারে?—

Desdemona. O, banish me, my lord, but kill me not.
Othello. Down, strumpet!
Des. Kill me to-morrow, let me live to night.
Oth. Nay, if you strive, –
Des. But half an hour,
Oth. Being done,
There is no pause.
Des. But while I say one prayer.
Oth It is too late.

(He smothers her)

এ দৃশ্য কখন ঘটিতেছে, যখন সমস্ত শ্রোতৃবর্গ বিলক্ষণ জানিয়াছেন ডেসডিমোনার কোন দোষ নাই। সেই নিরপরাধা, সরলা, বিশুদ্ধপ্রেমপ্রাণা, পতিপরায়ণা কেবল মূর্খ ও নির্বোধ পতির সন্দেহাগ্নিতে পতিতা হইয়াছেন। পতি সেই সন্দেহাগ্নিতে কোপান্বিত হইয়া অনর্থক সেই সরলাকে হত্যা করিতেছেন। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি স্বচক্ষে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহারও কি কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না? তিনিও কি রঙ্গভূমিতে দৌড়াইয়া গিয়া, ওথেলোকে নিরতিশয় প্রহার দিয়া গায়ের রাগ মিটাইতে যাইবেন না? তাহা হইলেই রঙ্গভূমিতে আর এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হয়। একজন প্রতারিত বুদ্ধিহীন মূরের মত লোকের প্রতি কিছু এত সহানুভূতি জন্মিতে পারে না যে, নিতান্ত নিরপরাধা স্ত্রীর হত্যা তাহার সহ্য হইবে। কোন ঘোর মহাপাতকীর খুন হইলে তবু লোক বলিতে পারে—কি হইবে? রাগের মাথায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি স্ত্রী-হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পাপীয়সী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। গোঁয়ার লোকের প্রতি কাহার দয়ার সঞ্চার হইতে পারে? হিন্দুর চক্ষে যে আদর্শ রহিয়াছে, প্রকৃত সহৃদয় হিন্দুর যাহা রুচি হওয়া উচিত, হিন্দু সমাজের এবং হিন্দু ধর্মের যাহা বিধান, স্ত্রীহত্যা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। আবার সেই স্ত্রীকে যখন নিরপরাধা

বলিয়া বিলক্ষণ জানা যাইতেছে, তখন তাহার হত্যা কোন্ হিন্দু পড়িতে বা দেখিতে পারেন? দেখিলে সহ্য করিতে পারেন? সেরূপ স্ত্রীহত্যা দেখাতে কি মনের মলিনতা জন্মে না, অন্তরে পাপস্পর্শ হয় না? সুতরাং তাহা দেখিতেও পাতক আছে।

প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে এই স্ত্রীহত্যার অভিনয় প্রদর্শন করা হিন্দু ধর্মাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। রঙ্গভূমিতেই তদ্দ্বারা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। পাছে রঙ্গভূমিতে এইরূপ অনর্থ ঘটে, পাছে হত্যাদর্শনের পাপ লোকের কল্পনাকে মলিন করে, তাই আমাদের নাট্যকারগণ কোনখানে এরূপ হত্যা-ব্যাপার প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের নবনাটকে এরূপ একটিও দৃশ্য নাই। বাস্তবিক যাহা ইউরোপে tragedy বলিয়া বিখ্যাত, আমাদের দেশে দশরূপক মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে না। কারণ তাহা হিন্দু ধর্মাদর্শের বিপরীত হওয়াতে নাটকীয় নিয়ম ও আদর্শেরও বিপরীত হইয়াছে। সেই ট্র্যাজিডি এ দেশে আসিয়া কি অনর্থই না ঘটিয়াছে।

আমাদের দেশে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে যেরূপ উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায়, তাহা হিন্দু ধর্মের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। হিন্দুর রুচি এবং হিন্দুর হৃদয়ের সহিত তাহা মেলে। ইউরোপ সে আদর্শ কোথায় পাইবে? আমরা 'সাহিত্য-দর্পণ' হইতে নাটকের যে নিষেধবিধি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আমাদের নাটকীয় আদর্শ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইউরোপে নাটকীয় আদর্শ গ্রীস হইতে প্রথমে গৃহীত হয়। তৎপরে তাহার বিবিধ ব্যতিক্রম করা হয়। নানা ইউরোপীয় জাতির রুচি অনুসারে এই সকল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু কি গ্রীক জাতি, কি অপরাপর ইউরোপীয় জাতি, কোন জাতিরই ধর্মাদর্শ হিন্দুর মত নহে, সুতরাং তাহাদের রুচিরও বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল। এজন্য ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্য কোন কালে হিন্দু নাট্যসাহিত্যের আদর্শে উঠিতে পারে নাই। ইউরোপীয় জাতিসমূহ যেরূপ রুধিরপ্রিয়, যেরূপ কঠিনস্বভাব, তাহাদের নাটকীয় আদর্শে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। স্পার্টার নিয়মাদি কিরূপ নিষ্ঠুর ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই বিদিত আছে। এথিনিয়রা দেশের অনেক বড় বড় ভদ্র ও দেশহিতৈষী লোককে নির্দয়রূপে নিপীড়ন করিয়াছিলেন। ধর্মাত্মা সক্রেটিসকে তাঁহারা এক রকম বিষপানে বধ করিয়াছিলেন। বিষপান করিয়া সক্রেটিস আপনার ধর্মানুরাগ

ও তেজ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই মহাজনের বিষপান তাহারা স্বচ্ছন্দে দেখিয়াছিল। ক্ষমা বুঝি তাহারা জানিত না। দেশের বিধানশাস্ত্র তাহাদিগকে অতি নির্দয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই নির্মম ও নির্দয় দেশ হইতে ট্র্যাজিডির উদ্ভব। সে ট্র্যাজিডি যে রক্তারক্তি ও নির্দয় ব্যবহারে পর্যবসিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

আর যাঁহারা এই ট্র্যাজিডি গ্রীক সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অপরাপর ইউরোপীয় জাতিগণ কিরূপ ছিলেন? আমি বার বৎসর পূর্বে "আর্যদর্শনে" যাহা লিখিয়াছিলাম, আজি তাহা আর একবার আবৃত্তি করি :—

"অতি প্রাচীন কালে সেই যে ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্বর জাতিসমূহ অত্যন্ত নির্দয়-স্বভাব ছিল, আজিও যেন তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত আধুনিক জাতিমধ্যেও প্রবাহিত হইতেছে। পূর্বে ইউরোপীয়গণ নৃশংসাচরণে যেরূপ আমোদ-প্রমোদ প্রাপ্ত হইত, সে আমোদ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। স্পার্টানগণের নৃশংসাচরণ, রোমানদিগের গ্লাডিয়েটারের ক্রীড়া আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। মধ্যযুগের ইতিহাস নররুধিরে কি ভয়ঙ্কর-রূপে প্লাবিত রহিয়াছে। ক্রুসেডের রক্তপাত, ইনকুইজিসনের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিবরণ পড়িলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। আবার দেখ, ইহুদী জাতির প্রতি উৎপীড়ন, উইচ্‌ক্রাফ্‌টের শাস্তির বিবরণে যে প্রকার নৃশংসাচরণের পরিচয় হয়, কোন্ জাতির ইতিবৃত্তে তত ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত আছে? আবার ঐ দিক? আয়ার্লণ্ডের ঘোর ইতিবৃত্ত—ইংরাজগণ ও স্কটগণের ঘোর হত্যাকাণ্ড, ফ্রান্সের প্রটেস্‌ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকগণের হত্যাকাণ্ড। এ সমস্ত পড়িলে আর কি ইউরোপীয়গণকে সভ্যজাতি বলা যায়? স্পেন আমেরিকা-জয়ের সঙ্গে কি অধমতম বর্বরতারই পরিচয় না দিয়াছে? ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখ, তাহাদিগের পূর্ব-কালের দণ্ডবিধান কেমন রুধিরের লোহিত বর্ণে অঙ্কিত ছিল! এই সমস্ত ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে বোধ হইতে থাকে যেন, ইউরোপীয়গণের প্রকৃতিই কেমন নৃশংস উপকরণে গঠিত। তাহা কিছুতেই নরম করিতে পারে নাই। খৃষ্টান ধর্ম যে এত উন্নত বলিয়া গর্ব করা হয়, তাহাও ইউরোপে ব্যর্থ হইয়াছে, ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের নৃশংসতার অপনয়ন করিতে পারে নাই।" কারণ :—

What is bred in the bone, cannot come out of the flesh.

"ইউরোপীয় জাতির উল্লিখিত প্রকৃতিমূলক দোষ শুদ্ধ যে তাহাদিগের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে, এমত নহে, তাহাদিগের সেই বর্বর স্বভাব তদীয় সাহিত্যের এক প্রধান ভাগকেও দূষিত করিয়াছে। তাহাদিগের নাট্য-রচনায় তাহা ট্র্যাজিডির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ট্র্যাজিডি শুদ্ধ ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্পত্তি। তাহা সেই সাহিত্যের গৌরব কি না তাহা বিচার্য বিষয়।"

বর্বরস্বভাব এবং রক্তপ্রিয় অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণ গ্রীক ট্র্যাজিডিকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও রুচি ট্র্যাজিডির বিষম পরিণামে আনন্দলাভ করিত। তাই ইংরাজী সাহিত্যেও এই ট্র্যাজিডি অনায়াসে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেক্সপিয়ারের অতুল্য প্রতিভা ট্র্যাজিডির আনন্দে মাতিয়াছিল। তাঁহার রুচি এমন পরিশুদ্ধ হয় নাই যে, সেই ট্র্যাজিডির দোষ দর্শন করিয়া তাহা পরিবর্জন করে। তিনি তাঁহার সমস্ত গুণপনা ও কবিত্বশক্তি সেই ট্র্যাজিডির মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সুতরাং জগতের এক অতুল্য পদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে সেক্সপিয়ারের প্রতিভা-সম্পন্ন কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষপান করিতেছে। আজিও আমরাও সেক্সপীয়ারের পাঠক, পাঠক কি! তাঁহাকে পূজা করিতেছি; কালিদাস যে সাহিত্যের সিংহাসনে বসিয়া তাহা শত শোভায় শোভিত করিয়াছেন, এবং শত মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সে সাহিত্যে আজি আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ব্যাস, বাল্মীকি অন্ধকারে বসিয়া কাঁদিতেছেন। ভবভূতির অলোক-সাধারণ "উত্তরচরিত" অবজ্ঞাত হইয়াছে।

এই ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে আমি বার বৎসর পূর্বে "আর্যদর্শনে" যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"প্রাচীন আর্যসাহিত্যে যদিও ইউরোপীয় বিয়োগান্ত রীতি অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিয়োগান্ত রীতির যাহা প্রধান গুণ, তাহা আর্যসাহিত্যে ছিল। যে করুণ রস বিয়োগান্ত রীতির প্রধান গুণ, তাহা আর্যসাহিত্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সেক্সপীয়ারের ডেসডিমোনার জন্য যেরূপ সন্তপ্ত হই, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, সাগরিকা, মালবিকা, মহাশ্বেতা, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি কবিকল্পিত নায়িকার জন্য কি তদপেক্ষা অনধিক পরিমাণে সন্তপ্ত হইয়া

থাকি ? অথচ তাঁহারা কেহই ডেস্‌ডিমোনার ন্যায় নৃশংসরূপে নিহত হয়েন নাই। বাল্মীকি মহাকবির ন্যায় কেমন কাল্পনিক সুন্দর দৃশ্যে সীতাকে আপন কাব্য হইতে অপসারিত করিয়াছেন। সরলা, নিষ্পাপিনী ডেস্‌ডিমোনা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইলেন ; সীতা কবি-কল্পিত স্বর্ণরথে দেবতাগণের পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দধ্বনি সহকারে স্বর্গারোহণ করিলেন। কিন্তু জন্মদুঃখিনী সীতার দুঃখ ও ক্লেশ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য মানব হৃদয়ের সহানুভূতি-মন্দিরে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে।”

“সীতার দুঃখে কাতর হইয়া আমরা বাল্মীকির সহিত প্রতি ঘটনায়, প্রতি পত্রে কাঁদি, কাঁদিয়া হৃদয়-কাতরতায় তাঁহাকে পবিত্র জ্ঞান করি, তাঁহার হৃদয়মাধুরী শনৈঃ শনৈঃ আমাদের হৃদয়ে জাগিতে থাকে, সীতার সকল গুণের পক্ষপাতী হই ; সরমার সহিত অশোকবনে তাঁহার জন্য কাঁদিতে থাকি। বনবাসে লক্ষ্মণের সহিত অশ্রুপাতে ভাসাইয়া দিই। সীতা আমাদের মনোমন্দিরে অতি পবিত্র মূর্তিতে চিরদিনের জন্য স্থাপিত হয়েন। সীতা ভারতবাসিগণের হৃদয় বিগলিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবাসিগণ সীতার জন্য চিরকালই অশ্রুবর্ষণ করিবেন।”

ভবভূতি বা বাল্মীকির সহিত এখানে সেক্সপিয়ারের তুলনা হইতেছে না। আমরা জানি, সেক্সপিয়ারের অনেক গুণ আছে, সে জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্যপাত্র। তিনিও একজন মহাকবি। কিন্তু এখানে tragic রসের বিচার হইতেছে ; সন্তাপের স্থায়ী ফলের কথা হইতেছে। এ প্রস্তাব কবিত্বের বিচার নহে। তাহা স্বতন্ত্র কথা। সীতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, দময়ন্তী সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। চিরদুঃখে তাঁহাদের পতিভক্তি পবিত্র হইয়া গিয়াছে। চিরদুঃখিনী হইয়া তাঁহারা জগজ্জনের হৃদয়মন্দির চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া আছেন। নিহত না হইয়াও তাঁহাদের বিয়োগ জগতের নিকট চিরসন্তাপের কারণ হইয়াছে। সকলেই তাঁহাদের জন্য কাতর। তবে ত হত্যা ব্যতীতও সন্তাপ সমান স্থায়ী হইতে পারে !

সে যাহা হউক, অনেকে হয়তো বলিবেন, ডেস্‌ডিমোনার জন্য কি আমাদের হৃদয় কাঁদে না ? হৃদয় কাঁদে বটে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড দ্বারা নিহত হইলে যে অশ্রুপাত হয়, তাহার সহিত সীতার মত বিয়োগ হেতু অশ্রুপাতের একটু স্বতন্ত্রতা আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

(২)

সেক্সপিয়ারে আমরা আইমজিন্ এবং ডেস্‌ডিমোনার মত পতিপরায়ণতা ও প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাই। ডেস্‌ডিমোনার প্রেম জুলিয়েটের মত 'বুকচাপড়ানি' প্রেম নহে। তাহা অতি গভীর, অতি শান্ত ও হৃদয়ব্যাপী, অথচ তেমনই উগ্র, উষ্ণ ও প্রবল। সে প্রেম চক্ষের নেশা নহে। সেই প্রেমভূষিতা ডেস্‌ডিমোনা সর্বজনমনোহরা, তাঁহার হৃদয়মাধুরীতে তিনি সকলের মন হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চিত্র আঁকিয়াই সেক্সপিয়ার মূরের চরিত্র ফুটাইতে ফুটাইতে ডেস্‌ডিমোনার খুনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তারপর পাঠক 'ডেস্‌ডিমোনা'র খুনের নিমিত্ত ষড়যন্ত্রে ও ঘোর হত্যাব্যাপারে নিমগ্ন হইলেন। ডেস্‌ডিমোনা নিদয়রূপে নিহত হইলেন। ডেস্‌ডিমোনার সৃষ্টি কি কেবল এইরূপ ঘোর হত্যা-ব্যাপারের নিমিত্ত? তাঁহার হত্যা-ব্যাপার দেখিয়া কি অশ্রুপাত হয়? না শরীর শিহরিয়া উঠে? ডেস্‌ডিমোনার পর এমেলিয়া নিহিত হইল। মনে হয়, সেই ছুরিকাঘাতে যেন নিজ বক্ষ বিঁধিল। কি ভয়ানক!

ম্যাকবেথ আরও ঘৃণিত ব্যাপার! ম্যাকবেথের সর্বত্র হত্যা;—তাহার গোড়ায় হত্যা, তাহার মধ্যে হত্যা, তাহার শেষে হত্যা। প্রথমে ডানক্যান মধ্যে ব্যাঙ্কো, শেষে নিজে ম্যাকবেথের হত্যা, নাটকের প্রায় সমুদায়ই কসাই-খানা, মধ্যে যখন লেডি ম্যাকবেথ উদয় হইয়া বলিতেছেন, আমার রক্তহস্ত যে কিছুতেই ক্ষালিত হইতেছে না, তখন যেন সেই কসাইখানা আরও দেদীপ্যমান হইতে থাকে। তাঁহার সামান্য অনুতাপের চিত্র সেই রক্ত-গঙ্গাকে আরও উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দেয়। প্রকাণ্ড গৃহদাহে দু' ফোঁটা জলের মত সেই অনুতাপ অগ্নিশিখাকে আরও যেন প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। সে অনুতাপ বিষকুম্ভে ক্ষীর মাত্র। সেরূপ সামান্য অনুতাপচিত্রে কি ভয়ানক হত্যা-ব্যাপার থাকে? নাটক-মধ্যে কোন্ চিত্রের গৌরব অধিক? সমস্ত হত্যা-কাণ্ডের না সেই অনুতাপচিত্রের? হত্যা, নাটকের সর্বত্র; অনুতাপ এক স্থানে মাত্র। সে অনুতাপচিত্র রক্ত-গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাহা ঘোর হত্যাপূর্ণ নাটকের প্রলোভনস্বরূপ।

সেক্সপিয়ারের সমস্ত বড় বড় নাটকে এই বীভৎস ব্যাপার। হ্যামলেটের শেষ অঙ্কও কসাইখানা। রিচার্ড দি সেকেণ্ড এবং থার্ড, জন, লিয়ার, কোরাইওলেনস প্রভৃতি সকল নাটকই হত্যাকাণ্ডে পরিপূর্ণ। জুলিয়স সিজারে

কি ভয়ানক রবে এই কথাগুলি প্রতিশব্দিত হয়—Beware the Ides of March! সিজরের হত্যার পর এই শব্দগুলি মনে হইলেই হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। কোথায় নাটকীয় করুণ রস! আজিও আমরা ম্যাকবেথের নাম করিলে শিহরিয়া উঠি, রিচার্ড দি থার্ডের ঘৃণিত ব্যাপার হইতে শত হস্ত দূরে যাই! নাটক পড়া দূরে থাক, মনে হয় আর tragedy পড়িব না।

সেক্সপিয়ার কি শুদ্ধ তাঁহার ট্র্যাজিডিতেই শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়াছেন? লিখিতেছেন comedy, সেখানেও সেই ছুরিকা। Merchant of Venice পাঠ কর, সেখানেও তোমার চক্ষু সমক্ষে ছুরিকা শাণিত হইতেছে। নাটককে কসাইখানায় পরিণত করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ এবং অতি ঘৃণিত ব্যাপার। এই দেখুন সুরুচিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক Addison কি বলিতেছেন:—

"But among all our methods of moving pity or terror there is none so absurd and barbarous, and which more exposes us to the contempt and ridicule of our neighbours, than that dreadful butchering of one another, which is so very frequent upon the English stage. To delight in seeing men stabbed, poisoned, racked, or impaled, is certainly the sign of a cruel temper; and as this is often practised before the British audience, several French critics, who think these are graceful spectacles to us, take occasion from them to represent us as a people that delight in blood. It is indeed, very odd to see our stage strewed with carcases in the last scenes of a tragedy, and to see in the wardrobe of the play-house several daggers, poniards, wheels, bowls for poison and many of the instruments of death."

এডিসন্ রঙ্গভূমিতে রক্তারক্তি করাকে যেরূপ জঘন্য ও বর্বরতার পরিচায়ক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হত্যা ও খুন কখন মানুষের আনন্দজনক হয় না। নাটক নবরসের আশ্রয়ভূমি। Tragedy করুণ ও ভয়ানক রসের আশ্রয়। হত্যা বা খুন কখন ভয়ানকের চরম সীমা নহে। রসের পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইলে তাহাকে আনন্দজনক করা চাই। যাহা আনন্দজনক না হয়, তাহা রসের পরিচায়ক নহে। কিন্তু শাণিত ছুরিকা বসাইয়া হত্যা করাতে কি আনন্দানুভব হয়, না ঘৃণার সঞ্চার হয়? হত্যাকাণ্ড দ্বারা

আমরা ভয়ানকের নিশ্চয় রসভঙ্গ সাধন করি। নাটককে কসাইখানায় পরিণত করাতে রসের পরিপাক হয় না; তাহা কবিত্বের হানিজনক এবং রসভঙ্গদোষে দুষ্ট হয়। Butchery is not poetry.

আমরা একথা বলাতে, সেক্সপিয়ারের সকল ট্র্যাজিডিতে যে একেবারেই কবিত্ব নাই, এমন কথা বলিতে চাই না। আমরা সাহিত্যে শুদ্ধ খুনেরই নিন্দা করিতেছি। খুন না করিলে কি করুণ রসের পরিপুষ্টিসাধন করা যায় না? যিনি না করিতে পারেন, তিনি বিভাবাদি দ্বারা রসের পরিপাক-সাধনে নিতান্ত অসমর্থ। তাঁহার সে রস গ্রহণ করাই অন্যায়। খুনের প্রতি মানুষের স্বভাবতই ঘৃণা। খুনের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবার জন্য নাট্য-সাহিত্যের সাহায্য আবশ্যক হয় না। যে কার্য হইতে ভদ্রসমাজ স্বতঃই নিবৃত্ত, সাহিত্যে তাহার উজ্জ্বল চিত্র ধরাতে বরং বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা। একটা সমগ্র রাজবংশ-মধ্যে কয়টা হত্যাকাণ্ড ঘটে? আমি যুদ্ধের কথা বলিতেছি না। রাজ্যলোভে আরঙ্গজীবের হত্যাকাণ্ডের মত হত্যার কথা বলিতেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে ওথেলোর ন্যায় কয়জন লোক দেখা যায়? বাস্তবিক সেক্সপিয়ার ওথেলোকে যেরূপ অতিরঞ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ওথেলোও যেন কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। লোক ততদূর নির্বোধ হয় কি না সন্দেহ,—বিশেষতঃ ওথেলোর মত একজন বীর সেনাপতি। সেক্সপিয়ারের কিং জনে যে স্থলে হিউবার্ট উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা আর্থারের চক্ষু উৎপাটন করিতে আসিয়াছে এবং সেই কার্যের উদ্যোগ হইতেছে, সে স্থলের অভিনয় কতই না ঘৃণার উৎপাদন করে! রক্ষা এই, শেষে সে কার্য ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু দেখা গেল, নৃশংস জনের (John) পীড়নের জ্বালায় সেই রাজপুত্র কারাবাসের উচ্চপ্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া মরিল। তাহার আত্মহত্যা কাহার না হৃদয়ে অনর্থক বেদনার উৎপাদন করে? এরূপ বীভৎস চিত্রের ফল কি? রাজ্যলোভের ঘৃণিত পাপচিত্র দেখাইবার জন্য কি এ চিত্রের অবতারণা? কয়জন রাজাই বা সেরূপ ঘৃণিত হইতে পারেন? হইলেই বা কিসে সে লোভ হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে? তবে সে চিত্র সাধারণ লোকের সম্মুখে কেন? নাটক কিছু ইতিহাস নহে। ইতিহাসের সম্পত্তি ইতিহাসে রাখিয়া দিলেই ভাল ছিল। সেক্সপিয়ার যেখানে butchery না করিয়া ট্র্যাজিডি রচনা করিয়াছেন, আমরা সে রচনার

যারপরনাই প্রশংসা করিয়া থাকি। তাঁহার অনেক tragi-comedy এই ধাতুতে গঠিত। সেরূপ রচনাকে আমি ট্র্যাজিডি-শ্রেণীভুক্ত করিতে কুন্ঠিত নহি। আইমজিম তত কষ্ট সহ্য করেন নাই যে, তিনি চিরদুঃখিনী দময়ন্তী বা সীতার মত জগতের সন্তাপভাজন হইতে পারেন। সিম্বেলিন বিয়োগান্ত হইলে যদি আইমজিনের সহিত লিয়নিটসের মিলন না ঘটিত, তাহা হইলে আইমজিনেতে লোক অধিকতর কাতর হইত। সীতার সহিত শেষে শ্রীরামের মিলন না হওয়াতে তাঁহার বিয়োগ-ব্যাপার এবং বনবাস অধিকতর কাতরতার কারণ হইয়াছে। সীতা জনকালয়ে প্রেরিত হইলে এ কাতরতা ঘটিত না। সীতার বনবাস কাব্যের করুণরসকে চরম সীমায় লইয়া গিয়াছে। বিয়োগান্ত 'উত্তর-চরিত'-এর স্থায়ী ফল এজন্য এত অধিক। ভবভূতির "ছায়াতে" সে ফল অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। বিয়োগে কাতরতা উৎপাদন করে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডে বীভৎস রসের সঞ্চার হইয়া রসভঙ্গ ঘটে। ডেস্‌ডিমোনাকে মনে হইলেই তাঁহার খুন মনে হয়, অমনি হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। সুতরাং রসভঙ্গ ঘটে।

(৩)

Horace বলেন, রঙ্গভূমে প্রকাশ্যরূপে খুন করাতেই দোষ, খুন যদি প্রকাশ্য রঙ্গভূমে কৃত না হয়, তাহাতে দোষ নাই। এ কথা কোন কাজেরই নহে। খুনের নাম শুনিলেই লোক শিহরিয়া উঠে। কলিকাতায় যে সকল খুন হয়, লোকে তাহা কি প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকে? না দেখিলেও হত্যাকাণ্ড শুনিলেই মনে মনে তাহার চিত্র অঙ্কিত হয়, কল্পনা রক্তারক্তি মনে চিত্রিত করিয়া দেয়! শিশুহত্যা, নারীহত্যা, স্বামিহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যার নাম শুনিলেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। লোক স্বচক্ষে যেন সেই হত্যাকাণ্ড জাজ্বল্যমান দেখিতে থাকে। সুতরাং নাটকের মধ্যে হত্যাকাণ্ড আনিলেই তাহাতে রসভঙ্গ ঘটে, এবং প্রকাশ্যরূপে সেই খুন দেখান বা না দেখান, উভয়ই সমান কুফল প্রসব করিয়া থাকে। গ্রীক ট্র্যাজিডি এই ঘোর হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত ছিল বলিয়াই যে সে দোষ গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইউরোপে নাট্যকারগণ তাহা গ্রহণ করিয়া কুরুচিরই পরিচয় দিয়াছেন; তাই বলিয়া আমরাও কি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের হিন্দু নামে ও আর্যগৌরবে জলাঞ্জলি দিব? ইংরাজীর অনুকরণ করিতে গিয়া

তাহার দোষ গ্রহণে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি চাহিয়া দেখ, সে সাহিত্য সে দোষে কলঙ্কিত নহে। স্বদেশীয় রত্নরাজি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় বর্বরতার একশেষ রক্তারক্তিতে হাত কলুষিত করি কেন?

সেক্সপিয়ার এদেশে সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বসাধারণগ্রাহ্য বলিয়া, আমি তাঁহারই দৃষ্টান্ত দিয়া এ প্রস্তাব লিখিয়াছি। সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সমস্ত যত লোকে পড়িয়াছে, তত অন্যান্য ইংরাজী নাটক নিশ্চয় পড়ে নাই। এমন কি, সেক্সপিয়ার আমাদের কলেজের ছাত্রগণ পর্যন্ত পড়িয়া থাকেন। অতি তরুণ বয়স হইতেই আমাদের রুচি কলুষিত হইতে থাকে।

এই কুরুচিতে আমরা এত দূর পরিবর্ধিত হইয়াছি যে, এখন আমরা ইংরাজী সাহিত্যের কোনরূপ নিন্দা সহিতে পারি না। যাহা বাস্তবিক নিন্দার্হ তাহারও নিন্দা করিলে শরীর জ্বলিয়া উঠে। আমরা সেই সাহিত্যের এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছি যে, তাহার নিন্দা শুনিলে দেশীয় সংস্কৃত সাহিত্যের তদ্রূপ দোষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে যাই। কিন্তু একজনের দোষ ও পাপ যে অন্যের দোষ ও পাপ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না, তাহা স্মরণ করি না। তথাপি কেমন পক্ষপাত, সংস্কৃত সাহিত্যের দোষ উল্লেখ করিয়া ইংরেজী সাহিত্যের দোষ ঢাকিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ জ্ঞান করি। Merchant of Venice নামক নাটকে যেরূপ ছুরিকা শাণিত হইয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করাতে কোন লোক বলিয়া উঠিয়াছিলেন, তোমাদের সীতার অগ্নিপরীক্ষা কি? আমি উত্তর করিয়াছিলাম, তাহা পরীক্ষামাত্র, তাহাতে সীতা পুড়িয়া মরেন নাই; যদি সংস্কৃত কোন নাটকে অগ্নি দ্বারা নায়ক-নায়িকার হত্যা-ব্যাপার সাধিত হইত, তাহা হইলে অগ্নি-পরীক্ষার ব্যাপারে ভয় পাইবার সম্ভাবনা ঘটিত এবং সদৃশ কাণ্ড বলিয়া উল্লেখযোগ্য হইতে পারিত। কিন্তু যখন অগ্নিদাহ ব্যাপার সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় না, তখন অগ্নিপরীক্ষা ও ছুরিকা শাণিত করা, সমান বা সদৃশ ব্যাপার নহে। জতুগৃহদাহ একটি প্রহসন মাত্র; রাজ্য স্থাপন ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য খাণ্ডবদাহ; নাটক নহে, কাব্যে তাহাদের স্থান। রামায়ণে যেমন অনেক অদ্ভুত কাণ্ড আছে, অগ্নিপরীক্ষা তন্মধ্যে অন্যতম।

ইংরাজী সাহিত্যের খুন সমর্থনার্থ অনেকে বলেন, তাহা স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু সীতার স্বর্গারোহণ অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক। ট্র্যাজিডির

ঘোর হত্যাকাণ্ড চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া চুপ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকা কিরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার, বলিতে পারি না। পাপমাত্রই মানুষের স্বাভাবিক ব্যাপার বটে, কিন্তু এ কাণ্ড যে পাপের চূড়ান্ত! হত্যার মত জঘন্য ও সর্বজনঘৃণিত পাপ কি আর আছে? এই স্বাভাবিক ব্যাপার কবি নাটক-মধ্যে আনেন কেন? তাহা নাটকীয় কৌশলমাত্র। যখন সীতা স্বর্গারোহণ করিলেন বা পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন, যখন যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলেন, রাম সরযূতে মিশাইয়া গেলেন, দ্রৌপদী অর্জুন ভীম প্রভৃতি হিমালয়ের মহাপ্রস্থানে অদৃশ্য হইলেন, তখন সকলেই জ্ঞান করিলেন, কবি সেই কৌশলে তাঁহাদিগকে কাব্য হইতে অপসৃত করিয়া লইলেন। খুন করিয়া স্বাভাবিক ভাবে অপসারণ করা অপেক্ষা এরূপ অপসারণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। খুন করিয়া অপসারণ করা নাটকীয় কৌশল ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না! তদ্রূপ পাতাল-প্রবেশ ও স্বর্গারোহণাদিও কৌশলবিশেষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সকলেই তাহা সেই অর্থে বুঝিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা গ্রন্থ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হয়! কিন্তু এই ট্র্যাজিডির হত্যাকাণ্ড দ্বারা গ্রন্থ সমাপ্ত করিলে, এক বীভৎসকাণ্ডে পর্যবসিত হয়। এরূপ পর্যবসান নিতান্ত নিন্দনীয়।

কেহ কেহ বলিবেন, হত্যাকাণ্ড যে সকল স্থানেই নাটকীয় কৌশল এমন নহে; কোন কোন স্থানে তাহা অবশ্যম্ভাবী। ডেস্‌ডিমোনার হত্যা এইরূপ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, তাহা ওথেলোর আখ্যানবীজ মধ্যে নিহিত; নহিলে ওথেলো-চরিত্রের পরিপুষ্টি সাধন হয় না। ওথেলোর পরিণাম ঘটনার পর্যায়ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। এ কথা সত্য। কিন্তু আমরা বলি, এরূপ স্থলে বিষয়-নির্বাচনের দোষ। যে প্রতিভা ঘটনাচক্রকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিতে না পারে, সে প্রতিভারও ত্রুটি আছে। সেক্সপিয়ারের প্রতিভার দোষ নহে, সেক্সপিয়ারের রুচির দোষ—সে রুচি এরূপ হত্যাব্যাপারে আনন্দ পাইত, সে রুচি একজন কৃষ্ণকায় মূরকে ঐরূপ নির্দয় পামররূপে চিত্রিত করিতে বড় আমোদ লাভ করিত। সেক্সপিয়ারের শুদ্ধ নিজের রুচি নহে, তখনকার কালের রুচি ঐরূপ ছিল, ইংরাজ জাতির রুচি ও প্রবণতা একজন মূরকে ঐরূপ চিত্রিত দেখিতে বড়ই আনন্দলাভ করে। আজিও এই রুচির পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি। তবে দুই দশজন যদি এ রুচির বিরোধী থাকেন, তাঁহাদের কথা ধর্তব্য নহে।

আমাদের 'বেণীসংহার'-এর বিষয়-নির্বাচনে এইরূপ দোষ দেখা যায়। যে আখ্যায়িকার পরিণামে দুঃশাসনের রক্তপান করিতে করিতে দ্রৌপদীর বেণী-বন্ধন হইবে, সে বিষয়-নির্বাচনের দোষ বলিব না ত কি? ভট্টনারায়ণের অন্যবিধ পর্যবসান করিবার সাধ্য ছিল না।

ইংরাজী ট্র্যাজিডির দোষ এক্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে গৃহীত হইতেছে। নিজে বঙ্কিমও এই দোষে দূষিত হইয়াছেন। তাঁহার কুন্দনন্দিনীর বিষপান এক্ষণে অনেক গৃহস্থসংসারে কার্যে পরিণত হইতেছে। আত্মহত্যায় যে ঘোর পাপ, এখন সে ঘোর পাপের ভয় আমাদের অনেক স্ত্রীলোকের মন ও কল্পনা হইতে অপসারিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্মভীরুতা বিনষ্ট হইতেছে। তাহারা রঙ্গভূমে ম্যাকবেথ দেখিয়া আসিয়া সাহসিনী হইতেছে। ম্যাকবেথের বিষ ছিল কেবল ইংরাজী ভাষায়, এক্ষণকার কুরুচিসম্পন্ন লোকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আনিয়াছে।

ইংরেজীওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিয়া উঠিবেন, তোমাদের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কি খুন নাই? আমরা বলি যথেষ্ট আছে। মহাভারতে অনেক খুন আছে। পাণ্ডব-শিবিরে পঞ্চশিশু-হত্যা কি? আতিথ্যধর্মরক্ষার্থ কর্ণের পুত্রবলি কি?

এ সমস্ত ব্যাপার আমাদের সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে নাই, তাহা শ্রব্যকাব্যে আছে। শ্রব্যকাব্যের সহিত দৃশ্যকাব্যের যে প্রভেদ, আমরা প্রথমেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। তাহার বিচার করিলে শ্রব্যকাব্যের এ দোষ, দোষ বলিয়াই ধর্তব্য হইবে না।

মহাভারত ও রামায়ণের অধ্যয়নফল বা ইষ্টার্থ অতি শুভজনক। বাস্তবিক সমুদয় রামায়ণ ও মহাভারতের অধ্যয়নফল হেতু আজিও হিন্দুসমাজে ধর্মের বল ও প্রভাব এত প্রবল রহিয়াছে। যে ধর্মতেজ ও ধর্মবল সেই দুই মহা-কাব্যের প্রাণ, তাহা সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। যখন আমরা দানবীরের পুত্রবলি দেখি, তখন আমাদের ধর্মভাব এত উচ্চে উঠে যে, অন্য সকলই নিম্নতলে যায়।

আমরা কর্ণের ধর্ম ও দানবীরত্বে মাতিয়া পড়ি। যে দানধর্মের জন্য তিনি সর্বত্যাগী হইতে পারিতেন, তাহার নিকট পুত্রবলি কি? সেই বলিতে ত্যাগের গৌরব এবং দানবীরত্বের ধর্মভাব পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ধর্মের উচ্চতায়

আমরাও ক্ষণিকের জন্য উত্থিত হইয়া কর্ণের ধর্মানন্দে মত্ত হই। পুত্রবলি তখন তুচ্ছ বোধ হয়। আর্য ধর্মপ্রাণ শুদ্ধ ঋষি-চরিত্রে ছিল না, যথার্থ ক্ষত্র-বীরেও তাহা বর্তমান ছিল। ব্যাস পুরাণে তাহা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। কুরুকুলের সহিত যখন কর্ণ রণমদে মত্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি দানবীরের ধর্মপালন করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া অকাতরে ইন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া নিজ অমোঘ কবচ ও কুণ্ডল দান করিয়াছিলেন। এই আখ্যান-পাঠের ফল ধর্মের উত্তেজনা, ধর্মবলে বলীয়ান হওয়া। তদ্দারা প্রকৃতি দূষিত হয় না, কিন্তু আরও উন্নত হইয়া উঠে। ধর্মের জন্য, দানবীরত্বের জন্য হিন্দু সর্বত্যাগী হইতে শিক্ষা করে।

আর, পঞ্চ-শিশুহত্যা কি? তাহা রণ-ব্যাপারের মধ্যে একটি ভ্রান্তি মাত্র। যে ভ্রান্তিতে দুর্যোধনেরও হরিষে বিষাদ জন্মিয়াছিল। দুর্যোধন এত যে পাণ্ডববিদ্বেষী ছিলেন, তিনিও তাহাতে বিষাদিত। রণকাণ্ডের গোলমালে কত ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, ব্যাস সেই যুদ্ধ ও গৃহবিবাদের ভীষণ পরিণাম এবং বিষময় ফল প্রদর্শন করিবার জন্য ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট এ ঘটনায় কোন দোষ নাই। যাঁহারা কাব্যরূপে মহাভারতকে দেখেন, তাঁহারাও দেখিবেন, যুদ্ধকাণ্ড কি ভয়ানক ব্যাপার! জ্ঞাতিবিরোধের বিষম পরিণাম কি ভয়ানক! যে কাব্যে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা পুরাণ। আপামর-সামান্য জনগণের ধর্মোন্নতি এবং হিন্দু সমাজকে ধর্মবলে বলীয়ান করিবার জন্য পুরাণের সৃষ্টি। সুতরাং, পুরাণের মহদুদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভ্যন্তরে কোথায় এরূপ বধকাণ্ড লুক্কায়িত থাকে, তাহা অনুভূত হয় না। ট্র্যাজিডিতে বধকাণ্ড প্রধান ঘটনা হইয়া পড়ে; পুরাণের প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহা আচ্ছন্ন থাকে। কেবল পুরাণ-পাঠের ফলমাত্র হৃদয়ে অনুভূত ও অঙ্কিত হইয়া থাকে, এবং সেই ফল চিরদিনের জন্য জীবনকে নিয়মিত ও শাসিত করে।

সাহিত্য, ১৩০২

সাহিত্যে ধ্বনিবাদ

ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যবিচার শাস্ত্রে আচার্য আনন্দবর্ধন প্রতিপাদিত ধ্বনিবাদ অতি প্রসিদ্ধ। এই ধ্বনির স্বরূপ কি? কিন্তু ধ্বনির স্বরূপ বুঝিতে হইলে, "শাব্দবোধ"—ইংরাজীতে যাহাকে Verbal knowledge কহে—সে সম্বন্ধে কতকগুলি মূল তথ্য অবগত হওয়া প্রয়োজন। 'শব্দ' হইতে কি করিয়া 'অর্থে'র বোধ হইয়া থাকে? সেই অর্থের কতরকম প্রকারভেদ? বিভিন্ন অর্থ-বোধের জন্য শব্দের কতগুলি ব্যাপার বা function কল্পনা করিতে হইবে? ঐ সকল শব্দব্যাপারের মধ্যে পরস্পর প্রভেদই বা কি? এই সকল সমস্যার সহিত সামান্যত কিছু পরিচয় না থাকিলে 'ধ্বনি' বা 'ব্যঞ্জনা'র প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে—কেননা, 'ব্যঞ্জনা' (suggestion) শব্দেরই একটি বিশিষ্ট ব্যাপার—যাহার আনুকূল্যে একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি সম্ভবপর হইয়া থাকে। ধ্বনিসম্প্রদায়ের আচার্যগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতবাদ শাব্দিক আচার্যসম্প্রদায়ের (grammarians) প্রসিদ্ধ স্ফোটসিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রথমতঃ পূর্বোদ্দিষ্ট প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিব, তাহার পর বৈয়াকরণ আচার্যগণের মতবাদের সহিত ধ্বনিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

[১] অভিধা (Denotation)

শব্দ হইতে কি করিয়া অর্থবোধ হইয়া থাকে? 'গো' শব্দটি উচ্চারণ করিলেই একটি বিশিষ্ট অর্থ (idea, meaning)—'প্রাণিবিশেষ', আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। স্বীকার করিতেই হইবে, উহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে, যাহার জন্য একটি জ্ঞান অপরটির জ্ঞানের প্রতি কারণ হয়। আমরা 'ধূম' দেখিয়া 'অগ্নি'র অনুমান করি—এখানে ধূমের জ্ঞান অগ্নির জ্ঞানের কারণ। হেতু কি? ইহার একমাত্র হেতু এই যে 'ধূম' ও 'অগ্নি'র মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান আছে—সেই সম্বন্ধের নাম 'কার্যকারণভাব' বা Causality, যাহা অন্বয়-ব্যতিরেকের (Joint Method of Agreement and Difference) দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। এখন 'শব্দ' ও অর্থের মধ্যে এইরূপ কি এমন সুনির্দিষ্ট 'সম্বন্ধ' আছে যাহার বশে একটি অপরটির

জ্ঞান জন্মাইয়া দিবে? 'গো' শব্দ ও প্রাণিবিশেষরূপ অর্থের মধ্যে কি এমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে যে, ঐ শব্দটি শ্রবণমাত্রই উক্ত প্রাণিবিশেষের বোধ হইবে? প্রশ্নটি সাধারণ পাঠকের কাছে হয়ত নিতান্তই বালকজনোচিত ও হাস্যজনক বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সমস্ত দার্শনিক বিচারের মূল তথ্য অনুসন্ধান করিলে শেষ পর্যন্ত ঐরূপ আপাতসরল শিশুসুলভ প্রশ্নের উৎসমূলেই আমরা উপস্থিত হইব।

শব্দ হইতে যে অর্থের প্রতীতি হয়—এ ত' অতি সাধারণ, নিতান্তই মামুলী কথা! কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতগণের বৈপশ্চিতী তত্ত্বদৃষ্টি এই নিতান্ত সরল প্রশ্নকেই দুরূহ, জটিল সমস্যায় রূপান্তরিত করিয়াছে,[১] এবং তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যহেতু একই অভিন্ন সমস্যার সমাধানের আকৃতিও হইয়াছে বহু ও বিচিত্র। শব্দ ও অর্থের ক্ষেত্রেও সমস্যা ও সমাধানের জটিলতা ও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। মোটামুটিভাবে কয়েকটির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

যেহেতু 'গো' শব্দ হইতে নিয়মতঃ একটি প্রাণিবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে, অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে উভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধের স্বরূপ কি? 'শিংশপা' বলিলে আমাদের 'বৃক্ষের' বোধ জন্মে, কেন না শিংশপা ও বৃক্ষের মধ্যে সম্বন্ধ আছে—উহা 'অভেদ' (Identity); 'ধূম' হইতে 'অগ্নি'র প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, যেহেতু ধূম ও অগ্নি যদিও ভিন্ন, তথাপি কার্যকারণভাবরূপ একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ উহাদের মধ্যে বর্তমান। শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ কি প্রকার? অভেদ সম্বন্ধ, অথবা কার্যকারণভাবাদি ভেদসম্বন্ধ?

ভর্তৃহরি প্রমুখ বৈয়াকরণ আচার্যগণ বলিবেন: "শব্দ ও অর্থ অভিন্ন। শুধু অভিন্নই নহে, শব্দ হইতে অর্থের কোনও পৃথক্ অস্তিত্বই নাই। শব্দের এমনই ঐন্দ্রজালিক শক্তি যে উহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করিয়া চলে। বস্তুতঃ, ঐ সমস্ত বস্তুই মায়াময়। এই যে কাল, দিক্ বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, রস—এই যে ঘট, পট, হস্তী, অশ্ব, পর্বত, অরণ্য, নদ নদী বিশিষ্ট পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্ব, ইহা কেবল শব্দেরই বিবর্তমাত্র। শব্দ আছে

---

১ "Nothing is more usual than for philosophers to encroach on the province of grammarians, and to engage in disputes of words, while they imagine they are handling controversies of the deepest importance and concern"—(Hume).

বলিয়াই, ইহারাও আছে। কিন্তু সাধারণ মানব আমরা, অনাদি অজ্ঞানের দ্বারা আমাদের তত্ত্বদৃষ্টি অবলুপ্ত, আবৃত—আমরা মনে করি শব্দ ও অর্থ উভয়ই সমানভাবে সৎ। উহারা যে বস্তুতঃ অভিন্ন, শুক্তিরজতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান অর্থের যে কোনও পারমার্থিক সত্তাই নাই, এই খণ্ডোচ্চারিত আবিদ্যক শব্দ যখন প্রকাশময়, বিজ্ঞানস্বরূপ, সূক্ষ্ম, অনুচ্চার্য, নিরাকার শব্দব্রহ্মের মধ্যে লীন হইয়া যাইবে, যখন সেই জ্যোতির্ময় বিজ্ঞানঘন শব্দব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা আমাদের মোহাবরণ ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন যে এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ বিশিষ্ট বিশ্বও ইন্দ্রজালসৃষ্ট মায়াতরুর ন্যায়, গন্ধর্বনগরের ন্যায় অকস্মাৎ বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা আমরা জানিনা। অতএব শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা কর, তবে বলিব, অবিদ্যারচিত 'অধ্যাসই' প্রকৃত সম্বন্ধ। শুক্তিতে যেমন অবিদ্যাবশে আমরা 'রজত' কল্পনা করি, সেইরূপ শব্দরূপ আধারে বিভিন্ন অর্থ অধ্যস্ত হইয়া থাকে, অবিদ্যাই ইহার মূল। সেই অবিদ্যার বিনাশসাধনে যত্নবান্ হও, স্বরূপজ্যোতিঃ সূক্ষ্ম শব্দব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ কর, অর্থের কোনও পৃথক্ সত্তা থাকিবে না, শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে ভেদপ্রতীতি সকল বাগ্‌ব্যবহারের ভিত্তিস্বরূপ, সেই ভেদ-প্রতীতি তিরোহিত হইবে, বাগ্‌ব্যবহারের কোনও প্রয়োজনীয়তাই আর থাকিবে না।" ইহা 'শব্দাদ্বৈতবাদ'রূপে দার্শনিকসম্প্রদায়ে পরিচিত। আলঙ্কারিকগণ ভর্তৃহরি-প্রমুখ শাব্দিক আচার্যগণের এই 'শব্দাদ্বৈত'রূপে দার্শনিকসম্প্রদায়ে পরিচিত। আলঙ্কারিকগণ—ভর্তৃহরিপ্রমুখ শাব্দিক আচার্যগণের এই শব্দাদ্বৈতবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন বটে। কিন্তু তাঁহাদের মতে সংসার-দশায় যখন আমরা 'মহামোহগর্ভে' নিপতিত, এই অদ্বৈতপ্রতীতি কখনই সম্ভবপর নহে। যতদিন আমরা ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনের দ্বারা চালিত হইব, ততদিন শব্দ ও অর্থের মধ্যে ভেদ-প্রতিভাস থাকিবেই থাকিবে এবং ততদিন আমরা খণ্ডোচ্চারিত একক শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক-ভাব কল্পনা করিতে বাধ্য হইব। অতএব সংসারদশাপন্ন জীবের জন্য শব্দাদ্বৈতবাদ নহে, ইহার অধিকারী সেই সমস্ত যোগী পুরুষ, যাঁহারা তাঁহাদের তপস্যা ও নিদিধ্যাসনবলে এই সংসারের দুস্তর মায়াজাল উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন।[১]

১। "যেহপ্যবিভক্তং বাক্যং তদর্থরূপমিত্যাহুঃ, তৈরপি অবিদ্যাপদপতিতৈঃ সর্বৈয়মনুসরণীয়া প্রক্রিয়া। তদুত্তীর্ণত্বে তু সর্বং পরমেশ্বরাদ্বয়ং ব্রহ্ম-ইত্যস্মচ্ছাস্ত্রকারেণ ন ন বিদিতং তত্ত্বালোকগ্রন্থং বিরচয়তা।"—অভিনবগুপ্ত : ধ্বন্যালোক-লোচন।

একদিকে বৈয়াকরণ আচার্যগণের এই 'শব্দাদ্বৈতবাদ', আর একদিকে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের 'দ্বৈতবাদ'। বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্যগণ বলেন:— "অর্থ ত' ক্ষণস্থায়ী (momentary)। যে গোব্যক্তিকে অভিন্ন ও চিরস্থায়ী বলিয়া বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা কতকগুলি ক্ষণিক পদার্থের প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব যে গোব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করিয়া তুমি শব্দটি উচ্চারণ করিতে যাইবে, শব্দোচ্চারণকালে সেই পূর্বভাবী ব্যক্তিটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষণিক। অতএব পরভাবী শব্দোচ্চারণের দ্বারা কখনও পূর্বভাবী ক্ষণিক দ্রব্যের বোধ হইতে পারে না। 'অর্থ' ও 'শব্দ' পরস্পর অসংস্পৃষ্ট, সম্পূর্ণ পৃথক্। শব্দের এমন শক্তিই নাই যে ক্ষণভিদ্যমান বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে—"নার্থং শব্দাঃ স্পৃশন্ত্যমী"। বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ ত' দূরের কথা, দ্বৈতভাবাপন্ন শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করাই অসম্ভব। তবে কি করিয়া 'গো' শব্দ হইতে 'গো'ব্যক্তিরূপ প্রাণিবিশেষের বোধ হইয়া থাকে? বৌদ্ধ আচার্যগণ বলিবেন, ইহা বিভ্রম মাত্র। বক্তাও ভ্রান্ত, শ্রোতাও ভ্রান্ত। এ যেন একজন তিমিররোগগ্রস্ত (opthalmic patient) ব্যক্তি আর এক তিমিররোগীকে আপনার দ্বি-চন্দ্র প্রতীতি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে! অতএব সমস্ত বাগ্-ব্যবহারই ভ্রান্তিমূলক। শব্দের দ্বারা কখনও বাস্তব অর্থসমূহ প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভবপর নহে।" সুতরাং বৈয়াকরণ আচার্যগণের অদ্বৈতবাদই গ্রহণ করা যাউক, অথবা বৌদ্ধ দার্শনিকগণের ঐকান্তিক দ্বৈতবাদই স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, শব্দব্যবহার উভয়মতেই আবিদ্যক, ভ্রান্তিমূলক। শ্রুতিগোচর শব্দের দ্বারা কখনও সত্যকে আবিষ্কার করা যায় না। অতএব মূক হইয়া থাকাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু সাংসারিক জীবের পক্ষে এই অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ কোনটিই ঐকান্তিকভাবে মানিয়া লওয়া দুরূহ।

বৈয়াকরণ অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধ দ্বৈতবাদের মাঝামাঝি নৈয়ায়িক ও মীমাংসক সম্প্রদায়ের দার্শনিক আচার্যগণের শব্দার্থবিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থান পাইবার যোগ্য। এই উভয় সম্প্রদায়ের মতে শব্দ ও অর্থ, দুইটি পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তু বটে; কিন্তু বৌদ্ধ আচার্যগণের ন্যায় তাঁহারা শব্দার্থকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাহারা বিভিন্ন হইলেও কখনই পরস্পর ঐকান্তিকভাবে সম্বন্ধহীন নহে

যদিও সেই সম্বন্ধের স্বরূপ অভেদ নহে। তবে উক্ত সম্বন্ধের প্রকৃত স্বরূপ কি? এই বিষয়ে মীমাংসক ও নৈয়ায়িক উভয়ের মতবিরোধ উপস্থিত হয়। নৈয়ায়িক বলেন: শব্দ হইতে যে অর্থের প্রতীতি হয়, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু শব্দ ও অর্থ এই দুই অত্যন্তভিন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপন কে করিল? তুমি আমি নহে। 'গো' শব্দ আজানিক কাল হইতে গোরূপ প্রাণিবিশেষকে বুঝাইয়া আসিতেছে। তখন আমি ছিলাম না, তুমি ছিলে না, রাম ছিল না, শ্যাম ছিল না। সৃষ্টির আদিতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই সম্বন্ধের কর্তা কোনও সাধারণ ব্যক্তিবিশেষ নহে। এই সম্বন্ধ উদ্ভাবিত হইয়াছিল ঈশ্বরের দ্বারা। তিনি লোকানুগ্রহমানসে ইচ্ছা করিলেন—'গো' শব্দটি গোব্যক্তিরূপ অর্থের বোধক হউক। এই সংকেত (convention) বা ঈশ্বরেচ্ছাই শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ। গো শব্দের দ্বারা অশ্বাদি প্রাণিবিশেষের প্রতীতি হয় না, কেননা, উহাদের মধ্যে উপরিউক্ত ঈশ্বরেচ্ছা বা সংকেত বর্তমান নাই। যে শব্দ যে অর্থের বাচক, সেই শব্দ ও সেই অর্থের মধ্যে তাদৃশ 'সংকেত' ঈশ্বর কর্তৃক জগৎসৃষ্টির প্রাগ্‌দশায় গৃহীত হইয়াছিল—ইহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে, গত্যন্তর নাই। অতএব শব্দ ও অর্থ সংকেতরূপ সম্বন্ধবলে পরস্পর-সম্বদ্ধ। সেইজন্য শব্দশ্রবণমাত্র 'সংকেতিত' অর্থের বোধ হইয়া থাকে। আমরা সেই সংকেতিত অর্থ স্মরণ করি। সুতরাং শব্দ হইতে অর্থের যে জ্ঞান উহা স্মরণাত্মক জ্ঞান। লোকেও ইহা সুপ্রসিদ্ধ যে দুইটি পরস্পর সহচরিত বস্তুর মধ্যে একটির দর্শনে অপরটির স্মরণ হইয়া থাকে। যেমন, হস্তীকে দেখিলে তাহার চালক হস্তিপকের স্মরণ হয়, কেননা, উভয়ের মধ্যে সাহচর্য আছে; যেমন, আম্রফলের রূপ (বর্ণ) দেখিলে উহার রসের স্মরণ হয়, কেননা, রূপ ও রসের মধ্যে অবিনাভাব বা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। এইরূপে, যে শব্দটির সহিত যে অর্থের এই সংকেতরূপ সম্বন্ধ আছে—সেই শব্দটি সেই অর্থের অভিধায়ক বা বাচক, এবং সেই অর্থটি সেই শব্দের বাচ্য বা মুখ্য অর্থ; এবং এই সংকেতরূপ সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া কোনও শব্দ যখন কোনও একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি করাইয়া থাকে, তখন শব্দের এই অর্থবোধকত্ব শক্তিকে 'অভিধা' (Denotation) বলা হইয়া থাকে। অতএব, মোট কথা দাঁড়াইল এই যে, শব্দ সংকেতরূপ সম্বন্ধ-সহকৃত হইয়া 'অভিধা' ব্যাপারের (function) সাহায্যে বাচ্য বা মুখ্য বা অভিধেয় অর্থের

প্রতীতি করাইয়া দেয়। এই সংকেতের কর্তা হইতেছেন, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর; এবং শব্দ হইতে যে মুখ্যার্থের বোধ উহা স্মরণাত্মক জ্ঞানের (recollection) মধ্যেই অন্তর্ভূত।"

কিন্তু মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের কোনও সত্তাই নাই—তাঁহারা নিরীশ্বরবাদী। সুতরাং, জগৎসৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরকর্তৃক শব্দ ও অর্থের মধ্যে সংকেতরূপ সম্বন্ধ প্রবর্তিত হইয়াছিল—নৈয়ায়িকদের এইরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মতে নিছক্ কল্পনামাত্র। সুতরাং শব্দ ও অর্থের মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছারূপ কোনও সম্বন্ধই নাই। তবে কিরূপে একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থের বাচক হইয়া থাকে? মীমাংসক বলেন: শব্দেরই ইহা একটি স্বতন্ত্র শক্তি, ইহার নাম অভিধা। যেমন অগ্নির দাহকত্ব শক্তি স্বাভাবিক, যেমন চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের রূপ, রস প্রভৃতি স্ব স্ব বিষয়ের প্রকাশনশক্তি স্বাভাবিক,—উহা যেমন কোনও ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা উদ্ভাবিত নহে, সেইরূপই 'গো' শব্দ আপন স্বতন্ত্র অভিধাশক্তিবশে প্রাণিবিশেষরূপ অর্থের বাচক। ইহার মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছা বা মানুষেচ্ছা—কোনটিরই স্থান নাই। যে বস্তুতে যে শক্তি স্বতই বর্তমান নাই,—সেই বস্তুতে ইচ্ছাবশে কখনও সেই শক্তি অর্পণ করিতে পারা যায় না।[১] আমরা সহস্রবার ইচ্ছা করিলেও বহ্নিতে তৃষ্ণাপ্রশমনশক্তি অর্পণ করিতে পারি না। সেইরূপ ইচ্ছার দ্বারা কোনও বস্তুর নৈসর্গিক স্বতন্ত্র শক্তিকে তিরোভূত করিতেও পারা যায় না। মানবের ইচ্ছার এমন কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নাই, যাহার বশে বহ্নির দাহকত্বশক্তির বিনাশ সাধন করা যাইতে পারে। সেইরূপ একক শব্দের যে বিশিষ্ট অর্থের প্রতি অভিধায়কত্ব শক্তি বা অভিধা, উহা স্বাধীন, উহা কাহারও ইচ্ছাপরতন্ত্র নহে। আমাদের অনুভব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও মীমাংসক দার্শনিকগণের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিভাত হইবে। আমরা বলিয়া থাকি—'এই শব্দটি এই অর্থটিকে বলিয়া থাকে'।[২] এখানে শব্দেরই স্বাতন্ত্র্য মুখ্যভাবে প্রতিপাদিত হইতেছে। যদি ঈশ্বরকৃত সংকেতবশে শব্দ অর্থের প্রতিপাদক হইত, তবে "ঈশ্বর এই শব্দের দ্বারা এই অর্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন"- এইরূপ উক্তিই

১ 'ন হি স্বতোঽসতী শক্তিঃ কর্তুমন্যেন পার্যতে'—কুমারিলভট্ট।

২ 'শব্দপ্রমাণকা বয়ম্। যচ্ছব্দ আহ, তদস্মাকং প্রমাণম্।' —মহাভাষ্য: পস্পশা আহ্নিক।

অধিকতর যুক্তিসংগত হইত। নৈয়ায়িকগণ যে একক শব্দ হইতে একক অর্থের বোধকে স্মরণাত্মক জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন,—সেই সিদ্ধান্তের কোনও ভিত্তিই নাই। স্মরণের আকার কিরূপ? পূর্বানুভূত কোনও বস্তুকে যখন আমরা স্মরণ করিয়া থাকি—তখন শুদ্ধমাত্র বস্তুটিরই জ্ঞান হয় না। 'সেই বস্তু'—এই প্রকারে তত্তোল্লেখ (knowledge of that-ness) সহকারে বস্তুটির জ্ঞান হইয়া থাকে। এই 'তত্তোল্লেখ'—বা 'সেই' বলিয়া বস্তুটির জ্ঞান—ইহাই হইল স্মৃতির বৈশিষ্ট্য। শব্দ হইতে যখন অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন স্মরণাত্মক জ্ঞানের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য—'তত্তোল্লেখ' কি লক্ষিত হইয়া থাকে? 'গো' শব্দ হইতে কি 'সেই গো-ব্যক্তি' এইরূপে প্রাণি-বিশেষরূপ অর্থের বোধ হইয়া থাকে? যদি নৈয়ায়িকগণ স্বকীয় সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনিবেশবশে শব্দ হইতে অর্থবোধের স্থলেও ঐরূপ 'তত্তোল্লেখ' সমর্থন করেন, তবে উহা নিতান্তই অনুভববিরুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব শব্দ স্বতই 'অভিধা' শক্তির বলে মুখ্য অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই 'অভিধা' শব্দেরই স্বতন্ত্র, অসাধারণ শক্তি। ইহা "ঈশ্বর বা মানব কাহারও দ্বারা উদ্ভাবিত বা অর্পিত হয় নাই"—মীমাংসক আচার্যগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। এইস্থলে মীমাংসকমতের বিরুদ্ধে কেহ হয়ত, প্রশ্ন করিয়া বসিতে পারেন: শব্দ যদি স্বতন্ত্র শক্তিবশে অর্থের প্রতিপাদক হয়, তবে সংকেতজ্ঞানের প্রয়োজন কি? কি জন্য আমরা Dictionary বা কোষগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া সময়ের অপব্যবহার করিতে যাই? যে ব্যক্তি বহ্নির দাহিকা শক্তির কথা জানে না সেও যদি অজ্ঞানবশে বহ্নিতে হস্তক্ষেপ করে, তবে তাহাকেও যেমন বহ্নি দগ্ধ করে, সেইরূপ 'এই শব্দটি এই অর্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে।' এইরূপ সংকেতের জ্ঞান যাহার না আছে, তাহারও ত' তুল্য যুক্তিবলে 'অভিধা' শক্তিবশে মুখ্য অর্থের বোধ হওয়া উচিত? অতএব মীমাংসকমত মানিয়া লইলে, যে ব্যক্তি 'অমরকোষ' কণ্ঠস্থ করিয়াছে, তাহার যেমন শব্দ হইতে অর্থবোধ হইবে, সেইরূপ শব্দার্থসম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিরও অজ্ঞাত শব্দ হইতে অর্থের বোধ হইবে,—কোনও প্রতিবন্ধকই আর থাকিবে না। উত্তরে মীমাংসকগণ কি বলিবেন? মীমাংসকগণ এই সমস্যার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান নির্দেশ করিয়া থাকেন: সত্য বটে শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য, এবং শব্দের অর্থবোধকত্বশক্তি বা অভিধাশক্তি

স্বাভাবিক, ঈশ্বরানুদ্ভাবিত। তথাপি যে ব্যক্তির শব্দ ও অর্থের মধ্যে পূর্ব হইতে সম্বন্ধের জ্ঞান নাই, সেই ব্যক্তির অজ্ঞাত শব্দ হইতে অর্থের কোনও বোধ হইবে না। আচ্ছা, বহ্নি এবং ধূমের মধ্যে কার্যকারণভাবরূপ (Causality) সম্বন্ধ ত' নিত্যসিদ্ধ। তবে কি যে কোনও ব্যক্তি,—যেমন 'নারিকেলদ্বীপবাসী' —যে পূর্বে কখনও ধূম দর্শন করে নাই, সে কি প্রথম ধূমদর্শনেই ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিবে ? সে কি দর্শনমাত্রেই উভয়ের মধ্যে 'কার্যকারণভাব' সম্বন্ধ অবগত হইতে পারিবে ? কিছুতেই নহে। কেন ? কার্যকারণভাব সম্বন্ধ ত' নিত্য স্বাভাবিক ?—কারণ, ভূয়োদর্শনের বা observation-এর ফলে, ধূম এবং বহ্নির মধ্যে অন্বয়-ব্যতিরেক (Agreement and Difference) দর্শনের ফলেই নিত্য ও স্বাভাবিক 'কার্যকারণভাব' সম্বন্ধ অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধ জ্ঞানের জন্য ভূয়োদর্শন প্রয়োজন। শব্দার্থের ক্ষেত্রেও একই কথা। শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্যবাচকভাবসম্বন্ধ যদিও নিত্য, শব্দের অভিধাশক্তি যদিও নিত্য এবং স্বাভাবিক, তথাপি ঐ শক্তির অভিব্যক্তির জন্য 'বৃদ্ধোপদেশ' প্রভৃতি সম্বন্ধ জ্ঞানের উপায় সহকারি-কারণ। ঐ সকল উপায়ের দ্বারা যখন শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান হইবে, তখনই কেবলমাত্র শব্দের অভিধাশক্তি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, এবং উহার দ্বারা বিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি হইবে। তাই বলিয়া, অভিধাশক্তি অনিত্য নহে, কিংবা 'সংকেতজ্ঞান' এবং 'অভিধা' একই পদার্থ নহে।"

অতএব নৈয়ায়িকমতে কোনও শব্দ যখন অভিধাব্যাপারের দ্বারা (function of denotation) সংকেতিত অর্থকে প্রতিপাদন করে, তখন তাহাকে বাচক শব্দ কহে, এবং ঐ সংকেতিত অর্থ বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ বলিয়া কথিত হয়। মীমাংসকগণ বলেন: যখন কোনও শব্দ আপন নৈসর্গিক অভিধাশক্তিবশে কোনও অর্থকে প্রতিপাদন করে—তখন সেই শব্দটি বাচক শব্দ এবং সেই অর্থটি বাচ্য বা অভিধেয় বা মুখ্য অর্থ। উভয়ের মধ্যে তফাৎ শুধু এই যে, নৈয়ায়িকগণের মতে 'সংকেত' একটি কৃত্রিম সম্বন্ধবিশেষ এবং বাচ্যার্থজ্ঞানের প্রতি উহাই অপরিহার্য অঙ্গ ; কিন্তু মীমাংসকগণের সিদ্ধান্তে শব্দের বাচ্যার্থবোধন শক্তি—বা অভিধাশক্তি— চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপপ্রকাশনশক্তির মতই নিত্য ও স্বাভাবিক। সংকেতজ্ঞান কেবল উহার ব্যঞ্জকমাত্র।

[২] লক্ষণা (Metaphor)

'অভিধা' যে শব্দের একটি শক্তিবিশেষ তাহা বুঝা গেল—এবং এই অভিধার দ্বারা বোধিত অর্থের সংজ্ঞা 'অভিধেয়'—যাহাকে ইংরাজীতে Dictionary Meaning বলা যাইতে পারে। কিন্তু মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ ভিন্ন অন্যান্য অর্থও শব্দের দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে—তাহার মধ্যে একটির নাম লক্ষ্যার্থ (Metaphorical Sense)। অভিধাশক্তির দ্বারা যেমন শব্দবিশেষ হইতে অভিধেয় অর্থের বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ শব্দের যে শক্তি বা ব্যাপারের সাহায্যে লক্ষ্যার্থের প্রতীতি সম্ভবপর হইয়া থাকে—তাহাকে সংস্কৃতে বলা হয় 'লক্ষণা'। এই লক্ষণার স্বরূপ কি? এবং লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থের মধ্যে প্রভেদই বা কি? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাই বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

আমরা আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি—তাহা কতকগুলি পদের সমষ্টিমাত্র, এবং বাক্যস্থিত প্রত্যেকটি পদের যে স্বতন্ত্র অর্থ, তাহাদেরই 'অন্বয়' বা সম্বন্ধ বাক্যের দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে—উহাই বাক্যার্থ। কিন্তু কোনও একটি পদের অভিধেয় অর্থ বা মুখ্যার্থের সহিত যদি অন্য পদের মুখ্যার্থের অন্বয় বা সম্বন্ধ অসম্ভব হয়—তবে বাক্যার্থবোধ হইবে না, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সকল স্থলেও বাক্যার্থবোধ ঘটিয়া থাকে। কিরূপে ইহা সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তরে বলা হয়ঃ সেস্থলে শব্দটির মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া 'লক্ষ্যার্থ' গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সেই লক্ষ্যার্থের সহিতই পদান্তরের দ্বারা প্রতিপাদিত অভিধেয়ার্থের সম্বন্ধ বা অন্বয়ের ফলে বাক্যার্থবোধ ঘটিয়া থাকে। উদাহরণের দ্বারা বিষয়টিকে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।

"গঙ্গার ঠিক্ উপরেই আমার বাড়ী"—এইরূপ উক্তি প্রায়ই শুনা যায়। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই, এইরূপ উক্তির অসামঞ্জস্য ধরা পড়িবে। 'গঙ্গা' শব্দের অভিধেয় অর্থ একটি বিশিষ্ট জলপ্রবাহ। সেই জলপ্রবাহের উপর বাস করা কিরূপে সম্ভবপর? সুতরাং মুখ্যার্থের মধ্যে অন্বয় বাধিত হইয়া গেল। অতএব মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে কি গঙ্গা পদটি একেবারেই নিরর্থক? তাহা নহে। যদিও 'গঙ্গা' শব্দটির মুখ্যার্থ বাধিত হইল, তথাপি লক্ষণা ব্যাপারের সাহায্যে উহা 'তীর' রূপ অর্থকে বুঝাইবে, এবং ঐ লক্ষ্যার্থ

গঙ্গাতীরের সহিত অন্য পদার্থের 'সম্বন্ধ' হইবে। এইরূপে সমগ্র বাক্যটি সার্থক হইবে। আচ্ছা, 'গঙ্গা' শব্দটি যে তটকেই বুঝাইবে, ইহার কারণ কি? 'গঙ্গা' শব্দটি লক্ষণাশক্তির দ্বারা যেমন তটকে বুঝাইতে পারে, সেইরূপ উহা উজ্জয়িনীকে কেন বুঝাইবে না? একটিকেই বা কেন লক্ষ্যার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব? গঙ্গা' শব্দের লক্ষ্যার্থ উজ্জয়িনী হইবে না কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রকারগণ বলেন: যে কোনও পদ হইতে আমরা ইচ্ছাবশে লক্ষ্যার্থ কল্পনা করিতে পারি না। লক্ষ্যার্থপ্রতীতির একটি বিশিষ্ট নিয়ম আছে। কোনও একটি পদের লক্ষ্যার্থ ও মুখ্যার্থের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান থাকা চাই। এই সম্বন্ধ পাঁচ প্রকার হইতে পারে: সাদৃশ্য, সামীপ্য, সংযোগ, সমবায়, এবং বৈপরীত্য।[১] যে অর্থের সহিত মুখ্যার্থের এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধের মধ্যে অন্যতম সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই, তাহা কখনও 'লক্ষণা' ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হইতে পারে না, তাহাকে লক্ষ্যার্থরূপে গ্রহণ করা যায় না। আলোচ্য উদাহরণে 'গঙ্গা' পদের মুখ্যার্থ 'জলপ্রবাহ' এবং বিবক্ষিত 'তট' রূপ অর্থের মধ্যে 'সামীপ্য' (Proximity) সম্বন্ধ আছে—সুতরাং 'গঙ্গা' পদ লক্ষণাশক্তির সাহায্যে 'তট'কে বুঝাইতেছে। অতএব এই স্থলে 'তট' হইল 'লক্ষ্যার্থ'। এক্ষণে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াইল: 'গঙ্গাতটের উপর আমার অট্টালিকা অবস্থিত'। এইরূপে লক্ষণার সাহায্যে আপাতবিরোধের সমাধান সম্ভব হইল। কিন্তু প্রশ্ন

১ Aristotle তাঁহার *Poetics* গ্রন্থে সাদৃশ্য (Analogy) সম্বন্ধকে Metaphor বা উপচার বা লক্ষণার মুখ্য নিয়ামক সম্বন্ধরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য: "Of the four kinds of metaphors," he says, "those kinds are the most highly approved metaphors which are constructed according to analogy" (Rhetoric, III, x) —in other words, on similarity in complexity."—J. G. Jennings ; *Metaphor in Poetry*, p. 16 বৈসাদৃশ্য, কার্যকারণভাব প্রভৃতি সম্বন্ধও যে উপচার বা Metaphor'-এর ভিত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে, ইহা প্রথম দেখাইয়া দেন Lord Kames তাঁহার *Elements of Criticism* গ্রন্থে: "And yet Kames, himself elsewhere takes some pride, and justifiably, in pointing out a type of figure which does not depend upon resemblance but upon other relations between tenor and vehicle. He says that it has been overlooked by former writers, and that it must be distinguished from other figures as depending on a different principle.

হইতে পারে: "এত ঘুরাইয়া নাসিকা দর্শনের প্রয়োজন কি? সোজা কথাটা সোজা করিয়া বলিলেই ত' সমস্ত হাঙ্গামা চুকিয়া যায়? মিছামিছি বাক্য-প্রয়োগে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া উহাকে এড়াইবার জন্য মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণাশক্তি আশ্রয় করার প্রয়োজন কি? 'গঙ্গাতটে আমার অট্টালিকা' এইরূপ বলিলেই ত' সহজ হইত?" ইহার উত্তরে আলঙ্কারিকগণ বলেন: লক্ষ্যার্থবোধের জন্যই কেবলমাত্র 'লক্ষণা'র আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। শুদ্ধ 'তট'কে বুঝাইবার জন্যই যদি 'গঙ্গা' পদটি ব্যবহৃত হইত তবে এইরূপ বাক্য-ব্যবহার দূষণীয় হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু 'লক্ষণা'র স্থলে একটি অতিরিক্ত 'প্রয়োজন' থাকে। অতি মূর্খ ব্যক্তিও প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোনও কার্যে অগ্রসর হয় না। সুতরাং লাক্ষণিক শব্দব্যবহারের মূলেও যে একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন থাকিবে, ইহা বিচিত্র কি? কিন্তু সেই প্রয়োজন? বক্তা যখন বলেন, 'গঙ্গার উপরেই আমার বাড়ী' তখন শুধু 'গঙ্গাতট' বুঝানই বক্তার অভিপ্রায় নয়। তিনি বলিতে চান গঙ্গাপ্রবাহ যেরূপ 'পবিত্র', যেরূপ 'শীতল', সেইরূপ পবিত্র ও শীতল তটের উপর তাঁহার বাসস্থান। 'গঙ্গাতটের উপর আমার বাস'—এইরূপ সোজাভাবে বলিলে যে শীতলতা ও পবিত্রতার বোধ হইত না, 'গঙ্গার উপর আমার আবাস' এইরূপ লাক্ষণিক শব্দ প্রয়োগের বলে সেই শীতলতা ও পবিত্রতার বোধ হইতেছে। এই 'শীতত্ব' ও 'পাবনত্বে'র বোধকেই আলঙ্কারিকগণ 'প্রয়োজন' এই আখ্যা দিয়াছেন। যে স্থলে

"*Giddy brink, jovial wine, daring wound* are example of this figure··· When we examine attentively the expression, we discover that a brink is termed *giddy* from producing that effect in those who stand on it······ Once we begin to examine attentively interactions which do not work through *resemblances* between tenor and vehicle, but depend upon other relations between them including *disparities*, some of our most prevalent, over-simple, ruling assumptions about metaphors as comparisons are soon exposed."—I. A. Richards: *The Philosophy of Rhetoric*, pp. 106 ff. অধ্যাপক Richards '*tenor*' এবং 'vehicle' এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ যথাক্রমে উপচারের বা লক্ষণার 'বিষয়' এবং 'বিষয়ী'—এই বস্তুদ্বয় বুঝাইবার জন্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। 'মুখটি চন্দ্র'—এই সাদৃশ্যমূলা লক্ষণার স্থলে 'মুখটি' বিষয়, 'চন্দ্র' বিষয়ী। অন্যান্য সম্বন্ধের স্থলেও একই রীতি। দ্রষ্টব্য: *Philosophy of Rhetoric*, p. 96.

এইরূপ কোনও প্রয়োজনের বোধ নাই, সেই স্থলে লাক্ষণিক শব্দের ব্যবহার দূষণীয় বটে। এইভাবে যে সকল 'লক্ষণা'র মূলে কোনও না কোনও প্রয়োজন নিহিত আছে—তাহাকে 'প্রয়োজনমূলা লক্ষণা' এইরূপ সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হয়। মোটকথা, 'প্রয়োজনমূলা লক্ষণা'র স্থলে মুখ্য বা অভিধেয় অর্থের (যেমন, গঙ্গাপ্রবাহ) সহিত লক্ষ্যার্থের (যেমন, গঙ্গাতট) 'অভেদ' (identity) প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং সেইজন্যই গঙ্গাগত শৈত্য এবং পাবনত্ব প্রভৃতি ধর্ম গঙ্গাতটেও প্রতীত হয়। সোজাসুজি 'গঙ্গাতট' বলিলে গঙ্গাপ্রবাহের সহিত তটের এই অভেদবোধ সম্ভবপর হইত না; ফলে প্রবাহের ধর্ম (অর্থাৎ শৈত্য-পাবনত্বাদি) তটে আরোপিত হইবার কোনও সম্ভাবনাই থাকিত না। এই ত' গেল এক শ্রেণীর লক্ষণার উদাহরণ। ইহা ভিন্ন অপর আর এক প্রকারের লক্ষণা আছে—আলঙ্কারিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন 'রূঢ়িমূলা লক্ষণা'। 'রূঢ়ি' শব্দের অর্থ 'প্রসিদ্ধি'। এই শ্রেণীর 'লক্ষণা'য় পূর্বের মত কোনও প্রয়োজন-বোধের আবশ্যকতা নাই। আজানিক কাল হইতে প্রচলিত লোকব্যবহারই এইরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগের ভিত্তিস্বরূপ। এখানেও পূর্বের মতই মুখ্যার্থবাধ, অন্বয়ের অনুপপত্তি, মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ, সবই আছে। কিন্তু প্রভেদ একমাত্র এই যে, কোনও 'প্রয়োজন' নাই। উদাহরণ যেমন—'কলিঙ্গ বড় সাহসিক' (কলিঙ্গাঃ সাহসিকাঃ)। 'সাহসিকতা' বা বীরত্ব কোনও দেশবিশেষের ধর্ম নহে—এই সকল গুণ চেতন প্রাণিতেই শুধু সম্ভব। সুতরাং 'কলিঙ্গ' শব্দটি এখানে উক্ত নামে প্রসিদ্ধ জনপদকে বুঝাইতেছে না,—কিন্তু উহার দ্বারা কলিঙ্গের অধিবাসিবৃন্দই বোধিত হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে—"কলিঙ্গাধি-বাসিগণ বড় সাহসিক" এইরূপ বলিলে কি ক্ষতি হইত? উত্তরে আলঙ্কারিকগণ বলেন: "ক্ষতি কিছুই হইত না। কিন্তু আমরা কি করিব? অতীতকাল হইতে অধিবাসী বুঝাইবার জন্য দেশবাচক শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে—সেই লোকপ্রসিদ্ধি বা 'রূঢ়ি' বশে বর্তমানেও ঐরূপ লাক্ষণিক ব্যবহার প্রচলিত আছে, যদিও ইহার কোনও দৃষ্ট প্রয়োজনই নাই।" এখানে মুখ্যার্থ ('কলিঙ্গ দেশ') ও লক্ষ্যার্থ (কলিঙ্গের অধিবাসিবৃন্দ) এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ 'আধার-আধেয়ভাব'। এইরূপে, প্রসিদ্ধিবশে যে-সকল লাক্ষণিক প্রয়োগ – উহাদিগকে 'রূঢ়িমূলা লক্ষণা' বলা হইয়া থাকে। 'বৈপরীত্য' (antinomy) সম্বন্ধে লক্ষণার উদাহরণ—যেমন, "মহাশয়! আমার বহু উপকার করিয়াছেন! আপনার

সৌজন্যে আমি মুগ্ধ। আর কি বলিব, এইরূপে আপনি শতবর্ষ সুখে জীবিত থাকুন।" এই উক্তিটি বক্তা তাঁহার কোনও অপকারক শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। সুতরাং 'উপকার', 'সৌজন্য', প্রভৃতি শব্দগুলি ঠিক 'বিপরীত' অর্থকেই বুঝাইতেছে (অর্থাৎ 'অপকার', 'দুর্জনতা' ইত্যাদি)। এইস্থলে বিপরীত অর্থ লক্ষণার দ্বারা বোধিত হইতেছে প্রয়োজন অপকারের অতিশয় বুঝান। "আপনি আমার অপকার করিয়াছেন। আপনার মত দুর্জন ব্যক্তি দ্বিতীয় নাই। এই মুহূর্তেই আপনার মৃত্যু হউক।" এইরূপ অনাবৃত কর্কশোক্তির দ্বারা অপকারের গুরুত্ব যত না বুঝান যাইত, বিপরীত লক্ষণার দ্বারা সেই 'অপরাধাতিশয়' অতি নিপুণভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া লক্ষণার উদাহরণ সাহিত্যের মধ্যে প্রচুর আছে, এবং লৌকিক বাক্যব্যবহারের ক্ষেত্রেও উহাদের উদাহরণ প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। 'সাদৃশ্যমূলা লক্ষণা'র বিষয়েই আলোচনা করা যাউক। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহারই প্রচলন সমধিক ব্যাপক। সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের বর্ণনায় বলিয়াছেন—"বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর"। সত্যসত্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সিংহ' ছিলেন না। তবুও কবি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সিংহের সহিত অভিন্ন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য সিংহশিশু ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 'সাদৃশ্য' (resemblance) বুঝান—'বিদ্যাসাগর মহাশয় সিংহসদৃশ ছিলেন'—এইরূপ সোজাসুজি 'সাদৃশ্য' বর্ণনা করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিংহসমান গাম্ভীর্য, বীরত্ব ও উদারতার ততখানি গভীরতা উপলব্ধি সম্ভব হইত না। অতএব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, লক্ষণার তিনটি প্রধান সামগ্রী—মুখ্যার্থবোধ, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন অথবা রূঢ়ি।[১] প্রয়োজনমূলা

১। ইউরোপীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে (Rhetoric) লক্ষণার এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার ও প্রভেদ নিরূপণ সাধারণতঃ দেখা যায় না। Aristotle তাঁহার Poetics, গ্রন্থে 'metaphor'-এর চার প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন : "In the 21st chapter of his *Poetic* Aristotle defines metaphor as "the transference of a word to a sense different from its proper signification." Four kinds of metaphors are distinguished by him, namely, those in which the transference is made (1) from the genus to the species, (2) from the species to the genus, (3) from the species to the species, and (4) according to the *analogous*."—J. G. Jennings : *Metaphor*

লক্ষণার স্থলে যে 'প্রয়োজন-বোধ' উহাই 'ব্যঙ্গ্য'। 'রূঢ়ি' স্থলে কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব ব্যঙ্গ্যও নাই। এখন 'ব্যঙ্গ্য' কাহাকে বলে? ব্যঙ্গ্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার পূর্বে 'ব্যঞ্জনা' বা 'ধ্বনি' কাহাকে বলে বুঝা দরকার। আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

[৩] ব্যঞ্জনা (Suggestion)

পূর্বপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, প্রয়োজনমূলা লক্ষণার স্থলে লাক্ষণিক শব্দ হইতেই মূলীভূত প্রয়োজনের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। যে 'গঙ্গা' শব্দ 'অভিধা' ব্যাপারের দ্বারা প্রবাহরূপ মুখ্যার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই লক্ষণা-ব্যাপারের সাহায্যে সামীপ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট 'তট'-কেও বুঝায়, এবং সেই একই শব্দই আবার প্রবাহের অসাধারণ ধর্ম—যেমন শৈত্য পাবনত্ব প্রভৃতি গুণ-সমূহ, যাহা 'লক্ষণা'র প্রায়োজনরূপে কথিত হইয়া থাকে, তাহারও প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রয়োজনবোধ কোন্ শব্দব্যাপারের সাহায্যে সম্পন্ন হয়? মুখ্য অর্থ 'অভিধা'র দ্বারা প্রকাশিত হয়, লক্ষ্যার্থের জন্য 'লক্ষণা'র উপাসনা

in Poetry (Blackie and Son Ltd. 1915), p. 1. চতুর্থ ভেদটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের 'সাদৃশ্যমূলা লক্ষণা' বা 'গৌণীলক্ষণা'র সহিত অভিন্ন। যদিও Aristotle স্পষ্টভাবেই Metaphor প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নাই, তথাপি পরবর্তী রোমীয় সাহিত্য মীমাংসক Quintilian তাঁহার *Institutes of Oratory* নামক গ্রন্থে এই metaphor বা উপচার বা লক্ষণার তিনটি মূল লক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন: "He distinguishes three kinds of uses of metaphor. 'This change we make', 'he says (VIII, vi), 'either because it is necessary, or because it adds *force* (significance), or because it is more ornamental······In this threefold distinction of the uses of metaphor, into the necessary, the forcible, and the ornamental, we may recognise an advance in the analysis of the subject······" ঐ, পৃঃ ১৮-১৯। ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি প্রভেদ যথাক্রমে 'রূঢ়ি' ও 'প্রয়োজন'-মূলা লক্ষণার সহিত তুলনীয়। তৃতীয় প্রভেদটি (*ornamental*) সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে লক্ষণার অপব্যবহারমাত্র। তাঁহারা এইরূপ অহেতুক 'লক্ষ্যার্থ' প্রয়োগকে কাব্যদোষের মধ্যে পরিগণনা করিয়াছেন। এইরূপ 'উপচার' কবির প্রতিভাশক্তির দুর্বলতা ও দারিদ্র্যই সূচনা করে। দ্রষ্টব্য: নেয়ার্থং নেয়োঽর্থো যস্ত তৎ। নেয়ত্বং চ······রূঢ়িপ্রয়োজনাভ্যাং বিনা যা লক্ষণা নিবিদ্ধা তদ্বিষয়ত্বম্।"—গোবিন্দ ঠক্কুরকৃত: 'কাব্যপ্রদীপ' পৃ. ১৮০ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

করা হইয়া থাকে, কিন্তু এই 'প্রয়োজন'-রূপ অর্থের প্রতীতির জন্য কোন্ ব্যাপার কল্পনীয়? অনেকে বলিবেন, একই শব্দ হইতে যখন এইরূপ বিভিন্ন অর্থের বোধ হইতেছে, তখন বিভিন্ন ব্যাপারের কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? এক 'অভিধা' ব্যাপারের দ্বারাই সমস্ত অর্থের ক্রমিক বোধ সম্ভব হইতে পারে। কোনও বাধাই নাই। ইহাই কোনও কোনও আলঙ্কারিক আচার্যের সিদ্ধান্ত। তাঁহারা শব্দের 'অভিধা' (denotation) শক্তিকে ধনুর্মুক্ত গতিশীল শরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। জ্যামুক্ত বাণ যেমন আপন নিরবচ্ছিন্ন বেগবশে শত্রুর বর্ম ভেদ করিয়া তাহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করে, এই সকল ক্রমভাবী বিভিন্ন কার্যের জন্য যেমন তাহার বিভিন্ন গতি (motion) কল্পনার কোনও প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ 'গঙ্গা' শব্দটিও একই অভিন্ন 'অভিধা' ব্যাপারের সাহায্যে প্রথমতঃ মুখ্যার্থ, অতঃপর লক্ষ্যার্থ বা গৌণার্থ, অনন্তর প্রয়োজনরূপ অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছুই নাই! শরের গতির মত অভিধাব্যাপার দীর্ঘদীর্ঘ, সুদূরপ্রসারী। অতএব উপরি উক্ত ত্রিবিধ অর্থের বোধের জন্য তিনটি বিভিন্ন শক্তি বা ব্যাপার কল্পনার সার্থকতা কি?[১] ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিক সম্প্রদায় ইহার উত্তরে বলেন: একই অভিধা ব্যাপার যদি 'প্রবাহ' 'তট' এবং 'প্রয়োজন' (শৈত্য, পাবনত্ব প্রভৃতি ধর্ম) বুঝাইতে সমর্থ হয়, তবে যুগপৎ সমস্ত অর্থেরই প্রতীতি হয় না কি জন্য? মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং প্রয়োজন, এই ত্রিবিধ অর্থের প্রতীতির মধ্যে ক্রমিকত্ব দেখা যায় কেন? সবগুলিই ত' সমানভাবে অভিধাশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, বিভিন্ন অর্থের প্রতীতির জন্য বিভিন্ন শক্তির সাহায্য আবশ্যক। মুখ্যার্থের প্রতীতি অভিধাব্যাপারের ফলে ঘটিয়া থাকে, গৌণার্থ (metaphorical sense) বোধের জন্য 'লক্ষণা' স্বীকার করা হয়। এই লক্ষণাকে আলঙ্কারিকগণ অভিধাব্যাপারের 'পুচ্ছ' বা 'লেজুড়' বলিয়াছেন। কেননা অভিধাশক্তিকেই কোনও নির্দিষ্ট কারণবশতঃ প্রসারিত করিলেই লক্ষণায় উপস্থিত হওয়া যায়, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু 'প্রয়োজন' রূপ অর্থের বোধ কোন্ ব্যাপারের কার্য? ধ্বনিবাদিগণের মতে ব্যঞ্জনাব্যাপারই

১। 'সোঽয়মিষোরিব দীর্ঘদীর্ঘতরোঽভিধাব্যাপারঃ।'

(suggestion) ইহার একমাত্র নিমিত্ত। প্রয়োজনমূলা লক্ষণার স্থলে প্রয়োজনের প্রতীতি ব্যঞ্জনাব্যাপারের মহিমাবশে সম্ভব হয় বলিয়া, আলঙ্কারিকগণ প্রয়োজনের অপর নাম দিয়াছেন 'ব্যঙ্গ্য', অর্থাৎ যাহা ব্যঞ্জনাব্যাপারের দ্বারা প্রকাশ্য। সুতরাং প্রত্যেক শব্দেরই 'অভিধা', 'লক্ষণা' এবং 'ব্যঞ্জনা'—এই ত্রিবিধ ব্যাপার বা শক্তি (function) বর্তমান আছে, ইহাদের দ্বারা প্রকাশ্য অর্থের যথাক্রমে 'অভিধেয়', 'লক্ষ্য' এবং 'ব্যঙ্গ্য'—এইরূপ সংজ্ঞা।[১] লক্ষণার মূলে প্রয়োজনের প্রতীতির জন্য যে ব্যঞ্জনাব্যাপার আলঙ্কারিকসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন, উহার অপর নাম 'লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা'—কেননা, লক্ষণাই ঐ ব্যঞ্জনার বীজস্বরূপ, লক্ষণা আছে বলিয়াই ঐস্থলে ব্যঞ্জনাব্যাপার স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু লক্ষণার পরিধির মধ্যেই শুধু 'ব্যঞ্জনা' সীমাবদ্ধ নহে, এই ব্যঞ্জনাব্যাপারের ক্ষেত্র অতি ব্যাপক। কেবলমাত্র 'প্রয়োজন'রূপ অর্থই ইহার দ্বারা বোধিত হয় না। কবি যে 'অলঙ্কার' স্পষ্টভাবে কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করেন নাই, যাহা তিনি উহ্য রাখিয়াছেন, সেই অনুক্ত অলঙ্কারের প্রতীতিও এই তৃতীয় শব্দব্যাপারের মহিমাবশে সম্ভবপর হইয়া থাকে ; যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসচর্বণা কাব্যচর্চার চরম লক্ষ্য, সেই রসাস্বাদও এই ব্যঞ্জনাব্যাপারেরই অনন্যসাধারণ কার্য। সেইজন্য 'প্রয়োজন' (বস্তু), 'অলঙ্কার' এবং 'রস' এই ত্রিবিধ কাব্যতত্ত্বই ব্যঞ্জনাব্যাপারের দ্বারা বোধিত হয় বলিয়া কাব্যজ্ঞসমাজ ইহাদের সংজ্ঞা দিয়াছেন 'ব্যঙ্গ্য'। অপরদিকে শব্দার্থময় কাব্যের মধ্যে যদিও ব্যঞ্জনার উল্লাস স্বভাবতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি শব্দ এবং অর্থই এই ব্যঞ্জনাশক্তির একমাত্র আধার নহে। 'অভিনয়,' 'কটাক্ষ,' 'ইঙ্গিত,' 'রাগিণী'—সমস্তই ব্যঞ্জনাব্যাপারের লীলাক্ষেত্র। সাহিত্যের মত অভিনয় এবং রাগিণীও ব্যঞ্জনাশক্তিবশে বিচিত্র বস্তু ও রসের দ্যোতনা করিয়া থাকে—ইহা সহৃদয়সংবেদ্য। সুতরাং এই ব্যঞ্জনাশক্তির ব্যাপকতা অসীম। এই ব্যঞ্জনারই অপর নাম 'ধ্বনি'।

১। মুখ্যার্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ ॥

[৪] বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক

আনন্দবর্ধনাচার্য তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের প্রারম্ভে স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন যে, সাহিত্যে 'ব্যঞ্জনা' বা 'ধ্বনিবাদ' ভর্তৃহরিপ্রমুখ বৈয়াকরণ আচার্যগণের স্ফোটবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈয়াকরণ আচার্যগণকেই তিনি বিদ্বৎসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন—"প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ।"[১] সুতরাং শাব্দিক আচার্যগণ শব্দের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া যে স্ফোটতত্ত্ব ও ব্যঞ্জনাব্যাপার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, আনন্দবর্ধনপ্রমুখ সাহিত্যমীমাংসকগণ সাহিত্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সেই ব্যঞ্জনারই প্রবর্তন করিয়াছেন মাত্র, ইহা তাঁহাদের নূতন কোনও আবিষ্কার নহে। কিন্তু 'স্ফোট' কাহাকে বলে? এই প্রসঙ্গে শব্দের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ আমরা যে সকল শব্দ অর্থবোধের জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, উহারা কতকগুলি স্বতন্ত্র বর্ণের সমষ্টিমাত্র। যেমন 'গো'-শব্দ। গ-কার, ও ও-কার এই দুইটি স্বতন্ত্র বর্ণ লইয়া গো-শব্দটি গঠিত। কিন্তু যদিও গো-শব্দটি বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন বর্ণদ্বয় লইয়াই গঠিত, তথাপি গো-শব্দ বলিতে আমাদের একটি একক শব্দের বোধ হইয়া থাকে, আমাদের কখনই বর্ণগত দ্বৈতের বোধ হয় না। অথচ, বাস্তবদৃষ্টিতে ঐরূপ একক-শব্দের বোধ সম্ভব নয়। কেননা, আমরা যুগপৎ (simultaneously) 'গ'-কার ও 'ও'-কার এই দুইটি বিশিষ্ট বর্ণ উচ্চারণ করিতে সমর্থ নহি, আমাদের উচ্চারণস্থানের (organs of articulation) সেইরূপ শক্তিই নাই। যখন 'গ'-কার উচ্চারণ করি, তখন ও'-কার অনুচ্চারিতই রহিয়া যায়। আবার যখন 'ও'-কার উচ্চারণ করি, তখন পূর্বোচ্চারিত 'গ'-কার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব উৎপন্ন ও অনুৎপন্ন, বিনষ্ট ও উচ্চার্যমাণ বর্ণদ্বয়ের সংহতি কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই সংহতির অভাবে 'গো' শব্দগত অবিসংবাদিত ঐক্য (unity)-বোধ কিরূপে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে? এবং অসংহত, নিরর্থক (meaningless, insignificant) ক্রমোচ্চার্যমাণ বর্ণদ্বয় কি করিয়াই বা একটি বিশিষ্ট প্রাণিরূপ অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে পারিবে? সুতরাং 'গো'

১। "সূরিভিঃ কথিত ইতি বিদ্বদুপজ্ঞেয়মুক্তিঃ, ন তু যথাকথঞ্চিৎ প্রবৃত্তেতি প্রতিপাদ্যতে। প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্"—ধ্বন্যালোক-বৃত্তিঃ ১ম উদ্দ্যোত।

শব্দ বলিয়া পৃথক্ কোনও একক শব্দ নাই, উহা ভ্রান্তিমাত্র ; প্রকৃতপক্ষে, নিরর্থক ক্রমিক বর্ণগুলিকেই 'একক' শব্দ বলিয়া ভ্রম জন্মে। তবে কি সত্য-সত্যই ক্রমিক নিরর্থক বর্ণরাজি হইতে ব্যতিরিক্ত কোনও নির্বিভাগ, অখণ্ড, একক, সার্থক শব্দের অস্তিত্ব নাই ? ইহার উত্তরে ভর্তৃহরিপ্রমুখ শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন : সত্য বটে, ক্রমিক, নিরর্থক ক্ষণবিধ্বংসী বর্ণরাজির যৌগপদ্য, সংহতি ও সার্থকতা অসম্ভব। তথাপি 'গো' শব্দের যে অবিসংবাদিত ঐক্যবোধ ও সার্থকতা—তাহাকে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু এই ঐক্যবোধ কিরূপে সম্ভব হয় ? ভর্তৃহরি বলেন : 'গ'-কার, 'ও'-কার প্রভৃতি ক্রমোচ্চার্যমাণ ও ক্ষণধ্বংসী বর্ণসমূহ প্রত্যেকেই অখণ্ড, নিত্য ও সার্থক 'গো' শব্দটিকে অভিব্যক্ত করে, এবং যখন অন্ত্য (final) বর্ণটি অনুভূত হয়, তখন পূর্ব পূর্ব বর্ণের দ্বারা ঈষৎ অভিব্যক্ত নিত্য শব্দটি পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। এইরূপে, বর্ণগুলি যদিও ক্রমভাবী ও ক্ষণিক, তথাপি তাহারা প্রত্যেকেই একটি অখণ্ড, ক্রমরহিত সার্থক শব্দ (যেমন 'গো'-শব্দ) অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। এবং ঐ অখণ্ড পদটিই প্রকৃতপক্ষে অর্থবোধক। সুতরাং বর্ণসমূহ যদিও অসংহত নিরর্থক ও বহু, তথাপি অভিব্যক্ত পদটি সংহত, সার্থক এবং একক। ভর্তৃহরি বলেন : যে 'ব্যাপার' বা 'শক্তি' (function) বশে নিরর্থক বর্ণগুলি সার্থক, অখণ্ড পদের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে, তাহাকে 'ব্যঞ্জনা' বা 'ধ্বনি' বলে। 'ব্যঞ্জনা' শব্দের অর্থ অভিব্যক্ত করা ; যাহা পূর্ব হইতেই অজ্ঞাত-ভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহাকেই জ্ঞাত করিয়া দেওয়া। যেমন, অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে অজ্ঞাত ঘট প্রদীপালোকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। 'উৎপত্তি' (production) এবং 'অভিব্যক্তি'র (manifestation) মধ্যে প্রভেদ বহু। যাহা পূর্বে ছিল না, তাহাই যখন জ্ঞানগোচর হয়, তখন তাহা 'উৎপন্ন' হয়। যেমন, যে 'ঘট' পূর্বে ছিল না, তাহাই যখন মৃৎপিণ্ড হইতে আত্মলাভ করে, তখন তাহা 'উৎপন্ন' হয়। কিন্তু প্রদীপ যে ঘট প্রকাশিত করে, তাহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। সেইজন্য উহা উৎপন্ন হয় না 'অভিব্যক্ত' হয় মাত্র। 'উৎপন্ন' দ্রব্যের অপর নাম 'কার্যদ্রব্য', উহার হেতুর নাম 'কারক'হেতু। কিন্তু যে বস্তু অভিব্যক্তি লাভ করে মাত্র, উহার অপর সংজ্ঞা 'ব্যঙ্গ্য' (যেমন, অন্ধকারাবৃত ঘট) এবং অভিব্যক্তির যাহা হেতু, উহা 'ব্যঞ্জক'হেতু (যেমন, প্রদীপ) রূপে কথিত হইয়া

থাকে।[১] বৈয়াকরণগণের মতে যে অখণ্ড, ক্রমরহিত শব্দটি অর্থের বোধ করাইয়া থাকে, তাহাকে 'স্ফোট' কহে। সেই 'স্ফোট' নিত্য, উহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। তথাপি সর্বদাই উহার জ্ঞান জন্মে না। ক্রমিক, ক্ষণবিধ্বংসী, নিরর্থক বর্ণের উচ্চারণের দ্বারা ঐ অজ্ঞাত, নিত্য 'স্ফোটে'র জ্ঞান জন্মে, উহা অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। সুতরাং, উচ্চার্যমাণ ক্ষণিক বর্ণসমূহ প্রদীপের ন্যায় 'ব্যঞ্জক', সার্থক অখণ্ড স্ফোটশব্দটি অন্ধকারাবৃত ঘটের ন্যায় 'ব্যঙ্গ্য', এবং যে ব্যাপারবশে বর্ণরাজি স্ফোটশব্দকে অভিব্যক্ত করে, উহার নাম 'ব্যঞ্জনা'। আমরা যখন ক্ষণিক নিরর্থক বর্ণরাজি উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সেই সার্থক, অখণ্ড, নিত্য 'স্ফোট'শব্দকে অভিব্যক্ত করা—বর্ণগুলি কেবল উপায় মাত্র, উহাদের স্বগত কোনও প্রাধান্য নাই। স্ফোটই প্রধান, বর্ণসমূহ গৌণ অপ্রধান।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে: "ভাল, স্ফোটতত্ত্ব ও বৈয়াকরণ আচার্যগণের ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিবাদের স্বরূপ বুঝা গেল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই ধ্বনিবাদের অবকাশ কোথায়, উভয়ের মধ্যে কি এমন গূঢ় সাম্য আছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া আনন্দবর্ধনাচার্য সাহিত্য-বিচারের স্থলে বৈয়াকরণ ধ্বনিবাদের অবতারণা করিয়াছেন?" উত্তরে ধ্বনিবাদিগণ বলেন: "আপাতদৃষ্টিতে বৈয়াকরণ স্ফোটবাদ ও ধ্বনিবাদ সাহিত্যিক বিষয়বস্তুর সহিত যতই অসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন, নিপুণভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ধ্বনিবাদের সহিত সাহিত্যিক বিচারপদ্ধতির একটি সূক্ষ্ম ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাহিত্য-ক্ষেত্রে শাব্দিক ধ্বনিবাদের এই অন্তরঙ্গতার বিশ্লেষণেই নব্য সাহিত্যমীমাংসক-গণের মতবাদের নবীনতাও বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখিয়াছি শব্দ হইতে তিনপ্রকার বিভিন্ন অর্থের বোধ হইয়া থাকে—বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য। শব্দাত্মক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই অর্থভেদ সুস্পষ্ট। উত্তম কাব্যের কোনও একটি বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার একটি 'বাচ্যার্থ' আছে, যাহা ঐ বাক্যান্তর্গত বিভিন্ন শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারা বোধিত অর্থের সমষ্টিমাত্র। ঐসকল শব্দের বাচ্যার্থ বা কোষনির্দিষ্ট অর্থের (Dictionary meaning) যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনিই সমগ্র বাক্যটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম

১। স্বজ্ঞানেনান্যধীহেতুঃ সিদ্ধেঽর্থে ব্যঞ্জকো মতঃ।
যথা দীপোঽন্যথাভাবে কো বিশেষোঽস্য কারকাৎ॥

করিতে পারেন। কিন্তু কবি যখন ঐ বাক্যটি রচনা করিয়াছিলেন, তখন প্রাকৃতজনসংবেদ্য বাচ্যার্থটুকু প্রকাশ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আর একটি গূঢ়, অধিকতর চমৎকারী অর্থের দ্যোতনা (suggestion) ব ইঙ্গিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এইরূপে কবি যে অর্থ সাক্ষাৎভাবে শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারা প্রকাশিত না করিয়া পাঠকের 'সহৃদয়তা'র ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া আভাসে উহার নিগূঢ় সত্তার কথা জানাইয়া দেন মাত্র, কাব্যজ্ঞ সম্প্রদায় সেই অপ্রকাশিত অর্থকে "ব্যঙ্গ্যার্থ" বলিয়া থাকেন। আমরা স্ফোটতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে ঘটপ্রদীপের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছিলাম। আনন্দবর্ধনাচার্য সাহিত্যে ব্যঞ্জনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সেই একই উদাহরণের সাহায্য লইয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বাচ্যার্থ প্রদীপালোকের ন্যায়, আর অপ্রকাশিত নিগূঢ় অর্থটি, যাহা বুঝানই কবির প্রধান লক্ষ্য, তাহা ঘট-স্থানীয়। প্রদীপ যেমন অন্ধকার অপসারণ করিয়া ঘটটিকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলে, সেইরূপ কাব্যের বাচ্য অর্থটিও আভাসনির্দিষ্ট অর্থটিকে ব্যঞ্জিত করিয়া তুলে। নিরর্থক ক্ষণিক বর্ণরাজি যেমন সার্থক, অখণ্ড স্ফোটশব্দকে ধ্বনিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অতিসাধারণ প্রাকৃতজনসংবেদ্য বাচ্য অর্থটিও কবির ও সহৃদয়ের দৃষ্টিতে যাহা নিতান্তই তুচ্ছ, সেই অন্তর্গূঢ় ব্যঙ্গ্যার্থটিকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে। সুতরাং বাচ্যার্থটি 'ব্যঞ্জক', আর গূঢ় অর্থটি—কবি যাহা ভাষায় সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, উহা 'ব্যঙ্গ্য'। এবং যে ব্যাপারের দ্বারা বাচ্যার্থটি ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়, উহা 'ব্যঞ্জনা'। এইরূপে বাচ্যার্থটি কেবলমাত্র উপায়, উহা অপ্রধান, উহার কোনও চমৎকারিতা নাই। প্রদীপশিখা তখনই সার্থক, যখন সেই শিখার আলোকে প্রিয়ার রমণীয় মুখচ্ছবি দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। উহার নিজের কি কোনও চমৎকারিতা আছে?[১] কিন্তু যদিও বাচ্যার্থটি ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতির উপায়মাত্র, তথাপি ব্যঙ্গ্যার্থবোধের সময়েও বাচ্যার্থবোধ অন্তর্হিত হয় না। যেমন ঘট যখন আলোকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া উঠে, আলোকের জ্ঞান তখন অবলুপ্ত হয় না। উভয়েরই যুগপৎ প্রতীতি

১ "আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥"—ধ্বন্যালোক : কারিকা, ১।৯
—"আলোকনমালোকঃ। বনিতাবদনারবিন্দাবলোকনমিত্যর্থঃ।"—অভিনবগুপ্ত : লোচন

হইয়া থাকে।[১] বৈয়াকরণ আচার্যগণ যেমন স্ফোটশব্দটির অপর আখ্যা-'ধ্বনি' বলিয়া থাকেন, আলঙ্কারিকগণও 'ব্যঙ্গ্য' বা প্রতীয়মান অর্থটিকেও 'ধ্বনি' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, এবং যে কাব্যে এইরূপ ব্যঞ্জনাব্যাপারের মহিমাবশে অপ্রকাশিত অর্থান্তরের প্রতীতি সম্ভব হইয়া থাকে, তাহারও ধ্বনিকাব্য এইরূপ সংজ্ঞা অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রচলিত। নব্য আলঙ্কারিকগণ এই ধ্বনিকাব্যকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যে কাব্যের মধ্যে দ্যোতনা নাই, শ্রবণমাত্রেই যাহার অর্থবোধ ঘটিয়া থাকে, যাহা কেবল কতকগুলি শব্দঝঙ্কারের সমষ্টিমাত্র, যাহার মধ্যে অন্তর্গূঢ় 'লাবণ্য' নাই—মহাকবিগণের লেখনী হইতে সেইরূপ কাব্য কখনই প্রসূত হয় না। বাল্মিকী, কালিদাস, শেক্সপীয়র্, রবীন্দ্রনাথ ইঁহারা মহাকবি, কেননা ইঁহাদের কাব্যের মধ্যে এই দ্বৈত অর্থ পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে—একটি প্রাকৃতজনসংবেদ্য বাচ্যার্থ, আর একটি যাহা সেই বাচ্যার্থের পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া ব্যঞ্জনার রাজ্যে অবস্থিত, যাহা গোধূলির ধূসর সন্ধ্যার মত রহস্যময়,—অর্দ্ধেক প্রকাশিত অর্দ্ধেক ইঙ্গিতময়, অর্দ্ধেক আলোক অর্দ্ধেক অন্ধকার, কাব্যরসিকগণের সহৃদয়তা যাহার বোধের একমাত্র উপাদান। পরবর্তী একজন সাহিত্যমীমাংসক এই ধ্বনিকাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"নান্ধ্রীপয়োধর ইবাতিতরাং প্রকাশঃ
নো গুর্জরীস্তন ইবাতিতরাং নিগূঢ়ঃ।
অর্থো গিরামপিহিতঃ পিহিতশ্চ কশ্চিৎ
সৌভাগ্যমেতি মরহট্টবধূকুচাভঃ॥"

"অন্ধ্রনারীর অনাবৃত পয়োধর এবং গুর্জরদেশীয় রমণীর সযত্নপ্রচ্ছাদিত স্তনদ্বয় ইহাদের—কোনটিই যেমন সৌন্দর্যরসিকগণের দৃষ্টি বিলোভিত করিতে পারেনা, সেইরূপ সাহিত্যক্ষেত্রেও একান্তভাবে প্রকাশিত অর্থ এবং নিতান্ত নিগূঢ় অর্থ, কোনটিই কাব্যজ্ঞহৃদয় বিমোহিত করিতে পারে না। কিন্তু যে

১ "নহি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্দূরীভবতি। বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ। তস্মাৎ ঘটপ্রদীপন্যায়স্তয়োঃ। যথৈব হি প্রদীপদ্বারেণ ঘটপ্রতীতৌ উৎপন্নায়াং ন প্রদীপ-প্রকাশো নিবর্ততে, তদ্বদ্ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতৌ বাচ্যাবভাসঃ।"—ধ্বন্যালোক-বৃত্তি, পৃ. ২৩৬-৩৭ (কাশী সংস্করণ)

অর্থ মহারাষ্ট্রবধূর স্তনদ্বয়ের মত ঈষৎ অনাবৃত ও ঈষৎ আবৃত, তাহাই সহৃদয়ের প্রীতিকর।”[১]

কবি যাহা উহ্য আবৃত রাখিয়া দেন, ব্যঞ্জনাশক্তি তাহাকেই সহৃদয়ের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। এই আবরণভঙ্গই ব্যঞ্জনার মহিমা। দুইটিই মহাকবির স্বেচ্ছাকৃত, অথবা প্রতিভাপ্রসূত—আবরণ ও অনাবরণ। পল্লবাচ্ছাদিত জাতীকুসুমের যে শোভা, সযত্নবিন্যস্ত পত্রগুচ্ছহীন কোরকের সহিত কি তাহার তুলনা হয়? এই ঈষৎ আবরণের জন্যই মহাকবিবর্ণিত অর্থের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের কোনও ইয়ত্তা অবধারণ করা সম্ভবপর নহে। পাঠকের সহৃদয়তা ব্যঞ্জনাব্যাপারের সাহায্যে কত দিক্ দিয়াই না সেই অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করিবার চেষ্টা করে! তাহার ফলে কত বিচিত্র অর্থের উল্লাস সম্ভব হয়! প্রাকৃতকবি বাক্‌পতিরাজ সত্যই বলিয়াছেন—“প্রিয়ার বিভ্রমের ন্যায় সুকবিবাণীর অর্থের কোনও অবধি নাই, পুনরুক্তি নাই।”

১ পাঠকগণের নিকট হয়ত' উপমাটি অশ্লীল ঠেকিবে। কিন্তু যাঁহারা তথাকথিত আধুনিক কবিসম্প্রদায়ের কাব্যোদ্গার পান করিয়া স্থির থাকিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাতে নাসিকা কুঞ্চন করার কোনও যুক্তিই নাই!

ভারতীয় লোক-সাহিত্য

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল

প্রাচীন ভারতীয় লোকশ্রুতির তিনটি স্থূল ধারা আমাদের চোখে পড়ে। এদের প্রথমটি প্রাগার্য – প্রাগদ্রাবিড় বা অষ্ট্রিক (Austric), দ্বিতীয়টি দ্রাবিড়ীয় (Dravidian) এবং তৃতীয়টি আর্যিক (Aryan)। এদের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে রয়েছে আর একটি গৌণধারা যাকে আমরা তিব্বৎ-ব্রহ্মণ বা'বোদ্+ম্রন-মা "বা" ভোট-ব্রহ্ম (Tibeto-Burman) বলে থাকি। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, অপ্সরা প্রভৃতি কুল ভারতীয় নৃত্য, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা, সঙ্গীত, লিপি, ক্রীড়া ও বাদ্য-যন্ত্রকে উন্নত ও পুষ্ট করতে রীতিমত সহায়তা করেছিল। নৈমিষারণ্যের শেষ মহাধিবেশনের পর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যখন "ভারত সংহিতা" রচনায় সম্মত হন তখন তাঁর সহায়তা করতে অগ্রসর হন লিপিকর গণেশ। সিদ্ধকুলের গুরুই হচ্ছেন গণেশ এবং তাঁর আয়ত্তীকৃত লিপি হচ্ছে "সিদ্ধমাতৃকা" লিপি। এই লিপিতেই "ভারত সংহিতা" প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। "সিদ্ধমাতৃকা" শব্দের অর্থ হয়, সিদ্ধকুলের আয়ত্তীকৃত ও ব্যবহৃত 'মাতৃকা' বা অক্ষর সমষ্টি (Syllabery)। এই লিপি বিশেষভাবে বৈদিক ও লৌকিকের বর্ণমালানুগ ছিল। পরবর্তী কালে উত্তরভারতে গৃহীত এই লিপির নামকরণ হয় "সিদ্ধ-সারস্বত" এবং এই লিপির শেষ উত্তরাধিকারী হচ্ছে কাশ্মীরের "শারদালিপি"। বলা বাহুল্য, তথাকথিত ব্রাহ্মীলিপি যেমন প্রাকৃত ভাষার উপযোগী বাহন ছিল তেমনি সিদ্ধ-মাতৃকা বা সিদ্ধ-সারস্বত লিপি ছিল লৌকিক সংস্কৃতের।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে এই ভাবটি লোকশ্রুতির ধারার মধ্যে বিনিময়-সংমিশ্রণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ হয়ে একটি সর্ব-সমন্বিত ধারার উদ্ভব হয়। এই সমন্বিত ধারাটি কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে একই লোকশ্রুতির রূপ বদলিয়ে গিয়ে different versions বা বিভিন্ন রূপ দেখা দেয়। কিংবদন্তীগুলি stylized হয়ে সাহিত্যের মধ্যে স্থান পেতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ ও অপরিণত কিংবদন্তীগুলি সম্পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করে।

আর্যিক লোকশ্রুতি যা আমরা ঋগ্বেদে, যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে এবং বিভিন্ন আরণ্যক ও ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখতে পাই তা বহু প্রাচীন (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ থেকে ৮০০'র মধ্যবর্তী কালের)। এই সব কিংবদন্তীর মধ্যে প্রাচীনতর হচ্ছে "যম-যামী সংবাদ", "পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ", "ইন্দ্র বসুক্র সংবাদ", "সরমা-পণি সংবাদ" ও অন্যান্য "সংবাদ" শীর্ষক লোকশ্রুতি। পরবর্তী কালের লোকশ্রুতি হচ্ছে ব্রহ্মণস্পতির আদর্শে বৃহস্পতির, নদীরূপা সরস্বতীর বিদ্যাদেবীতে রূপান্তর বিষয়ক, বৃষাহরি বা বৃষাকপি বিষয়ক, পুণ্যলক্ষ্মী ও পাপলক্ষ্মীর যথাক্রমে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীতে রূপান্তর সম্বন্ধে মিত্র থেকে উরুক্রম-ত্রিবিক্রম ও হয়শীর্ষ বিষ্ণুর আবির্ভাব বিষয়ক, ইষ্টনেমি ও অরিষ্টনেমি বিষয়ক, কুহূ, যাতুধানী, শিনীবালী, উমা হৈমবতী প্রভৃতি নতুন দেবী-কেন্দ্রিক।

প্রাচীন ভারতীয় লোকশ্রুতির উল্লেখযোগ্য সংকলন ঘটেছিল মহাভারতে। বিশেষভাবে মহাভারতের আদিপর্বে ও বনপর্বে "চরিত্র" ও সংবাদ শীর্ষক কাহিনী প্রচুর দেখা যায়। ঐতিহ্য অনুসারে মহাভারতের প্রাচীনতম রূপ ভারত সংহিতা ২৪০০০ শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল। তারপর তার কলেবর বর্ধিত হ'তে হ'তে যখন লক্ষ শ্লোকে দাঁড়ায় তখন তার নতুন নামকরণ হয় "মহাভারত"। মহাভারত একাধারে ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ। কৌরব ও পাণ্ডবদের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি, বনবাস, অজ্ঞাতবাস, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, ধর্মরাজ্য সংস্থাপন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণই মহাভারতের ইতিহাস অংশ, শান্তিপর্বের সমস্তটাই ধর্মশাস্ত্র আর আদিপর্ব ও বনপর্বে পৌরাণিক কাহিনীর সন্নিবেশের ফলে মহাভারতের পুরাণ অংশ বর্ধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদিপর্বে পাণ্ডব কৌরবের উত্তর-পুরুষ ও পূর্ব-পুরুষদের বিবরণ অংশ বাদে অন্য যেসব আখ্যান ও উপাখ্যান স্থান পেয়েছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। এর পর বনপর্বে-ও পাণ্ডবদের পুরোহিত ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরকে যে সব কাহিনী শোনাচ্ছেন তার সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সভাপর্বে ও বিরাটপর্বেও অল্পসংখ্যক কাহিনী চোখে পড়ে। এইসব কাহিনী যেমন, প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, নল-দয়মন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, শ্রীবৎস চিন্তা, হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, চন্দ্রহাস-বিষয়া, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মহাত্মা শিবির উপাখ্যান, অণিমাণ্ডব্যের উপাখ্যান, অজামিলের উপাখ্যান প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় কিংবদন্তীর পরিচায়ক। রামায়ণেও বিশেষভাবে কিছু কিছু দক্ষিণ-ভারতের কিংবদন্তীর

ধরাছোঁওয়া পাওয়া যায়, যেমন অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য অভিযান, অসুরদমন ও সমুদ্রপান, মাল্যবান ও মান্ধাতার বিবরণ ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে গরুড়ের জন্মবৃত্তান্ত, গজ ও গ্রাহের যুদ্ধ, জয়-বিজয়ের কাহিনী, হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুর বিবরণ, পুরঞ্জয় রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় লোকশ্রুতিরই অংশ।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত পুরাণগুলি ছাড়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীর প্রথম, মধ্যম ও উত্তম-চরিতে বিধৃত মধু ও কৈটভের কাহিনীতে দেখা যায় যে ঐ দুই দৈত্যের মেদ থেকে পৃথিবী গঠিত হয়েছিল বলে তার অন্য নাম "মেদিনী"। এই রকম ধারণা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কোন শাখার, যেমন Mon মন্ বা Khmer-এর হওয়াই সম্ভব। পিতা পশুপতি এবং মাতা পৃথিবী ধারণাও Suhmer বা Sumer সুহ্ম অর্থাৎ সুহ্মদের বলে মনে করা হয়। এরই পরবর্তীকালীন অনুরূপ ধারণা হচ্ছে "গণেশ" অর্থাৎ হাতী দেবতা, যাকে 'হেড়ম্ব' বলা হয়ে থাকে, তিনি কোঁচ, ধীমাল প্রভৃতি পর্বতবাসী উপজাতির উপাস্য দেবতা "হেড়ম্ব"। ইনি "সিদ্ধেশ"ও বটে, এবং নগেশও বটে কেননা ইনি সিদ্ধদের নায়ক এবং নাগজাতির নায়ক। সব রকমের শিল্পকলা এর করায়ত্ত। ইনি আবার 'নটেশের' পুত্র এবং "মুরুগেশ" বা কার্ত্তিকের ভাই। দ্রাবিড়ীয় জাতিদের চক্ষে "মুরুগেশ" একজন ঐশ্বর্যশালী, বীরযোদ্ধা ও বাঞ্ছা-কল্পতরু দেবতা। দ্রাবিড়দের মতে নটেশও শিল্পকলার অধিদেবতা। অতি প্রাচীনকালে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির দেবদেবী সম্বন্ধে ধারণার কি রকম যে বিনিময় ঘটেছিল তা' এগুলি লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়।

সপ্তশতী চণ্ডীর মূল আখ্যানবস্তু বিচার করলেও তার মধ্যে কিভাবে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় উপাদান মিলিয়ে মিশিয়ে রয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায়। রক্ত-বীজের প্রসঙ্গটি নিশ্চিতভাবে অষ্ট্রিক উপাদান যার আরেকবার সাক্ষাৎ পাই আমরা মহাভারতের আদিপর্বে, যেখানে রয়েছে কুন্তীর পুত্র আগেই জন্মেছে শুনে গান্ধারী তাঁর অপরিণত গর্ভ ছিঁড়ে ফেলেন। সেই খবর শুনে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হস্তিনাপুরে এসে শত মৃৎভাণ্ডে গান্ধারীর শরীরের রক্তবিন্দু সঞ্চিত ও সঞ্চারিত করে দেন এবং মন্ত্র পড়ে চাপা দিয়ে যান। তারপর যথাসময়ে শতভাণ্ডে শতপুত্রের জন্ম হয়। রক্তবীজের ও গান্ধারীর শতপুত্রের জন্মকাহিনী সজাতীয়। এই ধারণা আসলে সুহ্ম, রাড়ে, ম্যঅঙ্ প্রভৃতি

উপজাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে যে মৌলিক ধারণা—একটা বৃহৎ লাউ ফেটে গিয়ে তার অসংখ্য বীজ থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়, তার থেকেই উৎপন্ন।

চণ্ডীতে উল্লিখিত "কোলা-বিধ্বংসিনঃ" আসলে শূকর হন্তা কোল বা মুণ্ডা। সেনাপতি "চণ্ড" যদি আধুনিক চোড় বা চোল জাতীয় হন তবে "মুণ্ড" ছিলেন মুণ্ডা জাতীয়। শুম্ভ ও নিশুম্ভ (="সুহ্ম" ও "নে+সুহ্ম") সুহ্ম উপজাতীয় সর্দার ছিলেন। নে-বা নি-উপসর্গ ক্ষুদ্রার্থক। মহিষাসুর শব্দের দুই অর্থ হ'তে পারে; প্রথমটি হচ্ছে "মহিষ" অর্থাৎ বলবান+অসুর; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহিষা মণ্ডলের অসুর বংশীয় রাজা। মহিষা মণ্ডলের অসুর রাজা হ'লে তিনি দ্রাবিড় বংশীয় ছিলেন। চণ্ডী স্বয়ং ছিলেন চোড় বা চোল মাতৃকাতন্ত্রের নায়িকা। তাঁর সহায়িকা কৌশিকী ছিলেন "কুশিক" বা "কৌশিকদের মাতৃকা-তন্ত্রের নায়িকা এবং কালিকা ছিলেন "কালক"-দের মাতৃকাতন্ত্রের নেত্রী। এই সব উপজাতি বর্তমানে প্রাধান্য হারিয়ে অন্যান্য উপজাতির কাছে আত্মসত্তা বিক্রয় করেছে। Russian "Cazac" ও "Kulak" আমাদের "কুশিক" ও "কালকে"র প্রতিশব্দ, এবং মনে হয় এরা মূলতঃ কোন আনার্যিক উপজাতিই ছিল—যারা প্রাগৈতিহাসিক কালে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। মোটকথা সপ্তশতী চণ্ডীর মূল কাহিনী হচ্ছে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক মাতৃকাতন্ত্রের যুদ্ধাভিযান। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত পুরাণগুলি ছাড়া পদ্মপুরাণের সব কয়টি খণ্ডে, (খিল) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও কল্কিপুরাণে—রাম, সীতা রাধা, কৃষ্ণ, গণেশ ও কল্কি অবতার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী লক্ষ্য করা যায়। "কল্কি" শব্দের অর্থ অনাগত কাল। সুদূর অনাগতকালে মানুষের রূপ ও ব্যবহার কি হবে, তার সামাজিক অবস্থা কি দাঁড়াবে তাই নিয়ে পূর্ববর্তী বামন অবতারের আদর্শে যুগন্ধর পুরুষ সম্বন্ধে নানা জনপ্রিয় কল্পনা যে লোকশ্রুতির রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার বিবরণ রয়েছে কল্কিপুরাণে। ভৃগুরাম, রাম, বলরাম ও বুদ্ধ হচ্ছেন ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁদের কেন্দ্র করে যেটুকু লোকশ্রুতি গড়ে উঠেছিল তা অল্পই এবং আর্যিক প্রকৃতির। রামচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে রামাইয়াত সম্প্রদায়ের বাল্মীকীয় রামায়ণ ছাড়া "অধ্যাত্ম রামায়ণ" ও "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ"—যা লিখিত হয়েছিল, তাদের মধ্যেই অধিকাংশ লোকশ্রুতি বিধৃত হয়েছিল, বাকীটুকু "পদ্মপুরাণে" গৃহীত হয়েছিল। বিশেষভাবে মৎস্য,

কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ পুরাণে প্রাচীনতর জনশ্রুতি যা সংগৃহীত হয়েছিল তার আদিস্তর অষ্ট্রিক, মধ্যস্তর দ্রাবিড়ীয় এবং এই দুটির সমন্বিত রূপের ওপর দেওয়া হয়েছিল আর্যিক পালিশ।

এর পর জৈন ও বৌদ্ধজাতকের আলোচনা করা উচিত। জৈন জাতক সাধারণ উপাখ্যানের মত সরল প্রকৃতির। তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতির পূর্বজন্ম ও ইহজন্মকে কেন্দ্র করে জাতক-গল্প গড়ে উঠেছিল সামান্য কিছু। এদের মধ্যে কোন-না-কোন "যাম"-এর সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধজাতক সংখ্যায় পাঁচশতেরও অধিক। এই পাঁচশতেরও অধিক জাতকের মধ্যে প্রায় একশত পঞ্চান্নটি জাতক অকৃত্রিম। এদের গঠনভঙ্গী ত্রিধা, যথা—(১) অতীত বস্তু, (২) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও (৩) সমাধান। বৌদ্ধজাতকগুলির লোকশ্রুতির দিকটি ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। ঐতিহাসিক মূল্যও এদের যথেষ্ট। আবার, কতকগুলি জাতকের সঙ্গে হিতোপদেশের কতকগুলি গল্পের মিল আছে (যেমন, "সীহচম্ম জাতক", ইত্যাদি) এবং কতকগুলি জাতক বেশ পুরান বলে মনে হয়, যেমন দধি বাহন জাতক, কূট বণিজজাতক, কপিজাতক, তেল-কটাহ জাতক, বণ্ণুপথ জাতক, বেদব্ভ জাতক, ইল্লীস জাতক, নিগ্রোধমিগ জাতক, মূল পর্যায় জাতক, সুংসুমার জাতক[১] ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতীয় লোকশ্রুতির পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কোষতুল্য সংগ্রহ ছিল গুণাঢ্যের লেখা "বড্ডকহা"। "বড্ডকহা"র সংস্কৃত প্রতিশব্দ হয় "বৃদ্ধ কথা"। কবি ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব ও বুদ্ধদত্ত প্রভৃতি একে ধ'রে নিয়ে ছিলেন "বৃহৎ কথা" বলে। সংস্কৃত "বৃহৎ" শব্দের প্রাকৃত প্রতিশব্দ হয় "বিরাট" —তা যে-কোন প্রাকৃতই হোক না কেন। আমার অনুমানের সমর্থন পাই মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতে যেখানে যক্ষ তার দূত মেঘকে বলছে—

"প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান" ইত্যাদি-পূর্বমেঘ ৩১।

এবং—

"প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে,
হৈমং তালবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্‌ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্য দর্পা—
দিত্যাগন্তূন রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ॥" পূর্বমেঘ, ৩৩।

ঐতিহ্য অনুযায়ী "বড্ড কহা" লেখা হয়েছিল পৈশাচী প্রাকৃতে। তার কেন্দ্র পুরুষ ছিলেন উদয়ন। যে ভাবেই হোক "বড্ডকহা" ধ্বস্ত ও লুপ্ত হওয়ার পর ঐতিহ্য অনুসারে তার কাহিনীগুলি পুনরুক্ত ভাবে হোল সংস্কৃতে লেখা (১) বৃহৎকথা শ্লোকমঞ্জরী, (২) বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ ও (৩) কথাসরিৎসাগর। কালিদাসের কাল পর্যন্ত ভারতীয় আখ্যান সাহিত্যে উদয়ন-বাসবদত্তার যে অব্যাহত প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল তা পূর্বোক্ত শ্লোক দুটি থেকেই বুঝতে পারা যায়, তাছাড়া বড্ডকহার কাহিনী নিয়ে কবি ভাস, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি অনেকেই নাটক রচনা করেছিলেন। "হিতোপদেশ" ও "পঞ্চতন্ত্র" শীর্ষক গল্পসঙ্কলন দুটি অতি প্রাচীন। ঠিক কোন সময়ে এ দুটি রচিত হয়েছিল তা বলা দুষ্কর। হিতোপদেশের পশুপক্ষী বিষয়ক গল্পগুলি কিছু কিছু নীতিযুক্ত থাকায় কালক্রমে এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে পার্শী, আরবী ও গ্রীকভাষায় পর্যন্ত তার অনুবাদ করা হয়। আরবীভাষায় পঞ্চতন্ত্রের যে অনুবাদ হয়, তার নাম হয়—"কলিলহ-ব দিমনহ" "বেতাল পঞ্চবিংশতির" অনুবাদ হয় "সিদ্দিবেতাল" এবং হিতোপদেশের অনুবাদের "বিদপাই" নামকরণ হয়। পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্গত গল্প মোট পাঁচটি, যথা, মিত্রলাভ, মিত্রভেদ, লব্ধপ্রণাশ, কাকোলূকীয় ও অপরীক্ষিতকারক। পার্শী অনুবাদে হিতোপদেশ হয়ে দাঁড়ায় —হিতোপদেশ > হিদোপএস > ইদপএস > বিদ্পাই। হিতোপদেশ > Ædo-pa-aes > Æopa-aes > Æpo-es > Æsoep > Æsop গ্রীকে তার রূপ হয়।

এদের পর গুপ্ত যুগের শেষ দিকে "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকোপাখ্যান" রচিত হয়। এই গল্প সংগ্রহ দুটির কেন্দ্রপুরুষ হচ্ছেন বিক্রমাদিত্য। ইনি যে কোন্ বিক্রমাদিত্য তা বলা দুষ্কর, কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে একাধিক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ ও পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের বিক্রমাদিত্যে একাধারে যোগী, তান্ত্রিক ও সুবিচারক ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের পর ভারতীয় আখ্যান সাহিত্যের কেন্দ্র পুরুষ হ'ন শালিবাহন। এর পর "শুক সপ্ততি", আচার্য দণ্ডীর, "দশকুমার চরিত" ও বাণভট্টের "কাদম্বর্যম্"।[৩]

পাদটীকা

১। স্বর্গত ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতক-মঞ্জরী'র ভূমিকায় লেখক Æsop's

Fables-এর বহু গল্পের সাদৃশ্য জাতকের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় বলে দেখিয়েছেন, যেমন এর 'কুকুর ও তার প্রতিবিম্ব' 'চুল্লধনুগ্গহ জাতক', সিংহ-চর্মাবৃতগর্দভ কথা—'সীহ-চম্ম জাতক'। এই রকম এক চক্ষু হরিণের গল্প, নেকড়ে বাঘ ও গৃহপালিত কুকুর, দুই জল-পাত্রের বিবাদ প্রভৃতি গল্পের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়--একপন্নজাতক, বড্ঢকী শূকর জাতক, রাজাব বাদজাতক প্রভৃতির সঙ্গে। মহাউম্মগ্গজাতকের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় Bible এ উল্লিখিত King Solomon's Judgement-এর সঙ্গে। King Richard I ইংলণ্ডে ফিরে আসার পর প্রজাদের, Barons ও Knight-দের কাছে যে গল্পটি বলেছিলেন তা হচ্ছে আসলে 'সচ্চংকির জাতক।' Chaucer-এর Pardoner's Tale বেদব্ভ জাতকের রূপান্তর মাত্র। Tales of Uncle Rhemes-এর কোন একটি গল্পের সঙ্গে পঞ্চাবুধ জাতকের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। Bible-এ উল্লিখিত Jesus-এর পাঁচখানি মাছ ভাজা দিয়ে পাঁচশো লোককে খাওয়ানোর গল্পের মিল দেখতে পাওয়া যায় ইল্লীস জাতকের-সঙ্গে। দধিবাহন জাতকের রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায় Grimm's Fairy Tales-এর একটি গল্পে।

২। 'বড্ডকহা' লেখা হয়ে থাকলে খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম থেকে ৩য় শতকের মধ্যেই তা লেখা হয়ে থাকতে পারে, আর বুদ্ধদত্তের, সোমদেবের ও কবি ক্ষেমেন্দ্রের, "বৃহৎকথামঞ্জরী", "বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ" ও "কথাসরিৎসাগর" বহু পরবর্তী কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক থেকে ১০ম শতকের মধ্যে লেখা হয়েছিল। সুতরাং কালগত পার্থক্য অনেকখানি থাকায় ঐতিহ্যের অনুসরণ কতটুকু হয়েছিল তা সন্দেহযোগ্য। সন্দেহের সূত্র আরও অনেক আছে বলে মনে হয় উল্লিখিত সাহিত্যগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

এর উল্লেখ করতে হয়। সাত জন জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান ব্যক্তির উক্ত গল্পের সঙ্কলন হচ্ছে 'শুকসপ্ততি'। শুক শব্দের অর্থ জ্ঞানী। শুক-সপ্ততি কালক্রমে অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় পার্শী ও আরবী ভাষায় তার অনুবাদ হয় এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ খ্রীষ্টীয় শতকে Spanish ও Italian ভাষাতেও তার অনুবাদ হয় Novelle di Sette Savi। আচার্য দণ্ডীর দশকুমার চরিত ও বাণভট্টের 'কাদম্বরী' আসলে "প্রবন্ধ" নামে পরিচিত হলেও Prose Romance। দশকুমার চরিতে রাজবাহন, মিত্রগুপ্ত প্রভৃতি দশজন কুমারের adventures বা

বীর কীর্তি বর্ণিত হয়েছে, আর কাদম্বরীতে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। কাদম্বরী উপন্যাসের মতই সুদীর্ঘ ও চিত্তাকর্ষক পাঠ্য; James Joyce-এর Ulysses-এর সঙ্গে এর সংগঠনের তুলনা করা চলে আর দশকুমারচরিত কিশোর ও তরুণদের পাঠোপযোগী আরামদায়ক গল্প। ভাষা উভয়েরই কঠিন ও মার্জিত; বাক্যগুলি সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদযুক্ত। যাই হোক কাহিনীগুলি সবই ভারতীয় কিংবদন্তীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

প্রাকৃতে রচিত একখানি উল্লেখযোগ্য গল্প-সংগ্রহ হচ্ছে 'বজ্জালগগ', 'বজ্জালগেগর' অনেক কাহিনীই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এটি ছাড়া আরও অনেক গল্প প্রাকৃতে আছে। সংস্কৃতে রচিত বিদ্যাপতি ঠাকুরের "পুরুষ পরীক্ষা" একখানি কৌতুকপ্রদ চমৎকার গল্প-সঙ্কলন। পুরুষপরীক্ষার গল্পগুলির ভাষা সহজ ও সাবলীল; রচনার কাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক।

প্রাচীন ভারতীয় লোকশ্রুতির যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে (Motifs) আমরা নিত্য ও অমোঘ বলে মনে করি, সেগুলি হচ্ছে (১) অপূর্ব ধর্মপ্রাণতা, (২) পরলোক বিশ্বাস, (৩) সপত্নী বিদ্বেষ, (৪) রাজভক্তি, (৫) কর্তব্য-পরায়ণতা, (৬) অতিথিসেবা, (৭) সতীত্বের মূল্য, (৮) গুরুভক্তি, (৯) তীর্থ মাহাত্ম্য ও (১০) দান মহিমা।

৩। Rider Haggard-এর "She" উপন্যাসের বিষয়বস্তু "কাদম্বর্যম্" থেকেই আহৃত।

পশ্চিম বঙ্গ

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে অন্ততঃ ভারতের পূর্ব দিকের প্রদেশগুলিতে গোপীচাঁদের গল্প, মীননাথ-গোরক্ষনাথের গল্প, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গল্প প্রচলিত ছিল। রাজসুখের মধ্যে থেকেও রাজা গোপীচাঁদের মায়ের আদেশে ও গুরুর কথায় সর্বস্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে যাওয়া, ভিক্ষা করা, মাথা কামান, সন্ন্যাসী সাজা, দুই রানীর চোখের জলে দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস অপেক্ষা করা-র গল্প একদিন খুবই জনপ্রিয় ছিল। যোগীগুরু মীননাথ ও গোরক্ষনাথের নানা পরীক্ষা, প্রশ্ন ও প্রহেলিকা বিষয়ক গল্প, কবি কালিদাস সম্বন্ধে নানা বুদ্ধিপূর্ণ গল্প, রাজাভোজের গল্প ও ভর্তৃহরির গল্প লোকে শুনতে খুবই ভালোবাসত। এই সময়েই বাংলাদেশে খনা ও মিহিরের গল্প গজিয়ে

ওঠে। অধুনা প্রচলিত 'খনার বচন' ও 'ডাকের বচন' যা প্রথমদিকে প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে নিহিত ছিল এবং যার মধ্যে লোকশিক্ষার অনেক উপাদান নিহিত ছিল তা লোকমুখে প্রচলিত থাকার ফলে অপভ্রংশের খোলস ফেলে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে বাংলা, উড়িয়া ও অসমীয়া রূপ লাভ করেছিল, অথচ এই জাতীয় প্রবাদগুলি একদল তান্ত্রিক-জ্যোতিষী ও জৈন সন্ন্যাসী (ক্ষপণক) সাধারণ গৃহস্থের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছিলেন। বহু পূর্বেই গোরখনাথের নাম দিয়ে অনেক প্রহেলিকা, যাদের সাধারণ নাম ছিল "গোরখ ধন্ধ" (গোলক ধাঁধা) প্রচলিত ছিল। গুরুবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের সাধক জীবনের কিছু কিছু গল্পও প্রচলিত ছিল। রাজা মহীপালের দান ও কীর্তিবিষয়ক কিছু-কিছু গল্প অবশ্যই সেই সঙ্গে প্রচলিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আরও কিছু কিংবদন্তী ও লৌকিক কাহিনীর উদ্ভব ও প্রচলন হয়। দক্ষিণ রায়, কালু রায়ের যুদ্ধ-কাহিনী, ময়না-গড়ের ইছাই ঘোষের কাহিনী, শিবদুর্গার ঘর-করনার গল্প, রাক্ষস-খোক্কস, ভূতপেত্নী ও পরীর গল্প দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। বাঘের অত্যাচারের নানা গল্প, ডাকাতদের ডাকাতির গল্প ও বীর পুরুষের বীর কীর্তির গল্পও খুব প্রচলিত ছিল। কাশীতে গিয়া বাঙালী ব্রাহ্মণের অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার ফলস্বরূপ দেবীদুর্গা ও অন্নপূর্ণাকে কেন্দ্র করিয়া নানা গল্প গজাইয়া ওঠে। এছাড়া রাজা-রাজড়ার গল্প যেমন রাজা প্রতাপাদিত্যের গল্প, রাজা সীতারামের গল্পও কালক্রমে প্রচলিত হয়েছিল, প্রসিদ্ধ রঘু ডাকাত ও বিশু ডাকাতের বীর কীর্তি ও দানবিষয়ক নানা গল্প, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে বাঙালী সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল এবং মগ, বর্গী ও পোর্তুগীজ বোম্বেটিয়াদের উৎপাত ও অত্যাচারের কাহিনী এই সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ বিদূষক বীরবল ও গোপাল ভাঁড়ের নামাঙ্কিত নানান মজার গল্প খুবই চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয় ছিল।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিবিধ-বিস্তর সাহিত্যের অভ্যুত্থান খ্রীঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের পূর্বে ঘটে নাই। বাংলার মঙ্গলকাব্য বাঙালীর নূতন পুরাণ প্রণয়নের চেষ্টা এবং এই জাতীয় সাহিত্য একমাত্র বাঙলাতেই নিবদ্ধ। প্রাচীন পুরাণগুলি থেকে কতকগুলি দেব-দেবী চরিত্র আহরণ করে এনে তাদের নূতন-

রূপে পরিবেশণ করাই ছিল মঙ্গলকাব্যের কবিদের উদ্দেশ্য। এ রকম দেব-দেবী হচ্ছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে উল্লিখিত চণ্ডী, দেবীভাগবত, কালিকা-পুরাণ ও সপ্তশতী চণ্ডীতে উল্লিখিত কালিকাদেবী, অন্নদাকল্প ও কাশী খণ্ডে উল্লিখিত অন্নপূর্ণা, ভাগবতে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই নব রূপ ধারণ ও নব বেশ পরিধান ক'রে মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকায় পূজাপ্রার্থী ও পূজাপ্রার্থিনী হ'য়ে দেখা দিলেন। নূতনের মধ্যে মনসা ও ধর্মঠাকুর সমারোহে ও সাড়ম্বরে দেখা দিলেন। মনসা যে শিবের মানস-কন্যা ও চণ্ডীর প্রতিস্পর্দ্ধিনী এটাই নূতন কথা। ধর্মঠাকুর ত হিন্দুধর্ম বহির্ভূত শূন্য-নিরঞ্জন। বঙ্গীয় সমাজে কোনও অতীতযুগে যোগীজাতির প্রাধান্য পর্বে এই দেবতার আবির্ভাব ঘটেছিল। বৈশাখ ও কার্তিক মাসে ধর্মঠাকুরের গাজন হ'তো রাঢ় অঞ্চলে। শূন্য পুরাণে এই ঠাকুরের পূজা-পদ্ধতির বিধি-নির্দেশ দেখ'তে পাওয়া যায়। কিন্তু মনসা কোথাকার দেবতা? তিনি কি বৈদিক নাগমাতা "তৈমাতর" বা "দৈমাতর"? কিংবা দ্রাবিড়বর্গের পূজ্যা "মাংচা", কিংবা অষ্ট্রিক জাতির উপাস্যা "চিয়াং" (বা চ্যাং) "মোডিকানি" (বা মুড়িকানি)? অথবা সকলের সম্মিলিত রূপ? ভারতবর্ষের অল্পবিস্তর সকল প্রদেশে সর্পের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যেই এই দেবতার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। বাংলা দেশে যিনি মনসা, বিহারে তিনি বহুলা বা বিহুলা। "মনসা" শব্দ যদি দ্রাবিড়ীয় "মাংচা"র সংস্কৃতায়িত রূপ হয়, তবে "বহুলা—বিহুলা"-রূপ এল কোথা থেকে? বিহারে যিনি নাগমাতা, পশ্চিমবঙ্গে তিনি বেহুলারূপে সায়্‌বেণের ঝী ও লখীন্দরের স্ত্রী হ'য়ে এলেন কিরূপে? বাঙালী কাব্যকার কেউ কেউ বেহুলাকে "বিপুলা" করেছেন, সাঁতালী পর্বতকে সপ্ততাল পর্বতে পরিণত করেছেন, লক্ষ্মীধরকে লখিন্দর করেছেন এবং মূল আখ্যায়িকার motif পরিবর্তিত ক'রে বেহুলাকে আদর্শ সতীরূপে সাব্যস্ত করেছেন। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জলে ভাসালে জলীয়বায়ুর সংস্পর্শে সে বেঁচে ওঠে এবং বিষের প্রভাব নষ্ট হ'য়ে যায়—অন্ততঃ এই বিশ্বাস মহাভারত থেকে বাঙালী কাব্য-কারেরা সংগ্রহ ক'রে বেহুলার গল্প আরোপিত ক'রেছিলেন তির্যগ্‌ভাবে, অর্থাৎ কলার মান্দাস ভাসিয়ে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার ফলে নেতা ধোপানীর ঘাটে আগমন এবং সেখানে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রয়োগ দেখিয়ে নেতা ধোপানীকে ধ'রে স্বর্গে গিয়ে দেবসভায় বেহুলার নৃত্য প্রদর্শন

এবং দেবতাদের, এমনকি, মনসাকে সন্তুষ্ট ক'রে স্বামীর পুনরুজ্জীবন ঘটান ও মর্ত্যে ফিরে গিয়ে মনসাদেবীর পূজা প্রচারের প্রতিশ্রুতি দান ইত্যাদি। মূল কাহিনী সম্ভবতঃ এরূপ ছিল না, সুতরাং motif ও theme দারুণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। স্বয়ং বিষহরি মর্ত্যে আপনার পূজা প্রচারের জন্য মনসা পূজার বিরোধী শৈব চন্দ্রধরের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ সেজে লক্ষ্মীধরকে সর্পদষ্ট করিয়ে এবং বাঁচিয়ে দিয়ে আপনার মহিমা প্রচারিত করিয়েছিলেন, কারণ আমরা দেখতে পাই যে বিষহরি ও বেহুলা শব্দের মধ্যে গোত্রগত সম্পর্ক রয়ে গেছে, যেমন, বিষহরি > বিখ্ হরি > বিহ্ হরি > বিহালি > বিহালা > বিহলা > বিহুলা > বেহুলা। আবার বিহুলাকে বাঙালী কাব্যকারেরা সংস্কৃতায়িত ক'রে বিপুলা-য় পরিবর্তিত করেছিলেন। অপরপক্ষে বেহুলা হয়ত কোন জাঙ্গলী বা সর্পবিষবিদ্যায় পারদর্শিনী বণিক কন্যা ছিলেন যিনি কাল নাগ বা উদয়কাল কর্তৃক দংশনের পর স্বামী লক্ষ্মীধরকে জলের সংস্পর্শে এনে ঝাড়-ফুঁক, তাগা বাঁধা, মন্ত্র-তন্ত্র বা জড়ি-বুটির সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত ক'রে সর্পসঙ্কুল দেশে নাগমাতার পূজা প্রসারের জন্য শ্বশুর চন্দ্রধরকে দিয়ে প্রথমে মনসার পূজা করান। এমনও হ'তে পারে যে এই দুইটি ঐতিহ্যের একটি অষ্ট্রিক জাতির ও অন্যটি দ্রাবিড়গোষ্ঠীর এবং এই দুইটি ঐতিহ্যকে মিলিয়ে-মিশিয়ে যা দাঁড়িয়েছিল তার উপর আর্য ঐতিহ্যের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ও সতীত্ব মহিমার ওপর-চটক আরোপিত ক'রে হিন্দু মঙ্গলকাব্যকারেরা সমগ্র কাহিনীটিকে Hinduised বা synthesised ক'রে নিয়েছিলেন।

চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যানবস্তুর মধ্যেও অনুরূপ দুইটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। একটি প্রাগার্য—প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় ও অন্যটি দ্রাবিড়ীয়। গোধিকা যে চণ্ডীর প্রতীক ইহা কোন পুরাণেই পাওয়া যায় না। অথচ গোধিকা নিষাদ জাতির পক্ষে হত্যা করা নিষিদ্ধ (tabooed)। কালকেতু ব্যাধ বনে গিয়ে যেদিন কোন শিকার-যোগ্য পশু পেল না সেইদিনই সে পথিপার্শ্বে গোধা দেখে নিরাশ হয়ে ধনুকের ছিলায় গোধাটিকে উঠিয়ে নিয়ে গৃহে ফিরে এল। পরে সেই গোধিকা দেবীমূর্তি ধারণ ক'রে ফুল্লরাকে দেখা দিলেন। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম আখ্যানবস্তু কালকেতু ব্যাধের পালা নিঃসন্দেহে অষ্ট্রিক ঐতিহ্য। গোধিকা taboo এবং বন্য পশুদের সংরক্ষণী ও নিয়ন্ত্রণকারিণী শক্তির একদিকে ব্যাধকে রাজা করা এবং অন্যদিকে ব্যাধের হাত থেকে পশুদের রক্ষা

করার motif অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং অষ্ট্রিক জাতির। ব্যাধ পালার পর বণিক পালা বা বণিক খণ্ড। এর কেন্দ্রবিন্দু কমলে-কামিনী দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ধ্যান ধারণার symbol। কমলে-কামিনী গজগ্রাস ও উদ্বমন করতে রত। সুতরাং এর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে দশমহাবিদ্যার শেষ বিদ্যা গজলক্ষ্মী বা কমলাত্মিকার। এটি ছাড়াও শেষ-শয়নশায়ী অনন্তবিষ্ণুর পরিকল্পনা এগুলির সজাতীয়। এইসব পরিকল্পনাই দ্রাবিড়ী-গোষ্ঠীর দান। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় আখ্যান-বস্তু বণিক-খণ্ড দ্রাবিড়ীয় ঐতিহ্য-নির্ভর। শুধু পূর্বজন্মের অভিশাপ বর্ণন, বণিকগণের দীর্ঘকাল কারাবন্দী হইয়া থাকা, লহনা-খুল্লনার সপত্নী বিদ্বেষ প্রভৃতি মহাভারতের নানা আখ্যানের অনুসরণে পরিকল্পিত ওপর-চটক মাত্র।

বিভিন্ন কালিকামঙ্গলের উপজীব্য আখ্যান একমাত্র বিদ্যাসুন্দর। কবি গোবিন্দদাসই সর্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার পূর্বে এই কাহিনীর অস্তিত্ব শ্রীধর কবিরাজ ও শাবিরিদ-খানের নাটপালায় নিহিত ছিল। মৈমনসিংহ গীতিকার কবি কঙ্কই এই কাহিনীটিকে সত্যনারায়ণ পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁহার অনেক পরে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ইহাকে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন। বাকী অধিকাংশ কবিই যথা, বলরাম, প্রাণরাম, কৃষ্ণরাম, দ্বিজ রাধাকান্ত, কবীন্দ্র মধুসূদন ও রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন। অনেকের মতে বাংলা বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সংস্কৃত হইতে লওয়া এবং যে সাহসাঙ্কের সভাকবি বররুচি প্রণীত "বিদ্যাসুন্দর কাব্যম্" উপহার দিয়াছেন তাহার রচনাকাল খ্রীঃ দশম শতক। এই কাব্যের মধ্যে "চৌরপঞ্চাশৎ" আছে এবং ইহার বহির্ভূতভাবে শৃঙ্গাররসাত্মক "চৌরপঞ্চাশৎ", "চৌর-পঞ্চাশিকা" এবং "চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা" নামে কাশ্মীর, গুজরাট ও বাঙ্গলাদেশে পঞ্চাশটি ও পঞ্চাশটির অধিক শ্লোক সমন্বিত কাব্য প্রচলিত আছে। কিন্তু এই শৃঙ্গাররসাত্মক পঞ্চাশটি বা তদধিক শ্লোকসমন্বিত "চৌরপঞ্চাশৎ" বা "চৌরপঞ্চাশিকা" বা "চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা" ভারতের যে কোন প্রদেশেই হউক না কেন, একাদশ শতকের পূর্বে স্বাধীনভাবে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং ইহাদের প্রকৃত উৎস বররুচির কাব্য বিদ্যাসুন্দরই হইতে পারে।

চৌর কবি বিহ্লণ যদি খ্রীঃ একাদশ শতকের ব্যক্তি হ'ন তবে তাঁর সঙ্গে বাঙ্গলা নাটপালা বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা শ্রীধর কবিরাজ এ শাবিরিদখানের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় পাঁচশত বৎসরের। এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর কাব্য লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং দেশে দেশে চৌর কবি বিহ্লণের রচনা ব'লে প্রচারিত চৌরপঞ্চাশৎ প্রচলিত হ'য়ে থাকে এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনী লোকমুখে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। খ্রীঃ ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে এই কাহিনী বাংলা নাটপালায় নিবদ্ধ হওয়ার পর ঐ শতকের শেষ দিকে বা সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে মৈমনসিংহের কবি গোবিন্দ দাস ইহাকে প্রথম কালিকা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করেন। খ্রীঃ ১৬শ ১৭শ-১৮শ শতকে অন্ততঃ ৮ খানি কাব্যে এই কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর জনপ্রিয়তার কারণ ছিল গোপন প্রণয় ও সুরত ব্যাপার, সুন্দরের adventure ও মালিনীর কুট্‌নী ভূমিকা। কিন্তু গোবিন্দদাস যে কারণে বা যে দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি কালিকা ভক্ত ছিলেন তাই বিদ্যাকে কালিকা ও সুন্দরকে শিব ধরিয়া লইয়া বিদ্যাসুন্দর সমাগমকে শিবশক্তি সঙ্গম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। এই শিব-শক্তিতত্ত্বের রূপক বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে লোকগ্রাহ্য সরস রূপ দিবার জন্য তিনি আবার ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীকে ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

ধর্মমঙ্গলের যে ঐতিহ্য কর্ণসেন-রঞ্জাবতী-লাউসেন ও মহামদ-ইছাই ঘোষ প্রভৃতির যুদ্ধ-বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার কেন্দ্রস্থল বর্ধমান—হুগলী অঞ্চল যেখানে আজিও বল্লুকা নদীর ধারা-প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায়। বীর সেনাপতি লাউসেন ধর্মের বরে যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং তাহার ফলে ধর্মের অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচারিত ও তাঁহার পূজা প্রসারিত হয়। ধর্ম যুগীজাতির উপাস্য দেবতা "শূন্য নিরঞ্জন" নামে কথিত। এই শূন্য নিরঞ্জনই আবার আউল-বাউলদের "অল্ হক"। শিখ ধর্মেও শূন্য নিরঞ্জনই উপাস্য দেবতা; কবীর পন্থেও তাই; সুতরাং সারা উত্তর ভারত জুড়িয়া এই ধর্মের শাখা-প্রশাখা প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু কোন সুদূরবর্তী-কালে যে কানফাটা যোগীসম্প্রদায় সুফী ধর্মের শূন্য নিরঞ্জনের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার ফলে এক সঙ্কর ধর্মের অবতরণ ঘটিয়াছিল তাহা

কে বলিবে। শুধু তাহাই নহে, কালক্রমে হিন্দুরাও প্রভাবান্বিত হইয়া অল্ হক্ (=অলখ) নিরঞ্জনকে "শ্রীসত্যনারায়ণ" করিয়া লইয়া মানসিক করা ও মানসিক পূর্ণ হইলে শির্নী দিতে স্বরু করে।

শীতলা, ষষ্ঠী, দুর্গা, ভবানী প্রভৃতি দেবীর পূজার ও মঙ্গলকাব্যের পিছনে যে সকল ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল সে সকল ঐতিহ্য মনসা বা চণ্ডী বা কালিকার ঐতিহ্যের মত মহিমা মণ্ডিত নয়। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও শ্রীরামমঙ্গলের ঐতিহ্য মূল রামায়ণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তথাপি বাঙ্গলার মাটিতে প্রাচীনকালে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম ঐতিহ্যের যে বিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে কিছুটা বৈষ্ণব পদাবলীতে এবং রঘুনন্দন গোস্বামীর "রাম রসায়নে", জগদ্রামী রামায়ণে ও অদ্ভুত রামায়ণে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ নিরসনকল্পে অন্নপূর্ণার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব। কাশীখণ্ডে ও অন্নদাকল্পতন্ত্রে যে অন্নপূর্ণার ঐতিহ্য দেখা যায়, তা বাঙালীর দান। কাশী-পরিক্রমার মধ্যে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য বর্ণন দেখতে পাওয়া যায়, শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে অন্নপূর্ণার ঐতিহ্যের চূড়ান্ত সুন্দর প্রকাশ ঘটে। হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ঈশ্বর পাটনীর বৃত্তান্ত এমনি আরও কাহিনীর ভিতর দিয়ে রায়গুণাকর অন্নপূর্ণার কৃপা বাঙালীর ভাগ্যে জুটেছে, এইটুকু দেখিয়ে গেছেন। ভবানন্দ মজুমদার দেবীর একান্ত ভক্ত ও কৃপার পাত্র, যাকে কৃপা করতে তিনি কাশী থেকে বাংলায় চলে এসেছেন। এর পর জগদ্ধাত্রী বাঙালীর উপাস্য দেবী হ'লেও তাঁর মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে কোনও মঙ্গলকাব্য রচিত হয় নি। বোধহয় তখন মঙ্গলকাব্যের রচনার ধারা নূতন সভ্যতার সংঘাতের ফলে অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল, তাই জগদ্ধাত্রী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপাস্যদেবী হলেও এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বহু জ্ঞানী গুণী ও কবি থাকা সত্ত্বেও কোনও মঙ্গলকাব্য রচিত হয় নি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে ইংরাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সাহিত্যে নূতন ধারা এসে যায়।

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকেই বাঙ্গালী শ্রোতাদের রুচি পরিবর্তনের ফলে কবি-গান, টপপা, চপ্ সঙ্গীত, হাফ্ আখড়াই ও যাত্রাগানের প্রচলন ও প্রসার

ঘটতে থাকে। যাত্রাগান ব'লতে কালীয় দমন, বিত্থাসুন্দর পালা, মনসার ভাসান প্রভৃতি সামান্ত কয়েকটি পালার গীতাভিনয় হ'ত। যাত্রাগানের পিছে-পিছে হেরেসিমা লেবেডফের আনীত রঙ্গমঞ্চে থিয়েটার অভিনয় সুরু হ'য়ে যায়।

এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্ররূপে Asiatic Researches নামে (১৭৮৪—১৭৮৩ খ্রীঃ) যে সাময়িক পত্র প্রকাশিত হ'তে থাকে, তার মধ্যে বাংলার লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক প্রবন্ধের ও সঙ্কলনের সম্ভার কম নয়।

এসিয়াটিক রিসার্চেস্ ব্যতীত Indian Antiquary, Bombay (1872—1933), Jl. of Anthropological Society of Bombay (1886—1936), The Imperial Gazetteer (26 vols. 1892, 1907—1909), District Gazetteer—প্রভৃতি পত্রিকায় বঙ্গদেশের লোকসাহিত্য বা লোকযান বিষয়ক প্রবন্ধ বা সংকলন প্রকাশিত হয়। ভারতের বাহিরে Folk-lore Record (Lond., 1878-82) Folk-lore Journal (Lond. 1889–1888), and Folk-lore (Lond. 1890—1964), Journal of the American Folk-lore, (Boston 1888) Midwest Folk-lore (America).

টমাস হারবার্ট লিউইন তদানীন্তন চিটাগংয়েই নিযুক্ত ডেপুটি কমিশনার The Wild Races of Eastern India [Lond., 1870] গ্রন্থে বাংলার লোকযানের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে E.T.Dalton-এর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির নির্দেশে বাংলার ইতর বিশেষ সকল জাতির লোকযানের পরিচয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে Descriptive Ethnology of Bengal গ্রন্থটি সুসম্পন্ন করেন। আজিও এই গ্রন্থখানি সুধীবৃন্দের নিকট সমাদৃত হয়ে রয়েছে।

Indian Antiquary সাময়িক পত্রিকায় বাংলার প্রায় ২২টি রূপকথার সঙ্কলন প্রকাশ করেন একজন ব্রিটিশ নাগরিক, ভদ্রলোকটির নাম G. H. Darmont। সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ Sir George A Grierson Asiatic Society-র Journal-এ সংগৃহীত "মানিকচাঁদের গান" নামে একটি লোকগাথা প্রকাশিত করেন। Linguistic Survey of Bengal এ—তিনি বাংলার বিভিন্নস্থানের ভাষার পরিচয় প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন লৌকিক রূপকথার ও লোকগাথার।

স্যর হাবার্ট রিস্‌লে তাঁর The Tribes & Castes of Bengal এ বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও জাতির সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে, বাঙ্গালার লোকযানের বিষয়ে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত ভাবে। এই সময়ে Sir Bradley Birt ডিস্ট্রিক্ট কলেক্টর, সিলেট (1920—London) Bengali Fairy Tales নামে একটি গ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদনের কার্য সুসম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকল্পে যেসব মিশনারী ইংলণ্ড থেকে এখানে পদার্পণ করেন, তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেরী বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই দেখে দুইজন দেশীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু মুন্সীর সহায়তায় সংস্কৃত ও পারশী ভাষায় লিখিত বহুবিধ লৌকিক গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। Indian Antiquary—সাময়িক পত্রে John Beams বাংলা লোকসঙ্গীত প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সালেই Reverend James Long—নামক একজন সম্ভ্রান্ত পাদরী—Three Thousand Bengali Proverbs & Proverbial Sayings illustrating National life & feeling among Ryots & Women নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। (1868 ?)

উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ বরাবর কানাই ঘোষাল-এর প্রবাদ পুস্তক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বারকানাথ বসুর প্রবাদ পুস্তক ১৮৯৩, ও রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের Agricultural Sayings in Lower Bengal ১৮৯৩, পুস্তকত্রয় প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

এই সময়ে Mc. Culloch's-র সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক Bengali House hold Tales-এর উপকরণ বাংলাদেশে সংগৃহীত হয় এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে তাহা আত্ম-প্রকাশ করে।

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড লালবিহারি দে মহাশয়ের নামের সঙ্গে পরিচয় অনেকে লাভ করেছেন। তাঁর রচিত দুটি পুস্তকের জন্য—একটি, Bengal Peasant's Life ও আর একটি Folk Tales of Bengal—তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে শিশু-সাহিত্য-সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সঙ্কলন-গ্রন্থ ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে, দাদামহাশয়ের থলে—

বাংলাদেশে এক যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণাবাবুর এই সকল সঙ্কলিত গ্রন্থগুলি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন ঠাকুরমা'র ঝুলির। ভূমিকায় তিনি লেখেন—"দক্ষিণাবাবু ধন্য! তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তেমনি যে এতদূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩০০ খণ্ড প্রথম সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথের ছেলে ভুলান ছড়ার যে ধারাবাহিক সঙ্কলন প্রকাশ হতে থাকে তাহা তাঁহার লোক-সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম প্রীতির ফল। গ্রাম্যসাহিত্য, কবিসঙ্গীত প্রভৃতি রচনায় তাঁহার গভীর অনুচিকীর্ষা লক্ষ্য করে লোকসাহিত্য রসপিপাসু মন মগ্ন না হইয়া পারে না।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের রচিত গ্রন্থ –The Folk Literature of Bengal —১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ লাভ করে। ইতোপূর্বে লোকসাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা বার হয়, তা হয়ত সঙ্কলন বিশেষ কিংবা খণ্ডিত লোকসাহিত্যের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে। Folk Literature of Bengal গ্রন্থটি লোকসাহিত্যের সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। এর পর বৃহৎ-বঙ্গ নামে যে গ্রন্থখানি তিনি বাংলার লোকসমাজের চক্ষে তুলে ধরেন, তা বস্তুত বাংলার লৌকিক কৃষ্টির ইতিহাস। ইহার পর ময়মনসিংহ গীতিকা, ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা গ্রন্থে বাংলার লোকগাথার যে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তিনি তুলে ধরলেন, তাতে আপামর শিক্ষিত বাঙালী সমাজ কেন বিদেশী ব্যক্তিগণ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রতি প্রশংসামুখর হয়ে ওঠেন। তদানীন্তন বাংলার শাসনকর্তার সেক্রেটারী W. R. Gurley I.C.S. মালঞ্চমালার গল্পটির সম্পূর্ণ পরিচয় ও দীনেশ বাবুর সমালোচনা পাঠ করে যা বলেন আমরা তার বঙ্গানুবাদ করে দিলাম:—"যখন দীনেশবাবুর কৃত বাঙ্গলা দেশের পল্লীগল্প সমূহের এইরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমি প্রথম পাঠ করলাম, তখন মনে হ'ল স্বদেশ অনুরাগ তাঁর বিচার শক্তিকে নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু মালঞ্চমালার সুন্দর গল্পটির ইংরাজি অনুবাদ পড়ে আমি পুনরায় দীনেশবাবুর সমালোচনাটি পড়লাম এবং বুঝতে পারলাম যে তিনি যা লিখেছেন তাহা সত্য।"

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের পর ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা লোক-সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলার লোকসাহিত্য-রসপিপাসু ব্যক্তিদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র বলে গণ্য হয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থমালার মধ্যে (১) আলোচনা, (২) ছড়া, (৩) গীতি ও নৃত্য (৪) কথা ও (৫) ধাধা—বিষয়কে পাঁচটি খণ্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ

বাংলা লোক-সাহিত্যের চর্চা, সংগ্রহ ও সংকলনের প্রচেষ্টা আজও চলছে।

১৯৩৮ খ্রীঃ কিশোরগঞ্জ সাহিত্য-সমিতির উদ্যোগে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সভাপতি রূপে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ লোকসাহিত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। ঐ বক্তৃতার পর আর কিছু কাজ হোক বা না হোক তদানীন্তন বিশিষ্ট পত্রিকা ও সাহিত্য-সমিতিগুলি লোকসাহিত্য বিষয়ক অনুসন্ধান ও চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "পূর্ববাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহ" নামে এক সমিতির উদ্ভব হয়—এই সমিতির সভাপতি হন ডঃ শহীদুল্লাহ এবং তার সম্পাদক হন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। ঐ সমিতিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি অনেক সুধী দেন এবং অনেকে সক্রিয় সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে চন্দ্রকুমার দে, সিরাজউদ্দীন কাসিমপুরী ও পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন যুক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক্ তার পৃষ্ঠাপোষকরূপে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সমগ্র বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়, পূর্ব বাংলা পূর্ব-পাকিস্তান রূপে পৃথক রাষ্ট্র হয়ে যায়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্য পূর্বেকার সমিতিগুলির কার্যক্রম অবলুপ্ত হয়। তবে লোকসাহিত্য চর্চার দিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রচেষ্টা আরও ব্যাপক ও জোরদার হ'তে থাকে। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, দিনাজপুরের গৌড়বঙ্গ সাহিত্য সমাজ, রংপুরের সাহিত্য পরিষদ, মৈমনসিংহ সাহিত্য সমিতি, শিলেটের সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি লোকশ্রুতির সংস্থাগুলি লোকসাহিত্য সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দেন। পাকিস্তানের এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি

লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ আপনাদের সমিতির মুখপত্রে প্রকাশের সূচনা করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের সাময়িক পত্রিকাগুলি মোহাম্মদী, সৌগাত ও মহীনৌ প্রভৃতিতে লোকসাহিত্যের সংকলন ও চর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

১৯৫২ খ্রীঃ পূর্বপাকিস্তানের পক্ষে বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য—এই সালে বাংলা ভাষা পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৫ খ্রীঃ 'বেঙ্গল একাডেমি' নামে এক সংসদ গঠন করেন। এই সংসদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বাঙালী জাতির লোক-সংস্কৃতি, লোক-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং তা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করা। 'রৌসান ইজদানী' "মৈমনসিংহের লোক-সাহিত্য" নামে এক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার অভাব থাকলেও এই একটি সংকলন গ্রন্থরূপে এর আবেদন কম নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও লোক-সাহিত্য বা লোক-সংস্কৃতির পঠন-পাঠন বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আস্রফ আলি Indiana বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লোক-যান' বিষয়ক অধ্যয়ন সমাপ্ত করে স্বদেশে ফিরে আসেন। ইনি 'বেঙ্গল-একাডেমি'র একজন সভ্যরূপে সমিতির সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৬০ খ্রীঃ সৈয়দ আলি হোসেন বেঙ্গল একাডেমির প্রধান পরিচালক হন। এই সমিতির পক্ষ থেকে সিরাজুদ্দীন নশিমপুরী মৈমনসিংহ জেলা থেকে লৌকিক ছড়াগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। এর পর ১৯৬২ খ্রীঃ Bengal Academy কর্তৃক নিয়োজিত লোকযান বিভাগ-এর নিয়মানুসারে কয়েকটি লোকসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ;—

(১) হারামণি—বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ—সম্পাদক মনসুরউদ্দীন। (২) উত্তর-বঙ্গের মেয়েলি গীত -আলমগীর জলিল কর্তৃক সংগৃহীত। (৩) খুলনা-যশোহরের ছড়া—শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ; (৪) কিশোরগঞ্জের লোক-কাহিনী —মহম্মদ রউফ কর্তৃক সংগৃহীত ও আসরফ সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত। (৫) রাজশাহীর ছড়া—আলমগীর জলিল কর্তৃক সম্পাদিত।

উল্লিখিত গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রকাশ ব্যতীত বেঙ্গল একাডেমী পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পল্লী থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকসঙ্গীত ও রূপ-কথা সংগ্রহ

করে এক বিরাট ভাণ্ডারের সৃষ্টি করেছেন। এই সংগ্রহ কার্যে চৌধুরী গোলাম আকবর, নূরুল হক মোল্লা, শাহ মহম্মদ কলিমুদ্দীন আবদুল মজিদ, আবদুস সত্তার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন।

Oriental Institute of Czechoslovakia—সমিতি কর্তৃক প্রেরিত Dr. D. Zbavittel, ময়মনসিংহের গীতিকাগুলির পুনর্বিচার ও সঙ্কলন করবার জন্য এই Institute-এর সাহায্য গ্রহণ করেন। সম্প্রতি Dusan Zbavittel কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ গ্রন্থখানি Mymensingh Ballads নাম দিয়ে প্রকাশিত করেছেন।

বেঙ্গল একাডেমির উদ্যোগে ও ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লার সম্পাদনায় পূর্ব-পাকিস্তানে প্রচলিত দেশজ শব্দের একটি কোষ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় শ্রীকামিনীকুমার রায় কর্তৃক সম্পাদিত একটি দেশজ শব্দ-কোষ-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থে বাঙলা শব্দতত্ত্বের ও বাঙালী জাতিতত্ত্বের গবেষণার প্রচুর সম্ভার পাওয়া যায়।

কাশ্মীর

কাশ্মীর লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রচুর কাহিনী, ছড়া, গান, গাথা ও প্রবাদ দেখতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জন মুসলমান ও ১০ জন হিন্দু। হিন্দুরা আজ তাঁদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে ঘরে শারদালিপি ও বাহিরে যদিদি লিপিতে লেখাপড়া করেন আর মুসলমানেরা একটানা সর্বত্র যদিদি লিপিই ব্যবহার করেন। কাশ্মীরের লোক-কাহিনীর মধ্যে সর্বজনপ্রিয় হচ্ছে,—আকানন্দুন, হিমলনগরই, সানি ফিসার, লালমল পরী ও মিস্কান বুড়ে। এই গল্পগুলি কাশ্মিরী মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও বিষয়বস্তু হিন্দু সংস্কৃতি থেকে নেওয়া। আকানন্দুন গল্পটি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি—

যোগীর আশীর্বাদে রাজা সন্তান লাভ করেন, সন্তান প্রাপ্তির সঙ্গে এক সর্ত দিয়ে যান তিনি যে সন্তানের জন্মের পর যোগীকে সংবাদ দিতে হবে এবং যোগীই সন্তানটি নিয়ে যাবেন। সন্তানের উপর রাজারাণীর কোনও অধিকার থাকবে না। পুত্র-সন্তান লাভের সংবাদ যোগীর কাছে পৌছিলে, বার বৎসর পর যোগী রাজার কাছে এলেন ও সর্ত অনুযায়ী পুত্র সন্তানটি চাইলেন। রাজা পুত্র সন্তানটিকে যোগীর হস্তে অর্পণ করলেন। কিন্তু যোগী এতেও সন্তুষ্ট

হন না, পুত্র সন্তানটিকে হত্যা করে যোগীবরের জন্য মাংস রান্না করে দিতে বলেন। রাজা ও রাণীর প্রতি এইরূপ আজ্ঞা বর্ষিত হ'ল তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। এই ব্যাপারের পর যোগীর অনুরোধে রাজা ও রাণী পুত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকে, সেই সময়ে আশ্চর্যের বিষয় পুত্র আকানন্দুন সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়, পিতামাতার সঙ্গে রাজপুত্রের এইভাবে মিলন ঘটে।

এই গল্পের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বেশী কৃষ্ণের ছলনা ও বৃষকেতুর মস্তক ছেদন গল্প ও একটি ব্রতকথার আখ্যানের সুন্দর মিল রয়েছে।

বর্তমান কাশ্মীরী মুসলমানদের কাছ থেকে যে রূপকথা, গাথা, সঙ্গীত পাওয়া যায়, তার মধ্যে মুসলমানদের ধর্মের প্রভাবের চিহ্নের চেয়ে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। পাক্-মুসলমান প্রভাবিত কাশ্মীরে হিন্দুধর্মের ও সংস্কৃতির যে ধারা বর্তমান ছিল তা ফল্গুনদীর অন্তঃসলিলা ধারার মত নানা বিপর্যয়ের মধ্যে আজও কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রবহমান।

বিদেশী গল্প গাথার মধ্যে ইয়ুসুফ জুলেখা, লৈলা মজনু ও শিরী-ফরহাদ প্রভৃতি খুবই পরিচিত। 1883 খ্রীষ্টাব্দে J. H. Knowles "Folk-Tales of Kashmir" প্রকাশিত করেন। The Indian Antiquary, The Christian College Magazine প্রভৃতি পত্রিকায় কাশ্মিরী লোক-সাহিত্যের অনেক নিবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

পাঞ্জাব

এই রাজ্যের উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর, ও হিমাচল প্রদেশের কতক অংশ। পূর্বে তিব্বত, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ, দক্ষিণে রাজস্থান ও পশ্চিমে পাকিস্তান।

ভারতে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হ'লে বিদেশী মিশনারী ও রাজকর্মচারীদের ভারতীয় লোক-সাহিত্য, শিল্পকলা, আচার ব্যবহার রীতিনীতির প্রতি স্বাভাবিক কৌতূহল দেখা যায় এবং এই কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার বশবর্তী হ'য়ে রাজকর্মচারী ও মিশনারীদের মধ্যে অনেকেই আপন আপন কাজের অবসরে ভারতীয় লোক-সাহিত্যের সংকলন কার্যে ব্রতী হ'ন।

Mr. C. Swynnerton নামে একজন রাজকর্মচারী পাঞ্জাবের রূপকথার সঙ্কলন করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'The Romantic Tales from the Punjab'। এই প্রদেশের বীরত্বপূর্ণ গাথাগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করে Sir R. C. Temple নামে একজন সিভিলিয়ান 'Legends of the Punjab' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। C. F. Osborne নামে একজন ইংরেজ পাঞ্জাবের গীতি ও প্রবাদ সংকলন করে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, গ্রন্থটির নাম 'Punjabi Lyrics and Proverbs'। F. A. Steel নামে অপর একজন সিভিলিয়ান—'The Tales of the Punjab' নামক গ্রন্থে পাঞ্জাবের কিছু লোককথা প্রকাশ করেন।

বিক্রমাদিত্যের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী যেমন সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত, তেমনি এই প্রদেশে গোপীচন্দ্র, ভর্তৃহরি, রাজা রসাল, গোরখ, মছন্দর প্রভৃতি রাজা ও ধর্মপ্রচারকদের সম্বন্ধে বহু অলৌকিক গল্প, গাথা প্রচলিত আছে। হীরাবাঈ, শশীপুন্ন, মির্জা সাহিবাঁ, বুগ্‌গা-বসন্তী, পরতাপ্পী-করপালসিংহ প্রভৃতির বিভিন্ন গাথা সারা পাঞ্জাবে প্রচলিত। সুখের বিষয় এই গাথাগুলির সঙ্কলন ও প্রকাশের উদ্যোগ চলছে।

বাঙ্গলা দেশের যাত্রার অনুরূপ পাঞ্জাবে নাট্যানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে রামায়ণের কাহিনী বা কৃষ্ণলীলার দৃশ্যবিশেষ জনসাধারণের নিকট বিশেষ প্রিয় ব'লে লক্ষিত হ'য়ে থাকে। পৌরাণিক নাট্যানুষ্ঠান ব্যতীত সময়ে সময়ে বিবাহ বা পুত্রলাভ প্রভৃতি শুভ কর্মানুষ্ঠানে লৌকিক নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়, এই সকল নাট্যানুষ্ঠান 'সোয়াং' বা 'নকল' নামেই পরিচিত। 'জলসা' নামক একশ্রেণীর যাত্রায় বিষয়বস্তু প্রায় অবৈধ প্রেম হ'য়ে থাকে। নৌটাঙ্কির বিষয়বস্তু রূপে অমর সিং, রাঠোর, ঢোলামারু, রূপমতী-বাজবাহাদুর, পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা প্রভৃতি খ্যাতনামা বীর বা যোদ্ধার প্রেমের কাহিনীই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

দশকর্ম অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় লোক-সঙ্গীতের অবতারণা দেখা যায়, সোহাগ, গিদ্ধা, দোহড়া, বোলি প্রভৃতি বিবিধ গানে।

রাজস্থান

রাজস্থানের আর এক নাম রাজপুতানা। "রাজপুরানাং"শব্দ থেকেই "রাজপুতানা" শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। রাজপুত্র নামধারী একটি

জাতির বাসস্থানরূপে দেশের নাম প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে। যাইহোক, সমগ্র রাজস্থান কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এর চতুঃসীমায় আছে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, গুজ্‌রাত, সিন্ধু ও মধ্যপ্রদেশ। রাজস্থানের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে মেবার, মারব, আলবার কোটা, বুন্দী, শিরোহি, যশল্মীর, ইন্দোর, যোধপুর, বিকানির, শিখাবতী, নিমচ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমগ্ররাজ্যে মারবী, মেবাতী, হড়ৌতি, ভীলী প্রভৃতি চার-পাঁচটি ভাষা প্রচলিত আছে। এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে একটি করে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের কোনটির নাম শিশোদীয়, কোনটির চৌহান, কোনটির চন্দেল্ল, কোনটির পরমার, কারুর গিহ্‌লৌত, কারুর বা নাম ছিল রাঠোর। ঐতিহাসিকগণের মতে এই সকল রাজবংশ বহিরাগত শক ও হুনজাতির সহিত ভারতীয় জাতিগুলির সংমিশ্রণের ফলেই উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে। এদের মাতৃভাষা প্রথমদিকে যাই থাকুক না কেন, Sogdian (শকভাষা) বা "হিয়ুং-নু," এরা কালক্রমে ঘরের ও বাইরের ব্যবহারে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল। সেই মধ্যভারতীয় একাধিক আর্যভাষা একাধিক রাজস্থানী ভাষার রূপ ধারণ করে প্রচলিত হয়ে রয়েছে। এইসব ভাষার মূলে ছিল শৌরসেনী প্রাকৃত ও উত্তর-পশ্চিমের পৈশাচী প্রাকৃত।

এইসব প্রাকৃতের অপভ্রংশের শব্দবিশেষের সাক্ষাৎ ঘটে প্রাচীনতম রাজস্থানী ভাট সঙ্গীত ডিঙ্গলের মধ্যে এবং লোকসঙ্গীত আল্‌হখণ্ডের মধ্যে। খ্রীঃ ১০ম—১১শ—১২শ শতকে প্রাচীন রাজস্থানী ভাট বা চারণেরা নারাশংসী গাথার মত একধরণের গান যার বিষয় বস্তু ছিল বীর-কীর্তি, গেয়ে গেয়ে বেড়াত রাজসভায়, রাজপ্রাসাদে ও অভিজাত গৃহে। ডিঙ্গলের ছন্দোশাস্ত্রের বহির্ভূত ছন্দে রচিত হোত বলেই এই জাতীয় গানের ডিঙ্গল নামকরণের সার্থকতা। আল্‌হখণ্ডও বীরকীর্তি মূলক লোকসঙ্গীত যা কৃষক ও শিল্পীসম্প্রদায় সাধারণতঃ গেয়ে বেড়াত। এরপর খ্রীঃ ১২শ থেকে ১৪শ শতকের মধ্যে কিছু কিছু বর্ষার আবাহন গান, বিবাহের মঙ্গল গীত এবং বাপ্‌পা রাওলের সময় কিছু রাধাকৃষ্ণ-এর ঝুলন যাত্রা বিষয়ক গান যেমন,—

"আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ!
ঝুলনে ঝুলত শ্যামব্‌ চন্দ!

লোক মুখে রচিত হয়েছিল বলে খবর পাওয়া যায় Colonel Todd-এর "Annals and Antiquities of Rajasthan" গ্রন্থের প্রথমখণ্ড থেকে।

খ্রীঃ চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক পর্যন্ত রাজস্থানে যে সব কথা ও কাহিনী জন্মলাভ করে ও ছড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে কেশরীবার কাহিনী এবং পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার প্রেম কাহিনী, আলাউদ্দীন পদ্মাবতী কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Samuel Todd-এর গ্রন্থ থেকে আখ্যানবস্তু নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ যে সব ballads লিখেছিলেন তাদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন রাজপুত রাজবংশের বীরকীর্তির বিবরণই জানতে পারি। তাঁর "কথা ও কাহিনী" কাব্যগ্রন্থে রাজস্থানী বীরকীর্তিবিষয়ক ballad অনেকগুলি আছে।

মীরাবাই এর ভজন ও সন্ত-দাদু দয়ালের ভজনগুলি খ্রীঃ ষোড়শ সপ্তদশ শতকের রচনা। বলাবাহুল্য এই ভজনগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় অল্পকাল মধ্যেই এদের গুজরাতী ও হিন্দী প্রতিরূপ প্রস্তুত হয় এবং বিদ্যাপতি পদাবলীর মতই সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীযুক্ত মোতীলাল মেমারিয়ার "রাজস্থানী ভাষা ঔর সাহিত্য" গ্রন্থে প্রাচীন, ও আধুনিক যুগের সব রকমের লোক-সাহিত্য ও লোক-সংগীতের উল্লেখ ও আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া Dr. L. P. Tessitori-র আলোচনা পূর্ণ গ্রন্থেও প্রচুর লোক সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির খবর রয়েছে।

গুজরাট

এই রাজ্যের উত্তরে রাজস্থান ও পাকিস্তান। দক্ষিণে মহারাষ্ট্র রাজ্য ও আরবসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর, কাম্বে ও কচ্ছ উপসাগর এবং পূর্বে মধ্য-প্রদেশ।

এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কাথিয়াবাড় প্রদেশটি প্রাচীন কীর্তিকলাপের জন্মভূমি। গাথা ও গীতের প্রচুর সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। একজন পার্শী কৃতবিদ্য—এই প্রদেশ ও গুজরাটের উপর যে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে গেছেন, তার নাম 'The Folk-Lore of Gujrat'। গুজরাটের জনজীবন সম্বন্ধে যে গল্প, গাথা তিনি লোকেদের মুখে মুখে শুনতে পেয়েছেন, তা তিনি তাঁর সঙ্কলনে স্থান দিয়েছেন। এই প্রদেশের একজন কৃতকর্মা পুরুষ আজীবন, লৌকিক গল্প, গাথা, গীতি প্রভৃতি সঙ্কলন কার্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁর নাম 'ঝাবেরচন্দ্র' মেঘানী।

তিনি লোক-সঙ্গীতের যে বিরাট সংগ্রহমালা প্রকাশ করেন, তার নাম রাধিয়ালি রাত) 'Radhiyali Rata'—The blissful nights। তাঁর ছেলেভুলান-ছড়া সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম 'হলরদন' (Halaradan), বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহূত হ'য়ে তিনি লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা' 'লোকসাহিত্য-নৃ-সমালোচন' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা গ্রন্থ।

'লোক-সাহিত্য ও ধর্তি নৃ ধাওয়ানা' গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে লোক-সাহিত্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

মহারাষ্ট্র

ভারতের এই রাজ্যটির পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পশ্চিমে গুজরাট রাজ্য, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, পূর্বে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ-পূর্বে অন্ধ্র প্রদেশ এবং দক্ষিণে মহীশূর ও গোয়া।

মাহারাষ্ট্রী লোক-সাহিত্যের সঙ্কলন, চর্চা ও পর্যালোচনার জন্য মহারাষ্ট্র সরকার একটি সমিতি গঠন করেছেন এবং এই সমিতির পক্ষ থেকে প্রায় দশ বারোটি গ্রন্থ সঙ্কলিত হ'য়ে প্রকাশ লাভ করেছে।

অতীতে সর্বপ্রথমে মহারাষ্ট্রের লোক-কথার একটি ইংরাজী ভাষায় সঙ্কলন প্রকাশ হয়, তার নাম—Old Deccan Days। এই গ্রন্থটির সঙ্কলন কর্তা ও সম্পাদকের নাম—Mony Friyar। এর পর Campbell Enthoben, এ. এম. টি. জ্যাকসন, রাজারাম শাস্ত্রী, ভাগবত মহাদেব, মোরেশ্বর কুঠ, বি. কে. রাজবাড়ে, না. গো. চাপেকর, ও. দা. মুণ্ডলে, সানে গুরুজী, ইন্দ্রা সন্ত, কমলাবাঈ, দেশপাণ্ডে, বামন চোরঘড়ে, কাকা কালেলকর, মহাদেব শাস্ত্রী জোশী, বি. গ. ভিডে. রা. ম. আঠবলে, ভানু শিরধনকর, মালতীবাঈ দাণ্ডেকর, অনসূয়া লিমায়ে, সরোজিনী বাবর, দুর্গা ভাগবত প্রভৃতি লোকযানাভিজ্ঞ লেখক ও লেখিকা মাহারাষ্ট্রী লোক-সাহিত্য চর্চায় ব্রতী রয়েছেন।

মাহারাষ্ট্রী ভাষায় দুর্গা ভাগবতের রচিত 'লোক-সাহিত্যকি রূপরেখা' একটি অপূর্ব গ্রন্থ। মাহারাষ্ট্রী লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের আলোচনা এই গ্রন্থে রয়েছে। সজনী বাবের পুণা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাহারাষ্ট্রীয় লোক-সাহিত্যের উপর আলোচনা গ্রন্থ লিখে ডক্‌টরেট্‌ উপাধি লাভ করেছেন।

ভন্দরা থেকে কারওয়ার এবং নন্দেড় থেকে বোম্বে পর্যন্ত মারাঠী ভাষার প্রচলন রয়েছে। এই ভাষার চারিটি উপভাষা দেখতে পাওয়া যায়—(১) বারহাদি, (২) খান্দেশী, (৩) মাওয়ালী এবং (৪) কোঙ্কনী। ঘোরপাড়ে, বোরসে, অনসূয়া লিমায়ে, সরোজিনী বাবর প্রভৃতি লোকযান বিশেষজ্ঞ এই সকল উপভাষায় প্রচলিত লোক-সাহিত্যের সঙ্কলন ও সম্পাদন কার্যে ব্রতী আছেন।

পি. এস. গোরে এবং বামনরাও ঘোরপাড়ে ও সাদী লোক-সঙ্গীত সঙ্কলনের প্রভূত কার্য করেছেন। মাওয়ালী লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহ কার্যে ব্রতী রয়েছেন সরোজিনী বাবর। হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে কাজ করছেন ডঃ নন্দপুরকর। ডঃ চ্যবন ও গুতে কঙ্কনী-প্রবাদ ও লোক-সঙ্গীত চর্চায় আত্মসমর্পণ করেছেন। ডঃ বর্ষে সাতপুরার অন্তর্গত খান্দেশ এলাকার অধিবাসী ভীল, ঢোলা, আভীর প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের লোক-সঙ্গীত ও সাহিত্য সংগ্রহ করছেন।

মধ্যপ্রদেশ

এই দেশে যে সব খ্রীষ্টান মিশনারী কাজকর্মে এসেছিলেন, তাঁরা একান্ত ভাবে ভারতের আদিম অধিবাসীদের সংস্পর্শে এসে আপনাদের বিলিয়ে দিয়ে-ছিলেন ও তাঁদের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সঙ্গীতের গবেষণায় আপনাদের নিয়োজিত করেন। এদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তাঁর নাম Verrier Elwin। ইনি মধ্যপ্রদেশের গোন্দ জাতির এক কন্যাকে বিয়ে করে ওখানেই বসবাস করতে থাকেন। ইনি Myths of Middle India, The Marias and their Ghotul, The Banga, The Agaria, Folk-Songs of Maikal Hills, The Tribal Art প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থে আদিবাসীদের সংস্কৃতির পরিচয়ের সঙ্গে তাদের মুখে মুখে চলে আসা গল্প, গাথা, গান প্রভৃতি পর্যাপ্তভাবে দিয়ে গেছেন।

মধ্যপ্রদেশকে পূর্বে সেন্ট্রাল প্রভিন্স বলা হ'ত। বর্তমানে একে দুটি প্রধান ভাষাভাষীর প্রদেশ বলা যায়, এক ছত্রিশগড়ী, দুই মারাঠী। উত্তরাঞ্চলে ছত্রিশগড়ী উপভাষা ও দক্ষিণাংশে মারাঠী ভাষা প্রচলিত।

ছত্রিশগড়ী ভাষায় লৌকিক গল্প, গাথা, গান প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু পরিণত চিন্তাপুষ্ট সাহিত্য রচনার একান্ত অভাব। ডঃ এস. সি. দুবে এই

বিষয়ে যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তার নাম, Field Songs of Chattisgarh। পুস্তকটি লক্ষ্ণৌর Ethnographic and Folk Culture Society-র উদ্যোগে মুদ্রিত হয়েছে।

উড়িষ্যা

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ওড়িয়ার লোকসাহিত্য ও লোকশিল্প সর্বাধিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত। প্রদেশটির প্রাকৃতিক দৃশ্যও কম সুন্দর নয়। আর্যগোষ্ঠী ব্যতীত বিভিন্ন আদিবাসী, যেমন, সান্থাল, কোয়া, কান্ধা, পরজা, গদব, জুয়াং প্রভৃতির জন্মভূমিও এই উড়িষ্যা প্রদেশ।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকপিলেশ্বর ওঝা পাশ্চাত্য পণ্ডিত রাভেন শ-র উৎসাহে উড়িষ্যার প্রবাদগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নীলমণি বিদ্যারত্ন এই প্রদেশের প্রবাদ বা প্রবচনগুলির সংগ্রহ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন ও পরিশেষে প্রবাদগুলিকে সুসম্পাদিত করে প্রকাশ করেন। রাঘবানন্দ দাসও ঐ একই কার্যে ব্রতী হন, পরে আপনার সংগ্রহগুলি প্রকাশ করেন। তবে তার সংগৃহীত প্রবচনগুলি বেশীর ভাগই কৃষিকার্যের উপর। বিশেষ ভাবে "কৃষি-পরাশর" গ্রন্থে কৃষির উপর ডাকের বচন প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অপন্ন পাণ্ডা ৩২০টি প্রবাদ সংগ্রহ করে টীকা সমেত প্রকাশ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গোপাল চন্দ্র প্রহরাজ উৎকলের কতকগুলি রূপকথা সংগ্রহ করেন, তাহা মুদ্রিত ও জনসাধারণের নিকট "উৎকল কহানী" নামে আত্মপ্রকাশ করে। সংগ্রহের সময় ঠিক যেমন তিনি কাহিনীগুলির কথ্যভাষার রূপ পেয়েছিলেন, প্রকাশের সময় যথাযথ তাই বজায় থাকায় আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট তারা সমাদর পেতে থাকে। তাঁর শ্যালিকা পীতাম্বর দেবী উড়িয়ার 'ডাক-ধামালি' প্রভৃতি সংগ্রহ করতে থাকেন। যথা সময়ে তাহাও মুদ্রিত হয়। চক্রধর মহাপাত্র "গাঁওলী গীত চুম্বিকা" ও "বহুক্ষ সুখদুঃখ গীতিকা"—এই দুটি সংকলন গ্রন্থ ব্যতীত বহুবিধ পল্লীগীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদিত করেন।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে A Study Of Orissan Folk-Lore নামে একটি গ্রন্থ

ডঃ কুঞ্জবিহারী দাস মহাশয় প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে উড়িষ্যার লোক-সাহিত্যের এক সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ কুঞ্জবিহারী দাসের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে "পল্লীগীতি সঞ্চয়ন" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ দাস ওড়িয়া লোকগীতি ও কাহিনী গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এবং ঐ গ্রন্থের উপরই তিনি বিশ্বভারতী থেকে Ph. D. ডিগ্রী লাভ করেন।

বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের সঙ্গে উড়িষ্যার লোকসাহিত্যের প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় প্রদেশের গল্প, গাথা, প্রবচন, ব্রতকথা, ও লোকসঙ্গীতের মধ্যেও প্রচুর মিল আছে।

বিহার

বিহার প্রদেশের আয়তন ৯০ হাজার বর্গমাইল ও সাড়ে তিন কোটি লোকের বাস সেখানে। এর উত্তরে তিব্বত-বর্মী গোষ্ঠীর বাস, পূর্বে বঙ্গ ভাষাভাষী, দক্ষিণে উড়িয়াভাষী, পশ্চিমে ছত্রিশগড়ী বাঘেলী ও আউধী ভাষা-ভাষীর বাস।

বিহারে মৈথিলী, (২) মগহী ও (৩) ভোজপুরী এই তিনটি প্রধান উপভাষা আছে। এই তিনটি উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা করলে পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মিথিলার ভাষা মৈথিলী, চম্পারণ জেলা, মজফ্ফরপুর, দারভাঙ্গা, সহরসা, নেপালের তরাইয়ের কিছু অংশে প্রচলিত দেখা যায়। বর্তমানে মৈথিলী ভাষাভাষীর সীমানা পূর্ণিয়া জেলার বেশীর ভাগ, ভাগলপুর জেলার দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপত্যকা ও সাঁওতাল পরগণার উত্তর-পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় উপভাষা মগধী বা মগহী। প্রাচীনকালে এই দেশ মগধ নামেই পরিচিত ছিল। মগধ অঞ্চলের উপভাষা বলে মগধী বা মগহী নামে পরিচিত এই উপভাষা।

ব্যক্তিগত ভাবে ভোজপুরী লোকসাহিত্য সেবায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের মধ্যে বিহার-মতিহারীর পণ্ডিত গণেশ চৌবে, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সিং (বিহার-আরা) ও তারকেশ্বর প্রসাদ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। "ভোজপুরীর কবি" গ্রন্থে দুর্গাপ্রসাদ, ভোজপুরীর লোক সাহিত্যে বিশেষ আলোক সম্পাত করেছেন। "Studies in Bhojpuri Folk-literature" গ্রন্থ লিখে তিনি Lucknow

ইউনিভার্সিটি থেকে Ph. D উপাধি পেয়েছেন। All India Hindi Sahitya Sammelan এলাহাবাদ এই বইটির মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। 'Studies in Bhojpuri Folk-Music' গ্রন্থে ভোজপুরী সঙ্গীত সমীক্ষার ব্যাপক আলোচনা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

ডঃ কৃষ্ণদেও উপাধ্যায় ভোজপুরী লোকগীত, ভোজপুরী গ্রামগীত, ভোজপুরী লোক-সাহিত্যকা অধ্যয়ন, ও ভোজপুরী লোক-সাহিত্যিকী ভূমিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন।

উদয়নারায়ণ 'তেওয়ারী 'ভোজপুরী ব্যাকরণকা অধ্যয়ন' গ্রন্থে ভোজপুরী লৌকিক গল্পের অনেক উপাদান সংযোগ করেছেন। বিহারের বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তারকেশ্বর প্রসাদের অনেক লোকসাহিত্য বিষয়ক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়।

মতিহারীর চৌবেজীর লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক চর্চা অনেককাল আগের থেকেই সুরু হয়। বোধ করি ভোজপুরীর লোক-সাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা ইতোপূর্বে কেউ করেননি। Sir George Abraham Grierson 'Bihar Peasant Life.' প্রকাশিত করেন। Dr. Folonএর "Dictionary of Hindusthani Proverbs" নামে একটি পুস্তকে বিহার প্রদেশের সংগৃহীত প্রবচন একত্রিত করে প্রকাশ করেন। এরপর John Christian—"Bihar Proverbs" নামে সংগ্রহটি বিলাতে গিয়ে প্রকাশ করেন।

বিহারে লোক-সাহিত্যের উন্নতি ও রক্ষাকল্পে The Academy of National Language সংগঠিত হয়েছে। ভোজপুরী ভাষায় লৌকিক সাহিত্যের সংকলন ও চর্চা বিশেষভাবে পালনের উদ্দেশ্যে আরা জেলায় "ভোজপুরী সমিতি" গঠিত হয়েছে। এই সমিতির উদ্যোগে একটি লোক-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, পত্রিকাটির নাম "ভোজপুরী"। এই সমিতির বাৎসরিক সম্মেলনে লোককবি ও সাহিত্যিকদের বিশেষ পুরস্কারদানে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

লৌকিক গাথা রূপকথা বা লোক-সঙ্গীতে বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দ বা বিশিষ্ট প্রয়োগের যে রীতি ভোজপুরী লোক-সাহিত্যে দেখা যায়, তার অবিকল প্রতিরূপ বাংলাদেশের রূপ-কথায়ও পাওয়া যায়।

ভোজপুরীতে সৌরভীগায়, হংসরাজ ঘোড়া, অবন-পবন বৃক্ষ, উড়ন খাটৌলা, বাহেঙ্গ ও বাহেঙ্গনী প্রভৃতি যে সব গল্প দেখা যায় তাদের অনুরূপ বাংলায় রূপকথার গল্প সুরভী গাভী বা কামধেনু, পক্ষীরাজ ঘোড়া, মন-পবনের নৌকা, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী প্রভৃতি গল্প লক্ষ্য করা যায়। পশুপক্ষীর গুণ বিচারে ভোজপুরী গল্পে গাধার মূর্খামি, শিয়ালের ধূর্ততা, কুমীরের বোকামির কাহিনীগুলি আমাদের বাংলাদেশের রূপকথার সহিত অবিকল মিলে যায়। বিহার ও বাংলা উভয় প্রদেশ পরস্পরের প্রতিবেশী বলে এরকম মিল খুঁজে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ভোজপুরী লোককথা সম্পূর্ণ গদ্যময়; খুব অল্পই দোহা-র ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কথকেরা এইসব দোহাগুলি সুর করে শোনায়। রাজা, সাধু প্রভৃতি ব্যক্তির ভাষায় খড়ীবোলীর ও পশুপক্ষী ও দেবতা প্রভৃতির ভাষায় ভোজপুরীর ব্যবহার বা প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

মৈথিলী লোক-সাহিত্য

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে প্রয়াগ থেকে রাম ইক্‌বাল সিংহ 'রাকেশের' "মৈথিলী লোক-গীত" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মার্জিত ও লৌকিক সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ আছে। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি, প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের সংগ্রহের সঙ্গে লৌকিক পদগুলিও 'রাকেশের' গ্রন্থে স্থান লাভ করে। ইক্‌বাল সিংহ মহাশয় গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য ঠিকমত রাখেননি। বিদ্যাপতি বা গোবিন্দ দাসের পদগুলি কিভাবে লোক-সাহিত্যের মর্যাদা পেল তাই আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয়।

মৈথিলী লোক-সঙ্গীতের আলোচনা করে লেডী ব্রাবর্ণের অধ্যাপিকা ডঃ অনামিকা সিংহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ডক্টরেট" উপাধি অর্জন করেছেন। অধ্যাপিকা ডঃ সিংহের ডক্টরেট উপাধি অর্জনের ৫ বৎসর পূর্বে ডঃ জয়কান্ত মিশ্র 'Introduction to the Folk-Literature of Mithila' নামে একটি ইংরাজী গ্রন্থ প্রয়াগ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশ করেন। অধ্যাপিকা ডঃ সিংহ লোক-সংগীতের উপর গ্রন্থ রচনার পরও কতকগুলি লোক-সঙ্গীতের পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন,—(১) সোহর আউর খিলৌনা,

১৯৬৯ (২) কহাবত ১৯৬৯? (৩) আউর উদাসী, ১৯৬৯ ও (৪) শিশুগীত আউর খেল, ১৯৬৯। এ ছাড়া মৈথিলী পত্র-পত্রিকায় তাঁর লোক-সাহিত্যের বিষয়ে বহুবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এই অধ্যাপিকার মিথিলার লোক-গীত-গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হ'য়ে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

অধ্যাপিকা সিন্‌হার পূর্বে ডঃ তেজনারায়ণ লাল মহাশয় মিথিলার লোক-গীতের সঙ্কলন আলোচনা করে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন।

বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত গল্প, গাথা, গান ও লৌকিক আচার-ব্যবহারের যে সমতা দেখা যায় তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রায় দুর্লভ।

দু' একটি উদাহরণের দ্বারা আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করা যেতে পারে; ইংরাজী লোকসাহিত্যে প্রচলিত Faithful John-এর সঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত রাজপুত্র ও মন্ত্রী পুত্রের কাহিনীর মিল দেখতে পাওয়া যায়, তার অবিকল রূপ উড়িষ্যার লোক-গাথায় পাওয়া যায়।

বাংলায় প্রচলিত "নীলকমল-লালকমল," "সোনারকাঠি রূপারকাঠি"র গল্পের সঙ্গে ওড়িয়া গল্প কলারাজনের সাদৃশ্য খুব বেশী। ডালিমকুমার গল্পের সহিত উড়িষ্যার ডালিম্ব রাজকুমার গল্পের মিল দেখতে পাওয়া যায়। শিয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে 'বিলুআ-কুম্ভীর' গল্পের বিশেষ মিল আছে।

উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে প্রচলিত শীত-বসন্ত ও শ্বেতবসন্ত গল্পের সাদৃশ্য অদ্ভুত। শুধু বঙ্গদেশে প্রচলিত গল্পের শাখা-প্রশাখার তুলনায় উড়িষ্যায় প্রচলিত গল্পটির কলেবর বেশ সংক্ষিপ্ত। উড়িষ্যার 'শশিসেনা'র গল্প ও বঙ্গদেশে প্রচলিত 'সখিসেনা'র মূল কাহিনী একই। বাংলায় প্রচলিত কাহিনীর নায়কের নাম ও ওড়িয়া গল্পের নায়কের নাম এক 'অভিমন্যুই'। শিয়াল পণ্ডিতের কুমীরের ছানা পড়ান ও ছানাগুলির একে একে শিয়ালের ভক্ষ্যরূপে পরিণতি, কুমীরের প্রতিশোধ স্পৃহা ও বিফলতা ইত্যাদি উভয় প্রদেশেই প্রচলিত আছে। গল্পটির প্রচার ও প্রসার শুধু বঙ্গদেশে কেন সুদূর আসাম পর্যন্ত ছিল। বাঘের পিঠে খাওয়ার সাধ ও তার পরিণতির কাহিনী বঙ্গ ও আসামে সমানরূপে প্রচলিত হ'লেও বঙ্গদেশের গল্পটি কল্পনার দিক্ দিয়ে সমৃদ্ধ। "ওরে কুমার, দে কাস্তে, কাটব ঘাস, খাবে গরু, দেবে দুধ"—ইত্যাদি ও কাকের কাহিনীর সঙ্গে বাংলার

শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ সকলেই পরিচিত আছেন। এই গল্পটি উড়িষ্যা ও আসামে সমানরূপে প্রচলিত।

গল্পের প্রারম্ভে ও পরিণামে বঙ্গদেশে 'একটা কথা, কি কথা, ব্যাঙ্গের মাথা' বা 'আমার কথাটি ফুরল, নটে গাছটি মুড়ল' ইত্যাদি অর্থহীন, অসংলগ্ন ছড়া যেমন প্রচলিত, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে এইরূপ ছড়ার চলন তেমনি দেখা যায়।

তরুণ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনী ইতরবিশেষ বঙ্গ উৎকল বা আসাম কেন সারা উত্তর ভারতে গোবিন্দচন্দ্রের গীত বা গোপীচন্দ্রের গীত নামে নাথ যোগীদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-এর গীত করুণরসাত্মক, শ্রোতৃবৃন্দমাত্রই যোগীদের এই গীতে মুগ্ধ হ'তেন। বাংলাদেশে প্রচলিত চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-কাহিনীর অনুরূপই গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস। এই রাজা গোপীচাঁদ যে ইতিহাস খ্যাত পুরুষ ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। ইহার উল্লেখ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে গোবিন্দচন্দ্রের নামে পাওয়া যায়। এখনও নাথ-যোগীরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু ও মহারাষ্ট্রে গোবিন্দচন্দ্রের গীত গেয়ে ভিক্ষা মাগেন।

আসাম

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে আসাম দেশটি অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই দেশটিকে কামরূপ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলা হোত। পাহাড়, জঙ্গল ও নদনদী দিয়ে ঘেরা এই দেশ। বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন জীবজন্তুর সমারোহ ও তাদের বাস এখানে যেমন দেখা যায়, তেমনি বহুজাতি ও উপজাতির সমাবেশও এই আসামে চোখে পড়ে। উপজাতিদের বাসস্থান অনুযায়ী তাদের নামকরণ হয়েছে। গারো পাহাড়ে গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া জাতির, মিকির পাহাড়ে মিকির, মিজো পাহাড়ে মিজো, নাগা পাহাড়ে নাগা জাতির বাস রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে কাছাড়ী, রোঙ্, (Mrong) প্রভৃতির বাস। এছাড়া দেউরী, ছুটিয়া, মরান, মিরি, ফকিয়াল, আইটন, তুরডং ও আহোম জাতিকে আসামে থাকৃতে দেখা যায়।

নৃতত্ত্বের বিচারে আসামে মূলতঃ অষ্ট্রিক ও মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোকের বাস, আর এই দেশের উপজাতিরা মোঙ্গোলীয় ও অষ্ট্রিক-ভাষী লোক।

আসাম দেশের মধ্যে অসমীয়ারাই প্রধান। এই জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে বহির্ভারতের সংস্কৃতির যথা তিব্বত ও বর্মার বিশেষ মিল আছে।

বিহু নাচের দেশ এই আসাম। বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে ধানের জন্য জমি ঠিক করা, বপন করা ও ধানগাছ কাটা—এই তিনটি অনুষ্ঠানে নাচ ও গানের ব্যবস্থা হয়। বিশেষজ্ঞের মতে আসামের এই বিহু নাচ যৌনতত্ত্বমূলক। এই রীতি পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমদানি হয়েছিল। বিহু নাচ শুধু মেয়েদের জন্য, এই নাচে পুরুষেরা নিষ্ক্রিয়। নৃত্যের তালে তালে পুরুষেরা শুধু ঢোল বাজিয়ে থাকে।

আসামের লোক-গাথাগুলি বিশেষভাবে আবৃত্তিমূলক, সঙ্গীতের প্রাধান্য তেমন নাই। কয়েকটি প্রধান গাথা আসামে পরিচিত। ফুল-কোঙার, জনা গাভরু, দুর্বলা ও শান্তির গীত। ধর্মপ্রাণা দুর্বলার কাহিনী এই গাথায় বর্ণিত হ'য়েছে। কুমারী জনা ও রাজকুমার গোপীচান সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গাথা। তবে এই গোপীচানের সহিত বাংলার গোপীচাঁদের কোনও সম্পর্ক নাই। কাছাড়ীদের গীতিকার সঙ্গে আসামী লোক-গাথার প্রভূত মিল দেখা যায়।

ডাকের বচন বাংলা ও উড়িষ্যার মত আসামেও প্রচলিত। এসব দেশে যিনি 'ডাক' বিহারে তিনি ঘাঘ। মিথিলার লোক বলে 'ডাক' তাদের দেশের লোক। অসমীয়াদের এইরকম ধারণা—লেহি ডাঙ্গরার অন্তর্ভুক্ত কামরূপের একটি কুমোরের ছেলের নাম ডাক। ইনি উজ্জয়িনীর বরাহমিহিরের আশীর্বাদে নরনারীর চরিত্র বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অধুনা বাঙলা ও আসামে 'ডাক' নামাঙ্কিত বহু 'ছড়া' পাওয়া যায়। ছড়াগুলি কৃষি, গৃহস্থালী, ঋতু-বৈশিষ্ট্য, পাল-পার্বণ ও নানাবিধ লক্ষণ-বিষয়ক প্রবচনগুলি চিরন্তন সত্য বলে আজও তা' সর্বজনগ্রাহ্য ও বিভিন্ন প্রদেশে ভাষান্তরিত হ'য়ে বিরাজ করছে।

আসামের পর্বতগুলির নাম থেকে বিভিন্ন আদিবাসীর নামকরণের সৃষ্টি। পাহাড়, পর্বত, গুহা প্রভৃতির উপরেই খাসি প্রভৃতি আদিবাসীদের লোক-গাথার সৃষ্টি হ'য়েছে। সৎ ও অসৎ—এই দুই দেবতার পূজার জন্য তারা সচেষ্ট। জাতির বা ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জন্য তারা শয়তানের নাম নেয় ও তাঁকে পূজা, বলিদান প্রভৃতির দ্বারা সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করে।

বর্তমানে অসমীয়া লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চা বিশেষ লক্ষণীয়। 'ভদ্রসেনাবরার', 'ফুল কোঙার', 'মণি কোঙার' প্রভৃতি গ্রন্থ চক্রধর বড়ুয়ার

'অসময়িরা যোজনা আদির কথা', প্রবাদ, প্রসন্নচন্দ্র বড়ুয়ার লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তক উল্লেখযোগ্য। "কামরূপিয়ার বিয়া গীত" বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ইংরেজী ভাষায় বর্তমানে প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী, আসামের লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ Man in India, Eastern Anthropologist, Assam Review এবং Tea-News -প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত করেছেন। তাঁর Folk-Literature of Assam গ্রন্থটি আসামের লোকসাহিত্যের একমাত্র প্রাথমিক ভূমিকা।

হেমচন্দ্র বড়ুয়ার -Marriage Customs of the people of Assam 1892, বিরিঞ্চি বড়ুয়ার Travels & Adventures in the Literature 1892, John Brotler-এর Travels & Adventures in the province of Assam 1854, P. R. T. Gurddon-র Assamese Proverbs 1895, প্রভৃতি আসামের সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ পুস্তক।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Sidney Endle, G. A. Grierson প্রভৃতি ব্যক্তির অসমীয়ার লৌকিক রীতি ও চর্চা সম্বন্ধীয় প্রকাশিত গ্রন্থাদি উল্লেখযোগ্য। T. C. Hodgson-এর মেইথিশ, বৈরী নাগা ১৯২১ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়, Mrs. Rofy-র খাসি ফোক্‌টেলস্‌ 'T. Shakespeare' 'কুকি ক্লান' প্রভৃতি গ্রন্থে আসাম প্রদেশের আদিম জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ও তাদের মৌখিক সাহিত্য, গল্প, গান, প্রবাদ ও ছড়ার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রন্থবিচার

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

ভাগবত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া জাতিবিশেষের মধ্যে উন্নতভাবের কতদূর চর্চা হইয়াছিল যেমন বুঝা যায়, সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিবার তেমন সুবিধা হয় না। কবির ভাব সাধারণের অপেক্ষা চিরকালই উন্নত, এইজন্য তাহা দেখিয়া সাধারণের ভাব সম্বন্ধে অকাট্যরূপে বিশেষ কিছু বলা যায় না, তবে জাতির অবস্থা যে এমনতর উন্নত হইয়াছিল যাহাতে তেমন কবি জন্মাইতে পারিয়াছেন—এই পর্যন্ত বুঝা যায় বটে। সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিতে হইলে ভাবের হিমাদ্রিশিখর হইতে একটু নামিয়া আসিতে হয়, যে সাহিত্যে সমাজের বাহ্যচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এইরূপ সাহিত্যের অনুশীলন আবশ্যক। কারণ মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহা হইতে সহজেই মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থই এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামের ভাবের হিল্লোল কোথাও বড় খেলিতে পায় নাই, কবিত্ব বিকশিয়া উঠিয়া সৌন্দর্যের রহস্যদ্বার খুলিয়া দেয় না—চর্মচক্ষুতে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বর্ণনা করিতে আসিয়াছেন। উচ্চদরের কবি তিনি নহেন, কিন্তু সাজাইয়া গল্প করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। আর থোড় বড়ি মোচার ঘণ্টে তাঁহার অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হাটে যাইলে তিনি হাটশুদ্ধ জিনিসের দর জানিয়া আসেন, ঘরে আসিয়া পাকশালায় গিয়া পাচককে রন্ধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, সংসারের কাজকর্মে অনেক গৃহিণী তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মত মুকুন্দরাম হৃদয়ের সুগভীর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাহারও বিরহ-বেদনা আছে, মিলন-আনন্দ আছে, কিন্তু সে বেদনায় দেহই জ্বলিয়াছে অধিক, সে মিলনে দেহই বাঁচিয়া গিয়াছে। দেহকে বাঁচান তাঁহার কতকটা আবশ্যকও হইয়াছিল—তাঁহার স্ত্রীচরিত্রগুলির কি

কীলযুদ্ধে সামান্য ব্যুৎপত্তি! মুকুন্দরাম হৃদয়ের ভাষায় গান গাহিলে সপত্নীবর্গের গুম্ গুম্ কীলশব্দে এবং তাহাদের কণ্ঠ-সম্ভাষণে তাহা ডুবিয়া যাইত। যাই হৌক, এখন আর সে আশঙ্কা নাই, কবিকঙ্কণ বিরহ-বিধুরাদিগের রুদ্ধ নিঃশ্বাস বড় অনুভব করেন নাই; বিরহিণীদ্বয়ের কীলাকীলি দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বোধ করি হৃৎকম্প হইয়াছিল, দূর হইতেই তাই তিনি কাজ সারিয়াছেন।

মুকুন্দরাম জীবনে কষ্ট পাইয়াছেন অনেক। জীবনী লেখা উদ্দেশ্য না হইলেও এখানে আমরা তাঁহার দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতে পারি। কারণ, চণ্ডী-গ্রন্থের উৎপত্তি-কারণে কবি নিজেই আপনার দুরবস্থার কথা বলিতে বসিয়াছেন। অত্যাচারী মুসলমান ডিহিদারের নিষ্ঠুরতায় তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল; অনশনে, অর্ধাহারে, দয়াবানের ভিক্ষাদানে কোন প্রকারে জীবনধারণ করিয়া অবশেষে নরপতি রঘুনাথের আশ্রয়ে আসিয়া তিনি বাঁচিয়া যান। পথে চণ্ডীর আদেশে তিনি যে কাব্য রচনা করিতে বসেন, এইখানে আসিয়াই সম্ভবতঃ তাহা পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী মোটামুটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কালকেতুর কথা বর্ণিত হইয়াছে—কালকেতুর জন্ম, বিক্রম, বিবাহ, যুদ্ধ ইত্যাদি; দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কথা—লহনা-খুল্লনার দ্বন্দ্ব, বিরহ, অভিসার প্রভৃতি। সাময়িক সমাজের অবস্থা বুঝিবার সুবিধা অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্তু প্রথম খণ্ডটিও বাদ দেওয়া যায় না, তাহাতেও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। আমরা প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল কথা আলোচনা করিব।

স্বর্গের নীলাম্বরের প্রতি কোনও বিশেষ কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, মর্ত্যভূমে ব্যাধকুলে তাঁহার জন্ম হইবে। মহাদেবের শাপে ধর্মকেতুর গৃহে তাঁহার জন্ম হয়—নাম হইল কালকেতু। কালকেতু নিতান্ত দুধের ছেলে নয়—ব্যাধের ঘরে ব্যাধ হইয়াই সে জন্মাইয়াছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু। কবিকঙ্কণ বর্ণনা করিয়াছেন—

"নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল।"

শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই—কালকেতুর প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মৃদুস্পর্শনে বীরভাব প্রকাশ করিতে তিনি পারেন

নাই, কিন্তু মোটা মোটা বর্ণনা করিয়া একরকম বুঝাইয়াছেন। কালকেতুর শারীরিক বলই সম্বল, অসাধারণ হৃদয়ের বল তাহার চরিত্রে দেখা যায় না। আমাদের মুকুন্দরামও শরীরের কবি। তাঁহার বর্ণনা ভাবময় নহে—প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি বক্ষ বর্ণনা করিতে বসিলেই কপাটের সহিত তুলনা করেন, নেত্র বর্ণনা করিতে হইলেই আকর্ণ দীর্ঘ। কালকেতুর বর্ণনা আর একটু উদ্ধৃত করিয়া দি, পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন—

"কপাট-বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মতিপাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা,
কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।"

কালকেতুর বিক্রমও সাধারণ নহে। তাড়া দিয়া সে হরিণ ধরিতে পারে, ধনুর শরের আবশ্যক হয় না।

এই পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাধকে সুতরাং চিন্তিত হইতে হইয়াছিল—অনুরূপ কন্যা মিলে কোথায়? বিধাতা সদয় হইলেন, ফুল্লরা মিলিল। পুরোহিত সোমাই পণ্ডিতের সহিত ধর্মকেতুর বিরলে একদিন অনেক কথাবার্তা হয়—কথাবার্তা আর কি, কালকেতুর বিবাহ। এ কথাবার্তাগুলি কিন্তু পড়িয়া সুখ আছে—সব কেমন স্বাভাবিক। প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক অবস্থা ইহাতে বেশ বুঝা যায়। তাহার পর কালকেতুর বিবাহ হইল। মুকুন্দরাম পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। চোখে যাহা পড়িয়াছে—কিছুই বাদ যায় নাই।

বিবাহাদি করিয়া কালকেতু গৃহে ফিরিল। ধর্মকেতুর পুত্রবধূটিও মিলিয়াছে ভাল। ধর্মকেতুর সুখের অন্ত নাই। নিদয়াও আনন্দিত-হৃদয়। ফুল্লরা রাঁধে বাড়ে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে মন দিয়া খাওয়ায়, তাঁহাদের সেবার কোনও ত্রুটি হয় না। সংসারে এখন সব সুশৃঙ্খলা, গোলযোগ ঝঞ্ঝাট নাই। সংসারে শান্তি ভোগ করিয়া অবশেষে নিদয়ার সহিত ধর্মকেতু বারাণসীধামে মুক্তিচিন্তা করিতে চলিয়া গেল। ফুল্লরা গৃহের গৃহিণী হইল।

কালকেতু বনে বনে প্রতিদিন শিকার করিয়া বেড়ায়। হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া সে আছাড় মারে, ব্যাঘ্রকে ফাঁদ পাতিয়া ধরে, মহিষকে তাড়া দিয়া ধরিয়া ফেলে। ফুল্লরা হাটে গিয়া গজদন্ত, ব্যাঘ্রচর্ম, মহিষশৃঙ্গ বিক্রয় করিয়া পয়সা আনে। এইরূপে দম্পতীর দিন কাটিয়া যায়। ফুল্লরার গৃহিণীপনায় কালকেতুর বিপুল উদর পরিপূর্ণ থাকে—সে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলও পরিতৃপ্ত হয়। যোগ্য গৃহিণী না হইলে কালকেতুর ক্ষুধা কি যে সে নিবারণ করিতে পারে? কবি-কঙ্কণ বর্ণনা করিয়াছেন—

"মুচড়িয়া গোঁপ দুটো বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
একশ্বাসে সাত ঘড়া আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি অন্ন বীর খায় ক্ষুদ্ জাউ।
দালি খাইল ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খাইল আলু পোড়া।
বন পুঁই ভার দুই কলমী কাঁচড়া॥"

বীরের ছোট গ্রাস মুকুন্দরাম তাল-সমান বলিয়াছেন। বড় গ্রাস বোধ করি ছোটখাট লোকে আঁকড়িয়া পায় না।

কালকেতুর সহিত অরণ্যের পশুদের একবার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পশুরা তাহার তাড়নে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইয়া তাহারা বাঁচিয়া যায়। চণ্ডী গোধিকাবেশে কালকেতুকে দর্শন দেন। মৃগয়ায় বিফল-মনোরথ হইয়া কালকেতু সেই গোধিকাকে জালদড়ি দিয়া বাঁধিয়া আনে। গৃহে আনিয়া ব্যাধ গোধিকাকে চুপড়ি চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। গোধিকা কিয়ৎক্ষণ পরে নিজ যথার্থ মূর্তি ধারণ করিয়া বাহির হইল।

কালকেতু গৃহে নাই। ফুল্লরা আসিয়া দেখে যে তাহার গৃহে এক ষোড়শী রূপসী নীরবে বসিয়া আছে। রূপসীর লাবণ্য দেখিয়া ফুল্লরা অবাক হইয়া গিয়াছে—এমনতর সুন্দরী সে বুঝি জীবনে দেখে নাই। সুন্দরী আবার এত দেশ থাকিতে ফুল্লরার কুটীর-দ্বারে বসিয়া,—সুতরাং ব্যাধনিতম্বিনীর আরও আশ্চর্য ঠেকিতেছে। ফুল্লরা বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে সাহস করিয়া যুবতীর একাকিনী এরূপভাবে পরগৃহে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফুল্লরা সন্দেহ করিতে-ছিল—কুলবধূ কেহ স্বামীর সহিত অথবা শাশুড়ী-ননদের সহিত ঝগড়া করিয়া রাগের মাথায় চলিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য সে খুলিয়া বলিল যদি এরূপ

কিছু হইয়া থাকে, সুন্দরীর সঙ্গে গিয়া দুই পাঁচ কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাহাদিগকে সে শান্ত করিয়া আসিবে।

ফুল্লরার সান্ত্বনায় চণ্ডীর মুখ ফুটিল। তিনি বাঁধা আইনানুসারে উগ্র পতি এবং সোহাগিনী সপত্নীর বিরুদ্ধে ফুল্লরা সমীপে এক নালিস রুজু করিলেন। বীরের জন্য তিনি যে সকল কষ্ট সহিতে পারেন, সে কথারও আভাস দিতে ভুলিলেন না। ফুল্লরার কিন্তু তাহাতে মন উঠিল না; সীতা, সাবিত্রী, বেদবতীর উদাহরণ সমেত একটা লম্বা রকম বক্তৃতা ঝাড়িয়া বুঝাইল, ভালয় ভালয় দিন থাকিতে স্বামিগৃহে প্রতিগমন করা কর্তব্য। চণ্ডী ঘাড় নাড়িলেন—ফুল্লরার কুটীর হইতে সহজে তিনি নড়িতে সম্মত নহেন।

ফুল্লরা মহা বিপদে পড়িল - ও যোড়শী রূপসীটাকে কিছুতেই যে বিদায় করা যায় না। ফুল্লরা বার মাসের দুঃখ গাহিল। কিন্তু গাইলে হইবে কি? চণ্ডী নড়িবার কথা ভুলিয়াও বলেন না—তাঁহার ধনে এবার অবধি ফুল্লরার অংশ রহিল বলিয়া ভরসা দিলেন। ফুল্লরাও বেগতিক দেখিয়া স্বামীর নিকট দৌড়িয়া গিয়া বলিল যে, কাহার যোড়শী কন্যা ঘরে আনিয়া তিনি মরিবার উপায় করিতেছেন। কালকেতু শুনিয়াই অবাক। ফুল্লরাকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, মিথ্যা হইলে নাসিকা শূর্পণখার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে বুঝিয়া যেন সত্য বলা হয়। ফুল্লরা কালকেতুকে লইয়া আসিয়া দেখাইল। কালকেতু ভাবিল, তাইত এ ব্যক্তি এখানে কে?

কালকেতু রূপসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, ফুল্লরা সমেত গিয়া তাঁহাকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌছাইয়া দিয়া আসিতে চাহিল। অনেক পীড়াপীড়িতে চণ্ডী মহিষমর্দিনী-রূপ ধারণ করিলেন; তখন কালকেতু ভয়ে মূর্ছা যায়। চণ্ডী অভয় প্রদান করিলেন এবং কালকেতুকে অনেক ধনরত্নের অধিকারী করিয়া দিলেন। সেই অবধি ব্যাধনন্দনের কপাল খুলিয়া গেল।

চণ্ডীর অনুগ্রহে কালকেতু গুজরাট দেশে এক নূতন নগর নির্মাণ করিল। বীরের নগরে অনেক হিন্দু মুসলমান প্রজা আসিয়া জুটিল। মুসলমানেরা সহরের পশ্চিমভাগে বাস করিবার অনুমতি পাইল। মুকুন্দরাম মুসলমান-পাড়ার এক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি হইয়াছে ভাল। তাহা পড়িতে মজা লাগে। মোটা মোটা মুসলমানী কথায় তাহার মধ্যে যেন একটা হাস্য-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে।

মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণ পাড়ারও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা আরও দীর্ঘ; বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইতে মূর্খ বিপ্র পর্যন্ত কেহই তাঁহার বর্ণনার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তাহার পর ক্রমে ক্রমে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতিরও বর্ণনা হইয়াছে। কবিত্বরস এসকল বর্ণনায় লোকে বড় নাকি আশা করে না; তাই এগুলি পড়িতে মন্দ নয়। নহিলে স্বভাবের সৌন্দর্য কিম্বা হৃদয়ের গভীর ভাব বর্ণনা করিতে মুকুন্দরাম আদবেই পারেন না। তিনি কাঠাম গড়িতে পারেন, কিন্তু কাঠামে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন না। সাধারণ ভাব কথাবার্তা যেমন তেমনি তিনি বেশ বর্ণনা করেন বটে।

যাহা হৌক, কালকেতুর অদৃষ্টে নিরাপদে রাজ্যভোগ অধিক দিন ঘটিল না। ভাঁড়ুদত্তের ধূর্ততায় কলিঙ্গরাজের সহিত কালুর যুদ্ধ হইল। জয়লক্ষ্মী কলিঙ্গ-রাজের দিকেই চলিয়া পড়িলেন। কালকেতু কারাগারে বন্দী: সে স্বাধীনতা নাই, সে রাজ্যসুখ নাই, কালকেতুর লক্ষ্মী বুঝি চঞ্চলা হইয়াছেন। চণ্ডীর অনুগ্রহে কালুর অদৃষ্ট আবার ফিরিল। কলিঙ্গাধিপতি সসম্মানে কালকেতুকে পুনর্বার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গুজরাটের রাজা হইয়া কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া যথেষ্ট অপমানিত করিলেন। তাহার পর কিছু দিন অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া পুত্র পুষ্পকেতুর করে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন, এবং ব্যাধ জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নীলাম্বর স্বর্গধামে উপনীত হইলেন।

(২)

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র পূর্বভাগ এইখানেই সমাপ্ত হইল। উত্তর ভাগের সহিত এ খণ্ডের বিশেষ কিছু যোগ নাই। সে উপাখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্তের তাহাতে নামগন্ধও নাই। তবে গ্রন্থের প্রায় শেষে চণ্ডী কালকেতুর উদ্ধারের কথা একবার বলিয়াছেন বুঝি। পূর্বখণ্ডের পাত্র-পাত্রী উত্তরখণ্ডে পঁহুছিবার পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। চণ্ডীর প্রভাব দেখান বোধ করি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, সেইজন্য দুইটি বিভিন্ন উপাখ্যান রচনা করিয়া কেবলমাত্র চণ্ডীর অনুগ্রহ-সূত্রে দুইটিকে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। সংসারের সকল সুখদুঃখের মধ্যেই চণ্ডীর মঙ্গলহস্ত বিদ্যমান—তাঁহার অনুগ্রহ বিনা এখানে কোনও কার্য সুসম্পন্ন হয় না।

কবিকঙ্কণের লেখায় বরাবর কেমন একটি ধর্মের সুর আছে। লেখা পড়িলেই মনে হয় ব্রাহ্মণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। মুকুন্দরাম জীবনে দুঃখকষ্ট সহিয়াছেন অনেক, আর ঐ সকল দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি যেন মায়ের স্নেহ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ধরণ কতকটা পৌরাণিক—অসম্ভব রকম বর্ণনা করিয়া একটা গম্ভীর মূর্তি খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বুঝা যায়। জমকালো মূর্তি আঁকিবার তাঁহার যতটা চেষ্টা ছিল, গম্ভীর প্রশান্ত হৃদয় গঠন করিবার তেমন ঝোঁক ছিল না। কালকেতু-উপাখ্যান-খণ্ডেই কি, আর ধনপতি-সদাগর-কথায়ই বা কি—তাঁহার একটি চরিত্রও গম্ভীর হয় নাই। স্বয়ং চণ্ডীই গম্ভীর নহেন।

যাহা হৌক্, সাধারণ চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার ক্ষমতার নিতান্ত অভাব দেখা যায় না। কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতির চিত্র বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। ধনপতি সদাগর, খুল্লনা, লহনা, দুবলা প্রভৃতির চরিত্রও অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু থাক, এ সকল চরিত্র সম্বন্ধে এখন কিছু না বলাই ভাল। ধনপতি-উপাখ্যান আলোচনার সময় দেখা যাইবে।

ফুল্লরার বারমাস্যা বঙ্গদেশে খুব বিখ্যাত। অনেকে কবিকঙ্কণের কবিত্বের নমুনা স্বরূপ বারমাস্যা হইতে দু'এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান। বারমাস্যায় ফুল্লরা দুঃখ করিতেছে, আষাঢ় মাসে নিত্য ঘর পড়ে, শ্রাবণ মাসে ভগ্ন কুটীরে জল পড়িতে থাকে—গায়ে আচ্ছাদন নাই, ভাদ্র মাসে দুরন্ত বাদলে কিরাতের উপার্জন করিবার তেমন সুবিধা নাই, আশ্বিনে সকলে উত্তম বসন পরিধান করে—ফুল্লরার তখন উদর-চিন্তা, ইত্যাদি। কিন্তু ফুল্লরার বার মাসের দুঃখে কবিত্ব কোথায়ও ত দেখা যায় না। ফুল্লরার দুঃখ যদি কবিত্ব রসসিক্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ারে দুয়ারে দুইবেলা যে সকল অভাগিনীরা একমুষ্টি অন্নের জন্য কাঁদিয়া বেড়ায়, তাহাদের কথাই বা কবিত্ব নহে কেন? ফুল্লরা আপনার দুঃখগুলি আওড়াইয়া গিয়াছে মাত্র, এমন করিয়া কিছু বলে নাই যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভাবে একেবারে গলিয়া যায়। তবে দুঃখের কথা শুনিলেই লোকের দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয়। ফুল্লরার দুঃখ দেখিয়া আমাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে বটে। বারমাস্যা অতি দীর্ঘ না হইলে পাঠকদের দেখিবার জন্য আমরা উঠাইয়া দিতাম—ফুল্লরার বারমাস্যায় কবিত্ব আছে কিনা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন। কান্না মাত্রই কবিত্ব

হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল না, কিন্তু তাহা ত আর নয়, কবিত্ব স্বতন্ত্র জিনিস।

কালকেতু-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আর অধিক কথা না বলিয়া এইবারে আমরা ধনপতি সদাগরের গৃহে দৃষ্টিপাত করি।

(৩)

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর দ্বিতীয় খণ্ড—ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। পূর্বখণ্ডের উপাখ্যান অপেক্ষা এ উপাখ্যানটি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালীর ঘরের ব্যাপার ইহাতে বেশ চিত্রিত হইয়াছে, আলোচনা করিবার মত চরিত্রও আছে। তবে চরিত্রগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু বিশেষ প্রভাব—বিশেষতঃ খুল্লনার জীবনের দু'একটি ঘটনায়। মৃত স্বামী ক্রোড়ে লইয়া খুল্লনা যখন ক্রন্দন করিতেছে এবং হৃদয়ের কাতরতা দেখিয়া চণ্ডী ধনপতিকে বাঁচাইয়া দিলেন, তখন মহাভারতের কথা কাহার না মনে পড়ে? তদ্ভিন্ন, স্বর্গচ্যুতদিগের মর্ত্যবাস, স্বর্গ-গমন প্রভৃতি ঘটনায়ও পুরাণের অল্পবিস্তর অনুচিকীর্ষা-প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। মুকুন্দরামের নিজস্ব যথেষ্ট আছে, তাঁহার চরিত্রগুলি বাঙ্গালী বটে।

স্বর্গের নর্তকী রত্নমালা তালভঙ্গ অপরাধে মর্ত্যে আসিয়া খুল্লনারূপে জন্ম-গ্রহণ করে। ঘটনাচক্রে খুল্লনার সহিত ধনপতি সদাগরের বিবাহ হয়। ধন-পতির অনুপস্থিতিতে দাসী দুর্বলার পরামর্শে জ্যেষ্ঠা সপত্নী লহনার নিকট খুল্লনা অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে। ধনপতি গৃহে আসিয়া লহনার অত্যাচার সকলই জানিতে পারেন লহনাকে যথেষ্ট ভৎ‍র্সনাও করেন। তাহার পর বিশেষ কারণে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় খুল্লনাকে ছাড়িয়া তাঁহাকে সিংহল যাইতে হয়। অদৃষ্ট-দোষে সেখানে তাঁহার কপালে কারাগার জুটে। অবশেষে বহুদিন পরে চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত গিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া এবং রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া আনে। দেশে আসিয়া আবার জয়াবতীর সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। কিয়ৎদিবস পরে খুল্লনা স্বর্গে চলিয়া গেল।

সংক্ষেপে ধনপতি উপাখ্যানের কাঠাম এই। কিন্তু ইহার মধ্যে কথোপ-কথন, মান-অভিমান, জাল পত্র, দ্বন্দ্ব-কোলাহল, শিক্ষা-দীক্ষা অনেক বিষয় অবশ্য আছে। তাহা না থাকিলে গ্রন্থ লোকে পড়িবে কেন? খুল্লনার সহিত ধন-

পতির বিবাহ হইল। সকলে বলিল, খুল্লনার বর মিলিয়াছে ভাল। যুবতীরা অনেকে স্বাভাবিক ঔদার্যগুণে এবং পরশ্রীতে অনাসক্তি হেতু অকাতরে অনুপস্থিত স্বামিবর্গের সবিশেষ রূপগুণের বর্ণনা করিয়া লইলেন। দিনকতকের জন্য পাড়া জমিল—গল্পের বিষয় কাহাকেও ভাবিতে হয় না, সাথী খুঁজিতে হয় না, সব কূলে কূলে পরিপূর্ণ!

লহনার একটু অভিমান হইল। শাস্ত্রে কি চতুষ্পাঠীতে দুই বিবাহের ব্যবস্থা আছে বলিয়া স্ত্রী কি স্বামীর হৃদয় খানিকটা ছাড়িতে পারে? ধনপতি বুঝাইতে বাকি রাখিলেন না। লহনাও জবাব দিলেন। ধনপতি লহনার যথাসাধ্য মনস্তুষ্টি-সাধনের চেষ্টা করিলেন। লহনা ঘাড় নাড়ে, ধনপতির উপর রাগের তালটা পড়িবে খুল্লনার পৃষ্ঠে।

এদিকে গৌড়াধিপতির শুকপক্ষীর স্বর্ণপিঞ্জর নির্মাণের জন্য সদাগরের ডাক পড়িল। লহনার হস্তে খুল্লনাকে সমর্পণ করিয়া ধনপতি গৌড়ে চলিলেন। দিনকতকের জন্য সতীনে সতীনে বনিল ভাল। কিন্তু চিরদিন কি এ মিল থাকে? বিধাতা সপত্নীকে সহজশত্রু করিয়া গড়িয়াছেন, মানুষে কি করিবে? ধনপতি সদাগরের গৃহে আবার দাসী আছে। যে গৃহে পরিচারিকা আছে, সেখানে সপত্নী না থাকিলেও দ্বন্দ্বের কখনও অসদ্ভাব হয় না। ধনপতির গৃহে দুর্বলার বলে দুই সতীনের মধ্যে অল্পদিনেই বেশ বাধিয়া গেল।

দুর্বলা বলিল, লহনা ঠাকুরাণী ত বুঝেন না—দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিতেছেন। তা দাসী বাঁদীর কিছু ভাল দেখায় না, মোদ্দা এই বেলা দিন থাকিতে উপায় করা ভাল। লহনার মনের কোণে দুর্বলার কথা ঠাঁই পাইল। লীলাবতীর ডাক পড়িল, অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা হইল, ধনপতির নামে একটা জাল স্বাক্ষর-পত্রও বাহির হইল—তাহাতে অবশ্য খুল্লনাকে নিরাভরণা করিয়া ছাগরক্ষণ-কার্যে নিযুক্ত করিবার আদেশ আছে। খুল্লনা নিতান্ত বোকা মেয়ে নয়; লহনাকে সে চাপিয়া ধরিল, এ ত প্রভুর অক্ষর নহে—দিদির সব উপহাস। লহনাও বুঝাইল যে, পত্র ধনপতিরই বটে। খুল্লনা পত্রবাহককে দেখিতে চাহিল! এইরূপ ক্রমে ক্রমে জমিয়া গেল—দন্তযুদ্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হইল।

খুল্লনা ছাগল চরাইয়া বেড়ায়। যথাসময়ে বসন্ত আসিল। মুকুন্দরাম খুল্লনার মুখে এক খেদ গুঁজিয়া দিলেন। সুতরাং খুল্লনা তাহা ভালরূপ হজম করিতে পারে নাই। দুর্বলা খুল্লনার কষ্টের কথা তাহার পিত্রালয়ে গিয়া

সুবিধামত গল্প করিয়া আসিয়াছে। রম্ভাবতী কাঁদিতেছেন। চণ্ডী খুল্লনাকে রম্ভাবতী বেশে একদিন ছলনা করিলেন। তাহার পর খুল্লনার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া লহনাকে স্বপ্নাদেশ করেন। স্বপ্নাদেশের পর খুল্লনার একটু আদর-যত্ন বাড়িল।

সাধুকেও স্বপ্নাদেশ হইল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাজ সারিয়া ধনপতি তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলেন। ধনপতি এক ভোজ খাইলেন, খুল্লনার উপর রন্ধনের ভার পড়িল। দুর্বলা হাট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। মুকুন্দরাম তাহার এক নিখুঁত হিসাব দিয়াছেন; হাটবাজারে মুকুন্দকে কেহ ঠকাইতে পারে না; ক্রমে ক্রমে জাল পত্র ইত্যাদি বাহির হইল। ভোজ-পরিতৃপ্ত সাধু লহনাকে ভর্ৎসনা করিলেন।

এদিকে সাধুর বাড়ীতে কুটুম্ব-ভোজন হইল। খুল্লনা এতদিন বনে বনে হেথা সেথা ছাগল চরাইয়া বেড়াইয়াছে, এইজন্য সে যদি পরীক্ষা দেয় তবে সকলে সাধুর আলয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন, নচেৎ নয়! অগত্যা খুল্লনাকে পরীক্ষা দিতে হইবে। জতুগৃহ নির্মাণ করাইয়া খুল্লনা তাহার মধ্যে রহিল। অগ্নি-সংযোগে গৃহ পুড়িয়া গেল, চণ্ডীর অনুগ্রহে খুল্লনা বাঁচিল। নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হইল।

কবিকঙ্কণের এইখানকার বর্ণনাগুলি পড়িলে বঙ্গসমাজের দলাদলির অবস্থা বেশ বুঝা যায়। লোকের ছিদ্র পাইলে বাঙ্গালী জাতি যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এমন আর কোনও জাতি নহে। খুল্লনাকে পঞ্চাশবার পরীক্ষা দিতে হইয়াছে—জলে, স্থলে, অগ্নিতে কিছুতেই আর বাকি নাই। আত্মীয়-স্বজনেরা খুল্লনাকে সভামধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ব্যস্ত, পরীক্ষায় চরিত্র নির্মল প্রমাণ হইলে তাঁহাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কুল-বধূর কুলকলঙ্ক প্রমাণ করিতে পারিলে আনন্দের সীমা নাই—মহৎ কার্য করিয়া লোকে হৃদয়ে যে তৃপ্তি অনুভব করে, ইহার নিকটে তাহা কিছুই নহে। রাম-চন্দ্রের প্রজারা, অগ্নি-পরীক্ষার পর, সীতাকে সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া দুঃখিত হইয়াছিল। ধনপতির বুদ্ধিদৃপ্ত বাঙ্গালী আত্মীয়েরা খুল্লনাকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করিতে পারিল না বলিয়া দুঃখিত হইল।

তাহার পর ধীরে ধীরে কিছুদিন কাটিয়া গেল। নৃপতির আদেশে গর্ভবতী খুল্লনাকে ছাড়িয়া চন্দনের জন্য সদাগরকে পুনরায় সিংহলে যাইতে হইবে। লহনার কূটমন্ত্রে ভুলিয়া ধনপতি একদিন পূজার সময় খুল্লনা সুন্দরীকে চুল ধরিয়া

টানিয়া অপমান করিলেন—পূজার ঘট বারি প্রভৃতি লঙ্ঘন করিতে সাধুর কিছু মাত্র দ্বিধা উপস্থিত হইল না। খুল্লনা ত অপমান সহিল। চণ্ডী কিন্তু তাহা সহিতে পারিলেন না, সদাগরকে নাকের জলে চোখের জলে করিবেন স্থির করিলেন। মগরার নিকট সদাগরের ছয়খানা পোত ডুবিয়া গেল।

ঝড় বৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট একখানি জাহাজ লইয়াই ধনপতি চলিলেন। মুকুন্দরাম উদার সিন্ধুর বিশেষ বর্ণনা করিতে পারেন নাই, অনেক-গুলি জায়গার নাম করিয়াছেন মাত্র। কবি হইলে সিন্ধুর ভাবে তাঁহার কল্পনা উদ্দীপিত হইত সন্দেহ নাই।

ধনপতি পথে কমলে কামিনী দর্শন করিলেন। সিংহলের রাজসভায় সে কথা বলিতে ভুলিলেন না। কিন্তু রাজা যখন ধনপতির সহিত কমলে কামিনী দেখিতে গেলেন, কিছুই দেখা গেল না। ফল হইল, ধনপতির কারাবাস। ধনপতি এখনও চণ্ডীকে ডাকেন না—স্ত্রী-দেবতা পূজা করিতে তিনি বড়ই নারাজ। আর ঘরে তাঁহার যে চণ্ডী আছেন, চণ্ডীকে ডাকিতে ভাল লাগিবে কেন?

এদিকে খুল্লনার সাধভক্ষণ। লহনা জ্যেষ্ঠা, সপত্নী হইলেও খুল্লনার এ সময়ে দেখিতে হইবে। খুল্লনাকে কি খাইতে ভাল লাগে না লাগে জিজ্ঞাসা করিতে খুল্লনা বলিল—

"আপনার মত পাই, তবে গ্রাস চারি খাই
পোড়া মাছে জামীরের রস।
উদরে পরম ব্যথা, শুন দিদি দুঃখের কথা,
ওদন ব্যঞ্জন নিমবারি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, বদরী-শকুল ঝোল
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি।
লতা পাতা বন শাক, খর জালে করি পাক,
সম্ভলিবে যোয়ানী ফোড়ন দিয়া।
সম্ভোল (১) লবণ তথি দিবে হিং জীরা মেথী,
বহিন গণি যদি কর দয়া।

১। সাঁতলান

"নিধান করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই,
আমড়া সংযোগে রাঙ্গা শাক।
যদি পাই কিছু পুপ, আমে মসুরীর সূপ,
আমশীতে প্রাণ পাই, রাখ।
আমি যেন পাই সোণা শকুল মাছের পোনা
পোড়া কাসুন্দি দিয়া তথি।
হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জী উদর পূরিয়া ভুঞ্জি
বনশাকে বড়ই পিরীতি।"

ক্ষুধা তৃষ্ণা দিন দশ না থাকাতে খুল্লনার এই কয়টি জিনিস খাইতে সাধ হইয়াছে। সুতরাং দুর্বলা চুপড়ি হস্তে বাড়ী বাড়ী শাক তুলিতে বাহির হইল। মুকুন্দরাম শাকের এক লম্বা ফর্দ দিয়াছেন। ফর্দ অনুযায়ী পঞ্চাশ রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। খুল্লনা সাধ ভক্ষণ করিল।

সাধ-ভক্ষণের পর যথারীতি শ্রীমন্তের জন্ম হইল। শ্রীমন্ত রূপে গুণে অদ্বিতীয়। বিদ্যাটাও হইল বড় মন্দ নয়। গুরুর সহিত ঝগড়াটাও হইয়াছিল ভাল। আইনানুযায়ী অভিমান-পালা সাঙ্গ করিয়া শ্রীমন্ত ধনপতির উদ্দেশে সিংহল যাত্রা করিল। খুল্লনার নিষেধ বড় টিকিল না। সিংহল-যাত্রার বর্ণনা করিবার কিছুই নাই। মুকুন্দরাম পূর্ববৎ দেশের নাম আওড়াইয়াছেন। শ্রীমন্ত কমলে কামিনী দর্শন করিল, রাজসভায় সে গল্প করিল; ধনপতির মত সকল অবস্থাই ঘটিল। শ্রীমন্তকে মশানে পর্যন্ত লইয়া গেল। তবে চণ্ডী নাকি সহায় আছেন তাই ছিরা বাঁচিয়া গেল। শুধু বাঁচিয়া যাওয়া নয়, সুশীলার শ্রীমন্তের সহিত বিবাহ হইল। ধনপতি সসম্মানে কারামুক্ত হইলেন।

চণ্ডী খুল্লনা-বেশে একদিন শ্রীমন্তকে স্বপ্ন দিলেন। শ্রীমন্ত কাঁদিয়া উঠিল। সুশীলার প্রতিরোধ-বাক্যেও শ্রীমন্তের মন বুঝিল না। অবশেষে ধনপতি, সুশীলা, শ্রীমন্ত সাধুর আলয়ে চলিলেন। মগরায় নষ্ট ধনসম্পত্তি পুনরুদ্ধার হইল। সাধু স্বদেশে আসিয়া পঁহুছিলেন। বিক্রমকেশরীর নিকট কমলে কামিনীর কথা হইল। শ্রীমন্তের মশান-বাসও হইল। চণ্ডীর কৃপায় এ যাত্রায়ও কোনও অনিষ্ট ঘটিল না। বিক্রমকেশরী শ্রীমন্তের করে জয়াবতীকে সমর্পণ করিলেন।

খুল্লনা পুত্র-পুত্রবধূ সমেত স্বর্গে চলিলেন। শ্রীমন্ত স্বর্গের মালাকর ছিলেন—শাপে মর্ত্যে জন্ম হয়। এখন সকলেই শাপমুক্ত। ধনপতি সদাগর কাঁদিতে লাগিলেন। চণ্ডী লহনার গর্ভে সুপুত্র জন্মিবে বলিয়া ধনপতিকে বুঝাইলেন।

(৪)

এইবার সংক্ষেপে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর প্রধান চরিত্রগুলি একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্—ধনপতি, শ্রীমন্ত, লহনা, খুল্লনা, দুর্বলা। সুশীলা, জয়াবতীকে গ্রন্থকার অন্তঃপুর হইতে বড় বাহির করেন নাই, বিবাহ-রজনীতে এবং অন্য দু' এক দিন মাত্র দেখিয়া ইহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা চলে না।

ধনপতি সদাগর জাতিতে গন্ধবণিক। ব্যবসা-বাণিজ্যে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করিয়াছেন। সাধারণত ধনী বণিক্-সন্তানেরা যেরূপ হইয়া থাকে, তিনি তাহাই ছিলেন। অসাধারণ মহত্ত্ব অথবা বিশেষ কোনও কাজ করিবার দিকে লক্ষ্য তাঁহার ছিল না। ঘর-সংসারই তাঁহার জীবনের সর্বস্ব। তাঁহার নিকট স্বর্গও বোধ হয় তুচ্ছ। তদানীন্তন সমাজের প্রথা যেরূপ ছিল, ধনপতি তাহার সহিত ঠিক মিলিয়াছিলেন। আত্মসুখের জন্য তিনি দুই বিবাহ করেন। তবে, লহনার সন্তানাদি ছিল না বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের পক্ষে দুই চারি কথা অবশ্য বলা যায়। আরও ইহাও বলিতে হয় যে, খুল্লনার রূপে মুগ্ধ না হইলে তাঁহার আবার বিবাহ হইত কিনা সন্দেহ। বর্তমান বিদ্রূপীরা উপহাস-রসিকতায় প্রাচীন কালকে যাহাই প্রতিপন্ন করুন না কেন, রূপের আকর্ষণ তখন যে যথেষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের ধনপতি সে সময়ের একজন সাধারণ বাঙ্গালী। আদর্শ সৃষ্টি করিবার মত কল্পনা কবিকঙ্কণের ছিল না, তিনি সেরূপ চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার ধনপতি প্রতিদিন ঘরে-ঘরে দেখা যায়। রাগ করিলে স্ত্রীকে দুই ঘা বসাইয়া দিয়া ধনপতি স্থির হইতেন। তাঁহার ইহা কাপুরুষত্বও মনে হয় না, স্ত্রীকে সম্মান-প্রদর্শন বলিলে অবাক হইয়া থাকেন মাত্র। সমাজ-যন্ত্রে প্রতিদিন যে সকল জীব বাহির হইতেছে, ধনপতি তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র নহেন।

শ্রীমন্তের ভাবও পিতার মত। স্বর্গ হইতে আসিয়াছে বলিয়া নবীনত্ব কিছু নাই। কবিকঙ্কণের স্বর্গের ভাব যে তেমন উন্নত তাহাও নহে। স্বর্গ পার্থিব সুখময় একটা স্বতন্ত্র দেশ মাত্র। শ্রীমন্ত সেই দেশের অধিবাসী। সুশীলাকে

বিবাহ করিয়াই জয়াবতীর পাণিগ্রহণ করিতে শ্রীমন্তের বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইল না। বিবাহের পবিত্র উচ্চ আদর্শ ছিরার মনে কোনও কালে জাগিয়াছে কিনা সন্দেহ। শ্রীমন্ত একীকরণ, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলন, এ সকলের বড় ধার ধারে না। হয়ত যাহার অর্থই বুঝে না এমনতরো কতকগুলা বড় বড় কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাকে বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে।

ধনপতি ও শ্রীমন্তের চরিত্রে কবিকঙ্কণের সৃষ্টি-কল্পনার অভাব বেশ বুঝা যায়। অদ্ভুত রকম কল্পনা বাঙ্গালী জাতির চিরকালই আসে, তাহার কথা অবশ্য বলিতেছি না। কবিকঙ্কণে যে কল্পনার অভাব—তাহা উন্নত, মহান, গম্ভীর কল্পনা।

লহনাকে কবি নিজেই বড় ভাল চক্ষে দেখেন নাই। চণ্ডীর প্রিয় পাত্রী খুল্লনাই তাঁহার প্রিয়। কিন্তু প্রিয় হইলেও খুল্লনা অসাধারণ গুণবতী নহে। লহনার সহিত দ্বন্দ্বে আঁটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই খুল্লনাকে আমাদের মায়া করে। খুল্লনাকে কবি যে সীতা-সাবিত্রীর মত করিবার কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা অগ্নিপরীক্ষা, মৃতস্বামী-ক্রোড়ে ক্রন্দন দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু খুল্লনাতে সে পাতিব্রত্য-তেজের তেমন বিকাশ হয় নাই। রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া খুল্লনা যেন অভিনয় করিয়াছে। খুল্লনা স্ত্রীমাত্রেই সাধারণত যেরূপ হইয়া থাকে সেই রূপই, তবে মুকুন্দরাম রামায়ণ মহাভারতের ছায়া দিয়া তাহার চারিদিকে একটা সৌন্দর্য ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র যে কারণেই হৌক, সংস্কৃত মহাকাব্যের চরিত্রগুলির মত ফুটে নাই। সে স্বাভাবিক স্ফূর্তি, স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য এখানে কোথায়? তবে খুল্লনার কুল-বধূ ভাবটি রক্ষিত হইয়াছে স্বীকার্য। লহনারও সে ভাব আছে। খুল্লনাপেক্ষা কিন্তু লহনা ধূর্তা, কঠিনা।

ভাবের চরিত্র কবিকঙ্কণে নাই। সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যেই মুকুন্দরামের অবস্থিতি। দুর্বলা দাসী হাট বাজার করে, কবিকঙ্কণ তাহার নিখুঁৎ হিসাব প্রস্তুত করেন। দুর্বলা তাঁহার সকল কার্যে দক্ষা। সে চোরকে চুরির পরামর্শ দিয়া গৃহস্থকে সাবধান করিয়া দেয়। দুই সতীনে ঝগড়া লাগাইয়া দিয়া সে তামাসা দেখে। মন্থরার মতন উচ্চ শ্রেণীর হৃদয় তাহার নহে। পাঠকেরা মন্থরার সুখ্যাতি শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন; কিন্তু বাস্তবিক আমরা যতটা মনে করি—মন্থরা তত হীনপ্রকৃতি নহে। ভরতের মঙ্গল

কামনা করিয়াই সে কৈকেয়ীকে দশরথের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিল। সে যদি ভরতের প্রকৃতি বুঝিত, এমন কাজ কখনই করিত না। তাহার বুদ্ধির অভাব থাকিতে পারে, দূরদৃষ্টির অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যথার্থ ভালবাসা ছিল—তামাসা দেখার জন্য অথবা নিজের দুইখান কাপড়ের জন্য দুর্বলতা সাধারণ বলা যাইতে পারে। দুর্বলার প্রকৃতি যথার্থই নীচ। সে লহনাকে কুপরামর্শ দিয়া খুল্লনার নিকটে আর একরকম সাজাইয়া বলে, খুল্লনার নামে লহনার কাছে নিন্দা করে। মন্থরার ভালবাসা দুর্বলায় নাই।

(ভারতী, ১২৯৬)

প্রাচীন কবি সঙ্গীত

(১)

শৈলশ্রেষ্ঠ হিমগিরির অনন্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডারের মধ্যে যেমন সুরধুনীর আবেগময়ী সলিল-রেখা, কবির অনন্ত ভাব-প্রবাহের মধ্যে সেইরূপ সঙ্গীতধারা। উভয়ই স্নিগ্ধতায় সন্তাপহারিণী, উভয়ই অনাবিলভাবে জীবনতোষিণী, উভয়ই অপূর্ব মাধুর্যগুণে শান্তি-বিধায়িনী। একটি সুশীতল জলধারায় ভূখণ্ড প্লাবিত করিয়া, তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাইতেছে, অপরটি মানবহৃদয় বিমল রসসাগরে ডুবাইয়া, অপার্থিব সৌন্দর্য-গৌরবের পরিচয় দিতেছে। কবির সঙ্গীত কবিত্বে উদ্ভাসিত, কবিত্বে গৌরবান্বিত, এবং কবিত্বে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ-প্রাপ্ত। উহাতে কষ্টকল্পনা নাই, ভাবের জটিলতা নাই বা অপ্রাকৃত ও অসম্বদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ নাই। বর্ণনার চাতুরীতে, সুললিত শব্দ-সম্পত্তিতে, সর্বোপরি স্বাভাবিক সৌন্দর্যের আবির্ভাবে, উহা তুলনারহিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ রসশালী সঙ্গীতের অভাব নাই। বাঙ্গালায় উচ্চশ্রেণীর দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু গীতিকবিতায় বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডার চিরকাল সমৃদ্ধ। কেন্দুবিল্বের চিরপ্রসিদ্ধ কবি কোমল-কান্তপদময়ী দেবভাষায় যাহার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। জয়দেবের মধুর সঙ্গীতে মৈথিল কবির মাধুর্যের উৎস উছলিয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির সঙ্গীতমালাতেও সেই মাধুর্য-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

ন্যূনাধিক সার্ধশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালায় আর একশ্রেণীর সঙ্গীতকার কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা সাধারণতঃ কবিওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সঙ্গীত সর্বত্র কবিসঙ্গীত নামে পরিচিত। অধুনা যাঁহাদিগকে শিক্ষিত বলা যায় কবিওয়ালাগণ তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। তখন ইংরেজী শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সর্বত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি দেখা যায় নাই, যুবকদিগের উচ্চ শিক্ষাভিমান পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। তখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সাধারণতঃ শিশুবোধ বাংলা শিক্ষার শেষ সীমা বলিয়া পরিগণিত

হইত চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ অনুশীলন ছিল। অধ্যাপকগণ প্রায়ই সংসার-চিন্তা বিসর্জন দিয়া সংযতভাবে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। বৈষয়িক লোকে সামান্যভাবে ইংরেজী শিখিয়া বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হইত। যে পরিমাণে ইংরেজী শিখিলে সাহেবদিগের সহিত কথা কহিতে পারা যায়, ইহারা সেই পরিমাণে ইংরেজী শিখিয়া আপনাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিত। আধুনিক প্রণালীসম্মত বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও বিদ্যা-লোচনার অভাব ছিল না। তখন কৃত্তিবাস কাশীরামের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ছিল। মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে সকলে চরিতার্থ হইত। কবিরঞ্জনের অপূর্ব কবিত্বময়ী সঙ্গীতসুধায় লোকে বিভোর হইয়া থাকিত। অধ্যাপকগণের শাস্ত্রানুশীলনে বঙ্গভূমি মহিমান্বিত ছিল। ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনার জন্য ভারতের দূরবর্তী প্রদেশের শিক্ষার্থিগণ বঙ্গদেশে সমাগত হইত। হিন্দুস্থানী, তৈলিঙ্গী, মৈথিল, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের পদতলে বসিয়া সংযতভাবে শাস্ত্রাভ্যাস করিত। এক সময়ে এই অধঃপতিত দেশেই ভারতের এইরূপ একপ্রাণতার নিদর্শন লক্ষিত হইত। এখন সে দিন অন্তর্হিত হইয়াছে, সারস্বত সমাজের সে অপূর্ব দৃশ্যেরও বিলোপ-দশা ঘটিয়াছে। শাস্ত্রানুশীলন প্রাধান্যে সে সময়ে বাঙ্গালার এইরূপ সৌভাগ্য ছিল ; আর সৌভাগ্য ছিল কবিসঙ্গীতে—স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-সম্পত্তিতে চিরসমৃদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গীতমাধুর্যে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, কবিওয়ালাগণ বিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষা লাভ করেন নাই, উচ্চ শিক্ষার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া তাঁহারা অধুনাতন শিক্ষিতদিগের ন্যায় সকল বিষয়ে আড়ম্বরের পরিচয় দেন নাই। পরদাসত্ব, পর-তোষামোদ তাঁহাদিগকে সংসারের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। অহঙ্কারে তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় নাই। পল্লবগ্রাহিতায় তাঁহাদের কল্পনা সঙ্কুচিত এবং হৃদয়ের উন্নতভাব অবনত হইয়া পড়ে নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষিত না হইলেও, তাঁহারা সুশিক্ষিতের বরণীয় ; নানা শাস্ত্র পাঠ না করিলেও, তাঁহারা সরস্বতীর প্রিয় পুত্র ; নানা দেশ হইতে জ্ঞানরত্নসংগ্রহে তৎপর না হইলেও, তাঁহারা জ্ঞানিসমাজ ও জনসাধারণের চিরন্তন শ্রদ্ধার পাত্র। কমলে কমনীয় লাবণ্যের বিকাশ না হইতে পারে, পূর্ণচন্দ্রে স্নিগ্ধভাবের পূর্ণতা না থাকিতে পারে ; কিন্তু এই কবিওয়ালাদিগের সঙ্গীতমালায় নিঃসন্দেহ

সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মনোহারিত্বে তাঁহাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহারা স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় লোকের হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কোনরূপে পরপ্রদত্ত শিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হয় নাই। কুসুমস্তবক যেমন প্রকৃতির মনোহর রাজ্য—চিরহরিৎ কাননে আপনা আপনি প্রস্ফুটিত হয়, এবং আপনার অপূর্ব সৌন্দর্যে আপনিই কানন-ভূমি উজ্জ্বল করিতে থাকে, তাঁহাদের কবিত্বও সেইরূপ আপনা আপনি বিকশিত হইত, এবং আপনার গৌরবে গরীয়সী জন্মভূমির জয় ঘোষণা করিত। তাঁহারা এইরূপে স্বভাবের রাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বাভাবিক ভাবে বিভোর হইয়া, যে শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পর্যন্ত সহৃদয় সমাজে তাঁহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গীতসমূহ সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত। উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নশ্রেণীর মুচি এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় পর্যন্ত, সকলেই বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে এই রত্নরাশি ছড়াইয়া গিয়াছেন। সারস্বতী শক্তি যেন এক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধির জন্য, সকল সম্প্রদায়কেই অপূর্ব কবিত্ব-সুধার অধিকারী করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সুধা পানে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহারাই অপরিসীম বিস্ময়ে অভিভূত, অনাস্বাদিতপূর্ব প্রীতিরসে পরিতৃপ্ত এবং অচিন্ত্যপূর্ব আনন্দপ্রবাহে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

(২)

প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, রাসু, নৃসিংহ, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার (কেষ্ট মুচী) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। হরুঠাকুর ও নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর সময়ে কবিওয়ালার দল অধিকতর প্রসিদ্ধ হয়। রাম বসু উহার চরমোৎকর্ষ সাধন করে। গোঁজলা গুঁই অতি প্রাচীন কবি। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬১ সালের ১লা অগ্রহায়ণের "সংবাদ-প্রভাকরে" লিখিয়াছিলেন, "১৪০ একশত চল্লিশ বৎসরের এ দিক নহে, বরং অধিক হইবে, গোঁজলা গুঁই গান প্রস্তুত করেন।" ইঁহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইঁহার রচিত সঙ্গীতসমূহও সংগৃহীত হয় নাই। কেবল দুই একটি গান প্রচারিত হইয়াছে। একটি গান এই :—

"এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসে নীরসো কোরোনা ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভূজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥"

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার কবিগান এইরূপ ছিল। এই গানে রচনাচাতুরীর সহিত দার্শনিক ভাবের সমাবেশ আছে। রচয়িতা যে প্রকৃতি-সিদ্ধ কবিত্বশক্তিতে মহৎ ছিলেন, এই একটি গানেই তাহার পরিচয় আছে।

রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর। ইঁহারা কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্তী গ্রামে ইঁহাদের বাস ছিল। উভয় ভ্রাতাই কবি ছিলেন কিনা, তদ্বিষয়ে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইঁহাদের একজন সুকবি ছিলেন। প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্বে ইঁহাদের সঙ্গীত রচিত হয়। এই সঙ্গীতের স্থানে স্থানে ভাবের পারিপাট্য ও ললিত পদাবলীর সমাবেশ আছে। জয়দেব বিরহ-বিধুর কৃষ্ণের উক্তিতে লিখিয়াছেন :—

"হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে[১] ময়ি,
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥"

জয়দেবের এই ভাব বিদ্যাপতির সঙ্গীতে এইরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে :—

"কতি হুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর হুঁ বর নারী ॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতীমালে শিরে, নহ গঙ্গা ॥

১। পাঠান্তর—প্রিয়ারহিতে

মৌতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দূর-বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিকমল ইহ না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন স্বচ্ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক॥"

পরবর্তী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসু এই ভাব লইয়া একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন :—

"হর নই হে আমি যুবতী।
কেন জালাতে এলে রতিপতি।
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ,
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি॥" ইত্যাদি

জয়দেব শঙ্করের সহিত বিরহী কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। বিদ্যাপতি শঙ্করের সহিত বিরহিণী নারীর তুলনা করিয়াছেন। উভয়ের কবিতাতেই অনঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যেহেতু, অনঙ্গ শঙ্করের প্রতি শরনিক্ষেপে কৃতহস্ত। রাসু বা নৃসিংহও, হর ও হরির সমতা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাজনপ্রবর্তিত পথে পদার্পণ করেন নাই। জয়দেব বা বিদ্যাপতির কবিতা তাঁহার আদর্শস্থানীয় হয় নাই। তিনি সখীসংবাদে কল্পনাবলে অন্যভাবে শঙ্করের সহিত কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন :—

"মহড়া—প্রাণনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করো
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো আজু প্রভাতে।
বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে॥

চিতেন—পার্বতীনাথেরো অর্ধ শশধরো
সবিতা অর্ধ কপালেতে।
আমারো নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো
চন্দনো সিন্দূর ভালেতে।

অন্তরা—হায়! মথনেরো বিষে ভখিয়ে মহেশো,
নীলকণ্ঠদেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম,
জগতে রোয়েছে ঘোষণা॥

চিতেন—আমার নাগরো গিয়েছিলেন কারো
কলঙ্ক-সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশানো,
আঁখির অঞ্জন গলাতে॥

অন্তরা—হায়! ত্রিলোচনো হরো, জগতে প্রচারো,
এক চক্ষু যার কপালে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণযুগলে।

চিতেন—ইহারো সেই মতো, সপত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণযুগেতে।
ত্রিলোচনচিহ্ন দেখ দীপ্তমানো,
কপালে কঙ্কণ-আঘাতে॥"

একশত বৎসরের অধিক কাল পূর্বে প্রাচীন সঙ্গীতে এইরূপ শ্লেষোক্তি দেখা যায়। এরূপ কল্পনাপ্রসূত সাদৃশ্যকে অতি সুন্দর বলিতে হইবে। সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আহা! আহা! কবিওয়ালাদিগের মধ্যে এবম্ভূত শ্লেষঘটিত সরস রূপকরচনা প্রায় কখনই শ্রবণপথের পথিক হয় না। এই গীতটির তুল্য নাই, মূল্য নাই। এবিষয়ে কি বাক্যে কবির সুখ্যাতি করিব, তদ্বর্ণনে বর্ণ বিবর্ণ হইল।" রাসু বা নৃসিংহের সখীসংবাদের আর একটা সঙ্গীতের কিয়দংশ এই—

"চিতেন—শ্যাম এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন কুব্জীকৃষ্ণ বোলে ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরাবে দুজনে ॥
অন্তরা—শ্যাম, তেজিলো শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গমাণিকো হোরে নিলো ভেকো,
মরণে এ দুখো রহিলো ॥
চিতেন—শ্যাম, প্রদীপেরো আলো প্রকাশ পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গো-খুরের জলো জগতে ব্যাপিলো,
সাগরো শুকালো তপনে ॥"

এ সঙ্গীত অতি সুন্দর - প্রকৃত কবিত্বে পরিপূর্ণ। কবি বিরহ-সঙ্গীতেও এইরূপ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন :—

"মহড়া—কহ সখি! কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা ॥
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হে প্রেমধনো উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা।
* * *
অন্তরা—হায়! কোন প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,
মহাদেবো যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম-কারণে ভগীরথজনে
ভাগীরথী আনে ভারতভূমে ॥
চিতেন—কোন্ প্রেমে হরি, ব'ধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী কোরে অনাথা।
কোন প্রেমফুলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলো মাধবীলতা ॥"

(৩)

পরবর্তী সঙ্গীতকারের মধ্যে হরু ঠাকুর প্রধান। হরু ঠাকুর স্বভাবকবি ছিলেন। বাগ্‌দেবী সরস্বতী যেন তাঁহার রসনায় অনুক্ষণ লীলা করিয়া বেড়াইতেন। বিনা চেষ্টায়, বিনা চিন্তায়, বিনা সাধনায়, অমৃতময়ী কবিতা-ধারা তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত। উপস্থিত রচনায় হরু ঠাকুরের এমন ক্ষমতা ছিল যে, কেহ কোন পদ বলিয়া দিলে, হরুঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই পদ অবলম্বন করিয়া পাঁচশত অন্তরা গান প্রস্তুত করিয়া দিতেন। কবিপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নে হরুঠাকুরের ঐ সকল সঙ্গীতের অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্থলে দুই একটি প্রশ্নস্বরূপ এবং হরুঠাকুরকৃত উহার পূরণ উদ্ধৃত হইতেছে—

প্রশ্ন

"তোমার আশাতে এ চারিজন।"

পূরণ

"মহড়া—তোমার আশাতে এই চারিজন।
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন।
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্বক্ষণ।
দরশো পরশো, শুনিতে সুভাষো, করিতেছে
আরাধন্॥

চিতেন—অনুরূপো আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণো প্রাণো তুমি জুড়াবার।
শয়নে স্বপনে, মনোভাবে মনে, কবে হইবে মিলন॥

অন্তরা—প্রাণ, ইহার কি বলো উপায়।
আমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায়॥

চিতেন—অস্থির হোলো এ চারিজনে।
প্রবোধি প্রবোধো নাহি মানে॥
ইহারো বিহিতো, যে হয় ত্বরিত কর প্রেয়সি এখন॥"

ইত্যাদি

প্রশ্ন

"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।"

পূরণ

"মহড়া—পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে॥
শুনেছো কখনো জলন্ত আগুনো,
বসনো বন্ধনো করিয়ে রাখে।

চিতেন—প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো,
নয়নে না দেখে, উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো,
তৃতীয়ের চাঁদো জগতে দেখে॥"

উপস্থিত রচনা কালে এরূপ কবিত্বের পরিচয় দেওয়া সামান্য ক্ষমতার কর্ম নহে। উল্লিখিত দুইটি পূরণেই কবির ভাব-কৌশল পরিস্ফুট হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও দ্বিতীয় সঙ্গীতের অবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি ১২৬১ সালের ১লা পৌষের সংবাদ-প্রভাকরে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"এমত চমৎকার কবিতা, এমত আশ্চর্য ভাব, প্রায় কখনই শ্রবণ করি নাই। যিনি ইহার সম্পূর্ণ প্রদান করিবেন, তিনি আমাকে বিনামূল্যে ক্রয় করিবেন। তৃতীয়ের চাঁদো জগতে দেখে॥ এ কথার মূল্য নাই। অতি অমূল্য ধন।" হরু ঠাকুর অনেক স্থলেই এইরূপ অমূল্য ধন বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের নগরকীর্তন সময়ে হরু ঠাকুর কয়েকটি গান রচনা করিয়া দেন, তন্মধ্যে একটি গানের কিয়দংশ এই—

হরিনাম লইতে অলসো কোর না রসনা,
যা হবার তাই হবে।
ভবেরো তরঙ্গ বেড়েছে বোলে কি,
ঢেউ দেখে না ডুবাবে॥" ইত্যাদি

এই একটি গানে যেরূপ প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও গভীর ঈশ্বরভক্তিমূলক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। দূরদর্শী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"হরু ঠাকুরের একটি কবিতাতে এইরূপ দেখা যায়—

"নাম প্রেম তার, সাকার নহে বস্তুটি সে নিরাকার,
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ বশীভূত তার।
মুখে লোক বলয়ে পীরিতি সুখের সার ;
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন, জীবনে যেন মরে রই।"

কি চমৎকার ভাব ! ইহা প্লেটো অথবা কোল্‌রিজের উপযুক্ত ! কোল্‌রিজ একস্থানে বলিয়াছেন—

All thoughts, all passions, all delights
Whatever stirs this mortal frame,
Are all but ministers of love,
And feed his sacred flame.

হরু ঠাকুরের কবিতাটি ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না।

হরু ঠাকুরের পরবর্তী কবিওয়ালাদিগের মধ্যে নিত্যানন্দ বৈরাগী সঙ্গীত-নৈপুণ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি জনসাধারণের মধ্যে "নিতে বৈষ্ণব" নামে পরিচিত ছিলেন। ১১৫৮ সালে চন্দননগরে ইঁহার জন্ম হয়, ১২২৮ সালে অর্থাৎ সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, ইঁহার দেহাত্যয় ঘটে। নিত্যানন্দ দাস সঙ্গীতে যেরূপ পারদর্শী, সঙ্গীত-রচনায় সেরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। গৌর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুর, এই দুইজন কবি গান প্রস্তুত করিয়া ইঁহাকে দিতেন। কলিকাতা, সিমুলিয়ায় গৌর কবিরাজের নিবাস ছিল। নবাই ঠাকুরের প্রকৃত নাম কি, এবং ইনি কোন্ স্থানবাসী ছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, নবাই ঠাকুর সখীসংবাদ রচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। গৌর কবিরাজ উৎকৃষ্ট বিরহসঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। নিত্যানন্দ সুমধুর স্বরসংযোগে ইঁহাদের সঙ্গীত গান করিয়া শ্রোতাদিগকে মোহিত করিতেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বরে পণ্ডিতগণের ন্যায় জনসাধারণও অপরিসীম সন্তোষ লাভ করিত।

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর দলের কোন্ সঙ্গীত কে রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহার কোনও নির্ণয় নাই। রচনাকর্তাদেরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, নিত্যানন্দ যে সকল ভাল বিরহসঙ্গীত গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ গৌর কবিরাজের রচিত। নিত্যানন্দের দলের এক একটি সঙ্গীত এত উৎকৃষ্ট যে, তাহা যখন শ্রবণগোচর

হয়, তখনই হৃদয় অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। সখীসংবাদের একটি গান এই—

"মহড়া—বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ অবশো হইলো,
সুধা বরষিলো শ্রবণে।" ইত্যাদি

এই গানটি জনসাধারণের মধ্যে আজ পর্যন্ত সজীবভাবে রহিয়াছে। আজ পর্যন্ত এই গানে লোকের হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে। রচয়িতা কবে লোকান্তরিত হইয়াছেন, নির্ণয় নাই। কিন্তু তাঁহার এই সঙ্গীত আজ পর্যন্ত লোকের রসনায় লীলা করিয়া তদীয় অক্ষয়কীর্তির জয় ঘোষণা করিতেছে। এই দলের একটি বিরহসঙ্গীত :—

"মহড়া—প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে।
যার প্রেম ভাঙ্গে তার নাহি বাঁচে প্রাণ,
যারে লোকে প্রেমিক বলে।
জীবনের সাথী হয় যে পীরিতি,
জীবনে মরে পীরিতি গেলে।"

* * *

"অন্তরা—প্রাণ, সতীর পীরিতি দেখ পতির সহিতে।
চিরদিন সমভাবে যায় সুখেতে॥
চিতেন—আশ্চর্য মিলন হয় সেই দুজনে।
বিচ্ছেদ কাহার নাম না শুনে কাণে।
জিয়ন্তে মিলন আবার মিলন মোলে॥" ইত্যাদি

এই সঙ্গীত অতি মনোহর। পতিব্রতা রাধা সাধ্বীর প্রেমের ভাব ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। এই সকল সুমধুর সঙ্গীতের রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে এই চিত্তবিমোহিনী সঙ্গীতধারা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। ইহা বাংলা সাহিত্যের অল্প দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে।

(৪)

নিত্যানন্দ বৈরাগীর পর সুপ্রসিদ্ধ রাম বসুর দল গুণগৌরব ও রচনা-বৈভবে সাতিশয় খ্যাতি লাভ করে। রামমোহন বসু সাধারণতঃ রাম বসু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ১১৯৩ কি ৯৪ সালে ভাগীরথী তটবর্তী শালিখা গ্রামে রাম বসুর জন্ম হয়। রাম বসু ভদ্রবংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থের সন্তান। তিনি হরু ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় বাল্যকালে সৌখীনভাবে প্রমত্ত হইয়া লেখাপড়ায় তাদৃশ ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। রামমোহন বসু কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হয়। এই সময় তিনি যখন পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিতেন, তখন স্বয়ং কবিতা রচনা করিয়া কলাপাতে লিখিয়া রাখিতেন, এই স্বভাবকবি কবিত্ব-গৌরবে অল্প সময়ের মধ্যেই অপরের নিরতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন। তাঁহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন তিনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিতেন, ভবানী বণিক নামক একজন কবিওয়ালা, তাঁহার অনেক সাধনা করিয়া, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া লইত। কথিত আছে, ঐ সকল সঙ্গীতে ভবানী বণিকের দল সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দ্বাদশ বর্ষীয় বালক-কবির অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

রামমোহন বসু কিছু ইংরেজী শিখিয়া কেরাণীর কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এই কর্ম তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই। রামমোহন বসু কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কবিতা-রচনায় ব্যাপৃত হইলেন। প্রথমে তিনি ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির দলে গান প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। শেষে, তাঁহার নিজের দল হইল। ইহাতে তাঁহার যেরূপ প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল, সেইরূপ তদীয় কবিকীর্তি দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠিল। রাম বসু ৪২ বৎসরের অধিককাল জীবিত থাকেন নাই। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে, তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রামমোহন বসু নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সপ্তমী, সখীসংবাদ, বিরহ প্রভৃতি গানগুলি অতি মনোহর। বিশেষতঃ বিরহ তুলনারহিত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র,

সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।"

সপ্তমী

"মহড়া—তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ! ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে কি বলে॥

তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে॥
চিতেন—তারাহারা হোয়ে, নয়নের তারাহারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই॥
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে
উমা চন্দ্রবদনে, ডাকছে সঘনে, মা, মা, মা, বোলে।
উমা যত হেসে কথা কয় ও তো হাসি নয়, হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥
অন্তরা—ভাল হোক্ হোক্ ও হে গিরিরাজ
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে।
তোমার কি মনে হোতো না হে সাধ
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে॥
চিতেন—আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ,
রহে বল কত দিন।
দিনের দিন তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে সংবৎসরে তাকে
আন্‌তে তো যেতে হয়।
যেন মা-হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে
এলো হে হিমালয়।
মুখে করি হাহারব, ছিলেম যেন শব হে,
গৌরী মৃত দেহে এসে জীবন দিলে॥"

রাম বসু এই 'সপ্তমী' নিজের দলে গাহিয়া শ্রোতাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। এ সঙ্গীতে স্নেহময়ী জননীর স্নেহপ্রবাহ যেন উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। অনির্বচনীয় সন্তানস্নেহে হৃদয়নিহিত অপূর্ব বাৎসল্যে, এ সঙ্গীত অতুল্য ও অমূল্য।

রাম বসুর সখীসংবাদ:—

"মহড়া—মান্ কোরে মান্ রাখতে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখতে পাই,
সজল আঁখি জলধরবরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা, কৃষ্ণ-প্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালোরূপ সদা।
হৃদয়মাঝে, শ্যাম বিরাজে;
বহে প্রেমধারা দুনয়নে॥" ইত্যাদি

এই সঙ্গীতে প্রেমের বিশুদ্ধ ভাব কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা সহৃদয়-গণ বিবেচনা করিবেন। কবি বিরহিণী সতীর উক্তিচ্ছলে কহিয়াছেন—

"মহড়া—মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি, বলি, আর বলা হোল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী ব'লে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে
নারী-জনম যেন করে না॥

চিতেন—একে আমার এ যৌবনকাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো,
এ সময়ে প্রাণনাথ, প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নজলে।

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধোরো না ॥" ইত্যাদি

সুপণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন :— "কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনোহর চিত্র!" এইরূপ মনোহর চিত্রে রাম বসুর গীতাবলি সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, পূর্বোক্ত সখীসংবাদ ও বিরহ গানের সমুদয় অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া অনেক আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত সঙ্গীতের ন্যায় রাম বসুর অন্যান্য সঙ্গীতেও পতিব্রতা নারীর বিশুদ্ধ প্রণয়—হৃদয়ের মহান্ উদারভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে :—

"মহড়া—বসন্তেরে সুধাও সখি!
আমার নাথের মঙ্গল কি।
নিবাসে নিদয় নাথ, আসিবে নাকি।
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ, দিনে শতকরা গণি দিন,
আসার আশায় আছি, আশাপথ নিরখি ॥"

* * * *

"অন্তরা—হায়! 'কাল্ আসিবো' বোলে নাথ কোরেছে গমন।
ভাগ্যগুণে যদি, হোলো সে মিথ্যাবাদী,
উপায় কি এখন।

চিতেন—সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না করে।
আমি কেমনে ভুলিবো তারে।
পতি, গতি, মুক্তি অবলার,
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার।
তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি ॥"

গীতান্তরে :—

"মহড়া—প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে মনাগুনে, আমি জ্বোলবো বই আর বোল্‌ব কি ॥
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।

কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ, গেলে প্রাণ, নিজ দুখ তোমায় বলিনে॥
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদলে ফোল্‌বে কি॥" ইত্যাদি

যিনি এই সকল সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় অসামান্য পুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সতীর কোমলতায় যে অপার্থিব সৌন্দর্য আছে, স্নিগ্ধভাবে যে অপূর্ব মহত্ত্ব আছে, সর্বোপরি পাতিব্রত্য ধর্মে যে অনির্বচনীয় পবিত্রতা আছে, তাহা কবির রচনাকৌশলে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। একটি সঙ্গীতে কোমলতাময়ী পতিব্রতার পতিভক্তির সহিত হৃদয়ের অসাধারণ কোমলভাব পরিস্ফুট হইতেছে। অপরটিতে উন্মার্গগামী ও সুনীতি-ভ্রষ্ট স্বামীর জন্য পতিপ্রাণার ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "পতি, গতি, মুক্তি অবলার" এই একটি বাক্যে কবি পতিভক্তির অতি সুন্দরভাব পরি-ব্যক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে "প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি" এই কথাটিতে যে কিরূপ কবিত্বকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। উৎপথবর্তী স্বামীর প্রতি এইরূপ উক্তিতে সাধ্বী নারীর পতিপ্রেম, পতিভক্তি ও পতির উচ্ছৃঙ্খল ভাবের জন্য হৃদয়গত গভীর বেদনার অভিব্যক্তি হইতেছে। "ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদলে ফোল্‌বে কি" এই উক্তি অতি মনোহর। মহাকবি কালিদাস, "প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ" এই কথায় উপমাকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। রাম বসুর কবিতা-পাঠে ঐ সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাটি মনোমধ্যে উদিত হয়। উভয়ই লোকপ্রসিদ্ধ বিষয় হইতে পরিগৃহীত, উভয়ই উৎকট কল্পনার বহির্ভূত এবং উভয়ই জনসাধারণের সহিত সুপরিচিত। কবিত্ব-কৌশলে উভয়েরই গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে উভয়ই কবির সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

(৫)

কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার (কেষ্টা মুচি) এবং এ্যাণ্টুনি সাহেবও উৎকৃষ্ট কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণচন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, তাহার গানে অনেক সময়ে কবিপ্রধান হরু ঠাকুরকেও মস্তক অবনত করিতে হইত। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সঙ্গীত শুনিয়া পরিতোষ লাভ করিতেন। অনেক "ওস্তাদি" দলের লোকে কৃষ্ণচন্দ্রের গান লইয়া,

আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকারের সঙ্গীতসমূহের সংগ্রহে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কেবল নিম্নলিখিত গানটির একাংশ মাত্র তাঁহার হস্তগত হয়—

"মহড়া—হরি, কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে॥
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতি রাধারে রইলে ভুলে॥
চিতেন—শ্যাম, সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ
রাখালের বেশ, এখন্ কোথা লুকালে।
*　　*　　*
গোপাগোপীকুলে গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিয়ে॥"
ইত্যাদি

গানের অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই চর্মকারের রচনাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

এ্যাণ্টুনি ফিরিঙ্গী একজন ফরাসী। শাস্ত্রদর্শী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "একজন ফিরিঙ্গী হিন্দু কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এই আশ্চর্য। শুনা গিয়াছে, এ্যাণ্টুনি ফরাসডাঙ্গার বিখ্যাত একজন সম্ভ্রান্ত ফরাশিসের পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়েছিলেন। তৎপর কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া, একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।" কালের পরিবর্তনে এ্যাণ্টুনির অদৃষ্টচক্র এরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত ফরাসী পরিশেষে হিন্দুর দশভুজা দুর্গার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ—

"জয়া, যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা বোলে, যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তার ভবসিন্ধু পার॥ ইত্যাদি

এতদ্ব্যতীত কলিকাতানিবাসী কায়স্থ-কুলসম্ভূত রামসুন্দর রায় একজন সুকবি ছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার খেউড়ে এক সময় হরু ঠাকুরও পরাজিত

হইয়াছিলেন। রামসুন্দর রায়ের সমুদয় গান সংগৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ কোন্ কোন্ সঙ্গীত ইঁহার প্রণীত, এখন তাহার নির্ণয় করা দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে।

কতিপয় প্রধান কবিওয়ালা কবিত্বগুণে সাহিত্য-সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের রচনার সহিত বাঙ্গালা গীতি-কবিতার উন্নতি ও পরিপুষ্টির বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, ঐ সকল রচনা পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়। ইঁহারা আত্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই, স্বরচিত সঙ্গীত অক্ষতভাবে রাখিতেও যত্নশীল হয়েন নাই। শ্রোতারা চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চলভাবে থাকিয়া, ইঁহাদের পীযূষবর্ষী সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন; ইঁহারাও শ্রোতাদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াই, আপনারা তৃপ্তি লাভ করিতেন। ইঁহাদের রচনা যে উত্তরকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের কতদূর উপকার সাধন করিবে, তাহা ইঁহারা ভাবিতেন না। শ্রোতাদিগের সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত ইঁহাদের যে সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ হইত, তাহাই ইঁহারা আপনাদের প্রকৃষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন। অপরিসীম উদারতা ও মহত্ত্বের জন্য ইঁহাদের অনেকে আপনাদের অস্তিত্ব-বিলোপের পথ করিয়া গিয়াছেন! ইঁহারা স্বরচিত সঙ্গীতে অপরের নামে ভনিতা দিয়াছেন; অপরের নামে আত্মসঙ্গীত সুধীসমাজে পরিচিত করিয়াছেন এবং অপরের গুণগৌরবের নিকট আপনাদের গুণগৌরব সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবীর জলধারার ন্যায় ইঁহাদের আবেগময়ী কবিতাধারা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই খর-বেগে প্রবাহিত হইত। ঢোলক বা কাঁসির গগনভেদী রবের মধ্যেও ইঁহাদের কল্পনা সঙ্কুচিত হইত না, বা লোকারণ্যের বিস্ময়াবহ দৃশ্যেও ইঁহাদের কবিত্ব-শক্তি অবনত হইয়া পড়িত না। সারস্বত-সমাজে সরস্বতীর এইরূপ উপাসকদিগের অস্তিত্বলোপ কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। যে কোনরূপে হউক, ইঁহাদের কবিতা এবং ইঁহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে।

(সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২)

সধবার একাদশী

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য

(১)

"সধবার একাদশী"র মধ্যে যদিও অটলবিহারী নায়ক, তথাপি নিমে দত্ত অন্য সকল পাত্রগণের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। অতএব অন্য সকল পাত্রগণকে ছাড়িয়া আমরা নিমে দত্তের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিব।

নিমে দত্তের প্রকৃতি হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, হীরকের ন্যায় সারবান ও দুর্লভ। কিন্তু এই হীরকখণ্ড যত্নে রচনা করিয়া বিধাতা কি জানি কি কারণে ইহার মর্মমধ্যে এমন একটি কলঙ্ক-বিন্দু নিবেশিত করিয়া এই পাপপুণ্যময় সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন যে, সে কলঙ্কবিন্দু ক্রমশ আয়ত হইয়া সমগ্র হীরক-দেহকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতাকে নিজেরই মালিন্য-প্রকাশক করিয়াছে, তাহার স্বচ্ছতাকে নিজেরই ত্রুটি-প্রদর্শক করিয়াছে, তাহার বহু-মূল্যতাকে পাঠকগণের ক্ষোভ-পরিবর্ধক করিয়াছে মাত্র। নিমে দত্ত স্বভাবত সরল, খলদ্বেষী, পবিত্রচেতা, সারবান্, বুদ্ধিমান্। কিন্তু সুরা-সেবনরূপ এক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাদোষ এই সমগ্র গুণকেই ভ্রষ্ট করিয়া তাহার প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়াছে। এই প্রকৃতি-বিকৃতি নিমে দত্তের নিজের নিকটে অবিদিত নহে। তেমন বুদ্ধিমান্ ও স্বভাবত পবিত্রচেতা ব্যক্তির নিকটে অবিদিত থাকিতে পারে না। এই প্রযুক্ত তাহাকে সর্বদাই অনুতাপ করিতে হইত। একদিনের অনুতাপের সমাচার এই :—

"রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম-লজ্জা-মান-মর্যাদা-পরিপন্থী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হ'য়েছ! তুমি স্কুল হ'তে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হ'য়েছ একটি ভূত, যত দূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

Things at the worst will cease or else climb upward.

To what they were before.

হাঁ জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে অধর্মাকর মদিরা

হস্তে নিপতিত কল্যে! যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে শ্রাবণের বর্ষায় পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়াও আমার আহার আহরণ করিয়াছেন, সে পিতা আমায় এখন দেখলে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমায় বক্ষে ধারণ করে রাখতেন, এবং মুখ চুম্বন কর্‌তে কর্‌তে আপনাকে ধন্য বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন, যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন।"

এই প্রকৃতি-বিকারের প্রকাশ নিমে দত্তের কেবল চরিত্র-ভ্রংশে হয়, এমন নহে। অধিক মদ্যোন্মত্ততা প্রযুক্ত তাহাতে ঈষৎ বায়ুবিকার পর্যন্ত প্রকাশ পায়। নাটক মধ্যে নিমে দত্তের প্রকৃতি যেরূপ রচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত এই কথাটি স্মরণে রাখা আবশ্যক। যাহারা এই কথাটি স্মরণে না রাখেন অথবা না বুঝেন, তাঁহারাই "সধবার একাদশী"কে অসৎভাবের উদ্দীপক জ্ঞান করেন। "সধবার একাদশী" অশ্লীল বটে, কিন্তু নিমে দত্তের অশ্লীলতায় মনের অনুচিত বিকার জন্মে না। যে ব্যক্তির প্রকৃতি স্বভাবত এমন সুন্দর যে তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ না হইলে তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারা যাইত, তেমন ব্যক্তি বিকারবশত অশ্লীল জল্পনা করিলে তাহাতে মনের অনুচিত ভাব জন্মে কি? যাহার জন্মে তাহার অশ্লীল রচনা পাঠে ভয় কি?" বিধাতা ত তাহাকে অশ্লীল করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। নিমে দত্তের চরিত্র-দর্শনে অশ্লীল ভাবের উদয় হয় না। অশ্লীল ভাব যে জাতীয়, সে জাতীয় ভাবের উদয় হয় না; অপরিসীম ক্ষোভেরই উদয় হয়। পাপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার জন্য তেমন ব্যক্তির এমন ব্যবস্থা! এমন চিত্ত-বিকৃতি! অসৎ ভাবের উদয় হওয়া দূরে থাকুক বরং ইন্দ্রিয়সেবামাত্রেরই উপরে মর্মান্তিক ক্রোধ উপস্থিত হয়। সে ক্রোধ পাপ-পুণ্যের সৃষ্টিকারী বিধাতার প্রতিও ধাবিত হয়। কেন তিনি পুণ্যের সহচর স্বরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলেন? অমৃতরাশি মধ্যে গরল নিক্ষেপ করিলেন? কেন—

"নলিনীরে সৃজিলে বিধাতা,
জল-তলে বসি কলি-মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করে নিজ বলে?

নাটক মধ্যে নিমে দত্তের প্রকৃতির অন্য বিকৃতির সঙ্গে এই চিত্ত-বিকৃতি অতি নৈপুণ্য সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। মদ্যজনিত এই বায়ু-বিকারের নিমিত্তই প্রধানত নিমে দত্তের আত্মীয় পরিবার সকলে সদাই ক্ষুণ্ণ থাকে ; তাহার পিতা তাহাকে দেখিলে "চক্ষু মুদ্রিত" করে, তাহার জননী তাহাকে দেখিলে "কপালে করাঘাত" করে, তাহার শ্বশুর তাহাকে দেখিলে "মুখ ফিরিয়ে" বসে, তাহার শাশুড়ী তাহাকে দেখিলে "তনয়ার বৈধব্য কামনা" করে। মদ্যজনিত এই বায়ু-বিকৃতি এত অধিক হইয়াছিল যে, নিমে দত্তের এই স্বগত অনুতাপ-কালেও তাহার ভূরি প্রকাশ হইতে ত্রুটি হয় নাই।

"শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন ; শালী শালাজ আমায় দেখ্‌লে হাসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাসি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিমে দত্তের চিত্তে সহসা বিকৃত বায়ুর যেন দমকা আসিল, সম্মুখে আপনার পত্নীকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া বায়ু-বিকৃত ব্যক্তির ন্যায় বলিয়া উঠিল—

"তুমি কে, চাও কি, কাঁদ কেন ?"

বিকৃত বায়ুর দমকা থামিয়া গেল। অনুতাপের স্রোতে পূর্বের ন্যায় বহিতে লাগিল।

"আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই ; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই ; আমার জন্য প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দে শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি কর্‌চে, কুরঙ্গনয়নী কার্যান্তর-ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনা-প্রবাহে ভাসমান আছেন। আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আস্‌চে কিনা এক একবার মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌চেন।"

নিমে দত্তের বিকৃত বায়ুর হিল্লোল হইতে লাগিল ; অনুতাপ-স্রোত বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করিল।

"মদ কি ছাড়বো ? আমি ছাড়তে পারি। বাবা ও আমায় ছাড়ে কই ? সেকালে ভূতে পেত, এখন মদে পায়। ডাক ওঝা! ঝাড়িয়ে আমার মদ

ছাড়িয়ে দেক্। আমি সুরধুনী সভায় নাম লেখাবো, কারো কথা শুন্‌বো না, সভাপতি খুড়ো মোদের গঙ্গাময়রা। গঙ্গাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে, সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে।”

আবার বায়ুর দমকা আসিল—

“বাবা, ভূতের ওঝা আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে গেছে। দেখ বাবা, তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না।”

নিমে দত্তের এই চিত্ত-বিকৃতি-প্রকাশ তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আরম্ভ-স্থলে যথেষ্ট আছে; অন্যান্য স্থলেও আছে; সমুদয় গ্রন্থে ছড়ান আছে। বিবেচনা করিলে নিমে দত্তের উক্তির প্রধানাংশ এই বায়ু-বিকৃতিময় বোধ হইবে; তবে কোন স্থলে অধিক, কোন স্থলে অল্প। বায়ু-বিকৃতিময় বলিয়াই তাহার উক্তি এত হাস্যরসোদ্দীপক। পাগলের প্রলাপ শুনিতে বড় মিষ্ট লাগে। আবার যদি সে প্রলাপের মধ্যে গূঢ় ভাব থাকে, তবে আরও মিষ্ট লাগে। যদি তাহার সঙ্গে প্রলাপীর কল্পনাক্রীড়া হইতে থাকে, তবে আরও মধুর লাগে। নিমে দত্ত ইংরাজী-সাহিত্য-বিশারদ। মদ্য-মত্ততার সঙ্গে বায়ুবিকার মিলিত হইয়া যখন তাহার কল্পনা-যন্ত্র খুলিয়া দেয়, তখন ক্ষুদ্র কারণেও তাহার রসনা অঙ্গুলিস্পৃষ্ট বীণাতন্ত্রীর ন্যায় অমৃত প্রসব করে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ইহার বহুতর উদাহরণ প্রদান করিতেছে।

এই তৃতীয় গর্ভাঙ্ক হইতে নিমে দত্তের মদ্যজনিত বিচিত্র বিকারের একটি উদাহরণ দিব। নিমে দত্ত মাতাল হইয়া গোকুলবাবুর বাটীতে বারাঙ্গনা-বাটী ভ্রমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বাটীর দ্বারবানেরা তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। সে মাটিতে অচেতনবৎ পড়িয়া রহিয়াছে; যে কিঞ্চিৎ চেতনা আছে, তদ্দ্বারা তৎকালোচিত চিন্তা করিতেছে। এই অবস্থায় মনোমধ্যে যে প্রকার চিন্তার উদয় হইতে পারে, তাহা ঠিক ঠিক বর্ণনা করা সামান্য কবিত্ব-শক্তির কর্ম নহে। অধিকাংশ কবিগণে এরূপ স্থলে তদ্বর্ণনে সাহসী না হইয়া, কৌশল দ্বারা প্রবন্ধ শেষ বা ঘটনান্তর ঘটাইয়া আপনাদের ত্রুটি গোপন করেন। কিন্তু দীনবন্ধু বাবুর সে কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি নিমে দত্তের প্রকৃতি এরূপ স্পষ্ট কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করিয়া তাহার কার্যকলাপ মানস চক্ষে দেখিতেছিলেন, তাহার উক্তি-প্রত্যুক্তি মানস শ্রবণে শুনিতে-

ছিলেন। কল্পনাশক্তি যখন সম্যক্ স্ফূর্তি লাভ করে, তখন কল্পিত পাত্রের হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্যন্ত নয়নগোচর হয়, কাচের ঘড়ির ন্যায় সে হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র-পরম্পরা ও ব্যাপার-পরম্পরা নয়নগোচর হয়। কল্পনাশক্তির এরূপ স্ফূর্তি দীনবন্ধু বাবুর নিমে দত্ত সম্বন্ধে ঘটিয়াছে। কল্পনাশক্তির এরূপ নাটকোচিত স্ফূর্তি দীনবন্ধু বাবুর রচিত অন্য কোন পাত্রে নাই। অন্য কোন গ্রন্থকারের রচিত বাঙ্গালা নাটকে বা অন্য রসাত্মক বাঙ্গালা রচনাতেও পাই নাই।

মদ্যোন্মত্ত নিমে দত্ত দ্বারবানের হস্তে ধরানিক্ষেপিত হইলে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেন। গোকুল বাবুর বাটীতে নিমে দত্তের যে বেশ্যালয় ভ্রম হইয়াছিল, দ্বারবানের হস্তে প্রহাররূপ কঠোর উপদেশ পাইয়াও তাহা এককালে অপনীত হয় নাই। তাহা এককালে অপনীত হইলে, ভদ্রলোকের বাটী হইতে ভৃত্য দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোর অপমান বোধ হইয়াছে। নিজের পানদোষবশত এই অপমান সহিতে হইয়াছে, তজ্জন্য মনে ঘৃণা বোধ হইতেছে। এ ঘৃণাবোধ যে স্থায়ী হইবে না, তেমন বুদ্ধিমান লোকের নিকটে তাহার স্পষ্ট বোধ হইতেছে। অধিক মদ্যপানের পরে প্রথম শয়ন মাত্রে মস্তক ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সকলের সঙ্গে মদ্যপানের ঘোর নেশা আছে। মদ্যপানের কেবল নেশা নহে, তজ্জনিত বায়ুবিকারও উপস্থিত হইয়াছে। এ সমস্ত উপাদান হইতে তাহার তৎকালিক চিন্তাজাল রচিত হইবে। গ্রন্থকার কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন—

"So sweet was ne'er so fatal, I must weep. But they are cruel tears" –

"কারণ এখন আমি মনে কচ্চি আর খাব না; কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবী ঘোরে কি সূয ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে—সূর্য ঘোরে না? না—এখন রাত্রি হয়েছে—সূর্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন, এখন ত পৃথিবীটো বন্ বন্ করে ঘুরছে—পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক।"

(২)

বায়ুর এই আংশিক বিকৃতি ভিন্ন পানদোষবশত নিমে দত্তের আরও বিকৃতি জন্মিয়াছে। নিমে দত্ত স্বভাবত বুদ্ধিমান্; গ্রন্থ মধ্যে তাহার যথেষ্ট

পরিচয় আছে। নিমে দত্ত কৃতবিদ্য, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। নিমে দত্ত অন্য লোকের উপর প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ, সে তেমন মর্মঘাতী বাক্য প্রয়োগে মুক্তকণ্ঠ এবং নিরঙ্কুশ মদ্যোন্মত্ততাপ্রিয় হইয়াও অটলবিহারী ও নকুলেশ্বরের—বিশেষ সমাদর ভাজন হইতে পারিয়াছেন। নিমে দত্ত তেজস্বী ও আত্মাদরের পক্ষপাতী, তাহার দত্তকুল-গৌরবের ব্যাখ্যাতেই ইহার আংশিক পরিচয় আছে। এরূপ ব্যক্তি উন্নতি লাভের নিতান্ত আকাঙ্ক্ষী হয়, এবং এরূপ ব্যক্তিরাই উন্নতি লাভ করিয়া ইতর জনগণের আদর্শস্থানীয় হয়। কিন্তু নিমে দত্তের ভাগ্যে সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিবার পথে বাধা ঘটিয়াছিল। দুর্নিবার মদ্য-পিপাসাই সেই বাধা। ইহাতেই তাহাকে সে সমস্ত কামনায় জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া পশুবৃত্তি করাইতেছে। ইহাতে নিমে দত্তের মর্মে যে উৎকট আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রকৃতির মধুরতা অপগতা হইয়া ঘোর কটুতা জন্মিয়াছে। উন্নতি-কামনা পরিত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করা, তেজস্বী উন্নতিকাম ব্যক্তির পক্ষে যাতনার বিষয়, যিনি ভুগিতেছেন তিনিই বলিতে পারেন। আর যদি সে উন্নতিকামনা নিজের প্রকৃতিগত কোন দোষ বশত পরিত্যাগ করিতে হইয়া থাকে, তবে যাতনার ও ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। নিমে দত্তে এই অপরিসীম যাতনার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেনারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মহাশয়, কোথায় থাকেন?" নিমে দত্ত শ্যালকগৃহে থাকে, শ্যালকের অন্নে প্রতিপালিত হয়, তেমন গর্বিত ও উন্নতিকাম হইয়াও সুরাসক্তি-দোষ বশত তাহাকে পরপিণ্ডাশী হইতে হইয়াছে। নিমে দত্ত ভদ্রলোকের নিকটে সে কথা কিরূপে বলিবে? বলিতে তাহার যমযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রথম কেনারামের কথা কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন অটল তাহাকে অপদস্থ করিবার উদ্যোগ করিল, তখন ক্ষোভে, অভিমানে, মদ্য-বিকারের পদ্ধতিক্রমে, রুদ্ধ মর্মযাতনা ব্যক্ত হইতে লাগিল।

"ধর্ম অবতার! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, স্বনাম পুরুষো ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম—বিচারপতি, আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম। বাগবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে থাকি; সেই শালার নাম না কল্যে কোন শালা চিন্‌তে পারে না—হুজুর, বান্দা মজুর, ধামার ধামা দামার চাইতেও অধম।

অটল। ময়্যাল কারেজের ছেলে হয়ে Silly ঘোষের বাড়ী থাকিস ?

নিমে। Into what pit thou seest

From what height fallen (ঢুলে ভূমিতে পতন)।"

উন্নতিকামনা বিফল হওয়াতে নিমে দত্তের প্রকৃতি কত কটু হইয়াছে, তাহার সমস্ত আচরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিমে দত্ত স্বভাবত সরল, কুটিল ব্যবহারের চিরশত্রু, সাহঙ্কার ব্যবহারের চিরদ্বেষী, প্রাণান্তেও কাহারও অলীক জাঁক সহিতে পারে না। এই গুণগুলি অতি প্রধান গুণ, কিন্তু প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই ইহাদিগকে সামাজিকতার সঙ্গে সমঞ্জসীভূত করিয়া রাখেন। নিমে দত্ত নিরঙ্কুশ ব্যক্তি, ইহ সংসারে যাহা কিছু কামনা কারিতে হয়, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন নিমে দত্ত সে সকলেই জলাঞ্জলি দিয়াছে ; সমাজের নিকট হইতে তাহার কোন উপকার লাভ হয় নাই ; অল্পবুদ্ধিমান ও অল্পবিদ্য লোক অহরহঃ উন্নতি লাভ করিতেছে ; কিন্তু সে তত বিদ্বান ও তত বুদ্ধিমান হইয়াও তাহার পরপিণ্ডাশন ঘুচিল না ; তাহার আবার সামাজিকতা কি ? সমাজ তাহাকে নিরতিশয় ঘৃণা করে, সমাজকে সে সাধ্যানুসারে ঘৃণা ও দ্বেষ করিবে না ? নিমে দত্তের সরলতা ও কৌটিল্যদ্বেষ সর্বদাই কটুতাপূর্ণ ; তুড়ে কথা বলিতে কাহাকেও রেয়াৎ করে না। নিমে দত্তের রসনা চতুর্দিকেই বিষ বর্ষণ করে। বিধাতা তাহাকে যে অমৃতরসদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা গরলে পরিবর্তিত হইয়াছে। সুরাপান-নিবারণী সভার কথা হইল, "সুরাপান-নিবারণী সভা কচ্ছে কি ?"

নিমে। "Creating a concourse of hypocrites."

নকুলেশ্বর সুরাপান-নিবারণী সভায় নাম লিখাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আপনার সতীপনা জানাইতেছিলেন, অমনি নিমে দত্তের মুখ হইতে বিষাক্ত বাণ প্রয়োগ হইল :—

"বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না, তুমি নাম লেখালে সাড়ে তিন হাত ভূমি মৌরসি পাট্টা নিতে হবে ?

কাঞ্চন কুটিল-স্বভাব স্বার্থ-পরায়ণ বারাঙ্গনার আদর্শ স্বরূপ ; কাঞ্চন উপস্থিত হইবামাত্র তাহার উপরে গরলপূর্ণ নাগপাশ নিক্ষিপ্ত হইল। অটলবিহারী হঠাৎ বাবু হইয়াছেন, বাবুগিরি করিতে গেলে কাঞ্চনের আবশ্যক হয়, কাঞ্চন অটলের মায়ের বয়সী, তথাপি তাহাকে বৃত্তিভোগী করিল। অটলের উপরে শর নিয়োজিত হইল।

"তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।"

নিমে দত্তের ব্যাকরণ-প্রয়োগের কত উল্লেখ করিব? সকল উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থের অর্ধাংশ উদ্ধৃত করিতে হয়, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ এইমাত্র দেখিবেন যে, নিমে দত্ত কেবল খলদ্বেষী ও স্পষ্টবাদী বলিয়া বাক্যবাণগুলি প্রয়োগ করে না। নিমে দত্তের প্রকৃতিই নিতান্ত কটু হইয়া গিয়াছে। উন্নতিকামনার উচ্ছেদ ও সমাজকৃত অনাদর বশত তাহার প্রকৃতির এরূপ কটুত্ব আছে। প্রকৃতির এই কটুত্বের সঙ্গে আবার মদের নেশা আছে, আবার তাহার সঙ্গে তজ্জনিত বায়ু-বিকার আছে। নিমেদত্ত-রচনার উপাদান এইগুলি।

(৩)

নিমে দত্তের প্রকৃতিতে আরও দুই তিনটি প্রধান বিকৃত-ভাবের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিমে দত্ত স্বভাবত গর্বিত। গর্বিত লোকে কখন মুখে জাঁক করে না। কিন্তু নিমে দত্তের প্রকৃতি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রিয়-সেবায় লঘু হইয়াছে, আর গুণবত্তার সমুচিত পুরস্কারের অভাবেও লঘু হইয়াছে। নিমে দত্ত আপনাকে বড় বলিয়া জানে, অথচ ক্ষুদ্র লোকে সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে তাহাকে চারিদিকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে। যাহারা আগে ক্ষুদ্র ছিল, এখন তাহারা তাহার উপরে নিম্নদৃষ্টি করিতেছে। কাজেই তাহাকেও নাক তুলিয়া কথা কহিতে হইতেছে। কিন্তু সমাজমধ্যে যাহারা সাংসারিক বিষয়ে উন্নত, অথবা সমাজের আদৃত অন্য কোন বিষয়ে উন্নত, সমাজ কেবল তাহাদিগকেই বড় জ্ঞান করেনা। নতুবা অন্যবিধ লোকে হাজার নাক তুলিয়া চলিলেও তাহাদিগকে বড় জ্ঞান করে না। সুতরাং কেবল আপনি ভারি হইয়া চলিলে সমাজমধ্যে নিমে দত্তের বড় হওয়া ঘটে না। কাজেই তাহাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। অন্য উপায় আর কি আছে? সাংসারিক উন্নতি, মদ না ছাড়িলে হয় না। মদ ছাড়া আর জীবন ছাড়া নিমে দত্তের পক্ষে তুল্য। অবশেষে একমাত্র উপায় আছে—আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করা। এই উপায়ের অবলম্বন নিমে দত্তের অবিকৃত অবস্থায় সম্ভাবিত ছিল না। এক্ষণে সম্ভাবিত হইয়াছে। অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সেবনে অভ্যাস সমস্ত ইতর

হইয়াছে, আত্মাদর লঘু হইয়াছে, মনের দৃঢ়তা ঘুচিয়া শিথিলতা জন্মিয়াছে, ইন্দ্রিয়সংযমী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যেমন সমর্থ হয়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তি সেরূপ হয় না।

নিমে দত্ত যেখানে আপনার জাঁক আপনি করিতেছে, সেখানে পাঠকের ক্লেশ বোধ হয়। নিমে দত্ত ভাল লোক বোধ হয় বলিয়াই এরূপ ক্লেশ হয়। কিন্তু পান-দোষ নিমে দত্তকে কত দূর কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহার প্রকৃতিকে কত ইতর করিয়াছে, এই জাঁকগুলি তাহার অনেক পরিচয় দেয়।

নিমে দত্তের বিদ্যার জাঁক কোন স্থলে স্পষ্ট, কোনও স্থলে অস্পষ্ট। অস্পষ্ট জাঁকই অধিক, স্পষ্ট জাঁকই অল্প। তাহার প্রকৃতি লঘু হইয়াও এককালে লঘু হয় নাই। এই প্রযুক্ত স্পষ্ট জাঁকের উদাহরণ অল্প। অটলবিহারীর নিকট বিদ্যার জাঁক স্পষ্টরূপে করিবার কোন আবশ্যক নাই। অটলবিহারী নিমে দত্তের "আস্তাবলের বাঁদর"। স্পষ্ট জাঁক কেনারামের নিকটে হইয়াছে। কেনারাম ডেপুটী মেজষ্টর। কেনারাম আপনাকে ভারি বড় বলিয়া জানে; যাহারা ডেপুটী মেজষ্টর নহে, তাঁহাদিগকে ইতর মনুষ্য জ্ঞান করে। কেনারামের নিকট বিদ্যার জাঁক চাই। কেবল বিদ্যার জাঁক নহে, সেই সঙ্গে কেনারামকেও ছোটলোক বলা চাই, গরলে পরিবর্তিত প্রকৃতির চরিতার্থতা করা চাই।

"বাবা! মুরুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ, বিদ্যার জোরে হওনি; তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দেখি আমার মত ইংরাজী জানে। I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English বাবা ছেলের হাতের পিঠে নয়—কি খাবো বাবা বলতো—Claret for ladies, Sherry for men, and Brandy for heroes."

নিমে দত্ত স্বভাবত গর্বিত ও উন্নতচেতা। গর্বিত ও উন্নতচেতা লোক কাহারও মোসাহেব হইতে পারে না। নিমে দত্ত মোসাহেব হইতে শিখিয়াছে, মিছে আত্মীয়তা দেখাইয়া পরের মদ খাইতে শিখিয়াছে। কি করে? নতুবা মদ জুটে না। থাকে শ্যালকের বাড়ী, "অতি দীন, সহায়-সম্পত্তিহীন, কোন রূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরিনামামৃত পান করিয়া মাতাল-যাত্রা নির্বাহ" করে। সুরাপান-নিবারণী সভার উপরে বড় রাগ। "সুরাপান-

নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয়” তাহার “ভারি অমঙ্গল। বড় মানুষের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভা হবে, আর ধেনো খেয়ে মরবে! এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।”

নিমে দত্তের প্রকৃতি এইরূপে যে নীচ হইয়া গিয়াছে, নিমে দত্ত তাহা টের পায় না। নিমে দত্ত মনে করে, আমি চতুরতা খেলিতেছি, “অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি।” নিমে দত্ত তত বুদ্ধিমান হইয়াও আপনার প্রকৃতিলাঘব বুঝিতে পারিতেছে না। বুদ্ধিমান লোকে সকল বুঝিতে পারে, আপনার নীচাশয়তাটি বুঝিতে পারে না। মনে এক এক বার সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। আপনার নিকটে সহস্র ওজর-আপত্তি উপস্থিত করে। “এইরূপ কর্তব্য না করিলে আমার কর্তব্য-হানি হইবে।” “এইরূপ করিলে সামাজিক নিয়মের হানি হয় বটে, কিন্তু সমাজের নিয়মগুলি ভাল নয়।” “লক্ষ্মী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই নিমিত্ত, নির্বোধের নিমিত্ত নহে।” এইরূপ প্রবোধ-বাক্য দ্বারা আপনার নীচাশয়তার সংশয় দূর করে। নিমে দত্তও তাহা করে। নিমে দত্ত ফাঁকি দিয়া পরের খায়, মনে করে আমার বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে খাইতেছি।

(৪)

নিমে দত্ত স্বভাবত পবিত্রচেতা। কিন্তু মদ্যপান-দোষে তাহাকে অপবিত্র করিয়াছে, তাহার প্রকৃতিতে স্থল বিশেষে পশুচিত করিয়াছে। গোকুলবাবু দ্বারবান দিয়া তাহাকে বাড়ীর সম্মুখ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। গোকুলবাবুর কোন দোষ ছিল না। নিমে দত্ত বদ্ধ মাতাল। মদ খাইয়া খাইয়া স্বভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শিষ্টাচরণে তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব হইত। তাড়াইয়া না দিয়া কি করিবে? কিন্তু নিমে দত্ত তাহা বুঝিতে পারে না। নিমে দত্ত সমাজ হইতে যেখানে যত অনাদর প্রাপ্ত হইয়াছে, সমাজের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ-ভাব জন্মিয়া আছে, তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে যে গরল সঞ্চিত হইয়াছে, গোকুলবাবুর ব্যবহারে এককালে সমগ্রগুলি জাগরিত হইয়া উঠিল। গোকুলবাবুই তাহার চক্ষে সমাজের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইলেন। যে দ্বেষানল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য-স্বরূপ না পাইয়া সংযতরশ্মি ছিল, যাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখাগুলি কখন অটলকে কখন

কাঞ্চনকে কখন নকুলেশ্বরকে তাপিত করিয়া তৃপ্ত হইত, তাহা গোকুলবাবুর ব্যবহারে এককালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়-সেবায় প্রাপ্তমালিন্য পবিত্রবুদ্ধি ঘোরতররূপে মলিন হইল ; গোকুলবাবুকে পরিশোধ দিবার বাসনার সঙ্গে অতি জঘন্য ভাবের উদয় হইল ;—

"ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দয়, দারওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে (গাত্রোত্থান করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত)। এর পরিশোধ দেব তবে ছাড়বো—তোমার সদর দরজা বন্ধ থাকবে তোর অন্দরে ঢুক্‌বো—শালা মাগমুখো !"

নিমে দত্তের স্বাভাবিক পবিত্র বুদ্ধি মলিন হইয়াছে বটে, কিন্তু এককালে বিনষ্ট হয় নাই। এরূপ কুৎসিত ভাব তাহার মনোমধ্যে উদিত হইলেও তথায় ব্যাপক কাল স্থান পায় না। স্থিরভাবে বিবেচনার প্রয়োজন হইলেই তিরোহিত হয়। স্বাভাবিক হেয়-প্রকৃতি অটলবিহারী গোকুলবাবুর পত্নীকে অধিকার প্রস্তাব করিলে নিমে দত্তের পবিত্রতার পুনঃপ্রকাশ হইল, ঘৃণাসহকারে অটলকে এইরূপ উত্তর দিল।—

"গৃহস্থের মেয়ে বার কর্‌বার মতলব করো না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোন, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাব্‌কে দাও।" অটল সে কথা শুনিবে কেন? অপ্রত্যক্ষ ফলাফলের অনুরোধ বুঝিবে কেন? সে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিল—

"কাল আমাদের বাড়ীর ভিতরে মেয়ে-কবি হবে, গোকুলবাবুদের মেয়েরা সব আস্‌বে, সে সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস্, গোকুলবাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈঠকখানায় আনিস্।" প্রস্তাব শুনিয়া স্বভাবত পবিত্রচেতা নিমে দত্ত আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ঘৃণা ও কোপ সহকারে উত্তর করিল –

"একি ভদ্রলোক পারে ?

অটলের ধর্মাধর্ম-জ্ঞান স্বভাবত সঙ্কুচিত। আপত্তির মর্ম বুঝিতে না পারিয়া নিমে দত্তকে কহিল,

"মদ খেতে পার? কেশবের বেশ্যাকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে যেতে পার ?"

নিমে দত্ত এ সকল কর্মকে দুষ্কর্ম জ্ঞান করিত না ; কিন্তু অটলের প্রস্তাবিত কর্মকে অতি জঘন্য জ্ঞান করিত। আপনার দোষ-ক্ষালনের নিমিত্ত উত্তর করিল,

"I dare do all that may become a man ; who dares do more is none."

অটল নিমে দত্তের সুরাসক্তির কথা বিলক্ষণ জানিত, মদ্য-বৈকল্য উপস্থিত হইলে তাহার স্বাভাবিক সাধুপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইবে বুঝিত। পর দিবস তাহার পাপ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে, মনে মনে ভাবিতে লাগিল ;—

"একটু জেয়াদা করে মদ খাই (মদ্য পান)। বড় মজা হবে এখন—নিমে যে মদ খেয়েছে আর খানিক খেলেই ও আর মন্দ বলবে না।"

নিমে দত্তের সাধু প্রবৃত্তি প্রায় শেষ পর্যন্ত বলবতী ছিল। বরাবর অটলকে গালি দিয়াছে, নিবারণ করিয়াছে। অবশেষে সুরাপিশাচীর দ্বারা যখন এককালে অধিকৃত হইল, তখন গোকুলবাবুর উপর পূর্বসঞ্চিত দ্বেষবশত অটলের পাপ ব্রতে যোগ দিল। অটল কহিল,

"আমাকে তুই গোকুল বলে ডাকিস।"

নিম। Bloody bawdy villain,

Remorseless, treacherous, lecherous, kindless, villain.

অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন? (মদ্য পান) খা একটু মদ খা।

নিম। (মদ্য পান করিয়া) গোকুলবাবু ?

অট। কি বল্‌চো ?

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্রলোকের অপমান করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রহ্ম-শাপ হয়েছে ! তোমার নিস্তার নাই—The iniquities of the husband are visited on the wife to the third and fourth generations."

নিমে দত্তের স্বাভাবিক পবিত্রতার জন্য অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। অটলকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু বারাঙ্গনা-বিষয়ে তাহাকে সাবধান করিতে ত্রুটি করে নাই—

"বাবা আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারংবার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্‌নে আপনার ঘরে গিয়ে শুস্‌।"

যেখানে অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীকে আনিবার কথা নিমে দত্তকে বলিতেছে, সেখানে নিমে দত্ত তাহাকে বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে।

"গৃহস্থের মেয়ে বার করবার মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোকলো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাব্‌কে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও।"

পত্নীপ্রেম অটলের ভাল লাগিবে কেন? বিশেষত নিমে দত্ত স্বয়ং পত্নীকে অবহেলা করিত। অটল উত্তর করিল, "তুই তোর মেগের কাছে যা।"

এই কথা নিমে দত্তের মনে বজ্রাঘাতের ন্যায় লাগিল। নিমে দত্তের প্রধান দোষ মদ্যপরায়ণতা। বোধ করি অগ্রে মদ্যপরায়ণতা তাহার একমাত্র দোষ ছিল। কিন্তু নিমে দত্ত সম্বলবিহীন। শ্যালকের বাড়ীতে থাকিয়া কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত। মদ খাইবার অর্থ কোথায় পাইবে? সুতরাং তাহাকে বড় মানুষ মাতালের সঙ্গে ফিরিতে হইত। বড় মানুষ মাতালদের প্রধান তীর্থ বেশ্যালয়। নিমে দত্তের বেশ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয় হইল, স্বাভাবিক পবিত্র চিত্তে মালিন্য ধরিল। ক্রমে সে পরিচয় গাঢ় হইয়া উঠিল, মালিন্য ঘনীভূত হইল, নিমে দত্তকে ইন্দ্রিয়াশৌচ স্পর্শ করিল। পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আর অবকাশ নাই, অবকাশ থাকিলেও আর ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয়ের পূজা যোড়শোপচারে করিয়া আর স্বল্পোপচারে করিতে তৃপ্তি হইবে কেন? পত্নীর সঙ্গে ভিন্ন ভাব হইতে লাগিল, দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থগিতপ্রায় রহিল। কিন্তু স্বভাবের শক্তি প্রাণান্তেও যায় না। স্বভাব বিকৃত হইয়াছে, তথাপি তাহার শক্তি অনুতাপের রূপ ধারণ করিয়া যাতনা দিতেছে। এ অনুতাপাগ্নি তুষানলের ন্যায় সর্বদাই পুড়িতেছে। অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে, কাঞ্চনের পুরীতে যেখানে যখন থাকে, এ অনল তাহার অন্তরাত্মার ভিতরে থাকিয়া পুড়ে। সুরাসমুদ্রে পুনঃনিমজ্জন করিলেও ইহার দাহিকাশক্তি হইতে পরিত্রাণ নাই। এই অনল-তাড়নায় নিমে দত্তের মদ্য-বিকার আরও বিকৃত আকার ধারণ করে, আন্তরিক কটুতা আরও কটু হইয়া উঠে। নিমে দত্তের এই অনুতাপের প্রকাশ গ্রন্থের অনেক স্থলেই আছে, কিন্তু ইহা হইতে তাহার যে মর্মযাতনা হইয়া থাকে, তাহা অটলবিহারীর এই কথাতে যেমন

প্রকাশ আছে, তেমন আর কুত্রাপি নাই। অটল তাহাকে পত্নীসহবাসী হইতে বলিবামাত্র, নিমে দত্তের মর্মাভ্যন্তরস্থ অগ্নি বিলোড়িত হইল, শতশিখা বিস্তার পূর্বক তাহার অন্তরাত্মাকে গ্রাস করিল, নিমে দত্ত যাতনায় অধীর হইয়া বলিল,—

"Thou stickest a dagger in me. অটল কি গালাগালিই তুই দিলি।"

দীনবন্ধুবাবু "সধবার একাদশী"তে এই পাত্রের রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে যে অনাবশ্যক অশ্লীল কথা আছে, আমরা তাহার নিমিত্ত ক্ষমা-প্রদানের অনুরোধ করি না। কিন্তু নিমে দত্তকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত যে অশ্লীল কথা ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। নিমে দত্ত ইহশরীরে নরকযাতনা-ভোগের আশ্রয়স্বরূপ। পাপী ব্যক্তি কি প্রকার নরকযাতনা ভোগ করে, তাহা দেখাইতে হইলে কাজেই নরকোচির উপকরণের আবশ্যক হয়। নিমে দত্তের প্রকৃতি দুইটি পরস্পর বিষম পদার্থে রচিত। তন্মধ্যে একটি দেবোচিত, একটি পিশাচোচিত। পিশাচোচিত ভাগ প্রবল হইয়া দেবোচিত ভাগকে পরাভূত করিয়াছে;—দেবোচিত ভাগ পরাভূত হইয়াও রোষানল বিস্তার পূর্বক পিশাচোচিত ভাগকে তাড়না করিতেছে। সে তাড়নার পিশাচোচিত ভাগ আরও উত্তেজিত হইতেছে, আরও প্রবল হইবার চেষ্টা করিতেছে, দেবোচিত ভাগ রোষানলকে আরও উজ্জ্বল করিতেছে, আরও প্রখর করিতেছে। এই নিমে দত্ত নরক। "সধবার একাদশী" প্রহসন বটে, কিন্তু পাঠকের মনে আক্ষেপ জন্মাইবার পক্ষে এই প্রহসনের অপেক্ষা অধিক কার্যকরী গ্রন্থ অল্প দেখিয়াছি।

নাটকের পাত্র

আমরা নিমে দত্তের প্রকৃতির যে উপাদানগুলি নির্দেশ করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিব। নিমে দত্ত স্বভাবত উন্নতিকাম, অপরিমিত মদ্যপানে উন্নতিকামনা বিফল হইয়াছে। নিমে দত্ত স্বভাবত সহৃদয়, উন্নতিকামনার বিফলতাপ্রযুক্ত সহৃদয়তা কটুতায় পরিবর্তিত হইয়াছে। নিমে দত্ত স্বভাবত তেজস্বী, পানদোষে তেজস্বিতা মলিন হইয়াছে। নিমে দত্ত স্বভাবত পবিত্র-বুদ্ধি, মদ্যপানের আনুষঙ্গিক দোষে চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইয়াছে। নিমে দত্ত

বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, সর্বদা অপরিমিত মদ্যপানে বায়ুবিকৃতি পর্যন্ত উপস্থিত হয়। নেশার সময়ে নিমে দত্তের এই যে বায়ুবিকার দেখিতে পাওয়া যায়, নেশার অবসানে কিয়দংশ স্থায়ী হইয়া রহে কি না, তাহার নিরূপণ করা কঠিন। গ্রন্থকার নিমে দত্তের নেশা না থাকা অবস্থা বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু নেশার সময়ে তাহার যেরূপ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার বায়ুর আংশিক বিকৃতি স্থায়ী হয় বলিয়া সন্দেহ জন্মে।

দোষগুণে জড়িত এই প্রকার পাত্রের রচনাতে কল্পনাশক্তি বিশেষ প্রকাশ পায়। দোষে গুণে জড়িত এই প্রকার পাত্রই নাটকের উপযোগী। পূর্বেই বলিয়াছি নাটকের পাত্রগণ মানবোচিত প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য-মাত্রেরই প্রকৃতি দোষ-গুণ-জড়িত হয়। নিরবচ্ছিন্ন দোষ মনুষ্যে থাকে না, নিরবচ্ছিন্ন গুণও মনুষ্যে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন দোষ বা গুণ কেবল আমাদের কল্পনা-ভাণ্ডারেই থাকে। নিরবচ্ছিন্ন দোষ বা গুণ আমরা মানব-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন করিয়া মনে মনে ভাবিয়া থাকি। নিরবচ্ছিন্ন দোষ বা গুণের বর্ণনা রচনাভেদে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, রসাত্মক রচনাবিশেষেও সুন্দর হইতে পারে। কিন্তু অস্বাভাবিক বলিয়া তাহা নাটকের পক্ষে উপযোগী নহে। কাব্যরচনার মধ্যে নাটকরচনা যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-সাপেক্ষ তাহার একটি প্রধান কারণ ইহাই। আমাদের দেশে এক্ষণে যে সমস্ত নাটক প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে নাটকোচিত প্রকৃতিরচনার নিতান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধুবাবুও এ অভাবদোষ হইতে এককালে মুক্ত নহেন। তাঁহার রচিত অন্য নাটকে এবং এই "সধবার একাদশী" গ্রন্থের অন্য স্থলেও এই দোষের প্রকাশ আছে। কিন্তু নিমে দত্তের রচনাবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছেন। সে নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শত সাধুবাদ করি, এবং ভবিষ্যৎ রসগ্রাহী লোকেও সাধুবাদ করিবেন।

কেহ কেহ এমন বিবেচনা করিতে পারেন, একটা মাতালের বর্ণনা করাতে দীনবন্ধু বাবুর এতই কি প্রশংসার বিষয় হইয়াছে? কারণ মাতালের বর্ণনা যদিও ঠিক হইয়া থাকে, তথাপি প্রথমত তদালোচনায় সমাজের কোন উপদেশ লাভ নাই, দ্বিতীয়ত তাহাতে কবিত্বশক্তির নীচবৃত্তিপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ বিবেচনা আমাদের বোধে অনিষ্টকর। ইহাতে রসাত্মক রচনার প্রকৃত মর্মাববোধে ব্যাঘাত জন্মায়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নীতির উপদেশ দেওয়া

ধর্মশাস্ত্রের কার্য, নীতিশাস্ত্রের কার্য। রসাত্মক রচনার যে প্রকৃত কার্য, তাহা সুসম্পন্ন হইলেই সে পরোক্ষ ফল ফলে। রস ধর্মনীতিবিরুদ্ধ নহে, প্রত্যুত ধর্মনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, উভয়কেই একই পদার্থের রূপভেদমাত্র বলিলে বলা যায়। এত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, রসসংযোগ থাকিলে ধর্মনীতি মানব হৃদয়ে যে অনায়াস-প্রবেশ প্রাপ্ত হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্মনীতির উপদেশ তাহা কখনই প্রাপ্ত হয় না। এ কথা প্রসিদ্ধই আছে। নীতি-উপদেষ্টৃগণের মধ্যে অনেকে গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। গল্পচ্ছলে উপন্যাসগত রসসংযোগে, রসস্পর্শে হৃদয়ের আয়তনবৃদ্ধি হয়—হৃদয় উন্নত হয়, বিস্তৃত হয়। বহিরিন্দ্রিয় কয়েকটির পরিতৃপ্তি ভিন্ন এ সংসারে যে অধিকতর সুখপ্রদ পদার্থ আছে, তাহার উপদেশ দেয়। জগতের রহস্য-সমস্তের সমাচার দেয়। এই ভবযন্ত্র হইতে অহর্নিশ দৈবসঙ্গীত নিঃসৃত হইতেছে, তৎশ্রবণে অধিকারী করে। প্রকৃত রস মাত্রেই পবিত্র ; এমন যে আদিরস সেও পবিত্র। কবি বলিয়াছেন, নায়কের মনে এই রসস্পর্শমাত্রেই—"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট।" মনের এই কবাট খোলাই রসের কার্য। মনুষ্য জীব-প্রকৃতিসুলভ ধর্মের বশীভূত হইয়া সর্বদাই কবাট আঁটিয়া রাখে। কুলা, ধুচুনি প্রভৃতি দুই চারিখানি সামগ্রী কুটীরের মধ্যে রাখিয়া দৃঢ়রূপে কবাট বন্ধ রাখে। এ কবাট খোলে কে ? রস। কখন করুণরস খোলে, কখন অন্য রস খোলে। কিন্তু রস ভিন্ন কাহারও খুলিবার সাধ্য নাই। নীরস নীতি-উপদেশ এ কবাট খুলিতে পারা দূরে থাকুক, ইহার সংযোগরন্ধ্র দিয়াও অন্তঃপ্রবেশ করিতে পারে না। তবে খোলা কবাট পাইলে প্রবেশ করিতে পারে বটে। কিন্তু তাহাও রসের অনুগ্রহে।

প্রকৃত রসের সৃষ্টি হইলেই তাহা উপদেশ হয়। রসাত্মক রচনার উপকরণ যেরূপ হউক না কেন, রসের সৃষ্টি হইলেই তাহার কার্য সম্পন্ন হইল। মালিনী হউক, আর নিমে দত্ত হউক, যুধিষ্ঠির হউক, আর রামচন্দ্রই হউক, যে কোন অবলম্বনে রসের অবতারণা করিতে পারিলেই, তাহার পরোক্ষ ফল-স্বরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, হৃদয়ের উদ্দীপন সম্পাদিত হয়। হৃদয়কে আলোকিত করিবার বহ্নি যে কোন উপকরণ হইতে আহৃত হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কাব্যরসের মাহাত্ম্য কেবল ইহার নিজের প্রকৃতি ও নিজের

পূর্ণতার উপর নির্ভর করে। অবলম্বন-সামগ্রীর উত্তমতা গুণে অপ্রাকৃত রসের উৎকর্ষ হয় না, অবলম্বন-সামগ্রীর অধমতা-দোষে প্রকৃত রসের অপকর্ষ হয় না। রস নিত্য পবিত্র পদার্থ।

দীনবন্ধুবাবু লোকসমাজের আদর্শস্থলীয় পুণ্যশ্লোকস্বরূপ কোন পাত্রের রচনা না করিয়া, নিমে দত্তের সদৃশ মদ্যপায়ী যথেচ্ছাচারীর রচনা করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আমরা তাঁহার কবিত্বশক্তিকে নীচবৃত্তিপ্রিয় বলিতে পারি না। আমরা আবার বলিতেছি, অবলম্বনের উত্তমতা বা অধমতার উপর রসাত্মক রচনার উত্তমতা বা অধমতা নির্ভর করে না। অবলম্বন অতি উত্তম হইলেও রচনা অধম হইতে পারে। অবলম্বন অধম হইলেও রচনা উত্তম হইতে পারে। রসাত্মক রচনার প্রতি তাহার অবলম্বন সামগ্রীর উপযোগিতা কিরূপ আছে, রচনার গুণাগুণ বিচার সময়ে কেবল তাহারই বিবেচনা করিতে হইবে রোগের উপযোগী অর্থাৎ উপশমকারী হইলেই ঔষধ প্রশংসনীয় হয়; নতুবা স্বর্ণমুক্তাপ্রবালাদি মহার্ঘদ্রব্যজাত হইলেই প্রশংসনীয় হয় না, অথবা অনায়াস-প্রাপ্য, সর্বজনবিদিত সামান্য সামগ্রী হইলেই অবজ্ঞেয় হয় না। অবলম্বনের উপযোগিতা ধরিয়াই রসাত্মক রচনার বিচার, অবলম্বনের সাধুতা ও অসাধুতা ধরিয়া বিচার নহে।

এই সঙ্গে আমরা আর একটি ভ্রমের উল্লেখ করিব। এই ভ্রমটি অনেকের মধ্যে আছে। এমন কি বিশেষ ইংরাজী-ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা বিবেচনা করেন, কোন কবি উচ্চদরের নায়কের রচনা না করিয়া সামান্য দরের নায়কের রচনা করিলেই যেন অপরাধী হইল। বেদব্যাস দোষগুণজড়িত ধৃতরাষ্ট্রের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র উচ্চদরের পাত্র, নিমে দত্ত সামান্য দরের পাত্র। পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের বিবেচনায় দীনবন্ধুবাবু অপরাধী। এই বিবেচনাটি নিতান্ত ভ্রান্ত। পাত্র-রচনা বা রসাত্মক রচনার মধ্যে উচ্চ দর সামান্য দর আছে বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া যাহারা উচ্চদরের রচনা না করিয়া সামান্যদরের রচনা করে, তাহারা অপরাধী হইতে পারে না। একজনের কল্পনা উচ্চদরের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কঠিন রসের উপযোগী, আর একজনের কল্পনা সামান্যদরের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সহজ রসের উপযোগী— উভয়েই আপনাপন সঙ্কলিত বিষয়ের সুসাধন করিয়াছে, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে প্রশংসনীয়। দীনবন্ধুবাবু নিমে দত্তের সদৃশ সামান্য দরের পাত্ররচনার

সামর্থ্য পাইয়াছিলেন, এবং তদনুযায়ী রচনা করিয়াছেন। প্রশংসার যোগ্য ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় উচ্চদরের পাত্র রচনা করেন নাই বলিয়া তিনি তিরস্কার-যোগ্য হইতে পারেন না।

নায়ক-বিপর্যয়

নিমে দত্তের প্রকৃতি-রচনাতে কি প্রকার সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। তাহার প্রকৃতির কবি-কর্তৃক স্পষ্ট ও যথাযথ কল্পনা এই সঙ্গতি-রক্ষার যে প্রধান কারণ তাহাও বুঝিয়াছেন। অতএব "সধবার একাদশী"র নায়ক অটলবিহারী ইহার প্রকৃত নায়ক না হইয়া, নিমে দত্ত যে কারণে ইহার প্রকৃত নায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে তাঁহাদের বিশেষ কঠিন বোধ হইবে না। অটলবিহারীকে কবি স্পষ্ট দেখিতে পারেন নাই। নিমে দত্তকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, নিমে দত্তের প্রকৃতি কবির হৃদয়কে প্রবলরূপে অধিকার করিয়াছিল, আপনার অজ্ঞাতসারে নিমে দত্তের ব্যবহার ও নিমে দত্তের উক্তি-প্রত্যুক্তি অধিক করিয়া দিয়াছেন, যত্নপূর্বক যে চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার প্রধানাংশে নিমে দত্তের শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কাজেই সে চিত্রপটের মধ্যস্থলীয় মূর্তি নিমে দত্ত হইয়াছে; যথাস্থলে কল্পনাশক্তির মালিন্য এবং অযথাস্থলে কল্পনাশক্তির পূর্ণ স্ফূর্তিই এই নায়ক-বিপর্যয়ের কারণ হইয়াছে। এরূপ কারণে এরূপ নায়ক-বিপর্যয় ঘটা কাব্য-রচনার মধ্যে তত অসাধারণ নহে। অন্য কবিগণের রচনাতেও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় কবিদের কথায় কাজ নাই, মেঘনাদ-বধের নায়ক ইন্দ্রজিৎ না হইয়া রাবণ হইয়াছে। এই নায়ক-বিপর্যয়ের সঙ্গে গ্রন্থের মূল তাৎপর্যের অল্প বা অধিক পরিমাণে বিপর্যয় হয়। কারণ, গ্রন্থের মূল তাৎপর্য প্রধানত নায়কের প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। নায়কের বিপর্যয় ঘটিয়া ইতর পাত্র নায়কস্থলীয় হইলে তাহারই প্রকৃতির অনুসারে গ্রন্থের তাৎপর্য হয়। "সধবার একাদশী"তেও এইরূপ ঘটিয়াছে; কিন্তু অল্প পরিমাণে। "সধবার একাদশী"র মূল তাৎপর্য ছিল মদ্য-পানের দোষ প্রদর্শন করা। গ্রন্থের নাম-পত্রিকায় যে তিনটি ইংরাজী কবি-বাক্য উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহাতেই এই তাৎপর্য জানিতে পারা যায়। নায়কের বিপর্যয় হওয়াতে, অর্থাৎ মদ্যপানে নবব্রতী অটলবিহারীর সদৃশ পাত্রের স্থলে সুরাসমুদ্রবিহারী

নিমে দত্ত নায়ক হওয়াতে সে তাৎপর্য কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়াছে, পানদোষনিবন্ধন উত্তরোত্তর প্রকৃতিবিকৃতি প্রদর্শিত না হইয়া ঘোর মদ্যোন্মত্ততারই ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তাৎপর্য এমন স্পষ্টরূপে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, যাঁহারা নিমে দত্তের জটিল প্রকৃতি ভালরূপে বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা এই স্থলে সুরাপান-দোষের তাদৃশ প্রতিপাদক জ্ঞান করেন না।

যাঁহারা নিমে দত্তের প্রকৃতি ভালরূপে বুঝিতে পারেন, তাঁহাদেরও চক্ষে ইহার যে তাৎপর্য কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছন্ন বোধ হয়। নিমে দত্তের প্রকৃতি গোড়ায় মদ্যদোষে বিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে সে বিকৃতি-প্রকাশের সঙ্গে নিমে দত্তের উত্তম ও অধম প্রবৃত্তির পরস্পর-বিরোধেরও অধিক প্রকাশ আছে। সুবোধ পাঠক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সময়ে নিমে দত্তের প্রকৃতি উত্তরোত্তর বিকৃত হইতেছে না দেখিয়া, পূর্বঘটিত বিকৃতির কারণে তাহার আন্তরিক যাতনা-ভোগেরই অধিক লক্ষণ দেখিতে পারেন। সুতরাং যদিও ইহাতে সুরাসক্তির দোষ পাকতঃ প্রতিপন্ন হইতে থাকে বটে, তথাপি সে দোষকে, একক্ষেত্রগত উত্তম ও অধম প্রবৃত্তির পরস্পর-বিরোধের এক পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়, পাঠকের সম্মুখে গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য না থাকিয়া অন্য তাৎপর্য না আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অন্য তাৎপর্য আমার এরূপ গুরুতর ও গাঢতর রসের উদ্দীপক, ইহাতে পাঠকের হৃদয় এরূপ অপেক্ষাকৃত প্রবলরূপে অধিকৃত হয় যে, গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য পাঠকের চক্ষে আরও ম্লান হইয়া পড়ে, আরও ক্ষুদ্র অবয়ব ধারণ পূর্বক পার্শ্বে অবস্থান করিতে থাকে। তথাপি গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট এই তাৎপর্য গ্রন্থের তাৎপর্যের সঙ্গে কার্যকারণ-সম্বন্ধে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে, একের দ্বারা অন্যের পরিস্ফুট প্রকাশ পায়, এবং চরম ফলের দ্বারা গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে। এই প্রযুক্ত এ স্থলে নায়ক-বিপর্যয় ঘটিয়া মূল তাৎপর্যের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট হইলে বুদ্ধিমান পাঠকের নিকটে তাহার পরিমাণ অতি অল্প।

নাটক

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

(১)

কোন এক প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যই মনুষ্যের উৎকৃষ্টতম পাঠ্য পুস্তক। কবি বা দার্শনিক, ব্যবসায়ী বা রাজনীতিজ্ঞ, সকলের পক্ষেই মনুষ্যচরিত্রের কোন না কোন ভাগ মূলধন। যিনি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি কবি হইলে ব্যাস বা সেক্সপীয়র, দার্শনিক হইলে শঙ্করাচার্য বা কোমৎ, ব্যবসায়ী হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, এবং রাজনীতিজ্ঞ হইলে কণিষ্ক বা মেকিয়াবিলি, চাণক্য বা ডিস্‌রেলি।

এই মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য নানা প্রকারে সাধিত হয়। মনুষ্য সময়স্রোতের তাড়নায় নিরন্তরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এইরূপেই প্রাচ্য আর্যজাতির অধঃপতন ও প্রতীচীর আমেরিক জাতির অভ্যুত্থান। মনুষ্য আবার কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ এই ভূতচতুষ্টয়ের দাস; এবং আহার ও পরিচ্ছদ-বৈচিত্র্যেও মানবীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। এইজন্যই নাকি তণ্ডুলভোজী ভারতবাসী, গোল-আলুভোজী আইরিস ও রম্ভাফলভোজী দক্ষিণামেরিক, মাংসভুক বিজেতার চিরদাসত্বে নিযুক্ত রহিয়াছে। এইজন্যই ভারতবর্ষের বুদ্ধির দীপ এত ঝঞ্ঝাবাতেও নিবিয়াও নিবে না, আর লাপ্‌লাণ্ড বা শিবির-দেশবাসীর তিমিপঞ্জর-নির্মিত কুটির মধ্যে তিমি-তৈল পান করা ঘুচিয়াও ঘুচে না। মনুষ্যচরিত্র লইয়া, শীতবাতাতপের এইরূপ ক্রীড়া-কুর্দন উন্নত পদার্থ-বিদ্যার এবং আধুনিক বাকল-বিদ্যার[১] সমালোচ্য সামগ্রী।

আর এক প্রকারে দেখিতে গেলে মনুষ্য প্রাসাদশোভিনী বাতশলাকার ন্যায় সর্বদাই তাড়িত হইয়া থাকে। সেই তাড়নাকারী সমষ্টিকে সংসার বলা যায়। সকল মনুষ্যই এই জগৎ-সংসারের ক্রীড়াকন্দুক। সময়ের তরঙ্গাভিঘাতকে, জড় জগতের শক্তি-সামর্থ্যকে বা নীতির উপদেশ-পরিচালনাকে সংসার-তাড়না বলে না, মনুষ্য এই কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় আবেগের উপর যে পরকীয়

১ Buckle—*History of Civilisations.*

আবেগের আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সংসার-তাড়না বলি। সংসার-তাড়নার একটি অপূর্ব নিয়ম আছে। তাহা এইরূপ ;—দশদিক হইতে দশজনে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে তোমায় তাড়না করিতেছে ; অথচ তোমার প্রকৃতিবলে তুমি একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত হইতেছ। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলিলাম, এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা তাহাকেই অদৃষ্ট বলেন। এই অদৃষ্ট বা প্রকৃতি-পরিণত মানবের সহিত, সংসার বলিয়া অভিহিত পরকীয় আবেগসমষ্টির যে যুদ্ধ, তাহাই নাটকে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধ যে একের সহিত অনেকে করিতেছে, এমন নহে। এই সংসারে সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অথচ সময় বিশেষে এই সমর-ক্ষেত্রে এক একজন মাত্র অধিনায়ক বা অধিনীতরূপে পরিলক্ষিত হইতেছেন। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণীর সহিত একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে প্রবৃত্ত ছিল, তাহার ভাগবিশেষ অধিনায়কের নামে ভীষ্মপর্ব ও দ্রোণপর্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সংসারও সেইরূপ, কত শ্বেতপুরুষ ভারতবাসীকে উৎপীড়িত করিতেছেন এবং স্বকীয় অমল শ্বেত অঙ্গে ফুৎকার দিয়া রাজদ্বার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে কেবল মিয়ার্স বা ফুলারই অধিনায়ক বা অধিনীতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। নাটকে সেইরূপ কেণ্ট, গ্লষ্টর, এডমণ্ড, এডগার, বিদূষক, গণরিল, রিগান ও কদেলিয়া সকলের মধ্যেই আবেগের "ঘাত-প্রতিঘাত" চলিয়াছে. কিন্তু সকলের মধ্যে বার্ধক্যের বেগ-পরিচালিত নৃপতি লীয়রই অধিনীত, সুতরাং সমস্ত নাটকখানির নাম "লীয়র"। নাটকের অভিমন্যুরূপী দিনেমার রাজকুমার সপ্তরক্ষী-পরিবেষ্টিত ; রজনীযোগে ভূতযোনি-কর্তৃক আক্রান্ত, পরদিন প্রণয়িনী-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, কখন পাপিষ্ঠা গর্ভধারিণীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিতেছেন, আবার কখন বা প্রাণবন্ধু হোরেশিয়োর পরামর্শে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, লেয়ার্টিসের বিষাক্ত বাণে জর্জরিত-কলেবর হইয়া ঈদৃশ কপটাচরণে ঘৃণায় অভিভূত ;—আবার সেই মুহূর্তেই বন্ধুর প্রাণ-রক্ষার জন্য মৃত্যুশয্যা হইতে উত্থান করিতেছেন। তিনিই অধিনায়ক এবং তিনিই অধিনীত, সুতরাং সেই নাটকের নাম "হেমলেট"।

স্থূলত বলিতে গেলে অধিনায়ক বা অধিনীত-বিশেষের সংসার-তাড়নায় বা পরকীয় আবেগসমষ্টির উত্তেজনায় যে চরিত্রগত পরিবতন ও পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। যিনি শিখিতে জানেন

তিনি নাটক হইতে ইহলোকের চরমশিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বিষভক্ষণে মৃত্যু হয়, কেবলমাত্র অন্নভোজী হইলে মনুষ্য লম্বোদর সুতরাং অলস-প্রকৃতি হয়, বিলাসপ্রিয় জাতি ক্রমে কঠোরপ্রাণ জাতির কর-কবলিত হয়; ইতিহাস বা বিজ্ঞানের সমীপে এইরূপ নানাকথা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ কাব্য-নাটকের স্থানেও আমরা নানা গভীর নীতি শিক্ষা করিয়া থাকি। যদি ঘুণাক্ষরেও সরলা প্রণয়িনীকে অনর্থক অবিশ্বাস কর, তবে তুমি "ওথেলো" বৃথা পাঠ করিয়াছ; আবার যদি প্রণয়িনীর অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিতে ঘুণাক্ষরে সম্মত হও, তবে তুমি "মেকবেথ" বৃথা পড়িয়াছ। সম্মানলুব্ধ ব্যক্তিরা প্রায়ই চাটুবচনপ্রিয়। তুমি "লীয়র" পড়িয়াছ, এখনও কি চাটুবচনে নৃত্য করিবে? আর তুমি নেপোলিয়ন, লিঙ্কন, বিসমার্ক বা ডিসরেলি, তোমরা কি মনে কর যে কেবল সিজারের বিরুদ্ধেই ব্রুটসের বিশ্বাসঘাতকতার সমাধা হইয়াছে? শত শত ব্রুটস হয়ত এই মুহূর্তেই তোমাদের নিমিত্ত গুপ্ত-অস্ত্র শাণিত করিতেছে। কবির কল্পনা হইতে এইরূপ গভীর উপদেশসকল পাওয়া যায়। তবে কেহ তিন বৎসরেও ঋজুপাঠের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, আর কেহ যাবজ্জীবনেও উৎকৃষ্ট নাটকের মর্মকথার বর্ণমাত্র বুঝিতে পারে না। সংসার-তাড়নায় অধিনায়ক বা অধিনীত-বিশেষের চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম যখন নাটকের উদ্দেশ্য, এবং মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের "ঘাত-প্রতিঘাতই" যখন নাটকের জীবন, তখন কথোপকথন বা স্বগত-বচনই নাটকের একমাত্র দেহ।

অন্যরূপ কাব্যে কল্পনার অধিকতর লীলাচাতুরী আছে, সৌন্দর্যের স্ফুটতর বিকাশ আছে, হৃদয়ের তরতর উচ্ছ্বাস আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম অবশ করে এমন মোহিনী শক্তি আছে, এবং হয়ত অনেক স্থলে আবেগেরও তরঙ্গ আছে, কিন্তু কেবলমাত্র নাটকেই সেই তরঙ্গের "ঘাত-প্রতিঘাত" দেখিতে পাওয়া যায়। একজন কোন বন্ধুর নিকট চিন্তাবেগ প্রকাশ করিলেন; বন্ধু তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে উত্তর দিলেন; প্রথম বক্তার আবেগ অমনিই অন্যদিকে ধাবিত হইল, বন্ধু-হৃদয়ের আর একদিকে এবার আঘাত লাগিল, বন্ধু এবার সান্ত্বনা না করিয়া সহানুভূতিভরে দুইটি কথা কহিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন, তাহাতেই আবার প্রথম বক্তা বিচলিত হইলেন।—এইরূপ কথোপকথন থাকিলেই যে নাটকের বার আনা হইল এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তাহা হইলে প্লেটোর তর্কবাদ বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষড়দর্শনসংবাদ উৎকৃষ্ট নাটক, কেন না

তার্কিকের মধ্যে যত আবেগ আছে, এত বোধ হয় সংসারে আর কাহারও নাই। কিন্তু তাহাতে সংসার কৈ? সংসারের তাড়না কৈ? ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐ ষড়দর্শনসংবাদে বা প্লেটোর তর্কবাদে যদি দুটি একটি স্ত্রীলোক থাকিত ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর গল্প থাকিত, তাহা হইলেই ঐ গ্রন্থগুলি নাটক বলিয়া পরিগণিত হইত। এটিও নিতান্ত ভ্রমের কথা। তাহা যদি হইত, তবে টেকচাঁদের হরিহর-পদ্মাবতীর কথোপকথন, এবং যদুবাবুর ধাত্রীশিক্ষাও উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া সেক্সপীয়রের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিত। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের দেহ আছে, প্রায়ই প্রাণ নাই। কেবল রসপূর্ণ কথোপকথন আছে, আবেগ-তরঙ্গের চলাচল নাই। কেবল নাটক বলিয়া নয়, আমরা সর্বত্রই শুদ্ধ বাহাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখি, এবং বাহ্য চিত্রের উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া যাই। অন্যান্য কাব্যেতেও এইরূপ হইয়াছে। এতদিন বাঙ্গালা যাঁহাকে প্রধান কবি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেছিল, সেই ভারতচন্দ্র একজন বাহাড়ম্বরপ্রিয় কবি; তাঁহার দৃষ্টি কেবল ছন্দে আর লালিত্যে, অনুপ্রাসে ও যমকে। এখনও যাঁহাদিগকে আমরা কাব্যকাননে সারী-শুক বলিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করি, তাঁহারাও কি অনেক সময়ে কেবল বাগ্বিন্যাসে মত্ত নহেন? এখন সাতুবাবু নিধুবাবু, কোকিল, কমল, ভ্রমর গুঞ্জন, কদম্ব, দাড়িম্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, এখন হইয়াছে "নৈশ গগনের সান্ধ্য সমীরণ"—আর "নৈদাঘ তপনের মুর্মুর দাহন"। ফলকথা, বর্ণনকাব্যে এখনও আমরা শব্দের অনুচিত শাসন এড়াইতে পারি নাই।

কথোপকথন নাটকের শরীর, এই কথায় নাটকাবয়ব-বর্ণনের পর্যাপ্তি হয় না। আবেগের তরঙ্গ-চলাচল সাধারণত কথোপকথনেই বিকশিত হয় বটে; কিন্তু আবেগ-চলাচলের আরও দুইরূপ পরিণাম আছে। এক, আবেগের দুইটি প্রতীপগামী সংঘাত হইতে ঘোরতর সংশয়ের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে আত্মচিত্ত-পরীক্ষা, আর আবেগের পূর্ণতা হইতে উচ্ছ্বাস। উভয়ই স্বগত হইয়া থাকে, এবং ইহাও নাটকের অবয়বের মধ্যে। একাধিক ব্যক্তি মিলিয়া যে নাটকের মধ্যে গমন করে, এবং কাহারও আত্মচিত্ত-পরীক্ষা না হইয়াও যে স্বগতবাক্যের বিস্তার থাকে—সে কেবল নাটকের অঙ্গীভূত পদার্থ নহে।

(২)

এখন নাটকের পরিচ্ছদের কথা। নাটকের ছন্দোবন্ধন, ভাষার গাঁথনি বা রচনাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত? এইবার অনেক কৃতবিদ্যের মতের সহিত আমাদের মতবিরোধ উপস্থিত। আমাদের মূল সূত্রানুসারে বঙ্গীয় নাট্যকারের আবেগের তরঙ্গই যখন নাটকের জীবন, তখন ইহার পরিচ্ছদ বা ভাষাও সম্পূর্ণ তরঙ্গায়িত হওয়া আবশ্যক। ভাষার নিয়মিত তরঙ্গকেই রচনার ছন্দ বলিতে পারা যায়। নাটকে সেইরূপ ছন্দোবন্ধ রচনা হইলেই স্বভাবসঙ্গত হয়। স্বভাবে যেখানে দেখিলেন মানসিক উদ্বেগ, সেইখানেই দেখিবেন কথা ছন্দোময়ী! আনন্দের যে নৃত্য, তাহাতে যেরূপ ছন্দ আছে, শোকের যে উচ্ছ্বাস ও ক্রোধের যে গর্জন, তাহাতেও সেইরূপ ছন্দ আছে।

মনুষ্যমন আবেগপূর্ণ হইলে কথা কেন ছন্দোময়ী হয়, এ প্রশ্নের উত্তর দান করা তত সহজ নহে, কিন্তু এরূপ যে হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এইজন্য পৃথিবীর সকল উৎকৃষ্ট নাট্যকারই ছন্দোময়ী ভাষাতে নাটক রচনা করিয়াছেন। যদিও সংস্কৃত ভাষার প্রধান নাট্যকারেরা গদ্য-পদ্য উভয়বিধ প্রকারেই নাটকের পরিচ্ছদ প্রদান করিযাছেন কিন্তু তাহাতে আমাদের মূলসূত্র খণ্ডন হয় না, কেননা সংস্কৃতের যে গদ্য তাহা অন্য ভাষার পদ্য বলিলেও চলে। যখন শাপবশে লুপ্তস্মৃতি দুষ্মন্ত নৃপতি শকুন্তলাকে শুদ্ধান্তশ্চারিণী করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন সেই যে শকুন্তলা একবার মাত্র ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আবার নতনয়না হইয়া সর্বংসহাকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়ভেদিনী উক্তি প্রয়োগ করিলেন,—বলিলেন "ভঅবদি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরম্"—এই উক্তিকে আমরা গদ্য বলি না। ইহা পদ্যের চরমোৎকর্ষ। ইহাতে তরঙ্গ আছে, ছন্দ আছে, ন্যাস আছে, লয় আছে। সংস্কৃত নাটকের গদ্য এইরূপ, আর তাহাতেই সংস্কৃত নাটকে গদ্য পদ্য উভয় পরিচ্ছদই সন্নিবেশিত আছে। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা সেরূপ নহে, বাঙ্গালা এখনও এলাইয়া এলাইয়া পড়ে, ধরি ধরি করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং বাঙ্গালা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক। যে ছন্দে হিন্দুস্থানী সিপাহী দুর্বল বাঙ্গালীর উপর স্বীয় ক্রোধ প্রকাশ করে, যেরূপ ছন্দে পুত্রশোকবিহ্বলা জননী বিনাইয়া বিনাইয়া আপনার শোক প্রকাশ করে, আবেগের তাহাই প্রকৃত পরিচ্ছদ। আবেগ-জীবন নাটকে সেইরূপ তরঙ্গায়িত রচনা থাকা

নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ নাটকের ভাষা সাধারণত অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ভাষা কেবল তরঙ্গায়িত বা ছন্দোময়ী হইলেই যথেষ্ট হইবে না। ভাষার জমাট গাঁথনি হওয়া চাই। যেখানে মানবিক আবেগের গভীরতা আছে, সেখানে ভাষার গাঁথনি কখন বালকের মত আধ আধ বা গোস্বামীর গীতিকাব্যোক্ত ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল-মলয়সমীরের ন্যায় ধারাবাহী ও নিদ্রাকর্ষণকারী হয় না। না বাঙ্গালা দেশেই আছে, আর না বাঙ্গালা কাব্যেই আছে, কোথাও শোকের বা ক্রোধের, ঘৃণার বা সাহসের গভীরতা নাই। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা সর্বত্রই চিরবিরহান্তে মিলিত নায়ক সমীপে রসালসা নায়িকার মত কেবলই এলাইয়া এলাইয়া যায় ও হেলিয়া হেলিয়া পড়ে। ভাষার এ বিলাসিতা হইতে আমরা কবে মুক্তিলাভ করিব বলিতে পারি না।

নিপীড়িত জাতির ভাষায় এত বিলাসিতা? যাহার মর্মে পীড়া, গাত্রে কশাঘাত, হৃদয়ে বেদনা, সে কেন গলিগলি আধ্‌ধার তালে ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ গাইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়? তাহার ভাষায় আবার এত রসাবেশ কেন? লালিত্য কেন? মাধুর্য কেন? আর সেই বাঙ্গালীর রচিত নাটক-নামধারী কথোপকথন ঘটায় এত প্রণয়, প্রণয়, প্রণয় কেন? বাস্তবিক এই বাল-স্বভাব-সুলভ, অল্পপ্রাণ প্রণয়েই বাঙ্গালার কাব্য বল, নাটক বল, সমাজ বল, আর যাহাই বল, সকলই ছারখার হইল। পূর্বে এই প্রণয়ের তাড়নায় জটাবল্কলধারী যোগী সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই প্রণয়ের বেগে শত শত সতী নারী জলন্ত চিতায় সুখশয্যাবোধে মৃত পতি পার্শ্বে শয়ন করিতেন। সমাজে প্রণয়ের বেগ এইরূপ; তবে নাটকে তদপেক্ষা যে গভীর হইবে,—তাহার সম্ভাবনা কেন কর? রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডবাসীর মানসিক আবেগের গভীরতা ছিল, সেই সময়ের ভাষার প্রগাঢ়তাও সেইরূপ ভূরি পরিমাণে ছিল, তাহার ফল বেকন ও ফুলর, রালী ও সেক্সপীয়র, বেন জনসন ও মাসিঞ্জর। আমরা মনোমধ্যে একটু মাত্র আবেগ হইলেই সফরীর মত ফর ফর করি, দু'খানি ক্ষুদ্র পক্ষ পাইলেই পিপীলিকার মত আকাশে উড্ডীন হইয়া হিংস্র পক্ষিগণের কবলাশ্রয়ে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হই। আমাদের মনের সেরূপ বেগ

...ই, আমাদের ভাষার সেইরূপ গাঢ়তা ও তেজ নাই। সেক্সপীয়ারের প্রণয়বীর ...ও যখন একটিমাত্র শ্লোকার্ধ উচ্চারণ করেন He jests at scars that never felt a wound, —আমাদের লীলাবতীর প্রণয়বাতুল ললিত-...ন সেই সময়ে আপনার পুস্তকাগারে বসিয়া কেবল হৃদয়ভাবের ব্যাখ্যার ...র ব্যাখ্যা ও টীকার উপর টীকা ও ভাষ্যের উপর অনুভাষ্য কল্পনা করিত। ...দের যেরূপ স্বভাব চরিত্র, তাহাদের ভাষাও সেইরূপ, কাব্যও সেইরূপ, ...কও সেইরূপ। তাহাতেই নাটকের সুদীর্ঘ বক্তৃতাসকল জমাট করিয়া ...িতে বলি।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা উপরোক্ত হেতুবাদে সাধ্য-সাধনের ...-ঘটনা করিতেছি, অশ্বের অগ্রে শকটযোজনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা ...। আপাতত বোধ হইতে পারে বটে, যে অগ্রে মানসিক পরিবর্তন, তাহার ...র কাব্য-নাটকাদির পরিচ্ছদের পরিবর্তন। অনেকস্থলে এইরূপ হয়, তাহাতে ... সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় ভাষার উন্নতির বলে জাতীয় চরিত্রের উন্নতি ...ও বিচিত্র নহে। জর্মনির পঞ্চম চার্লস বলিতেন যে, আমি নূতন একটি ... শিক্ষা করিলে আমার বোধ হয় যেন আমি আর একটি অভিনব আত্মা ...ইয়াছি। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই। একজনকে বেকনের ... ভাষার শিক্ষাদান করুন, দেখিবেন তিনি ক্রমেই স্থির গম্ভীর হইবেন। ...রে এইরূপ মহীয়সী শক্তি আছে বলিয়াই আমরা নাটকের ভাষার দিকে ...কারগণকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলি।

(৩)

এখন নাটকের পরিণামের কথা। এস্থলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের সহিত, ...মাদের বাঙালীর প্রচলিত প্রবৃত্তির সহিত এবং ড্রাইডেন প্রভৃতি সমালোচক-...ণের "কাব্যে সুবিচার চাই" ইত্যাদি কথার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মত-...রোধ। উৎকৃষ্ট নীতি ও উৎকৃষ্ট নাটক একই শিক্ষা প্রদান করে, উভয়ই ...ষ্টবাক্যে আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়,—"শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।" ...জীবনের যে পরিণাম, সংসার-তাড়িত মনুষ্য-জীবন-চিত্রেরও তাহাই ...ণাম। ঐ যে জনাকীর্ণ সভাস্থলে ঘোর বাগ্মী স্বদেশী বিদেশী উভয়কে দক্ষিণ ...মে কশাঘাত করিতেছেন, তাঁহার পরিণাম কি? আর এই যে পতিবিয়োগ-

বিধুরা বঙ্গীয়বালা, নীরবে—অতি নীরবে, অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে,—উহারই বা পরিণাম কি? আর ঐ যে শতগ্রন্থিবসনা ভিখারিণী রোগ-শোক-জরাজীর্ণ হইয়া রাজপথপার্শ্বে পড়িয়া আছে, উহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেহ শুনিয়াও শুনিতেছে না, উহার রক্তহীন পাণ্ডুরচ্ছবি কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহারই বা পরিণাম কি? সকলেরই এক পরিণাম, সেই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত ভূমিখণ্ডোপরি "দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম কলেবর"।

এই জন্যই সকল ভাষারই উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম সেইরূপ হৃদয় ভেদ করে। নাটক বলিয়া নহে, উৎকৃষ্ট কাব্য মাত্রেরই পরিণাম এইরূপ। বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের অদ্ভুত গ্রন্থদ্বয়, হোমরের ইলিয়দ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিসৃষ্ট পৌরাণিক কাব্য বা মহাকাব্যগুলির পরিণামের বিষয় সকলেই জানেন। সুতরাং নাটকের পরিণামও যে সেইরূপ ঘোর বিষাদপূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? নাটকের বিষাদ-পরিণাম সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি আছে। আমরা বলিয়াছি যে "মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ" এই কথাই স্বাভাবিক এবং নাটকে তাহাই থাকে মাত্র। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, স্বাভাবিক হইলেই যে কাব্যোপযোগী হইবে, এমত কি কথা আছে? বরং কবির সৃষ্টি সংসারসৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কবি আবেগপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কল্পনার সাহায্যে মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহার সংসার-কৌশল স্বাভাবিক না হইয়া বরং অনেকটা কাল্পনিক; সুতরাং কাব্যের পরিণাম সংসারের পরিণামের অনুরূপ না হইলেও ক্ষতি নাই। যাঁহারা এইরূপ যুক্তিবাদ দর্শন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, "কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্", যাঁহাদের মতে কাব্যকলাপ তাসক্রীড়ার মত কাল কাটাইবার ও বিনোদনের সামগ্রী, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন তর্ক নাই। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষাবলে কাব্যের উচ্চতর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং মহর্ষি বাল্মীকি বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সংহিতাকারগণ অপেক্ষা আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বিষাদ-পরিণাম নাটক হইতে আমরা গভীরতর উপদেশ প্রাপ্ত হই, এবং সেই সকল উপদেশ গভীরতর খাতে হৃদয়ে বহিতে থাকে। কেন থাকে তাহা পরে দেখান যাইতেছে; এক্ষণে আপত্তিকারীগণের আর দু-একটি হেতুবাদের কথা বলিব।

অনেকে বলিতে পারেন যে, কবিগণকে নীতিশিক্ষক বলিয়া স্বীকার

করিলেও বিষাদ-পরিণাম নাটক যে অন্য নাটক অপেক্ষা অধিকতর নীতিপূর্ণ এ কথা স্বীকার করা যায় না। প্রথম আপত্তি এই যে, সংসারে এত বিষাদ আছে যে বিষাদে হৃদয় দ্রাবিত করিবার জন্য ঐরূপ নাটক পাঠের কোন প্রযোজন নাই। এই তর্ক সারগর্ভ হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে সাগর দেখিয়াছে সে আবার বায়রণ বা কালিদাস হইতে কি সাগরবর্ণন পাঠ করিবে? যুবক-যুবতী যদি বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া থাকে, তবে তাহারা আর জয়দেব-ভারতী শ্রবণ করিয়া কি করিবে? ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে—যখন সংসার রহিয়াছে তখন আবার কাব্য কেন? বাস্তবিক বিবেচনা করিতে গেলে কবির কাব্য এরূপ অপদার্থ পদার্থ নহে। কাব্যজগৎ এই জড়-জীব-জগতের সার,—এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এসেন্স বা আরক। কাব্য-শোধিত সংসার এক অপূর্ব সামগ্রী। কাব্যে যে তীব্রতা যে উপকারিতা আছে, সংসারে তাহা নাই। কেন না সংসার যদি গোলাপবারি, তবে আমরা বলিব কাব্য আতর; আবার সংসার যদি দ্রাবক হয় তবে কাব্য মহাদ্রাবক। কাব্য তীব্র বলিয়াই অধিকতর উপকারী। সুতরাং সংসারে বিষাদ আছে বলিয়া কাব্য-নাটকে বিষাদ থাকিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা সারগর্ভ নহে। সংসারে তুমি আমি আছি বটে, আমাদের বিষাদও আছে, কিন্তু কাব্যে রাম ও হরিশ্চন্দ্র, জোভ ও হেমলেট, ওথেলো ও লীয়র, সীতা ও দেসদিমোনা আছেন, সংসারে সেরূপ কোথাও নাই। সে জন্য কর্পূর থাকিতেও কর্পূরের আরকের প্রয়োজন সেই জন্যই কাব্যের প্রয়োজন। আর এক প্রকার আপত্তি আছে।—কেহ কেহ বলেন যে, বিয়োগ-পরিণাম নাটকের একটি মহান্ দোষ এই যে, ইহাতে মনোমধ্যে সহানুভূতি সমুত্থিত হয়, অথচ তাহা হইতে কোন কার্য হয় না। এইরূপ বারংবার হইলে মনের এমনই একটি স্বভাব হইয়া উঠে যে, তাহাতে কেবল সহানুভূতিই হইতে থাকে, সেই চিত্তবেগ কখনও কার্যে পরিণত হয় না। এ কথাটি সম্পূর্ণ মনুষ্য-স্বভাবের গতির বিপরীত কথা। মহাবীর আলেকজাণ্ডার জপমালার মত হোমরের অদ্ভুত গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে রাখিতেন; এরূপ প্রবাদও আছে যে, উহার সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কে বলিবে যে সেই বীররসাত্মক মহাকাব্য পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কেবল বীররসের উদ্দীপনা হইত, কখনও প্রবর্তনা হইত না। মহাবীর নেপোলিয়ন সেইরূপ জুলিয়সের স্বরচিত ইতিহাস অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নেপোলিয়ন কি কিছুই বীরের কার্য করেন

নাই? চৈতন্যদেব দিবারাত্রি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কৃষ্ণভক্তির পদাবলী পাঠ করিতেন। গৌরাঙ্গ কি কেবল ভক্তিতেই অভিভূত রহিয়াছিলেন, কোন কার্য করেন নাই? বালক বালিকার মনে যত ভয়ের ভাব উদ্দীপন করিবে, কার্যকালে তাহারা তত ভীত থাকিবে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণেরও এই মত। তাঁহারা বলেন যে, কোন রসের স্থায়িভাব হইতেই কাব্যের উৎপত্তি হয় এবং সকল কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য হৃদয়-মধ্যে স্থায়িভাবের উদ্দীপনা। উৎকৃষ্ট নাটকের স্থায়িভাব শোক। যে কাব্যের লুক্রিশিয়া বা দ্রৌপদী দেখিয়া শোকতপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সে নব্য টারকুইন বা জয়দ্রথ দেখিলে অবশ্য তাহার আক্রমণ বিফল করিতে অগ্রসর হইবে। আরও এক প্রকার আপত্তি আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটি আপত্তি নহে, আব্‌দার। অনেকে আব্‌দার করেন যে, ভগবানের সৃষ্টিতে সুবিচার হউক আর না হউক, অন্তত কাব্যে সুবিচার চাই। এসকল কাব্যপ্রিয় শিশু-প্রকৃতির সমালোচক মহর্ষি বাল্মীকিকে দেখিতে পাইলে এইরূপ সৎপরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন,—'মহর্ষে! আপনি আপনার মহাকাব্যের পরিণামে সীতাদেবীকে পাতালগতা করাইয়া সুবিচারের কার্য করেন নাই। আহা! সেইদিন যদি রামচন্দ্র সীতা সতীকে বামে বসাইতেন, আর কুশী লব যদি তাঁহাদের অঙ্কে উপবিষ্ট হইত, তাহা হইলে কি শোভা হইত! কি আহ্লাদের কথা হইত! আবার কিছুদিন পরে অষ্টভ্রাতার বিবাহের পর সীতা ভগিনীত্রয়সহ নবদম্পতি-চতুষ্টয়কে বরণ করিয়া গৃহে লইতেছেন, দেখিতে কি সুন্দর হইত!' এই সকল সমালোচকের ইচ্ছা যে নিমজ্জমানা ওফেলিয়াকে কোন ধীবর গৃহে লইয়া গিয়া রাখে, আর হেমলেট লেয়ার্টিসকে বধ করিয়া ও ক্লাদিয়সকে কারারুদ্ধ করিয়া গোরার বাজনা বাজাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। ইঁহাদের ইচ্ছা যে বৃদ্ধ লীয়র কর্দেলিয়ার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার বড় মাসীদের রীতিচরিত্রের ব্যাখ্যা করেন। ইঁহাদের ইচ্ছা যে স্ত্রীবধোদ্যত ওথেলোর নিকট কণ্ঠাগতপ্রাণ ইয়াগো মুমূর্ষু স্থিতিতে আপনার ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে এবং যেরূপ একটি ক্ষুদ্র শিশু দ্বাপরের ভাদ্রাষ্টমীর নিশীথে বসুদেবের ক্রোড় হইতে যমুনায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুদিন পরে সেইরূপ একটি নীলকান্ত কালমাণিক ওথেলোর অঙ্ক হইতে দেসদিমোনার গলা জড়াইয়া ধরে। এ সকল বালকদের আব্‌দার বালকের মুখে শুনিতে মন্দ শুনায় না, কিন্তু বঙ্গীয় সমালোচকগণ যখন ড্রাইডেনের চরিত্র

চর্বণ করিতে করিতে কুন্দনন্দিনীর সমালোচনার উপলক্ষে এই সকল কথার উল্লেখ করেন, তখন আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না।

যদি কর্ডেলিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিতেন, তবে লীয়র যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই প্রকৃত হইত। তাহা হইলে লীয়রের যে এত শোক তাহা কেবল উপন্যাসের রচনাভঙ্গী মাত্র, আর কিছুই নহে। সেক্সপীয়র তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্য কয়খানিতে সে প্রকার উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেন নাই। তিনি এক একখানিতে এক একটি গভীর রসের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। আজি লীয়রের জন্য কাঁদিতেছি, কাল আবার লীয়রের দৌহিত্রের সঙ্গে কৌতুকালাপ দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি, এরূপ কাব্য "লীয়র" নাটক নহে। লীয়রের জন্য যে দুঃখ তাহা আমাদের হৃদয়ে চির অঙ্কিত রহিয়াছে। সেইরূপ হেমলেট, সেইরূপ ওথেলো। সসত্ত্বা শকুন্তলাকে যখন দুষ্মন্ত পরিবর্জন করেন, তখন কেবল দুর্বাসার উপরেই ক্রোধ হয়, শকুন্তলার জন্য তত দুঃখ হয় না, কেননা জানি যে আবার সেই রাজদম্পতীর মিলন হইবে। কিন্তু চিরদুঃখিনী সীতার কথা স্মরণ আছে বলিয়া অদ্যাপি কেহ আপন কন্যার নাম সীতা রাখিতে পারে না। আমাদের পূর্বতন মহর্ষিগণ বা পাশ্চাত্ত্য কবিগণ যদি এখনকার যাত্রাকারগণের মত যুগলরূপের মিলন করিয়া সকল কাব্যের সমাপ্তি করিতেন, তাহা হইলে করুণরসের স্থায়িভাব আমরা কাব্যে কখনও দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে হৃদয়ের প্রধান শিক্ষার অভাব থাকিত। হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা এই রোগ শোক দুঃখ-দারিদ্র্য-জরা-জড়িত সংসারে, মানব-হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা করুণ রসের স্থায়িভাবে। যে পরের দুঃখ দেখিয়া অন্তরের সহিত চিরদিন কাঁদিতে পারে, কখনও ভুলে না, ইহজগতে তাঁহার নীতি-শিক্ষার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। একদিন ছিল, এককাল ছিল, যখন আর্যসন্তান সেইরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পরের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেন। তখন আর্যসন্তান বুঝিতেন যে, যে নদীতে জল ওদিকে যায় আবার এদিকে আসে, তাহা জোয়ার-ভাটার নদী, সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের লীলাখেলার সামগ্রী, কিন্তু কখনই গভীর নায়েগ্রা প্রপাতের মত আত্মার উচ্ছ্বাসক নহে। তখনই রামায়ণ-মহাভারতের সৃষ্টি হয়। তাহার পর আর্যের অধঃপতন। এই অধঃপতনের পর না হইলে ভবভূতি কখনও রামসীতার পুনর্মিলনের কল্পনা করিয়া বালকবৃন্দের করতালির প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান হইতেন না। তদবধি আমরা অধঃপাতে যাইতেছি,

তাহাতেই আমরা এখন শোকের স্থায়িভাব যত্নপূর্বক পরিহার করি। আর তাহাতেই "নীলদর্পণ" আমাদের তত ভাল লাগে না। বাস্তবিক ভারতবাসীর এখন আর হৃদয় নাই, মর্ম নাই, আবেগ নাই। তীব্রতর, কঠোরতর, গভীরতর, গম্ভীরতর ভাবপ্রকৃতি কিছুই নাই। হৃদয়মধ্যে কোন ভাবেরই স্থায়িত্ব নাই, গভীরতা নাই, প্রগাঢ়তা নাই। জলতলে শৈবালরাজির ন্যায় আমাদের হৃদয়ভাবসকল পবনদেবের স্বেচ্ছাচার-ফুৎকারে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে যাইতেছে; ভীমের ত্রিবেণী বন্ধনের ন্যায়, ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের ন্যায়. পাষাণের গভীরখাতে খোদিত নদীশয্যার মত, চিরদিন একদিকে বহে না।

(৪)

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছলিত তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতই নাটকের জীবন। এখন আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত আবেগ নাই। মানসিক হ্রদে সামান্য কুলকুলি আছে, কিন্তু গভীর প্রপাতের সহিত কল্লোল নাই। আমরা এখন বাতুলের মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি। সুতরাং আমাদের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট নাটকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না। ভাল নাটক যে হয় না, সে এখন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য হেতু, কেবল গ্রন্থকারগণের দোষে নহে। এইজন্য আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই, অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। এরূপ প্রহসন অন্য কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ। কবি মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী", "পদ্মাবতী", "শর্মিষ্ঠা", নাটকগণনায় কোথায় স্থান পায় তাহা নির্দেশ করাও কঠিন; কিন্তু দত্তজকৃত "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রহসনের আদর্শ। আবেগপূর্ণ মানব-চরিত্রের কিছুই তাহাতে নাই, কিন্তু যেরূপ গৌরাঙ্গের জীবসকল এখন বাঙ্গালায় ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাদের চিত্র সেই প্রহসনদ্বয়ে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

তাহার পর পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন। বিবেচনা করিতে গেলে তিনি পণ্ডিতের পদ্ধতিতে প্রহসনের কবি, নাটকের কেহ নহেন। তাঁহার "কুলীন-কুলসর্বস্ব" পাঠ করিলে, কুলীন কন্যাগণের কথাবার্তা শুনিলে, যেমন সকলই

গড়াপেটা বলিয়া বোধ হয়, মর্মকথা যেরূপ কর্ণে বাজে সেরূপ হয় না। তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে একটি বিবাহের কথা শুনিয়া বলিলেন—

"জাহ্নবী যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট।
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরীর কাঠ॥"

সুতরাং তর্করত্নের নাটক বিষাদ-পরিণাম হইয়াও একরূপ প্রহসন। তর্করত্নের নাপিতিনী ভাল। যখন সে অলক্তক-সজ্জা লইয়া—

"বাড়ী মোর কাশীপুরে, দেখা যায় কিছু দূরে,
ঘেরা-ঘোরা ঘর দুইখানি।"

বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে দিতে রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে ভারতের হীরার সহচরী করিতে প্রস্তুত হই। আর তাহার উদরপরায়ণ শর্মা যখন—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি দু'চারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই"

বলিয়া উত্তর ফলার বর্ণনা করিতে থাকেন তখন তর্করত্নের গরম লেখনীর গুণে সত্য সত্যই আমাদের রসনা রসাল হইয়া উঠে, এবং পণ্ডিতবর রামনারায়ণকে বৈদিক-কুল চূড়ামণি বলিয়াই বোধ হয়। তর্করত্নের নবনাটকও সেই ;—নাটক নহে প্রহসন। নবনাটকের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গবেশবাবুকে ভুলি নাই।

তাহার পর দীনবন্ধু। দীনবন্ধু এককালে প্রকৃত দীনবন্ধুই ছিলেন। প্রপীড়িত প্রজার জন্য দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, এখন পর্যন্ত বাঙ্গালার কোন গ্রন্থকার তাহা করেন নাই। তাঁহার অক্ষয়-কীর্তি—সেই "নীলদর্পণ"। অনেকে মনে করেন যে, "নীলদর্পণ" কেবল সাময়িক তরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাত্র ; এই কথাটা কতকদূর সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। "নীলদর্পণ" যদি সত্য সত্যই একদিন বা দশদিনের জন্য হইত, যদি জেতৃবর্গের অত্যাচার কেবল এক দেশেই পর্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে এ সংসার সোনার সংসার, এ ভারত সোনার ভারত। আমেরিকায় যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও একরূপ নীলদর্পণের অভিনয়। তবে সেখানে শত সহস্র বিন্দুমাধব ও নীলমাধব একবারে উত্থাপন করিয়াছিলেন, আর এখানে ক্বচিৎ এক আধ জন দেখা দেন এইমাত্র প্রভেদ। বহুদিন হইল

মিস ষ্টোয়ে "আঙ্কল টমস কেবিন" লিখিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ—বৃটিশ গায়েনার শ্রমজীবী গৃহস্থগণের কষ্ট বর্ণনা করিয়া একজন বিলাতের ব্যারিষ্টার "কুলী" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ।

দীনবন্ধু বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাট্যকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে "নীলদর্পণ" রচনার পর হইতেই তাঁহার কাব্য-রস তরল হইতে থাকে। তাহার পরিচয়—'সধবার একাদশী।" তাঁহার নিমে দত্ত কবির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। নিমে দত্ত স্বর্গভ্রষ্ট শয়তান, তাহার সম্মুখে কাচপাত্রে নরকাগ্নি। নিমচাঁদ, এখন আর স্বর্গে অধিকার নাই বলিয়া স্বর্গের উপর রাগ করিয়া, অবাধে সেই নরকাগ্নি দিবারাত্রি গলাধঃকরণ করিতেছে। এই স্বর্গ-নরক-সমষ্টিকে দীনবন্ধু তরলমতি বঙ্গীয় যুবকের দলে স্থাপিত করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার নিমচাঁদ পূর্ণকলেবর হইয়াও স্ফূর্তি পায় নাই। নিমচাঁদের প্রয়োজন ছিল কেবল এক নরকাগ্নি। এ স্বর্গভ্রষ্ট সমাজে তাহার অভাব কোথায়! যে নরকাগ্নি হরিশ্চন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল এতদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোকুলের উপবনে, কাঞ্চনের ভবনে, নিমচাঁদকে পাঠান কেন? নিমচাঁদকে সেই হরিশ, সেই রামগোপাল মধ্যে স্থাপিত করিতে হয়। তবে নিমচাদ স্ফূর্তি পাইত। আর নীলদর্পণ-কার যেরূপ পল্লীগ্রামের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নাগরিক চিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অধিকতর যশস্বী হইতেন। তাহা হয় নাই; দীনবন্ধু ক্রমেই তরলভাব অবলম্বন করেন। সেই জন্য তিনি "নবীন তপস্বিনী"তে নাটক লিখিতে প্রহসন করিয়াছেন, আবার "জামাই বারিক" প্রহসন লিখিতে গিয়া নাটক করিয়াছেন। তাঁহার লীলাবতীর নায়ক নায়িকাকে যত না মনে পড়ে, তাঁহার নদেরচাঁদকে তাহার অধিক মনে পড়ে। প্রহসনে দীনবন্ধু অদ্বিতীয়।

তাহার পর "নয়শোরূপেয়া"-কার তাঁহার নায়ক-নায়িকা ঠিক লীলাবতীর মত, কিন্তু তাঁহার সতুলাল একটি প্রকৃত শোধিত চিত্র। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, সতুলাল গাঁজায় নিমচাঁদ। সুতরাং বাঙ্গালার পূর্বতন নাট্যকারগণ সকলেই প্রহসনপটু। কেবল নীলদর্পণকারই প্রগাঢ় ও "নীলদর্পণ" প্রকৃত নাটক পদবাচ্য।

(৫)

আধুনিক নাটক প্রধানত তিন শ্রেণীর—(১) দেশ-হিতৈষিতা প্রাসঙ্গিক, (২) অনুবাদমূলক, (৩) প্রণয়-জীবন নাটক।

আমাদের উল্লিখিত কয়খানি নাটক এই তিন শ্রেণীর ; তবে দুই একখানি একটু বিশেষ সমালোচনার যোগ্য। "শরৎ-সরোজিনী" গ্রন্থ নিতান্ত তরলমতি বালকের জন্য নহে। শরৎ-সরোজের প্রণয় প্রগাঢ় ও পরীক্ষিত, শরতের দেশহিতৈষিতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তার ভুবনমোহিনীর প্রতিহিংসাও নিতান্ত অশ্রদ্ধার সামগ্রী নহে। ইহার ভাষা প্রায়ই প্রগাঢ় ছন্দোবদ্ধ হইলে আরও অধিকতর আবেগপূর্ণ হইত। ৭৫ পৃষ্ঠায় ভুবনমোহিনীর উক্তি মধ্যে এইরূপ আছে ; "এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম (দন্ত-ঘর্ষণ) যে মতিলালের রক্তে চান করে আমার মেয়ে-জনম সার্থক করব।"

আমরা বলি এইরূপ স্থলে অমিত্রাক্ষরছন্দ হইলে অধিকতর আবেগপূর্ণ হইত। "মনে মনে তাই ভাবি করিনু প্রতিজ্ঞা, মতিলাল পাপিষ্ঠের রক্তে স্নান করে, আমার এ নারীজন্ম করিব সার্থক।"

যাহাই হউক গুণগণনায় "শরৎ-সরোজিনী" প্রথম-স্থানীয় ও "শরৎ-সরোজিনী"কার আধুনিক নাট্যকারগণের মধ্যে সর্বপ্রধান।

(২) তাহার পর "হেমলতা"। "হেমলতা" নাটকে দেশহিতৈষিতার সঙ্গে সঙ্গে বীর-রস উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে। আমাদের পূর্বকথিত নানা কারণে হরলাল বাবু ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রন্থকার যে কেবল প্রণয় লইয়া মত্ত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে উপ্লা-প্লাবিত দেশে বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। "হেমলতা"র কমলা দেবীতে আমরা বাৎসল্য রসের বিলক্ষণ পরিপুষ্টি দেখিতে পাই।

(৩) তাহার পর "মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক"। ইহাতে যবন কলঙ্ক ঔরঙ্গজিবের হস্তে মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক শম্ভুজীর দুর্দশার কথা বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে সাময়িক চিত্র প্রদর্শনের অনেক ব্যতিক্রম আছে, আর এখনকার প্রথামত তুলিকার উপর তুলিকা ঘষিয়া, সুদীর্ঘ আত্মসমালোচন ও বক্তৃতা আছে। বন্ধুঘাতক শম্ভুজী গদ্যে পদ্যে আড়াই পৃষ্ঠা স্বগত ঢালিয়াছেন ; সুতরাং আবেগের কঠোর আঘাত

ও ভাষার প্রগাঢ়তা ইহাতে অতি অল্পই আছে। কিন্তু তথাপি "মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক" দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রধান নাটক।

দ্বিতীয় "ভারত-বিজয়"। ইহারও অধিনায়কগণ—পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র একদিকে; অন্যদিকে কুতব, মামুদ, রহিম প্রভৃতি।

তৃতীয়। 'ভারতের সুখশশী যবন-কবলে'। ইহাতেও ঐ সকল অধিনায়ক

চতুর্থ। 'জয়পাল'। ইহাতে পঞ্চনদেশ্বর জয়পাল ও তৎপুত্র অনঙ্গপাল একদিকে, অন্যদিকে পূর্বোক্ত মুসলমান আক্রমণকারিগণ।

ভারতের সেই দুর্দশার দিন বাঙ্গালা বা ভারতবাসী যদি এখন উজ্জ্বল অক্ষরে, আবেগ সহকারে, প্রগাঢ় ভাষায় বা গভীরভাবে চিত্রিত করিতে পারিবে, তাহা হইলে আমাদের ভাবনা কোথায়? ভারতের এখন সে দিন আসে নাই।

এই জন্যই বিদ্যারত্নের পৃথ্বীরাজ ও মিত্রজের জয়পাল 'জীবিতেশ্বরি, জীবিতেশ্বরি' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।* আর এই জন্যই "ভারত-বিজয়"-এর উপসংহারে আমরা ঝিঁঝিট মধ্যমানে এইরূপ সঙ্গীত শুনিতে পাই:—

'আহা কি সুন্দর শোভা কর সবে দরশন।
পবিত্র-প্রণয়-ডোরে বাঁধা প্রণয়ী দুজন।'

তাহার পর বাবু হরলাল রায় প্রণীত দুইখানি অনুবাদিত নাটক। সংস্কৃত 'বেণীসংহার' হইতে 'শত্রুসংহার' ও সেক্সপীয়রের 'মেকবেথ্' হইতে 'রুদ্রপাল' সেক্সপীয়রের প্রগাঢ়তা বাঙ্গালার 'রুদ্রপালে' অনেক সময়েই রক্ষা হয় নাই বলিলে, কেবল প্রকারান্তরে সেক্সপীয়রেরই প্রশংসা করা হয় ও প্রগাঢ়তায় বাঙ্গালা ভাষা এখনও অনেক উন্নতি-সাপেক্ষ ইহাই বলা যায়। 'রুদ্রপাল' অপেক্ষা 'শত্রুসংহার' অনুবাদ ভাল হইয়াছে।

অবশিষ্ট চারিখানি প্রণয়-জীবন নাটক। বাঙ্গালীর প্রণয়ের অর্থ বেহাগের গান—'সখিরে আমায় ধর ধর'—কোমল, মৃদুল, এলায়িত, আবেগময়, রসালস পূর্ণ। সুতরাং প্রণয়-জীবন নাটকে আর কিছু না থাকিলেও কোমলতা থাকে। প্রণয়ের প্রতিফলে সেইরূপ কোমল, ললিত পদবিন্যাস আছে আর 'প্রকৃত বন্ধুর' বনদেবীতে সেইরূপ সরল লীলাময় আত্মোৎসর্গ আছে

* 'ভারতের সুখশশী যবনকবলে'র ১৩৭ পৃষ্ঠা ও 'জয়পাল' নাটকের ১০৮ পৃষ্ঠা দেখ

কিন্তু "কুমুদ-কামিনী"তে এইরূপ কিছু না থাকিলেও এক "প্রমোদ-মনোরমা"তেই সকল আছে। উহাতে রাজা আছে, পুরোহিত আছে, ভট্টাচার্য আছে, বিদূষক আছে, জমিদার আছে, ইয়ারগণ আছে, মন্ত্রী, শিক্ষক, নর্তক, প্রতিহারী, দূত, পান্থ, ভৃত্য, রাজরাণী, রাজকন্যা, সুদীর্ঘ বক্তৃতা, নানা রসের গীত, রজ্জুকাষ্ঠ, মৃত্তিকা, গোময়, তৃণ, ছাই, পাঁশ, ভস্ম সকলই আছে; নাই কেবল গ্রন্থকারের শিক্ষা কিংবা শক্তির পরিচয় ও তাহার ভাষাজ্ঞান। অনেক নাট্যকার সংস্কৃত বা ইংরেজী নাটক পড়েন না, "প্রমোদ-মনোরমা"-প্রণেতা বাঙ্গালা কোন নাটক পর্যন্তও পড়েন নাই। "প্রমোদ-মনোরমা" আধুনিক অপকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ।

আমরা নাটক, বাঙ্গালা নাটক ও আধুনিক বাঙ্গালা নাটক সমালোচনা করিতে গিয়া মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের অপকৃষ্ট গ্রন্থরূপ অধঃপতিত বাঙ্গালার অন্ধতম কূপে আসিয়া পতিত হইয়াছি।

এক্ষণে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিব।

মনুষ্য নানারূপে তাড়িত। সংসার-তাড়িত মানব-বিশেষের পরিবর্তন ও পরিণাম প্রদর্শন করা, নাটকের উদ্দেশ্য। মনুষ্য-হৃদয়ের আবেগ-পরম্পরার চলাচলে এই পরিবর্তন হইয়া থাকে। জীব শরীরে শোণিতসঞ্চালন যেমন জীবনীশক্তির মূল, আবেগচলাচল সেইরূপ নাটকের জীবন। আবেগপূর্ণ কথোপকথন বা স্বগত আত্মচিত্তপরীক্ষা বা কণ্ঠোচ্ছ্বাস নাটকের শরীর। অলঙ্কারিত বা ছন্দোবদ্ধ রচনাই নাটকের উপযুক্ত পরিচ্ছদ। অন্য পরিচ্ছদে একরূপ চলে, কিন্তু সাজে না। উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম অতীব শোককর; এরূপ না হইলে ভাবের প্রগাঢ়তা হয় না, এবং রসের স্থায়িত্ব হয় না।

উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক রচনার জন্য ভাষার প্রগাঢ়তা অবলম্বন করা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য। নহিলে রসের ঘনীভাব হয় না। ভাষার প্রগাঢ়তা হইতে আমাদের ভাবের গভীরতা হইবে, তাহা হইলে ক্রমে আমরা কার্যকর মনুষ্য হইব। এখন আমাদের যেরূপ জাতীয় স্বভাব, আর যেরূপ এলায়িত ভাষা, ইহাতে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকের উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব। ভাল প্রহসন হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে। মধুসূদন, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু ইঁহারা সকলেই প্রহসন-লেখক। প্রহসনে বাঙ্গালা অদ্বিতীয়। আধুনিক বাঙ্গালা

নাটকে কেবল দুই একখানি ব্যতীত সকলগুলিই অসার। যেখানে দেশ-হিতৈষিতা উদ্দীপনের চেষ্টা, সেখানে গ্রন্থকার প্রায়ই অকৃতকার্য। বাঙ্গালী দেশহিতৈষিতা করিতে শিখিয়াছে, মর্মকথার দীর্ঘশ্বাসে এখনও অপরের হৃদয়ে দেশবাৎসল্যের উদ্দীপন করিতে শিখে নাই। কোমল বাঙ্গালী একটু কোমল প্রণয় লিখিতে, বলিতে শিখিয়াছে। অপকৃষ্ট নাটকগুলি তাই লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি, আবারও বলি—মর্মে যার পীড়া, গাত্রে যার কশাঘাত, গৃহে যার অন্নকষ্ট, বাহিরে যার দণ্ডবিধি, মস্তকে যার অগ্নিবৃষ্টি, পদে পদে যার বিপদ, সে কেন আধ্‌ধার তালে ঝিঁঝিট রাগিণীতে প্রণয়ের গীত গাইয়া বেড়ায়। বঙ্গবাসিন্‌! একবার প্রগাঢ় ভাষায় কঠোর ভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা কর দেখি।*

—বান্ধব, ১২৮৩

* ১। শরৎ সরোজিনী।
২। হেমলতা—হরলাল রায় প্রণীত।
৩। মহারাষ্ট্র কলঙ্ক—উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।
৪। যৌবনে যোগিনী—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
৫। ভারত-বিজয়—রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত।
৬। জয়পাল—প্রমথনাথ মিত্র প্রণীত।
৭। ভারতের সুখশশী যবনকবলে—নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।
৮। রুদ্রপাল নাটক—হরলাল রায় প্রণীত।
৯। শত্রুসংহার—হরলাল রায় প্রণীত।
১০। প্রণয়ের প্রতিফল নাটক—মোহিনীমোহন ঘোষাল প্রণীত।
১১। প্রকৃত বন্ধু—ব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত।
১২। কুমুদ-কামিনী—রজনীকান্ত শর্মা প্রণীত।
১৩। প্রমোদ-মনোরমা—বিশ্বেশ্বর বসু প্রণীত।
এই কয়েকটি নাটকের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

মৃন্ময়ী*

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

কোন কোন দার্শনিক বিয়োগান্ত আখ্যায়িকাকে দোষবহ এবং অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য-চরিত্রের একটি নিয়ম এই যে, পুনঃ পুনঃ ভাবোত্তেজনে ভাবপ্রাখর্যের হ্রাস হইয়া যায়। যদি সেই ভাব কার্যে পরিণত হইতে পায়, তাহা হইলে ভাবপ্রাখর্য হ্রাস হইয়া যায় বটে, কিন্তু কার্যপারগতা বৃদ্ধি পায়; সুতরাং কোন অনিষ্ট হয় না। ভাবোদ্দীপন হইতে কার্যানুস্মৃতির নিরোধ না হইলে, প্রথমে যে কার্য করিতে প্রখর ভাবোত্তেজনের আবশ্যক হইত, অভ্যাস নিবন্ধন, পরে অতি দুর্বল ভাব হইতেই তাহা সমুৎপন্ন হয়। অবশেষে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন ভাব ব্যতিরেকে অথবা অতি অল্প ভাবেই আমরা কার্য করিতে পারি। সুতরাং ভাবপ্রাখর্যের হ্রস্বতানিবন্ধন কোন ক্ষতি হয় না। বিয়োগান্ত উপন্যাস পাঠে ভাবোত্তেজিত হয় অথচ তাহার কার্য হইতে পায় না—ভাবপ্রাখর্য কমিয়া যায়, কার্যপারগতা বৃদ্ধি হয় না। বিয়োগান্ত উপন্যাস অথবা নাটকের বিরুদ্ধে, এই আপত্তি অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এ আপত্তি সমর্থন করি না।

এ সংসারে আমরা দিবারাত্র শত সহস্র বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহাতে অবশ্য ভাবোদ্রেক হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা হইতে কার্যানুস্মৃতি ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা হইতে যে অনিষ্টাশঙ্কা করি, তাহা মনুষ্য-জীবনে অপরিহার্য। আমাদের নিরর্থক ভাবোত্তেজন এত অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে যে; দুই চারি দশখানা বিয়োগান্ত উপন্যাস পড়া না পড়ায় উল্লিখিত অনিষ্টের ক্ষতি-বৃদ্ধি সম্ভবে না। সাগরগর্ভে যখন শয্যা পাতিয়াছি, তখন শিশিরপাতে অনিষ্টাশঙ্কা করার ন্যায় হাস্যজনক আর কি হইতে পারে?

দ্বিতীয়ত, সংসারে—সুখ-দুঃখময়-মিলন আছে, বিয়োগও আছে। কেবল

---

* মৃন্ময়ী। কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

সুখের ভাগটা দেখাইলে, কেবল মিলনান্ত উপন্যাস লিখিতে হইলে, সংসারের একদেশমাত্র প্রদর্শিত হয়।

তৃতীয়ত, মিলনান্ত উপন্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না—গ্রন্থ বন্ধ করিয়া নায়ক নায়িকাকে ভুলিয়া যাই। তাঁহাদের মিলন হইল, তাঁহারা সুখী হইলেন—আর তাঁহাদের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন কি? বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা পড়িয়া দুঃখিত হই, আপনা ভুলিয়া যাই এবং সে ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। হেলেনার প্রেম, জুলিয়েটের প্রেমাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; কিন্তু এ দুইজনের জন্য পাঠকের মনে যে ভাবোদ্রেক হয়, তাহার অনেক তারতম্য আছে। একখানি গ্রন্থ বন্ধ করি, আর হেলেনাকে ভুলিয়া যাই—সেক্সপীয়রের কবিত্বকে ধন্যবাদ দিই বটে, কিন্তু হেলেনাকে ভুলিয়া যাই। অপর গ্রন্থখানি শেষ করিয়া জুলিয়েটকে ভুলি না—কবিকে ভুলিয়া যাই, কিন্তু জুলিয়েটকে কখন ভুলি না। সেক্সপীয়র কেমন কবি, একথা পাঠকের মনে হয় না; পাঠকের মনে হয়, জুলিয়েট বড় দুঃখিনী!—বড় হতভাগিনী! জুলিয়েটের জন্য আপনার সর্বস্ব দিতে পাঠকের ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ী নহে। জুলিয়েট মন হইতে যায় না, সে ইচ্ছাও মন হইতে যায় না। মানব-হৃদয়ের কোমলতা-সম্পাদনের জন্য, মনুষ্য-জীবনের মহত্ত্ব সাধনের জন্য, এরূপ আত্মানাদর, এরূপ আত্ম-বিসর্জনের ভাব যে হৃদয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহা বাঞ্ছনীয়। পরের দুঃখে আমরা যতটুকু দুঃখিত হইতে পারি, তাহাতে মঙ্গল আছে। সময়ে সে ভাব দুর্বল হইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার কার্যের অবসান হয় না। ক্রমে ঐ ভাব, ঐ পরদুঃখকাতরতা হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ভাবাবেগ মন্দীভূত হইলেও, তন্নিবন্ধন অনিষ্ট হয় না, কেননা যেমন ভাবের বেগ হ্রাস হয়, তেমনই হৃদয়ের কোমলতা বৃদ্ধি হয়। তাহাতেই বলি, বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা আবশ্যক, বাঞ্ছনীয়, আদরণীয়।

অতএব 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার ভাগ লিখিত হইবার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। যখন 'কপালকুণ্ডলা' প্রথম বাহির হইল, তখন অনেক অল্পবুদ্ধি লোকে এরূপ ভরসা করিয়াছিল যে, সত্বরেই ইহার দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইবে। যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন 'কপালকুণ্ডলা' শেষ হইয়াছে। নায়ক-নায়িকার মিলন যে সুখের হইবে না, ভগবতী বিল্বপত্র গ্রহণ না করিয়াই ত তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন; এবং গ্রন্থের আরও দুই এক স্থলে বঙ্কিমবাবু ইহার

আভাসও দিয়া রাখিয়াছেন। তবে দামোদরবাবু গায়ে পড়িয়া মিলন করাইতে আসিলেন কেন?

দামোদরবাবুর গ্রন্থের দোষগুণ সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও বলা হয় নাই। তাহা এক্ষণে বলিতেছি। গ্রন্থখানিতে প্রশংসা করিবার অনেক জিনিষ আছে। স্থানে স্থানে এরূপ মনোহর, হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে যে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ, গ্রাম্যতা-সম্বন্ধবর্জিত এবং উপন্যাসের বিলক্ষণ উপযোগী। রচনাভঙ্গী অধিক স্থলেই প্রশংসনীয় এবং আড়ম্বরশূন্য। সত্যানুরোধে বলিতে হইতেছে, এ গ্রন্থে অনেকগুলি দোষ আছে। লেখক অতি সামান্য হইলে, সে সকল আমরা ধরিতাম না।

এ গ্রন্থে এতগুলি নূতন লোকের সমাগম হইয়াছে যে, ইহাকে আমরা 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার ভাগ বলিতে সম্মত নহি। সকল গ্রন্থেরই নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকা বিধেয়। 'মৃন্ময়ী' যখন 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার ভাগ, তখন কপালকুণ্ডলার কেন্দ্রই মৃন্ময়ীর কেন্দ্র হওয়া উচিত। তাহা হয় নাই। 'কপালকুণ্ডলা'র অনেকগুলি লোক এ ব্যাপারে দেখা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেমন উদাসীন ভাবে। তাঁহারা এ ব্যাপারে লিপ্ত নহেন—কেবল অনুরোধে পড়িয়া, প্রণামীর টাকাটি হাতে করিয়া, যেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে 'মৃন্ময়ী' 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার ভাগ হয় নাই;—যেন একটি নূতন কাহিনী লিখিত হইয়াছিল, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া, 'কপালকুণ্ডলা'র ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'র নায়ক, নবকুমার শর্মা; 'মৃন্ময়ী'র নায়ক, তাঁহার বন্ধু।

নবকুমারকে মৃন্ময়ীর নায়ক বলিতে আমরা সম্মত নহি কেন? উত্তর, দামোদরবাবু তাঁহাকে নায়ক করেন নাই,—সে প্রাধান্য দেন নাই। 'মৃন্ময়ী'তে নবকুমারের কথা এবং কার্য এত অল্প এবং এত সামান্য যে, অনুগ্রহ করিয়াও তাঁহাকে নায়ক বলা যায় না। যেখানে নবকুমারের সহিত দেখা হইল, সেইখানেই দেখিলাম, নবকুমার পরের হাত ধরিয়া হাঁটি হাঁটি পা-পা করিয়া বেড়াইতেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে একবার যখন দেখা দিলেন, তখন, কখনও তাঁহার বন্ধুর হাত ধরিয়া, কখনও চিরপাপিষ্ঠা পদ্মাবতীর উপর ভর দিয়া

আবার যখন জাহাঙ্গীর শাহ পদ্মাবতীর কাছে শেষ বিদায় লইতে আসিলেন, তখন দেখি, নবকুমার শর্মা, "দীনহীন কাঙ্গালের মতন এক পাশে দাঁড়ায়ে" আছেন। 'মৃন্ময়ী'তে নবকুমারের কথা আছে, কিন্তু না থাকিলেও চলিত। বোধ হয়, যেন, নবকুমারের কথা না থাকিলে এ গ্রন্থ, 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার ভাগ বলিয়া পরিচিত হইতে পায় না, এই জন্য নবকুমারকে এখানে ধরিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার, বিদ্বান, ভদ্রলোক, বিজ্ঞ, ধীরপ্রকৃতিক এবং পরোপকারী;—যাহার সঙ্গে পরিচয় হইবে, সেই প্রশংসা করিবে, সেই শ্রদ্ধা করিবে, সেই ভক্তি করিবে। দামোদর বাবুর নবকুমারকে, যাঁহার ভাল লাগে, তিনি প্রশংসা করুন, কিন্তু কেহ কোন কালে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। ইনিও ভদ্রলোক বটেন, কিন্তু এ ভদ্রতা অন্য প্রণালীর।

কথাটা, বোধ করি, পরিষ্কার হইল না। আমরা বুঝাইতেছি। নবকুমারের বন্ধু যখন তাঁহার নিকটে পদ্মাবতীকে পুনর্গ্রহণ করিবার কথাবার্তা কহিলেন, তখন নবকুমার বলিলেন—"পদ্মাবতী যবনী বলিয়া আমার তাদৃশ আপত্তি নাই।" কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুর পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিক আপত্তির কারণ আর কি হইতে পারে? যে নবকুমার কৃতোপকারিণী বিবাহিতা পত্নীকেও সমাজের এবং আত্মীয়-কুটুম্বের মুখাপেক্ষা করিয়া আদর করিতে পারেন নাই, সেই নবকুমারই যে, তাঁহার বন্ধুর অসার যুক্তিতে ভুলিয়া এমন কথা বলিবেন, এ আশা আমরা করি নাই। দামোদর বাবুর মনে থাকিলে থাকিতে পারে যে, আর একদিন যখন পদ্মাবতী নবকুমারের কাছে কাতরভাবে স্নেহভিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন নবকুমার সদর্পে বলিয়াছিলেন—"আমি যবনীজার হইতে পারিব না।"

যে সময়ের এ কাহিনী, সে সময়ে, মুসলমানের একাধিপত্য সত্ত্বেও হিন্দু সমাজ, হিন্দু সমাজই ছিল। সে সময়ে কোন হিন্দু যুবার মুখ হইতে, বিশেষত নবকুমারের ন্যায় লোকের মুখ হইতে, এরূপ অত্যাশ্চর্য চমৎকার সভ্যতার কথা বাহির হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। পদ্মাবতী অনুতাপ করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু অনুতাপের উপর এতটা ভর দেওয়া ভাল নহে।

পদ্মাবতী নবকুমারের পত্নী ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে কি?-ধর্মভ্রষ্টা, সমাজচ্যুতা, মুসলমানী, মুসলমানের উপপত্নী, মুসলমানের পরিত্যক্তা উপপত্নী।

এমন পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিতে ভদ্রলোকে পারে না। বঙ্কিমবাবুর নবকুমার পারেন নাই। তারপর, প্রত্যাখ্যানের কারণ বৃদ্ধি হইয়াছে বৈ কমে নাই। পদ্মাবতীর ষড়যন্ত্রেই নবকুমার প্রাণাধিকা পত্নীকে হারাইয়াছেন। যে মৃন্ময়ী আসন্ন মৃত্যু হইতে নবকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, যে মৃন্ময়ীকে বিবাহ করিয়া নবকুমার জীবন আলোকিত করিয়াছেন, যে মৃন্ময়ীকে হারাইয়া নবকুমারের জীবন অন্ধকার হইয়াছে, সেই মৃন্ময়ীর প্রাণনাশের যে কারণ, তাহাকে কি নবকুমার ভালবাসিতে পারেন? দামোদর বাবুর নবকুমার মানুষ নহেন;—তিনি হয় দেবতা, না হয় পিশাচ।

আবার যে দিন জাহাঙ্গীর বাদশাহ, লুৎফ উন্নিসাকে দেখিবার জন্য সপ্ত-গ্রামে আসিলেন সে দিন নবকুমার আরও ভদ্রতার পরিচয় দিলেন। উপপতির সঙ্গে গোপন কথাবার্তা কহিবার জন্য পদ্মাবতী স্বামীকে (নবকুমারকে) তফাৎ হইতে বলিলেন। নবকুমারও বিনাবাক্যব্যয়ে-বোধ করি, কর্তব্যানুরোধে উঠিয়া গেলেন। তারপর আবার বেশ পরিষ্কার ভাবে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে পদ্মাবতী-সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তাও কহিলেন, জাহাঙ্গীর পদ্মাবতীকে কেমন ভালবাসেন, তাহা বসিয়া বসিয়া শুনিলেন। নবকুমার নিরীহ লোক হইতে পারেন, কিন্তু ভদ্রলোক কখনই নহেন।

দামোদর বাবুর হাতে পড়িয়া, নবকুমার শর্মা যেমন বিকৃত হইয়াছেন, তেমনি অনেকে হইয়াছেন। পদ্মাবতীতে কই আর সে গর্ব নাই। যে গর্ব, প্রেমভিক্ষা করিতে আসিয়া, প্রাণাধিকের পদপ্রান্তে লুটাইতে লুটাইতেও গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে গর্ব মুছিয়া গিয়াছে। সময়ে, শোকে, দুঃখে, প্রণয়ে, মনুষ্যহৃদয় পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু একেবারে "মূলেই ভুল" হইয়া যায় না। আবার যে পদ্মাবতী আপন মুখে পেশমনের কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আতাউল্লা হইতে জাহাঙ্গীর বাদশাহ পর্যন্ত যত উপপতি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কাহাকেও ভালবাসেন নাই, সেই পদ্মাবতীই আবার জাহাঙ্গীরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যেমন তেমন ভালবাসা নয়, একেবারে যা-নয়-তাই-গোছ হইয়া উঠিয়াছে। আইভ্যান্‌হোর সম্বন্ধে রেবেকা যাহা ভাবিয়াছিলেন; জগৎ সিংহকে আয়েষা যাহা বলিয়াছিলেন; প্রতাপকে শৈবলিনী যাহা বলিয়াছিল, পদ্মাবতী—যে পদ্মাবতী জাহাঙ্গীরকে সিংহাসন-বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই, সেই পদ্মাবতী—

জাহাঙ্গীরকে তাহাই বলিতেছেন। সে কথার মর্ম এই ;—তোমায় আর দেখা দিব না ; তুমি আর আমায় দেখিতে চাহিও না, চিঠিপত্র লেখালেখিরও আর প্রয়োজন নাই, কেন না আমার ন্যায় স্নেহশালিনী রমণীর বেগবান হৃদয়কে বিশ্বাস নাই।

কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির ছবি অবিকল চিত্রিত হওয়া উচিত। তাহার ব্যভিচারে পাপ আছে। ভবিষ্যতে লোকে ভ্রমে পতিত হইতে পারে। দামোদরবাবুর গ্রন্থ পড়িয়া ভবিষ্যতে কাহারও ভ্রম জন্মিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু এমন কার্য দোষাবহ। পদ্মাবতীকে আগ্রা হইতে শেষ বিদায় দিবার সময় জাহাঙ্গীর শাহ্ অজস্র অশ্রুপাত করিযাছেন, এবং "বঁধু আমি তোমা বই আর কার নই" রকমের অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা স্পষ্ট বুঝিয়াছি, জাহাঙ্গীর শাহ্ পদ্মাবতীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, তাহাকে ছাড়িবার লোক জাহাঙ্গীর শাহ্ ছিলেন না। ছাড়িয়া দিলে, পদ্মাবতী সুখী হইতে পারে সত্য ; কিন্তু পরের সুখের মন্দিরে আত্মসুখকে বলি প্রদানের মহত্ত্ব জাহাঙ্গীরের ছিল না। তিনি নূরজাহানের রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে আপন আয়ত্ত করিবার জন্য, তাহার স্বামীকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই,—তেমন উন্নত-চরিত্রের লোক তিনি ছিলেন না। তিনি মনে করিলেই পদ্মাবতীকে আয়ত্তে রাখিতে পারিতেন। তবে যে দেহবদ্ধ-ভোগাসক্ত জাহাঙ্গীর শাহ্ ইচ্ছাপূর্বক অভিলাষের ধনকে, বিলাসের উপকরণকে, প্রিয়তমা বেগমকে, অপরকে বিলাইয়া দিলেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দামোদরবাবুর গ্রন্থে জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া, তাঁহাকে ইতিহাসের জাহাঙ্গীর শাহ্ বলিয়া আমরা চিনিতে পারিলাম না।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এ সমালোচনা শেষ করিব। গ্রন্থকারের সহৃদয়তা নাই। নবকুমার শর্মা এমন কি মহাপাতক করিয়াছিলেন যে, দামোদরবাবু তাঁহাকে পদ্মাবতীর প্রণয়াসক্ত করাইলেন? পুণ্যবানের অধঃপাত দেখিলে আমাদের বড় দুঃখ হয়। আবার পদ্মাবতী এমন কি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন যে, তিনি অসৎভাবে যৌবন অতিবাহিত করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে স্বামীপ্রেম লাভ করিলেন। পাপের দণ্ড হওয়া উচিত। পদ্মাবতী দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, দুই চারিবার 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' বলিয়াছেন, তাহা জানি ; চক্ষের জল যে ভাল জিনিষ, 'প্রাণনাথ' বেশ সরস কথা, তাহাও জানি ; কিন্তু ইহাতে আজীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

আপন হৃদয়ের পবিত্রতায়, একজনকে অযথা ভালবাসিয়াছিল বলিয়া, বিশুদ্ধমতি আলিস* আঠারো বৎসরকাল কাঁদিল—সুখের সমাধির উপর বসিয়া সমস্ত যৌবন বুকের ভিতর জ্বলন্ত হুতাশন বহিল; অযথা ভালবাসিয়াছিল বলিয়া সরলা কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়া মরিতে হইল; অযথা ভালবাসিয়া শৈবলিনী জাগিতে ঘুমাইতে, বুকে করিয়া নরক বহিল। আর পদ্মাবতী, আজীবন পাপহ্রদে ডুবিয়া থাকিয়াও, শেষে স্বর্গে গেল। পতিব্রতার মাহাত্ম্য, অপবিত্রতার নীচতা যিনি বুঝেন না, তাঁহার রুচির প্রশংসা করিব না। ধর্মাধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যিনি জানেন না, তাঁহাকে সহৃদয় বলিব না। পাপের জয় দেখিতে আমরা নারাজ। যে গ্রন্থকার এ সকল দেখাইতে আসেন, তাঁহার উপর আবার ততোধিক নারাজ।

—জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮১

* A character in Lord Lytton's Alice or the Mysteries.

বিষবৃক্ষ

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ

(১)

যে গুণে বঙ্কিমবাবু বঙ্গীয় আখ্যায়িকা-লেখকদিগের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছেন, যে গুণে তিনি বঙ্গের প্রতিগৃহের প্রতিহৃদয়ের উপাস্যদেবতা-স্বরূপ হইয়াছেন, তাহা চরিত্র-চিত্রণ। আভ্যন্তরীণ চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার ক্ষমতা অসীম। বাল্মীকি ও ব্যাস, ভবভূতি ও কালিদাস, এবং বাণভট্টের পর ভারতে এরূপ চিত্রকর অল্পই জন্মিয়াছে। কিন্তু যে চিত্রে তিনি এই অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ের একটি মাত্র ভাবের। যে ভাবে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ভাবের। যে ভাবে পিশাচ-পিশাচীও দেব-দেবী হয়, সেই ভাবের। মানুষের সুখ ও দুঃখের প্রধান নিয়ন্তা, সেই প্রণয়-ভাবের চিত্রণেই বঙ্কিমবাবুর বিশেষ পারদর্শিতা। সেই প্রণয়ের বিভিন্ন বিভিন্ন আবর্ত্তনে মনুষ্য-হৃদয়ে যে সকল তরঙ্গ উত্থিত হয়, বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকাগুলিতে তাহাই পরিব্যক্ত। তাঁহার আয়েষা ও তিলোত্তমা, মৃণালিনী ও মনোরমা, কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতী, শৈবলিনী ও দলনী, সূর্য্যমুখী ও কুন্দ, বিমলা ও পশুপতি, নবকুমার ও নগেন্দ্র, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর, অমরনাথ ও শচীন্দ্র—সমস্তই প্রণয়ের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রতিকৃতি। বঙ্কিমবাবু সেক্সপীয়ার, সিলার, ফিলডিং প্রভৃতির ন্যায় প্রতিহিংসা, দ্বেষ, দুরাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি অসংখ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ; এবং স্বজাতি-প্রেম, মানব-প্রেম, দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মানবহৃদয়ে যে অসংখ্য বিবর্ত উত্থিত হয়, মানব কর্তৃক যে সকল কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার চিত্র দেখান নাই বটে ; কিন্তু প্রণয়কে ভারতচন্দ্রের জঘন্য ইন্দ্রিয়পরতা হইতে উত্তোলিত করিয়া অতি উচ্চ ও পবিত্র স্বর্গীয় সিংহাসন সংস্থাপিত করিয়া, বঙ্গদেশে অতর্কিতভাবে একটি চমৎকার নৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকা প্রচারিত হওয়ার পর অল্প বঙ্গীয় নরনারীকে বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালীর কুৎসিত প্রেমচিত্রের অনুশীলন করিতে দেখা যায়।

মনুষ্য-জাতিকে উন্নত করার প্রধান উপায় প্রণয়। ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না। যিনি লোককে পবিত্র ও নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে শিখাইতে পারেন—তিনি জগতের একজন প্রধান শিক্ষক ও মঙ্গলদাতা। যে সূত্রেই হউক, আত্মবিসর্জন-শিক্ষা একবার আরম্ভ হইলে, তাহা আধার হইতে আধারান্তরে ক্রমেই প্রসৃত হইয়া পড়ে। প্রণয়-মাহাত্ম্যে যিনি একবার একজনের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, অন্যের জন্য আত্মবিসর্জন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইয়া দাঁড়ায়। যিনি সেই আত্মবিসর্জন, শিক্ষা দেন, তিনি মানবজাতির পরম বন্ধু সন্দেহ নাই। এই জন্যই আমরা বঙ্কিমবাবুকে বঙ্গীয় যুবক-যুবতীর প্রিয় বন্ধু ও প্রধান শিক্ষক বলিয়া মনে করি।

যৌবনের প্রারম্ভে যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল উত্তেজিত হয়, তখন বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকাসকল যুবক-যুবতীগণের জঘন্য ভোগলালসা হইতে আত্মবিস্মৃতিতে ও আত্মবিসর্জনে লইয়া যায়, যাহাকে ভালবাসি, তাহার সহিত সম্ভোগের ইচ্ছা হইতে, তাহার সুখের জন্য আত্মসুখ বলিদান দিতে অগ্রসর করে। হৃদয়ের সেই দুর্বলতার সময় এরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়।

শাস্ত্রকর্তার কঠোর নিয়ম, ও ধর্মোপদেষ্টার দুর্লজ্ঘ্য শাসন লোকের মনকে ভোগলালসা হইতে ফিরাইতে সকল সময় সমর্থ হয় না। কারণ প্রণয়বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা তাঁহাদিগের লক্ষ্য। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর লক্ষ্য ভোগ-লালসার মূলে কুঠারাঘাত করা; প্রণয়-বৃত্তির মূলে নহে। বঙ্কিমবাবু জানেন যে, প্রণয় মানুষকে দেবতা করে, আত্মবিস্মৃত করে, পরসুখে আত্মবিসর্জন করিতে শিখায়। প্রণয় যত পরিপুষ্ট হইবে, ততই জগতের মঙ্গল; ভোগ-লালসাই মানুষের যত অনিষ্টের মূল; ভোগলালসা হইতেই তাঁহার "বিষবৃক্ষ"-এর সৃষ্টি। সুতরাং ভোগলালসার সংযমন করিতে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার আখ্যায়িকাসকলের নৈতিক উদ্দেশ্য। "বিষবৃক্ষ"-এ এই নৈতিক লক্ষ্য বিশেষরূপে প্রতিভাত। নগেন্দ্রের ভোগলালসা দমন করার শিক্ষার অভাবই বিষবৃক্ষের অঙ্কুর। বঙ্কিমবাবু যে কয়খানি আখ্যায়িকা রচনা করিয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "বিষবৃক্ষ" আমাদিগের

মতে সর্বোৎকৃষ্ট। ভাবের গভীরতায় ও রচনার শিল্প-পরিপাট্যে ইহা বঙ্গ-ভাষায় প্রতিদ্বন্দ্বি-রহিত।

এই চিত্রপটে ছয়টি ছবি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। দুইটি পুরুষের—নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রের; চারিটি স্ত্রীলোকের- সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি ও হীরার। শ্রীশ এ পুষ্পস্তবকের নবীন পল্লবমাত্র। আমরা এই প্রকাণ্ড গ্রুপ হইতে এক একটি করিয়া কয়টি ছবির স্বতন্ত্র ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের সৌন্দয দেখাইয়া পাঠকদিগকে পরিতৃপ্ত করিব।

(২) সূর্যমুখী

সূর্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা প্রতিবাক্যে পরিব্যক্ত। "পৃথিবাতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, ত সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী, পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; * * * পৃথিবীতে আমার যদি কোন কিছু অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ।" "তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল। তুমিই আমার পরকাল, তোমার কাছে কেন লুকাইব? কখন কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন একজন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব?" এই সকল বাক্যের প্রতি অক্ষরে নগেন্দ্রময়তা দেদীপ্যমান।

সূর্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা শেষে, আত্মোৎসর্গে ও আত্মবিসর্জনে পরিণত হইয়াছিল। নগেন্দ্রের স্বার্থ, নগেন্দ্রের সুখ, নগেন্দ্রের জ্ঞান হইতে সূর্যমুখীর স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র সুখ ও স্বতন্ত্র জ্ঞান ছিল না। "তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না।" এইখানে আত্মজ্ঞানের অপলাপ। "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি—তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই";—"আমার সর্বস্বধন। তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?" "আমি কে? একবার তোমার দাদাকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস; তখন জানিবে তোমার দাদা আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিবে? যাঁহার একদণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে,

দেখিলাম, দিবারাত্র তাঁর মর্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি রহিল? বলিলাম, 'প্রভো! তোমার সুখেই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,—তাই বিবাহ করিয়াছেন'।"—এইগুলি আত্মস্বার্থ ও আত্মসুখ জীবিত-সর্বস্ব নগেন্দ্রের চরণে উৎসর্গ করার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। বাল্মীকির সীতা ও ব্যাসের সাবিত্রী ভিন্ন আর কোন আর্য কবির মানসী কন্যা আত্মোৎসর্গের এরূপ পরিচয় দিয়াছেন কি না জানি না।

নগেন্দ্র সূর্যমুখীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মানুষে যেমন দেবতাকে সর্বোৎকর্ষের আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করে, সূর্যমুখী সেইরূপ নগেন্দ্রকে সর্বোৎকর্ষের আদর্শ বলিয়া জানিতেন। নগেন্দ্র তাঁহার চক্ষে অপাপবিদ্ধ, দোষস্পর্শশূন্য একটি আদর্শ পুরুষ। সূর্যমুখী যখন পত্রে কমলমণির নিকট আপনার হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিতেছেন—তখন পাছে সেই যাতনা-প্রদাতার উপর কমলমণির ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, পাছে কমলমণি ভাবেন, সূর্যমুখী আত্মযাতনা ব্যক্ত করিয়া যাতনা-প্রদাতাকে প্রকারান্তরে তিরস্কার করিতেছেন—এই আশঙ্কায় সূর্যমুখী লিখিলেন, "তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক কখনও করিতে পারে না।"

নগেন্দ্র যখন সূর্যমুখীকে পায়ে ঠেলিলেন, তখনও সূর্যমুখী ভাবিয়া নগেন্দ্রের দোষ পাইলেন না, আত্ম-অদৃষ্টের উপরও সন্দেহ করিতে পারিলেন না—কমলকে বলিলেন, "আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য, সম্পদ্—সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?" সূর্যমুখী আপনার দুঃখের কারণ নগেন্দ্র ও নিজ অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছু স্থির করিলেন।

নগেন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর গুণবানের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া সূর্যমুখীর বোধ ছিল না। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কমলমণির নিকট বিদায়-গ্রহণ-কালে রোদন করিতে করিতে সতীশকে আশীর্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয়গুণে গুনবান্ হ'ও। ইহার বাড়া আশীর্বাদ আমি আর জানি না।"

স্বামীর প্রেমই সূর্যমুখীর ইহকাল ও পরকাল। যে দিন সেই স্বামি-প্রেমে বঞ্চিত হইলেন—যে সময় তিনি নগেন্দ্রের মুখে শুনিলেন, “তোমাতে আমার আর সুখ নাই। *** আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—” সেই দিন সেই সময় সূর্যমুখীর হৃদয়ে শেল বিঁধিল, তিনি বলিলেন, “যাহা তোমার মনে থাকে, থাক—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে।” এতদিনে সূর্যমুখীর আত্মস্মৃতি বলবতী হইল। এতদিনে সূর্যমুখী জানিলেন, নগেন্দ্র হইতে সূর্যমুখী পৃথক্—সূর্যমুখীর সুখ আর নগেন্দ্রের সুখ এক নহে। তখন সূর্যমুখী নগেন্দ্র যে সুখের প্রত্যাশী তাঁহাকে সেই সুখে সুখী করিয়া দেশত্যাগিনী হইলেন। যাইবার সময় একখানি পত্রে মনের কথা সমস্ত লিখিয়া কমলমণির জন্য রাখিয়া গেলেন। এই পত্রখানিতে সূর্যমুখীর তদানীন্তন হৃদয়ের ছবি সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত। পত্রখানি এই :—

“যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনে মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখন পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব। কেন না আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

“কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সেই সুখ দুই একদিন চোখে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। ** আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

*   *   *   *

“তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। ** তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই ; কখন তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখন করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ

হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি তাহাই রহিল, যতদিন না মাটিতে এ মাটি মিশায়, ততদিন থাকিবে; কেন না তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমারও কাছে জন্মের মত বিদায় লইলাম * * * আরও আশীর্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আমায় এ আশীর্বাদ কেহ করে নাই।"

এই পত্রে সূর্যমুখীর বলবতী আত্মস্মৃতি ও প্রবল আত্মজ্ঞান জাজ্জ্বল্যমান। যতদিন সূর্যমুখী নগেন্দ্রের আদরিণী ছিলেন, ততদিন এ পৃথিবী সূর্যমুখীর নিকট স্বর্গ বোধ হইয়াছিল এবং নগেন্দ্র সেই স্বর্গের দেবতা বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন; ততদিন সূর্যমুখী নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলেন; নগেন্দ্রের জীবনে, ও নগেন্দ্রের সুখে—তাঁহার জীবন, ও তাঁহার সুখ বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তখন তিনি জানিতেন যে নগেন্দ্রকে সুখী করিতে পারিলেই তাঁহার সুখ, কারণ নগেন্দ্র তাঁহারই, সুতরাং নগেন্দ্রের সুখ তাঁহারই সুখ! এই জন্য তিনি নগেন্দ্রের সুখবর্ধনে নিরত ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল—আত্মস্মৃতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। তিনি দেখিলেন নগেন্দ্র যাহাতে সুখী, সে সূর্যমুখী নহে—কুন্দনন্দিনী। তিনি নগেন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন বলিয়া নগেন্দ্রের সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিলেন—দেখিয়া পরিতৃপ্তি জন্মিল। এতদিন নগেন্দ্রের সুখ দেখিয়া সূর্যমুখীর পরিতৃপ্তি জন্মে নাই, কারণ এতদিন সে সুখের অর্ধাংশভাগিনী তিনি স্বয়ং ছিলেন। আজ পরিতৃপ্তি জন্মিল, কারণ আজ সে সুখের অর্ধাংশভাগিনী কুন্দ। আজ সূর্যমুখী গৃহত্যাগিনী, কারণ আজ নগেন্দ্রের স্বার্থ—সূর্যমুখীর স্বার্থ নহে। এতদিন পরে আজ সূর্যমুখী নগেন্দ্রের সহস্র গুণের সহিত একটি দোষ দেখিলেন, কারণ আজ নগেন্দ্র তাঁহার প্রতি বিমুখ! আজ সূর্যমুখীর নগেন্দ্রময়তার সহিত তাঁহার স্বার্থপরতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। স্বার্থপরতা বিজয়িনী হইল—সূর্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইলেন। কি স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে সূর্যমুখী গৃহত্যাগিনী

হইলেন? নিজের সুখ? না—কারণ নগেন্দ্র বিনা সূর্যমুখীর সুখ কোথায়? তবে কি জন্য? নিজের সুখের ব্যতিঘাতে পরের সুখের উৎপত্তি দেখিতে অসমর্থতা নিবন্ধন। আজ সূর্যমুখী কি নগেন্দ্র-সুখদর্শন-কাতরা হইয়াছিলেন? না—নগেন্দ্রের সুখ তিনি অম্লান-বদনে দেখিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সে সুখের সহিত কুন্দের সুখ তাঁহার অসহনীয়। যে সপত্নী-দ্বেষ স্ত্রী-সাধারণে বিদ্যমান, সূর্যমুখীর অপার্থিব হৃদয় সে পার্থিব ভাবকে আজ জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। এ পরাজয়ের কারণ আত্মবিশ্লিষ্টভাবে নগেন্দ্রকে ভালবাসা তাঁহার কখনই শিক্ষা হয় নাই। যখনই তিনি নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছেন, তখনই জানিতে পারিয়াছেন—নগেন্দ্র তাঁহার। নগেন্দ্র তাঁহার ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারেন—এ ভাব ইহার পূর্বে সূর্যমুখীর মনে আর কখনও উদিত হয় নাই। এজন্য সহসা এ ভাব-পরিবর্তন তাঁহার অসহনীয় হইল।

আয়েষা যখন জগৎসিংহকে প্রথম দেখেন, তখন হইতেই তিনি জানিতেন, জগৎসিংহ হিন্দু, তিনি নবাবদুহিতা; জগৎসিংহ তাঁহার নহেন এবং কখনও হইতেও পারেন না। এই জন্য তিনি যখন মনে মনে জগৎসিংহকে পতিত্বে বরণ করেন, তখনই প্রস্তুত হন যে এ জীবন জগৎসিংহকে শুদ্ধ ভালবাসিয়াই অতিবাহিত করিবেন—এ প্রেমের প্রতিদান পাইবেন না। আশা ছিল না বলিয়াই আয়েষার স্বর্গীয় প্রেমের সহিত পার্থিব ভাবের কখন কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। সূর্যমুখীর আশা ছিল, এবং তাঁহার মনে আশা-ভঙ্গের সম্ভাবনা পর্যন্তও কখন উদিত হয় নাই, এই জন্য আশাভঙ্গে যে চিত্তস্থৈর্যের আবশ্যকতা—তাঁহার তাহা শিক্ষা হয় নাই। এই জন্য নগেন্দ্রের সহিত কুন্দকে সংশ্লিষ্ট দেখিয়া আশাভঙ্গে আজ তিনি গৃহত্যাগিনী হইলেন। এই জন্য আজ জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-সমাগমে আয়েষার ন্যায়, সূর্যমুখী নগেন্দ্র-কুন্দ-সমাগমে চিত্তের গাম্ভীর্য ও স্থৈর্য দুই দিনের অধিক রক্ষা করিতে পারিলেন না। নিঃস্বার্থ ও নিরাশ প্রণয়ের যে স্বর্গ হইতেও উচ্চতর ভাব, স্বর্গের সুখ অপেক্ষাও পবিত্রতর সুখ, আজ সে ভাবে ও সে সুখে, তিনি বঞ্চিত হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন দেব-ভাব-পূর্ণ আয়েষার নিকট দেব-মানব-ভাব-পূর্ণ সূর্যমুখী আজ পরাস্ত হইলেন। নিরভিসন্ধি ধর্মের নিকট স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ধর্ম আজ পরাজিত হইল। এই পরাজয় হইতেই উপন্যাসের অবশিষ্ট ঘটনা প্রসূত। সূর্যমুখীর গৃহ-ত্যাগ, তদনুসন্ধানার্থ নগেন্দ্রের দেশপর্যটন, নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর অশেষ কষ্ট যন্ত্রণা,

সূর্যমুখী-প্রেম-প্রাবল্যে নগেন্দ্রের কুন্দের প্রতি অনাদর, সেই অনাদরে কুন্দের বিষপান - এই সমস্ত ঔপন্যাসিক ঘটনাই এই পার্থিব ভাবের নিকট স্বর্গীয় ভাবের পরাজয়ের ফল। যদি সূর্যমুখী নিরাশ ও নিরাকাঙ্ক্ষ প্রণয়ের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা হইলে শুদ্ধ নগেন্দ্রকে দেখিয়াই তাঁহার অতুল আনন্দ জন্মিত। নগেন্দ্রের সুখ দেখিয়া তাঁহার পর্যাপ্তি বোধ হইত না; তিনি গৃহে থাকিয়া শুদ্ধ নগেন্দ্রকে দেখিয়াও সুখী হইতেন, এবং নগেন্দ্রের সুখে নিজ হৃদয় ভরিয়া ফেলিতেন; সে সুখ ছাড়িয়া তিনি কখনই গৃহত্যাগিনী হইতেন না। তিনি সীতার ন্যায় বলিতেন, "আমাকে সামান্য প্রজাভাবে দেখিলেও আমি চরিতার্থ হইব"।[১] তাহা হইলে নগেন্দ্রের বৈরাগ্য অবলম্বন করার প্রয়োজন হইত না, কুন্দকেও বিষপান করিতে হইত না। কিন্তু তাহা হইলে সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, কুন্দ, কমলমণি ও হীরা এ কয়টি চিত্রই অপরিপুষ্ট থাকিত; ঘটনা-বৈচিত্র্যাভাবে কবির অপূর্ব সৃষ্টি 'বিষবৃক্ষ' একটি সামান্য উপন্যাসরূপে পরিণত হইত।

নগেন্দ্রের সহিত সূর্যমুখীর অনেকদিন দেখা না হওয়ায় সূর্যমুখীর আত্মস্মৃতি আবার বিলুপ্ত হইল। নগেন্দ্রময়-জীবিতা সূর্যমুখী আবার আত্ম ভুলিয়া নগেন্দ্র-ধ্যানে নিরতা হইলেন। এবার সূর্যমুখী আত্মবিশ্লিষ্ট ও অন্যসংশ্লিষ্ট ভাবে নগেন্দ্রকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। এবার ভালবাসার প্রতিদান-নিরপেক্ষ হইয়া সূর্যমুখী নগেন্দ্রকে ভালবাসিতে লাগিলেন। তিনি নগেন্দ্রের হৃদয়েশ্বরী না হইতে পারেন, কিন্তু নগেন্দ্র ত তাঁহার হৃদয়েশ্বর - এই ভাবে তিনি এবার হৃদয়ে নগেন্দ্র-পূজা আরম্ভ করিলেন। সূর্যমুখী এখন কেবল নগেন্দ্রের দর্শনমাত্র-পিপাসু হইলেন। নগেন্দ্র যাহারই হউন না কেন, নগেন্দ্র-দর্শনেই সূর্যমুখীর স্বর্গলাভ। সূর্যমুখী পাতিব্রত্য-ধর্মজনিত পুণ্যের একমাত্র ফলস্বরূপ নগেন্দ্র-দর্শনের ভিখারিণী হইলেন। তিনি ব্রহ্মচারীর পত্র প্রেরণের পর হৃদয় ভরিয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি

১ নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ স এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া॥

—রঘুবংশম্ ১৪, ৬৭

পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।”

সূর্যমুখী পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। নগেন্দ্র-দর্শনলালসা তাঁহাতে এরূপ প্রদীপ্ত হইল যে, তিনি ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে করিয়া গোবিন্দপুরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে নগেন্দ্র তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নগেন্দ্র সূর্যমুখী-কক্ষে শয়ান, দীপ নির্বাণোন্মুখ, এই অবস্থায় ছায়ারূপে নগেন্দ্রকে দেখা দিলেন। মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের পর হঠাৎ পুনর্দর্শনে আনন্দাতিশয্যে নগেন্দ্রের শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে—এই ভাবে সূর্যমুখী কবির অদ্ভুত কৌশলে কেমন ধীরে ধীরে নগেন্দ্রের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, যে তিনি মরেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উপস্থিত—“উঠ! উঠ! আমার জীবনসর্বস্ব! মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ! উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।

বিচ্ছেদে সূর্যমুখীর ঈর্ষ্যানল নির্বাপিত হইয়াছিল, আত্মবিশ্লিষ্টভাবে নগেন্দ্রকে ভালবাসিতে শিখায়, কুন্দের অস্তিত্ব আর সূর্যমুখীর ক্লেশকর বোধ হইল না। যে সূর্যমুখী গৃহ-পরিত্যাগকালে কমলকে লিখিয়া গিয়াছিলেন, “কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না এবং আমার সন্ধানও পাইবে না,” সেই সূর্যমুখী আজ গৃহে প্রত্যাগতা হইয়া কমলের কানে কানে বলিলেন, “চল, তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এক কনিষ্ঠা ভগিনী।”

যে সূর্যমুখী একদিন কুন্দকে স্বামিপ্রেমের অংশ দিতে কাতর হওয়ায়, “আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, যে আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।” —পতিপরায়ণতার এই অলৌকিক ভাব ব্যক্ত করার পরও, কমলমণি কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, “তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?”—

সেই সূর্যমুখী আজও কুন্দকে লইয়া স্বামীর ঘর করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নায়িকা কুন্দের প্রতি পাঠকবর্গের মনকে অধিকতর শোকপ্রবণ করিবার জন্য এবং কবির অলৌকিক মানসী কন্যা সূর্যমুখীও পাছে কুন্দ সহ একত্র সহবাস নিবন্ধন স্ত্রীসুলভ বিদ্বেষাদির বশবর্তিনী হইয়া স্বর্গীয় ভাব হইতে বিচ্যুত হন—এই জন্য কবি সূর্যমুখীর গৃহে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই স্বস্পষ্টা ও স্বহস্ত-পালিতা অনাথিনী কুন্দকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। অপার্থিব সূর্যমুখী নগেন্দ্রের নিকট রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকা বয়স হইতে মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।" অবিদ্বেষের ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই চিত্তসংযম আর কিছুদিন পূর্বে ঘটিলে, সূর্যমুখীর চরিত্র-শশধর নিষ্কলঙ্ক থাকিত, এবং সূর্যমুখীর স্বর্গীয় ভাব বিন্দুমাত্রও পার্থিব-ভাব-মিশ্রিত হইত না। সূর্যমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্দের নিকট গিয়া কথঞ্চিৎ রোদন সম্বরণ করিয়া কুন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক! আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করি।" ইহা অপেক্ষা আদর্শ সতীর প্রার্থনা আর কি হইতে পারে?

(৩) কুন্দনন্দিনী

সূর্যমুখী সতত-ভুক্ত-ক্ষণমাত্র-বিচ্ছিন্ন অসীম ও অনন্ত প্রেমের ছবি, কুন্দ সতত-নিরাশ-ক্ষণমাত্র-গভীর ও অতলস্পর্শ প্রেমের প্রতিকৃতি। সূর্যমুখী চিরদিন স্বামিসোহাগিনী ছিলেন, কুন্দছায়ায় সে সোহাগ কেবল কয়দিন মাত্র আবরিত হইয়াছিল; কুন্দ কয়দিন মাত্র নগেন্দ্র-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। অভাগিনীর জীবন চিরদিনই নিরাশ-প্রণয়ের অন্তর্দাহে ভস্মীভূত হইয়াছিল। সূর্যমুখী গৃহিণী, আদরিণী, সকল বিষয়েই তাঁহার অধিকার; কুন্দ নিরাশ্রয়া,- নগেন্দ্র-প্রতিপালিতা অনাথা বিধবা, সুতরাং নগেন্দ্র-প্রাপ্তির আশাও হৃদয়ে লালিত করিতে অক্ষম। অথচ ধীরে ধীরে বালিকার সেই হতাশ হৃদয়ে নগেন্দ্রপ্রেম অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। সরলা সংসারানভিজ্ঞা বালিকার হৃদয়ও প্রেমের অস্পৃশ্য নহে। বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় সরলা

নগেন্দ্রপ্রেমানলে ঝাঁপ দিলেন। নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ দেবমূর্তি কুন্দের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। দেব যেমন মানবীর অলভ্য ও উপাস্য, নগেন্দ্রও কুন্দের নিকট সেইরূপ অলভ্য ও উপাস্য মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেন। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর হৃদয়াকাশের চন্দ্র, কুন্দের হৃদয়াকাশের সূর্য। সূর্যমুখী নগেন্দ্রের সহস্র গুণের সহিত একটি কলঙ্করেখাও দেখিতে পাইতেন; কিন্তু নগেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যে কুন্দের দৃষ্টি প্রতিহত হইত। সূর্যমুখী প্রাণ ভরিয়া নগেন্দ্রকে দেখিতেন, যতবার দেখিতেন অমৃতরসে অভিসিঞ্চিত হইতেন, কুন্দদৃষ্টি নগেন্দ্রকে ধারণা করিয়া উঠিতে পারিত না। সূর্যমুখী তুলনা করিয়া নগেন্দ্রকে পুরুষরত্ন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কুন্দ পৃথিবীতে নগেন্দ্রের তুলনা আছে বলিয়া জানিতেন না। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর পূজ্য আদর্শ পুরুষ, কিন্তু কুন্দের উপাস্য দেবতা। দেবচরিত্র যেমন মানবের অনালোচ্য, নগেন্দ্রচরিত্র সেইরূপ কুন্দের অনালোচ্য ছিল, নগেন্দ্রের দোষ-গুণ-গ্রাহে কুন্দের কখন সাহস হয় নাই। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর আদর্শ মানব, সুতরাং নগেন্দ্রের সহস্র গুণ ও একটি দোষও সূর্যমুখীর পর্যবেক্ষণ এড়াইতে পারে নাই। সূর্যমুখীর নগেন্দ্র-প্রেম প্রধানত বুদ্ধি-বৃত্তিমূলক। কুন্দের নগেন্দ্র-প্রেম সর্বথা হৃদ্বৃত্তি-মূলক। সূর্যমুখী জানিতেন নগেন্দ্রকে তিনি কেন এত ভালবাসেন—নগেন্দ্রের যত গুণ এত গুণ মানবে দুর্লভ; কিন্তু কুন্দ জানিতেন না যে নগেন্দ্রের প্রতি তাঁহার হৃদয় কেন এত অনিবার্য বেগে আকৃষ্ট হয়—কুন্দবুদ্ধি নগেন্দ্রকে দেখিলে জড়ীভূত হইয়া নগেন্দ্রের দোষগুণ বিচারে অসমর্থা হইত। 'প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ-ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জন, ইহা দ্বারা বঙ্কিমবাবু যে প্রণয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—এবং ভবভূতি "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরণুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যদ্‌ বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নাহার্যো রসঃ। কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণয়তে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্ * * *" 'যে, প্রেম সুখ ও দুঃখ এবং সকল অবস্থায় অবিচলিত, যাহাতে হৃদয়ের বিশ্রাম, বার্ধক্যে যাহার বিলয় নাই; যে প্রেম বহুকাল-সংসর্গে লজ্জাভয়াদি সঙ্কোচকারণের অপগমনে স্নেহসারে পরিণত হয়'—এই শ্লোকে ভবভূতি যে প্রণয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, সূর্যমুখীর নগেন্দ্র-বিষয়ক প্রেম সেই প্রেম। আর—"ভূয়সা জীবিধর্ম এষ যদ্রসময়ী কস্যচিৎ ক্বচিৎ প্রীতিঃ * * তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধং প্রেমাণমামনন্তি।

অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া। স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তর্মর্মাণি সীবতি॥" দেখিতে 'পাওয়া যায় কাহার প্রতি কাহারও হৃদয় স্বতঃই প্রীতিপ্রবণ হয়; সেই প্রণয়ের মূল অনুসন্ধান করা দুরূহ তাহাকেই নিষ্কারণ প্রেম বলা যাইতে পারে। যে প্রেম নিষ্কারণ, তাহা অপ্রতিবিধেয়, সেই প্রণয় দুইটি হৃদয়কে অনুস্যূত করিয়া দেয়।' ইত্যাদি দ্বারা ভবভূতি যে অহেতু ও অপ্রতিবিধেয় প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন, কুন্দের নগেন্দ্র বিষয়ক প্রেম সেই প্রেম। বঙ্কিমবাবু কুন্দের এই প্রেমের ছবি দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রেমের বিশ্লেষণ ও বিবরণস্থলে এই অহেতু ও অপ্রতিবিধেয় প্রেমের কোনও উল্লেখ করেন নাই, তাঁহার মতে—সকল প্রেমই সহেতু, রূপ হইতে, গুণ হইতে বা উভয় হইতেই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভবপর, বিনা রূপ-গুণ-মোহে প্রেমোৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু তিনি নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের প্রেম কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা বলেন নাই। সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রের পরস্পর প্রেম গুণজ, নগেন্দ্রের কুন্দপ্রেম রূপজ—কিন্তু কুন্দের নগেন্দ্র-প্রেম কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহার তিনি কিছু উল্লেখ করেন নাই। দুইটি রমণীকে দেখিলাম, একটি পরমা সুন্দরী, অপরটি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টা, উভয়েরই গুণ আমার নিকট অবিদিত, অথচ নিকৃষ্টার প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল—বঙ্কিমবাবু এরূপ ঘটনার রহস্যোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ভবভূতি তাহার রহস্যোদ্ভেদে অক্ষম হইয়া সেই প্রেমকে অকারণ বা অলৌকিক-কারণজনিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

জ্বলনোন্মুখ বহ্নির ন্যায় নগেন্দ্র-প্রেম কুন্দের হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল, আজ কমলমণি দ্বারা সেই ধূমায়মান প্রেম কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল। নগেন্দ্রকে ভালবাসেন—কুন্দ একথা এতদিন কাহাকেও বলেন নাই, সেই প্রেম কুন্দ এতদিন হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিগূহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ কমলমণি কুন্দহৃদয়ের সেই গূঢ়তম প্রদেশ হইতে সেই কথা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই দাদাকে বড় ভালবাসিস—না?" সহসা এই প্রশ্নে কুন্দের হৃদয় ভাবাবেগে উচ্ছলিত হইল; কুন্দ কমলের হৃদয় মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। আজ এ প্রশ্নে কুন্দের হতাশা-পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল, কুন্দের মনে হইল—নগেন্দ্র তাঁহাকে ভালবাসেন, তাই কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসে কি

না জানিবার জন্যই আজ কমলমণির এই প্রশ্ন। এই জন্য কুন্দনন্দিনী মস্তকোত্তোলন করিয়া কমলের মুখ প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন, বলিলেন, "পোড়ারমুখী, চোখের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে দাদা তোকে ভালবাসে।"

এ আশাতীত সংবাদ আজ কুন্দের ভগ্নাংশ হৃদয়ের পক্ষে অতিশয় বলবান হইল। বাতাহত তরুশিরের ন্যায় ঘুরিয়া "কুন্দের সেই উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল।" কমল যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কুন্দের নীরব ক্রন্দনে তাহার পূর্ণ উত্তর পাইলেন। সব দিক যায় দেখিয়া কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কুন্দ অনেক ভাবিয়া অশ্রু মুছিয়া বলিলেন "যাব"। "কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল।" কুন্দ আপনার মঙ্গল একবার ভাবিলেন না, কারণ "কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।" 'দাদা তোকে ভালবাসে'—কমলের এই কথা কুন্দের হৃদয় আলোড়িত করিল। এতদিন কুন্দ নগেন্দ্রকে শুদ্ধ ভালবাসিয়াই সুখিনী ছিলেন। তিনি এতদিন নিরাশ প্রণয়ের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ ছিলেন। ভালবাসার প্রত্যর্পণ পাইবার আশা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় নাই। নগেন্দ্রকে শুদ্ধ দেখিয়াই জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। নগেন্দ্র তাঁহার হইতে পারেন এ ভাব কেবল তাঁহার মনে আজ উদিত হইল। কিন্তু আবার অদৃষ্টের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিল। তিনি কাতর হইয়া একদিন প্রদোষে নগেন্দ্রের উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া এই ভাবিতে লাগিলেন, "ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব –তা হলে—হবে ত? দেখিতে পাব – রোজ রোজ দেখিতে পাব – কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারিনে কি? আচ্ছা নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না! একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন নগ-নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র আমার নগেন্দ্র, আ মলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে! সূর্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা—সূর্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—

ডুবেই মরি। আচ্ছা যেন এখন ডুবিলাম, কাল্ ভেসে উঠবো—তবে সবাই শুন্‌বে, শুনে নগেন্দ্র।—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র—আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন, ত বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভালবাসেন! আচ্ছা, সে কথা কি সত্য; কমল দিদি ত বলিল—কিন্তু কমল জানিল কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না! ভালবাসেন? কিসে ভালবাসেন? কি দেখে ভালবাসেন, রূপ না গুণ? রূপ দেখে?—দূর হউক, যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্যমুখী সুন্দর, আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর, বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর, আমার চেয়ে হীরে দাসীও সুন্দর। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লায়ই গেল—গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে।—কই, মনে ত তা হয় না। কমলের মন-রাখা কথা—আমায় কেন ভালবাসিবেন? তা কমল মন-রাখা কথা বল্‌বে কেন? কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! তা মিছে কথাই ভাবি। মিথ্যা কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না। দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পার্‌ব না পার্‌ব না পার্‌ব না। তা না গিয়েই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাদেরও অসুখী করিতেছি। সূর্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে, বুঝিতে পারি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তবে ডুবে মরি! মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে;"—

এইটুকুর মধ্যে কুন্দের হৃদয়ে কত বিপরীত তরঙ্গ উত্থিত হইল—কমলের কথা এইবার সত্য বলিয়া বোধ হইল, আবার তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। একবার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বলবতী হওয়ায় কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল, আবার নগেন্দ্রের আদর্শ-জনিত যাতনা মনে হইল আবার সে সঙ্কল্প

পরিত্যক্ত হইল। যখন কৃতজ্ঞতা ও নগেন্দ্র-প্রেম উভয়ই প্রবল হইয়া উঠিল, তখন ডুবিয়া মরাই স্থির হইল। কুন্দ যখন এই শেষ সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন নগেন্দ্র পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে ধীরে কুন্দের পৃষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন —কুন্দ তাঁহাকে চিনিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুন্দ ! কালি কলিকাতায় যাইবে ?" কুন্দ উত্তর দিলেন না - কেবল চক্ষু মুছিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুন্দ ! ইচ্ছাপূর্বক যাইতেছ ?" কুন্দ আবার চক্ষু মুছিলেন —কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি বলিলেন, "কুন্দ কাঁদিতেছ কেন ?" এবার কুন্দের হৃদয় ফাটিল -- তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি এতদিন নগেন্দ্রের নিকট আত্মগোপন করিয়া আসিয়াছিলেন, নির্বাক রোদনে তাঁহার হৃদয় দ্বার নগেন্দ্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। এই বিশ্বাসের প্রত্যর্পণ জন্যই যেন নগেন্দ্র আজ কুন্দের নিকট আপনার হৃদয় খুলিলেন। নগেন্দ্র-হৃদয়ের সমস্থিতি আজ বিনষ্ট হইল, কিন্তু কুন্দ রোদন সম্বরণ করিয়া আবার চিত্তসংযমে কৃতকার্য হইলেন। আজ বালিকার নিকট মনীষী পরাজিত হইলেন। আজ নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কিন্তু কুন্দ বলিলেন, "না"।

তাহার পর একদিন সূর্যমুখীর তিরস্কারে কুন্দ রজনীযোগে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সূর্যমুখী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুন্দ-পতঙ্গ নগেন্দ্র-বহ্নি পরিত্যাগ করিয়া অধিকদূর যাইতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নগেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে আসিয়া বসিল।

কুন্দের যাইবার দিন নগেন্দ্র যে সার্সী খুলিয়া আলোকপটে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্তি কুন্দকে দেখাইয়াছিলেন, আবার সে সার্সী বন্ধ করিয়া নগেন্দ্র সরিয়া গেলে কুন্দ মনে মনে বলিয়াছিলেন, "নির্দয় ! ইহাতে কি ক্ষতি ! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও, শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।" আজ তিনি নগেন্দ্রের উদ্যানে আসিয়া সেই সার্সীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মানস-নগেন্দ্র উঠিয়া বাতায়ন সমীপে দাঁড়াইলে তাঁহাকে দেখিয়াই ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু আজ অভাগিনীর সে মনোরথ পূর্ণ হইল না। তিনি নগেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু পুষ্পচয়নব্যগ্রা সূর্যমুখীর নয়নপথে পতিত হইলেন। সূর্যমুখী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বাটীর ভিতর

লইয়া গেলেন। সূর্যমুখী এবার নিজে উত্তরসাধক হইয়া নগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহ দিয়া নিজে নিরুদ্দেশ হইলেন। অভাগিনীর সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

কুন্দ আজ আশাতীত সুখের অধিকারিণী হইয়াও অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন—মনে ভাবিলেন, "সূর্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নইলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।"

নিজ স্বার্থের সহিত পরস্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কুন্দ পরস্বার্থের নিকট নিজ স্বার্থ বলিদান করিতেন। যে দিন প্রথম নগেন্দ্র সেই বাপীতটে প্রাণ খুলিয়া প্রণয়-পূরিত বাক্যে তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন তখন তিনি উপকর্ত্রীর দুঃখ ভাবিয়া চিত্তসংযম করিয়া বলিয়াছিলেন 'না'। কিন্তু যখন সূর্যমুখী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন তখন উপকর্ত্রীকে অসুখিনী করিব বলিয়া কুন্দের কোন আশঙ্কা হয় নাই। সূর্যমুখীর তাৎকালিক হৃদয়ভাব—ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ববর্তী প্রশান্তভাব—চিরসহচর নগেন্দ্রই বুঝিতে পারেন নাই, সরলা বুঝিবে কিরূপে? তিনি নগেন্দ্রকে শুদ্ধ দেখিয়াই জীবন কাটাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের পত্নী হইবেন সে আশা তিনি একদিনও করেন নাই। তিনি নগেন্দ্রেরই, কিন্তু নগেন্দ্র যে তাঁহার—তিনি একদিনও তাহা ভাবিতে সাহস করেন নাই। কেবল সেইদিন মাত্র প্রদোষকালে বাপীতটে বসিয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন - "আমার নগেন্দ্র!" কমলমণির মুখে "দাদা তোকে ভালবাসে" এই কথা শোনার পরই তাঁহার এরূপ সাহস হইয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল সূর্যমুখী নগেন্দ্রের, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আ মলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্যমুখীর নগেন্দ্র।" কিন্তু আজ তাঁহার সে দুরাশাও পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি কুন্দ দুঃখিনী। কুন্দ যে সুখ অনন্ত, অসীম ও অপরিমিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে সুখে পদার্পণ করিতে না করিতেই তাহার সীমা, অবধি ও পরিমাণ দেখিলেন। যাঁহাকে লইয়া তাঁহার সুখ তিনি আজ সূর্যমুখী-বিরহে নিরতিশয় কাতর।

সূর্যমুখীর পলায়নের পরদিন প্রদোষে কুন্দ নগেন্দ্রকে ব্যজন করিতেছেন, আর কেহ নাই—অথচ দুইজনেই নীরব। কুন্দ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত; আজ মুখ ফুটিয়া নগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিলে আবার যেমন ছিল তেমনই হয়?"

নগেন্দ্র সন্দেহ করিলেন যে, কুন্দ বিবাহ জন্য অনুতাপিনী। কুন্দ ইহাতে ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখন আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে, সূর্যমুখী ফিরিয়া আসে।" নগেন্দ্র সূর্যমুখীর নাম-গ্রহণে কুন্দের অধিকার নাই কুন্দকে এইরূপে তিরস্কার করায়, কুন্দ কাতর হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।" আমরাও বলি কুন্দ ত কোন দোষ করেন নাই। 'বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকেও বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই; আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল কে?' বস্তুত সূর্যমুখীই কুন্দকে এই আশাতীত সুখে সুখিনী করিয়াছিলেন। তিনি অনাথিনীকে স্বয়ং সুখিনী করিয়া আজ দুঃখ-পারাবারে ভাসাইয়া গেলেন, কিন্তু সে দোষ তাঁহার নহে নগেন্দ্রের। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াও যদি সূর্যমুখীকে পায়ে না ঠেলিতেন—যদি সূর্যমুখীর অলৌকিক ঔদার্য ও অতিমানুষ আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন—তাহা হইলে 'বিষবৃক্ষ' অঙ্কুরে বিদলিত হইত, গোবিন্দপুর স্বর্গধাম হইত, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়েই নগেন্দ্র-দেবের সেবায় নিরত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না। ভবিতব্যের দ্বার কে রোধ করে? কুন্দকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র ভাবিলেন কুন্দ রাগ করিয়াছেন। রাগ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 'না'। নগেন্দ্র ছোট্টো 'না' কথাটি ঔদাসীন্য ও ভালবাসার অভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিলেন। ভালবাস কি না জিজ্ঞাসা করায় কুন্দ বলিলেন, "বাসি বই কি।" এই সরল ভাবশূন্য অকৃত্রিম প্রণয়খ্যাপনে নগেন্দ্র বিরক্ত হইলেন। যে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর—"আমার সর্বস্বধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি," "তুমি আমার পরকাল" ইত্যাদি অসংখ্য হৃদয়দ্রাবক প্রেমখ্যাপনা শুনিয়াছেন, তিনি আজ সরলার এই সংক্ষিপ্ত প্রণয়েতিহাসে কেন পরিতৃপ্ত হইবেন? নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুন্দ! বোধ হয় তুমি আমায় কখন ভালবাসিতে না।" কুন্দ আবার সরলভাবে উত্তর দিলেন, "বরাবর বাসি।"

'নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে এ সূর্যমুখী নয়। সূর্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরুস্বভাব, কথা জানেন না, আর কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না। এই কথা না জানাই কুন্দের ধ্বংসের মূল হইল, কুন্দ নগেন্দ্র-পত্নী হইয়া অধিক দিন নগেন্দ্র-প্রণয়িনী থাকিতে পারিলেন না। যতদিন দূরত্ব-জনিত মোহ ছিল—ততদিন কুন্দ নগেন্দ্র প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন, বিবাহ হইলে সে দূরত্ব গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে মোহও অপনীত হইল। নগেন্দ্রের নিকট কুন্দ সূর্যমুখীর সহিত তুলনায় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন না। কুন্দ এখন নগেন্দ্রের চক্ষুঃশূল হইলেন। নগেন্দ্র কুন্দকে ফেলিয়া সূর্যমুখীর অন্বেষণে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

'কুন্দনন্দিনী ভগ্ন পুতুলের ন্যায়, নগেন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন।'

নগেন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে দেওয়ানকে পত্রাদি লিখিতেন—কিন্তু অভাগিনী কুন্দকে একখানি পত্র লিখিতেন না। কুন্দ দেওয়ানের কাছে সেগুলি চাহিয়া আনিয়া পড়িতেন, পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিতেন না। সেইগুলির পাঠই তাঁহার গায়ত্রীজপ হইয়াছিল। সেই বিপুল পুরীমধ্যে একাকিনী কুন্দ নগেন্দ্র-বিরহে যে কি যাতনা পাইতেছিলেন তাহা কে জানিবে? নগেন্দ্রের অনাদরে সূর্যমুখীর যে যাতনা হইয়াছিল, কুন্দের এ যাতনা তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও ন্যূন ছিল না।

"সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া তাহা নিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত।' কুন্দ রাত্রি-দিন ভাবিতেন—'সূর্যমুখী আকাশের চাঁদ হাতে দিয়া কি দোষে তাহা কাড়িয়া লইলেন? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? ভাল, নগেন্দ্র নাই ভালবাসুন—তাকে ভালবাসিবেন কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন কুন্দই এই বিপত্তির মূল; সকলেই ভাবে কুন্দই অনর্থের মূল।' কিন্তু অভাগিনী কুন্দ বুঝিয়া স্থির করিতে পারিতেন না কি দোষে তিনি সকল অনর্থের মূল, বুঝিতে না পারিয়া কেবল দিন-রাত্রি রোদন করিতেন।

আবার কখন কখন কুন্দ সমস্ত দোষ নিজ মস্তকে লইতেন। ভাবিতেন

"সূর্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল। সূর্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল— আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত তাহাকে পথের কাঙ্গালিনী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখনও মরি না কেন?" অমনি নগেন্দ্রের দেবমূর্তি তাঁহার স্মৃতিপটে প্রতিবিম্বিত হইত—অমনি নগেন্দ্র-দর্শন-লালসা প্রদীপ্ত হইত আবার ভাবিতেন, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি, তিনি কি আর আসিবেন না?" নগেন্দ্র দর্শনই কুন্দের স্বর্গ নগেন্দ্র-দর্শন ভিন্ন কুন্দ আর কোন সৌভাগ্যেরই প্রার্থিনী নহেন। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী ফিরিয়া আসিলে, নগেন্দ্রকে দেখিয়া, সূর্যমুখীর নগেন্দ্র সূর্যমুখীকে প্রত্যর্পণ করিয়া মরিব; আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না—কুন্দ অবশেষে তাহাই স্থির করিলেন।

নগেন্দ্র বাটী আসিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রিতেই সূর্যমুখী দেখা দিলেন 'বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকেও বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এ রোদনের মর্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে।' নগেন্দ্রের অনাদরে কুন্দের পরিতাপ জন্মিল, কুন্দ ভাবিলেন, "কেন আমি স্বামিদর্শন-লালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম। এখন আর কোন্ সুখের আসায় প্রাণ রাখিব?" কুন্দ এইরূপ চিন্তায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় ও রোদনে যাপিত করিলেন। প্রত্যূষে হীরা আসিয়া দেখিল, 'কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে'। হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কেন বাবু কিছু বলেছেন?" কুন্দ বলিলেন "না"।" এই বলিয়া কুন্দ আবার দ্বিগুণিত বেগে কাঁদিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র আসিয়া তাঁহার সহিত কি কথাবার্তা কহিলেন হীরা তাহা জানিতে চাহিল। কুন্দ বলিলেন, "কোন কথাবার্তা বলেন নাই।" হীরা বলিল, "সে কি মা! এতদিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?" কুন্দ বলিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।" এই শেষ কথা বলিতে কুন্দের হৃদয় ফাটিয়া গেল, উচ্ছলিত শোক-বেগে কুন্দ কাঁদিয়া ফেলিলেন। হীরা হাসিয়া বলিল, "ছি মা! এতে কি কাঁদতে হয়? কত লোকের বড় বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করায় বিলম্ব করার জন্য কাঁদিতেছ!" ইহা অপেক্ষা "বড়

দুঃখ” আর কি হইতে পারে কুন্দ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। হীরা বলিল, “আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এতদিন তুমি আত্মহত্যা করিতে।”

“আত্মহত্যা” এই অশুভসূচক ধ্বনি কুন্দের কর্ণকুহরে বজ্রধ্বনির ন্যায় বাজিয়া উঠিল। কুন্দ সে আঘাতে শিহরিয়া উঠিলেন। কে যেন তাঁহার কানে কানে আসিয়া বলিল, “তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে? এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?” ভূতাবিষ্টার ন্যায় কুন্দ কিরূপে আত্মঘাতিনী হইবেন কেবল এই ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন। সুবিধাও জুটিয়া গেল। হীরা যে বিষের কৌটা ফেলিয়া গিয়াছিল, কুন্দ তাহা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিয়া বিষপান করিলেন।

সূর্যমুখী কমলকে সঙ্গে করিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কুন্দের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুন্দের অবস্থা দেখিয়া শিরে করাঘাতপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে কমল ভয়বিক্লিষ্ট বদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইয়া নগেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে তাঁহাকে কুন্দের ঘরে যাইতে বলিলেন। নগেন্দ্র তথায় গিয়া দেখিলেন সূর্যমুখী কাঁদিতেছেন।

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে?” সূর্যমুখী বলিলেন, “সর্বনাশ হইয়াছে।” নগেন্দ্র ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, “কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু হীনতেজ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।”

আজ এই শেষদিনে অনাথিনীর সাহস বাড়িল—আজ প্রথম ও শেষ দিনে দুঃখিনী কুন্দ হৃদয়-নিগূহিত গভীর প্রেম বাক্যে ও কার্যে প্রকাশ করিলেন, নগেন্দ্র নিকটে আসিলে অশ্রুজল দরবিগলিত ধারায় তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল, তিনি ছিন্নমূল লতার ন্যায় নগেন্দ্রচরণে লুণ্ঠিতশির হইলেন। নগেন্দ্র স্খলিত-কণ্ঠে বলিলেন, “একি কুন্দ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?”

কুন্দ নগেন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন, তিনি আপনাকে নগেন্দ্রের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিবার যোগ্যা বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু আজ কুন্দ শেষদিনে নির্মুক্তভাবে তাঁহার কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। কুন্দ-কুসুম শুষ্ক হইবার পূর্বে ক্ষণেকের জন্য ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইল। কুন্দ বলিলেন, “তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?”

নগেন্দ্র অবাক হইয়া নতশিরে কুন্দের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কুন্দ তখন আবার বলিলেন, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমন করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে, কাল যদি একবার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিনমাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না?"

এই প্রণয়পূরিত, হৃদয়-বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া নগেন্দ্র বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রের মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। আজ কুন্দ সূর্যমুখী অপেক্ষাও বাক্‌পটু। আজ কুন্দের প্রেমবহ্নি আধার-স্বরূপ হৃদয় ভস্মসাৎ করিয়া বাহিরে জ্বলিয়া উঠিল। স্বর্ণপ্রভার বিলসনের ন্যায় ইহা আজ জগৎ আলোকিত করিল। কুন্দ বলিলেন, "ছি! তুমি অমনি করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসি-মুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম, তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

পতি-প্রেমের ইহা অপেক্ষা প্রবলতর দৃষ্টান্ত সূর্যমুখীও দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজ এ প্রেমখ্যাপনে কুন্দের কি লাভ? অথবা লাভ নাই বলিয়াই আজ কুন্দ সাহসিনী—স্বার্থসাধনের সন্দেহ স্পর্শিতে পারে না বলিয়াই আজ কুন্দ নগেন্দ্রের সম্মুখে হৃদয় খুলিলেন। ভালবাসা দেখাইলে নগেন্দ্র ভালবাসিবেন—এ আশার সহিত আজ কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই আজ কুন্দ এত নির্মুক্তভাবে নগেন্দ্রকে ভালবাসা দেখাইলেন।

নগেন্দ্র এতদিন কুন্দের প্রেমের গভীরতা নিঃস্বার্থতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ শেষ দিনে উপলব্ধি করিয়া মর্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ সৌদামিনী-বিলসনের ন্যায় মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলামতাহা কেবল মনের বেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথের কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্রকে দেখিলে কুন্দের মরিতে ইচ্ছা হয় না—এইটুকুতেই কুন্দের প্রেমের মাহাত্ম্য। নগেন্দ্র-দর্শনেই কুন্দের পরিতৃপ্তি। নগেন্দ্রভোগলালসা কুন্দকে কখনই পার্থিব করিয়া তুলিতে পারে নাই। নগেন্দ্র আজ কুন্দের সেই অপার্থিব প্রেমের নিকট পরাজিত হইলেন। আজ নগেন্দ্র চিরমুগ্ধা বালিকার বাক্যগাম্ভীর্য ও বাক্য-মাহাত্ম্যে পরাস্ত হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল বিশ্রামের পর আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখন মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ পর্যঙ্কাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া, ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া মুদিত-নয়ন ও নীরব হইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া কুন্দ সূর্যমুখী ও কমলকে দেখিতে চাহিলেন। তাঁহারা আসিলে কুন্দ তাঁহাদিগের চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া স্বামীর চরণযুগল-মধ্যে মুখ লুকাইলেন। ক্রমে ক্রমে বিগত-চেতনা হইয়া, স্বামীর পদযুগল-মধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কুন্দ-কুসুম মুহূর্তমাত্র ঈষৎ বিকশিত হইয়া জন্মের মত শুকাইয়া গেল। সেই ঈষদ্বিকশনের সৌন্দর্যে—সেই অনতিপরিস্ফুট কোরকের সৌগন্ধ্যে—সহৃদয় পাঠকবর্গের মানসক্ষেত্র আজও সমুজ্জ্বলিত ও সুরভিত হইয়া রহিয়াছে। চিরদুঃখিনী অনাথিনী নিরপরাধিনী নগেন্দ্রময়-জীবিতা কুন্দের দুঃখে—কুন্দের মৃত্যুতে পাষাণেরও হৃদয়ে সহানুভূতি উদ্দীপিত হয়, রক্তমাংসনির্মিত মানবের হৃদয়ে যে সহানুভূতি উদ্দীপিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কুন্দের দুঃখ ও কুন্দের মৃত্যু সংঘটিত না হইলে "বিষবৃক্ষের" হৃদয়দ্রাবণী শক্তির অর্দ্ধেক বিনষ্ট হইত।

(৪) সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী

বঙ্কিমবাবু পুরুষচরিত্রে যেমন নগেন্দ্রে স্বর্গীয়, শ্রীশে পার্থিব, ও দেবেন্দ্রে নারকীয় প্রেমের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ স্ত্রী-চরিত্রে সূর্যমুখী ও কুন্দে স্বর্গীয়, কমলমণিতে পার্থিব এবং হীরায় নারকীয় প্রেমের ছবি দেখাইয়াছেন।

সূর্যমুখী ও কুন্দ স্বর্গীয় প্রেমের দুইটি বিভিন্ন আকৃতি। উভয়েরই হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ। উভয়েরই হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেব নগেন্দ্র। এ জগতে নগেন্দ্র ভিন্ন উভয়েই আর কিছুই জানিতেন না।

সূর্যমুখীর প্রেম অনন্ত ও অসীম, কুন্দের প্রেম অতলস্পর্শ। সূর্যমুখী একটি বিকশিত কুসুম, কুন্দ একটি কুসুম-কোরক। সৌরভে উভয়েই জগজ্জনমনোরঞ্জন। একজন হৃদয়ের প্রত্যেক দল খুলিয়া সকলকে দেখাইতেছেন; আর একজনের হৃদয়দল লজ্জায় আকুঞ্চিত। একজন লজ্জাবতী লতা, আর একজন বন জ্যোৎস্না নবমালিকা। একজন প্রগল্ভা, একজন মুগ্ধা। একজন সাহসিনী, একজন ভয়-বিহ্বলা। একজন বাক্‌পটু, একজন বাক্‌বিধুরা। একজন লৌকিকজ্ঞা, একজন সংসারানভিজ্ঞা। যে সাবিত্রীচিত্রে ব্যাস ও যে সীতাচিত্রে বাল্মীকি জগৎ চমকিত করিয়াছিলেন, এবং যে ডেস্‌ডিমোনা-চিত্রে সেক্সপীয়ার জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন, সূর্যমুখী সেই চিত্র; এবং যে শকুন্তলা-চিত্রে কালিদাস এবং যে মিরান্দা-চিত্রে সেক্সপীয়ার জগতে আরাধ্য হইয়াছেন, কুন্দ সেই শ্রেণীর চিত্র। আয়েষা-চিত্রে যে সৌন্দর্য সূযমুখীতে তাহা বর্তমান, কপালকুণ্ডলায় যে সৌন্দর্য কুন্দে তাহা বিদ্যমান। আয়েষা রেবেকার প্রতিবিম্বন, রেবেকা পাশ্চাত্ত্য রমণীর প্রতিকৃতি; সূর্যমুখীতেও পাশ্চাত্ত্য-রমণীর প্রগল্‌ভতা ও সাহস বিদ্যমান। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিদুহিতা, সভ্যতার প্রৌঢ়াবস্থার ছবি নহে, জাতীয় শৈশবের ছবি—মৃতোত্থিত ভারতেই এ চিত্রের অস্তিত্ব সম্ভব; তাই কপাল-কুণ্ডলার সংসারানভিজ্ঞতা, মুগ্ধতা ও সরলতা কুন্দে বিদ্যমান। সূর্যমুখী সীতা ও ডেস্‌ডিমোনার সংমিশ্রণ, কুন্দ শকুন্তলার ও মিরান্দার সংমিশ্রণ। সূর্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা – সূর্যমুখীর প্রতি কার্যে ও প্রতি কথায় পরিব্যক্ত; কুন্দের নগেন্দ্রময়তা – কুন্দের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিগূহিত। নগেন্দ্রকে দেখিলে আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় সূর্যমুখীর হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া সহস্র স্রোতে বাক্যে প্রবাহিত হইত; কুন্দের হৃদয়ে ঘোরতর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিত—নগেন্দ্রকে দেখিলে ভাবপ্রাবল্যে কুন্দের হৃদয় ফাটিবার উপক্রম হইত। উদ্যমশীলা ও বাক্যপটু সূর্যমুখী নগেন্দ্রকে যতখানি ভালবাসিতেন, তাঁহার কার্যে ও বাক্যে প্রকাশ করিতেন; ভাবময়ী ও বাক্যবিধুরা কুন্দ নগেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা নগেন্দ্রের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। নগেন্দ্র সূর্যমুখীর হৃদয়ের প্রতি অক্ষর পড়িতে পাইতেন;

কিন্তু কুন্দহৃদয়ের জলন্ত বর্ণগুলিও তিনি দেখিতে পাইতেন না। সূর্যমুখীর হৃদয় শরৎকালীন পূর্ণ শশধর—নির্মল, উজ্জ্বল ও স্থূলদৃষ্টির গোচর; কিন্তু কুন্দের হৃদয় শারদীয় তারকা—নির্মল, উজ্জ্বল কিন্তু যদিও অন্য জগতের প্রকাণ্ড সূর্য—সূক্ষ্মদর্শনেরও সম্পূর্ণ গোচর নহে। নিরাবরণ পরীদেহের যে সৌন্দর্য, সূর্যমুখী-হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য—তৃপ্তিপ্রদ, অতুল ও মুগ্ধকর; অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরীর যে সৌন্দর্য—কুন্দ-হৃদয়ের সেই সৌন্দর্য, সাকাঙ্ক্ষ, অনুপম ও উন্মাদক।

—আর্যদর্শন, ১২৮৪

মনোরমা

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

(১)

ভালবাসা নানা প্রকার। অবস্থা-ভেদে ইহার প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। যেরূপ মানবের মূল প্রকৃতি সর্বত্রই প্রায় একরূপ, কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে তাহা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া দাঁড়ায়—ভালবাসারও বুঝি মূল প্রকৃতি সেইরূপ সর্বত্রই প্রায় একরূপ, বিভিন্ন অবস্থাতেই ইহার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। ফলত এক কথার মধ্যে অন্য কথা অন্তর্নিবিষ্ট আছে—ভালবাসাও মানবের একটি মূল প্রকৃতি।

আমাদিগের বঙ্গীয় কবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে, প্রণয়ের এই বিভিন্ন রূপ বড়ই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহার এক একটি রমণী—এক এক প্রকারের ভালবাসা; তাঁহার এক একটি পুরুষ—এক এক প্রকারের প্রণয়! প্রণয়ই তাঁহার কাব্যের প্রধান উপাদান; এই উপাদানটি তাঁহার হস্তে এরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, এতদ্দ্বারা তিনি যথেচ্ছা প্রণয়মূর্তি গঠন করিয়া লইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি অনেক স্থলে দেখা যায়, কিন্তু এক বৃত্তির এরূপ বিভিন্ন মূর্তি এত স্পষ্ট এত মধুর আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

এক এক করিয়া তাঁহার রমণী-মূর্তিগুলি পরীক্ষা কর, দেখিবে প্রায়ই প্রণয়-ভেদে তাহাদের বিভিন্নতা হইয়াছে। সেই বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা; সেই কপালকুণ্ডলা, পদ্মাবতী, শ্যামাসুন্দরী; সেই মৃণালিনী, মনোরমা, গিরিজায়া; সেই সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি; সেই শৈবলিনী, সুন্দরী, দলনী; সেই লবঙ্গলতা, রজনী; ভ্রমর, রোহিণী; শান্তি, কল্যাণী; সেই প্রফুল্ল, সাগর; নন্দা, শ্রী, রমা—ইহারা সকলেই ন্যূনাধিক সেই ভালবাসার জন্য প্রকারভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পুরুষগুলি প্রায় এইরূপ—তবে পুরুষ-চরিত্রে ততটা প্রকারভেদ হইতে পারে নাই; ইহার কারণও আছে। —শৈবলিনীর একদিকে প্রতাপ, একদিকে চন্দ্রশেখর থাকিলে যেরূপ ঘটিয়া উঠে, সীতারামের একদিকে নন্দা অপরদিকে রমা থাকিলে সেরূপটি ঘটিয়া

উঠে না। প্রণয়ের বৈচিত্র্য অবস্থানুযায়ী রমণীতে যেরূপ দেখিতে পাইবে, পুরুষে সেরূপ দেখিতে পাইবে না। এই প্রণয় লইয়া রমণীকে যেরূপ ঘটনা-বৈচিত্র্যে পড়িতে হয়, পুরুষকে সেরূপ হয় না। ইহাই আমাদিগের সামাজিক গঠন—তাই পুরুষের প্রণয়-বৈচিত্র্য অপেক্ষা রমণীর প্রণয়-বৈচিত্র্যই বঙ্গীয় কাব্যে অধিক দেখিয়া থাকি।

এই প্রণয়-বৈচিত্র্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার কাব্যের মধ্যে কারণ সহ অতি সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। যেরূপ অবস্থায় ভালবাসা যেরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিনি সেইরূপ অবস্থা আঁকিয়া, সেইরূপ ভালবাসার মূর্তি আঁকিয়াছেন। সর্বত্রই যে তিনি এইরূপ করিয়াছেন, এরূপ নহে—কোন কোন স্থলে আমরা সেই মূর্তিই দেখিতে পাই, তৎপ্রতি কারণ বড় একটা দেখিতে পাই না। বাল্যাবস্থার কথা না জানিলে কারণ সহজে ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যেখানে তিনি এইরূপ গোড়ার কথা পাঠকবর্গকে বলিয়া দিয়াছেন, সেইখানেই আমরা কারণ সহ ভালবাসার এক একটি মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কপাল-কুণ্ডলা, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতির কথা মনে করিয়া একথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

আমাদিগের শীর্ষোক্ত মনোরমাও ভালবাসার সেইরূপ একটি মূর্তি। অবস্থাধীন এই মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছে। সেই অবস্থা ও তজ্জাত সেই মূর্তিটির অবয়বগুলি আমরা অদ্য আলোচনা করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

এ সময়ে পাঠকবর্গকে একবার কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ করিতে হইবে। পার্থক্য তুলনা হইতেই জাত—তুলনা করিয়া না দেখাইলে সে পার্থক্য ভাল বুঝা যাইবে না। আমরা তাই কপালকুণ্ডলার অবস্থার সহিত মনোরমার অবস্থা তুলনা করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব, অবস্থাভেদে কিরূপে মূর্তিভেদ হইয়া থাকে। ক্ষেত্রাদির দোষগুণে এক প্রকার শস্যের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতি প্রাপ্তির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে মনের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা বঙ্কিমবাবু তদীয় কাব্য মধ্যে জলন্ত অক্ষরে লিখিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলার ভিত্তি বা পূর্ব পরিচয় এইরূপ—

কপালকুণ্ডলা বাল্যকালে নৌকাপথে তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া কোনও এক সমুদ্রতটে পরিত্যক্ত হয়েন। সেই সাগরতীরে, প্রকৃতির নির্জন প্রকোষ্ঠে এক দুরন্ত কাপালিক তাঁহাকে প্রতিপালন করে। কাপালিক ঘোর নিষ্ঠুর-

প্রকৃতি—মানববধই তাহার ধর্ম। সে সেই বিজন প্রদেশে নরবলি ইত্যাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ভবানীর সাধনা করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবতী ইহাতেই সাধকোপরি প্রসন্না থাকেন। সেই বিজন কাননে আরও একটি বৃদ্ধ ভবানীভক্ত ছিল। তাহার সহিত কপালকুণ্ডলার স্নেহ-ভক্তি-বিনিময় হইত। সেই বৃদ্ধ অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কন্যানির্বিশেষে পালন করিতেন।

এই ভিত্তি হইতে, কিরূপে ঘটনার পর ঘটনা সংযোগে কপালকুণ্ডলা নির্মিতা হইয়াছিল, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। এখন আমরা মনোরমার কথা বলিব।

মনোরমার ভিত্তি এইরূপ—

কাশীধামে কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে তাঁহার এক কন্যা ছিল—অষ্টমবর্ষে কেশব পশুপতি নামক কোন এক ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত তাহার বিবাহ দেন। একজন জ্যোতির্বিদ কেশবের নিকট গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের কন্যা অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই ভয়ে বিবাহের রাত্রেই কন্যা লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। পশুপতির সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

অল্প বয়সেই হৈমবতীর মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, কিছুদিন পরে আবার পিতৃবিয়োগও ঘটিল। মৃত্যুকালে কেশব জনার্দন নামে তাঁহার এক আচার্যের হস্তে হৈমবতীকে সমর্পণ করিয়া যান। আচার্য শিষ্যের নিকট প্রতিশ্রুত থাকেন, পশুপতির সহিত সেই কন্যার পরিণয়-কাহিনী কখনও তিনি পশুপতি কিম্বা হৈমবতীর নিকট প্রকাশ করিবেন না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে জনার্দন নবদ্বীপে গমন করিয়া এক প্রাচীনা শক্তিহীনা ব্রাহ্মণীর সহিত মনোরমাকে লইয়া একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃসহায় ছিলেন। কিছুদিন পরে প্রবল বাত্যায় ইঁহাদের সেই পর্ণকুটীরটিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তদবধি ইঁহারা এক বৃহৎ রাজপুরীর একাংশে রাজানুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। ওদিকে পশুপতি কালক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া নবদ্বীপের ধর্মাধিকার-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তখন পর্যন্তও দারান্তর পরিগ্রহ করেন নাই।

কালক্রমে হৈমবতীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে, তিনি জানিতে পারিলেন যে,

পশুপতি তাঁহার স্বামী। এই সংবাদ জানিবার পূর্বে তিনি আপনাকে বিধবা বলিয়াই জানিতেন। অন্যের নিকটে তিনি বিধবা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পশুপতির সহিত তাঁহার নির্জনে প্রণয়ালাপ হইত। পশুপতি হৈমবতীকে চিনিতেন না, কিন্তু তৎপ্রতি তিনি একান্ত আসক্ত ছিলেন। হৈমবতী একথাও জানিতেন।

ইহাই মনোরমার প্রকৃত ভিত্তি বা পূর্ব-পরিচয়। এখন তদুপরি গঠিত মূর্তির কথা বলিতে হইবে। পরিশেষে সেই ভিত্তি ও মূর্তির সম্বন্ধের কথা বলা যাইবে।

(২)

মনোরমার আকৃতি গ্রন্থকার দুই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। এক প্রকার হেমচন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া, অন্য প্রকার পশুপতির সম্মুখে ধরিয়া। এই উভয়ের নিকটে, তাঁহার দ্বিবিধ মূর্তিই প্রকাশিত হইত সত্য, তবু যেন দুইজনের কাছে দুই মূর্তিই কিছু বেশী ফুটিত। আমরা 'মৃণালিনী' হইতে উক্ত স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্তে তাঁহার বোধ হইল সম্মুখে একখানি 'কুসুম-নির্মিতা দেবী প্রতিমা'। দ্বিতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, 'প্রতিমা সজীব'; তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নাই, বিধাতার নির্মাণ-কৌশল-সীমা-রূপিণী 'বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী'।"

সেই বাপীকূলের আকৃতিও বলিয়া রাখি। হেমচন্দ্র সহসা চমকিত হইয়া দেখিলেন, "চন্দ্রালোকে, সর্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসন-পরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা, অবেণীসম্বদ্ধকুন্তলা; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয় সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।"

অন্যত্র—

"সেই রত্নপ্রদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোক-বিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল।

মনোরমা নিতান্ত খর্বাকৃতা নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্বচনীয় কোমল, অনির্বচনীয় মধুর ; নিতান্ত বালিকাবয়সের ঔদার্যবিশিষ্ট ; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ কি যোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যূন তাহা ইতিহাসে লিখে না।"

"মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপরাশি অতুল—চক্ষে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোনার চাঁপা ; তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে, এক্ষণে বাপীজল-সিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে ; অর্ধচন্দ্রাকৃত নির্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল লোচনযুগল ; মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত-রন্ধ্রযুক্ত, সুগঠন নাসা ; অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃ-শিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর সুরযুগলতুল্য। কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন ; শাবক-হিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা,— বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদ-রদ যদি কুসুম-কোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত, সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে, মনোরমার রূপরাশি কেবল তাঁহার সর্বাঙ্গীণ সৌকুমার্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার ; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার, সুকুমার কপোল ; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গিতে, সৌকুমার্য ; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য ; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য। সুকুমার চরণ, চরণ-বিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্তবায়ু-সঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য ; বচন সুকুমার, নিশীথ-সময়ে জলরাশি-পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য ; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য, আর এই যে মনোরমা দেবী, গৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্ধ্বস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, আবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ হস্তে ধরিয়া এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্তী করিয়া যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া

আছেন,—ও ভঙ্গীও সুন্দর ; নবীন সূর্যাগ্রে সদ্যঃপ্রফুল্ল ছলনাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।”

এইটি মনোরমার “মোহিনী” মূর্তি।

সেই গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে সন্ধ্যালোকে ক্লান্ত নবকুমারের চক্ষে সেই কপালকুণ্ডলার মূর্তি দেখিয়াছ ; অদ্য এই রত্নপ্রদীপ্ত দেবীমন্দিরে চন্দ্রালোক-বিভাসিত দ্বারদেশে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে মুগ্ধ ধর্মাধিকার পশুপতির চক্ষে এই মনোরমা-মূর্তি অবলোকন কর। কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাও কি? কপাল-কুণ্ডলাকে যদি মনোরমার সমাজে পুষিয়া লওয়া যাইত, তবে তাহাতে এ মনোরমা-মূর্তি দেখিতে পাইতে কি?

আবার হৈমবতীর এ মনোরমা-মূর্তি ছাড়িয়া মনোরমার এক মনোরমা মূর্তি দেখ—

“পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য-সাগরের এক অপূর্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয় তেমনি পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার (হৈমবতীর) সৌকুমার্যময় মুখ-মণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকা-সুলভ ঔদার্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত, প্রশস্ত বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। পশুপতি কহিলেন, ‘মনোরমে. এত রাত্রে কেন আসিয়াছ?—এ কি? আজি তোমার এ ভাব কেন’?”

এইটি মনোরমার চিন্তাশালিনী গম্ভীরা মূর্তি।

এই দুই আকৃতি বা প্রকৃতি পশুপতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, মনোরমার দুই মূর্তি—“এক মূর্তি ‘আনন্দময়ী, সরলা, বালিকা’, অন্য মূর্তি ‘গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী’। এই দ্বিবিধ মূর্তি এই স্থলে একের পরে অন্যটি কেন প্রকটিত হইল, তাহা আমরা পরে বলিব, এখন এই দুই মূর্তি বা প্রকৃতি মনোরমার কিরূপে গঠিত হইয়াছিল তাহাই বলি।

মনোরমা যে আকৃতি বা প্রকৃতিতে আনন্দরূপিণী অলৌকিক সরলা বালিকা, যেই আকৃতি মধ্যে আমরা কপালকুণ্ডলা অথবা মৃন্ময়ী মূর্তি দেখিতে পাই, এই রূপ সেই—কথাবার্তাও তদনুরূপ। শৈশবে যে যেভাবে পালিতা হয় যৌবনেও

তাহার সে ভাব অন্তর্হিত হয় না। নির্জনে পরিবর্ধিতা মাতৃহীনা কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনীর ন্যায় হৈমবতীও শৈশবে পালিতা হইয়াছিলেন। অবস্থানুযায়ী হৃদয়ের স্নেহভাগ ইঁহাদের সকল মধ্যেই কিছু অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ইঁহাদের অলৌকিক সরলতার একটি প্রধান কারণ। অন্য সম্বন্ধে একমাত্র কারণ বলিলেও চলে, মনোরমা সম্বন্ধে আমরা ইহাকে একটি প্রধান কারণ বলিব। কারণ, মনোরমার এ প্রকৃতির কারণান্তও পরিদৃষ্ট হয়।

(৩)

মনোরমার অপর প্রকৃতিটি কিছু মিশ্র, জটিল, সুতরাং ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। মনোরমার দ্বিতীয় প্রকৃতিটি ব্যাখ্যা করার পূর্বে অন্য একটি কথা বলিয়া লইতে হয়।

আমরা সচরাচর মানুষের এক প্রকার প্রকৃতিই দেখিয়া থাকি, তবে মনোরমার এই দ্বিবিধ প্রকৃতি কোথা হইতে আসিল? মনোরমা কি কবির কল্পনা-সঞ্জাত কোন এক অমানুষী সৃষ্টি?—এইরূপ কথা অনেকের মনেই উত্থাপিত হওয়া সম্ভব; সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া লওয়া ভাল।

প্রথম কথাটি এই। কবিগণ এক প্রকার বিভাগানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন—সাময়িক কবি ও সর্বসময়ের কবি। যাঁহারা সাময়িক কবি, তাঁহারা সেই সময়ের আচার, ব্যবহার, নীতি, প্রকৃতি লইয়াই তাঁহাদের কাব্যচিত্রিত চরিত্র অঙ্কিত থাকেন। ইঁহাদিগকে স্বাভাবিক (realistic) কবিও বলা হইয়া থাকে। অপর শ্রেণীর কবিগণ এরূপ কোন সময়ের চিত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত হয়েন না। তাঁহাদের মনীষী কল্পনা তাঁহাদের সেই সময়ের সীমা অতিক্রম করিয়া পরবর্তী ভাবী সময়ে লইয়া যাইতে সক্ষম; তাই তাঁহারা যাহা দেখিতে বা জানিতে পারা যায়, শুদ্ধ তাহাই কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ না করিয়া, যাহা ভবিষ্যতে দেখিতে বা জানিতে পারা যাইতে পারে, তাহাও কাব্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। যাহা সকল সময়েই সমান ছিল, যাহা সকল সময়েই সমান থাকিবে, সেই অবিকৃত, অপরিবর্তনীয় মূল "তত্ত্ব"গুলি ভিত্তিরূপে রাখিয়া তদুপরি তাঁহারা ভবিষ্যৎদর্শী তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে বিবিধ প্রকার চরিত্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই সব চরিত্র যদিও তাঁহাদের সময়ে অলৌকিক (unrealistic) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, সময়ান্তরে তাঁহাদের সেই সব

চরিত্রই আবার লৌকিক বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে, কবি মাত্রই (যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি) স্বাভাবিক চরিত্র-স্রষ্টা—কবি মাত্রই realistic। Realistic (স্বাভাবিক) না হইলে তিনি কখন কবি পদবাচ্য হইতে পারেন না। তবে প্রভেদ এই, এক শ্রেণীর কবির দৃষ্টি অদূরদর্শী, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের সময়ের চিত্রই আঁকিতে সক্ষম—অন্য শ্রেণীর দৃষ্টি কল্পনাবলে দূরদর্শিনী, তাঁহার পরবর্তী সময়ের চিত্র দিব্য-চক্ষে দেখিতে পারেন। এক শ্রেণীর কবি যাহা আছে, তাহাই দেখাইতে পারেন, অন্য শ্রেণীর কবি, যাহা নাই, কিন্তু যাহা হইতে পারে, তাহাও দেখাইতে সক্ষম—প্রত্যুত তাঁহারা তাহাই দেখাইয়া থাকেন। ফল কথা Real এবং Ideal-এ কোন প্রভেদ নাই। সবই Real, নতুবা Ideal-এর কোন তাৎপর্যই থাকে না। আমরা দুই শ্রেণীর কবিকে, সাময়িক কবি (Poet of his own age) এবং সর্বসময়ের কবি (Poet of all ages) নামে অভিহিত করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত শ্রেণীর কবিই সম্যক্ উচ্চে সমাসীন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা আমাদিগের বর্তমান প্রস্তাবের অপ্রাসঙ্গিক কথা, সন্দেহ নাই। তবু, একথা লইয়া সময়ে সময়ে, বড় ঝগড়া করিতে হয়, স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা লইয়া অনেক তর্কও শুনিতে পাওয়া যায়, তাই মনোরমার চরিত্রের স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা উপলক্ষে এই কথাগুলি বলিয়া লইলাম।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এইটুকু প্রাসঙ্গিক কথা বাহির করা যাইতে পারে যে, যাহা সচরাচর ঘটে না বা আমরা যাহা সচরাচর দেখিতে পাই না, তাহাই অলৌকিক বা অস্বাভাবিক নহে। যদি মনোরমার মতো দ্বিবিধ প্রকৃতি-শালী লোক নাই দেখিতে পাওয়া যায়, তবু এ চরিত্রকে হঠাৎ অস্বাভাবিক বলিতে কাহারও অধিকার নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে আরও অনেকটা দেখিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় কথাটি এই। মনোরমা আমাদিগের বর্তমানেরও স্বাভাবিক চিত্র বটে। মনোরমার প্রকৃতি এখনকার মানুষেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা রমণীবৃন্দের স্ফুটনোন্মুখা যৌবনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা মনোরমার এ দ্বিবিধ মূর্তিতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা দেখিতে পাইবেন না। স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ বয়সে, তাহারা এক একটি ছোটখাট মনোরমা। এত

উজ্জ্বল, এত মধুর না হউক, মনোরমা বটে। এক দিকে বালিকা বয়সের প্রকৃতি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে চলিতেছে, অন্য দিকে প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইতেছে। সেই গঙ্গাযমুনাসঙ্গমকালে, রমণীগণ এইরূপ মনোরমা হইয়া উঠেন। তাঁহারা মাতাপিতার কাছে, বয়স্ক অভিভাবকদের কাছে প্রতীয়মান হয়েন বালিকা—স্বামীর নিকট প্রতীত হয়েন যুবতী। তাহাই বা কেন, এক স্বামীর নিকটেই দুই ভাবে পরিচিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই সংসারজ্ঞানশূন্য সরলতা-ক্ষেত্রে যেন একটু একটু করিয়া জ্ঞান-গাম্ভীর্যের ছায়া পড়িতে থাকে। সেই সময়কার এই আকৃতি যাঁহার চরিত্রে অবস্থাক্ষেত্রে স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়, তিনিই আমাদিগের এই কবির মনোরমা হইয়া পড়েন।

যাঁহাদিগের এই রমণীয় রমণী-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই, বা যাঁহারা স্মৃতিপথে এসকল কথা আর আনিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে একটি অতি স্থূল দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে পারি। আমাদিগের পূর্ববর্তী সময়ের অধ্যাপক শ্রেণীমধ্যেও মনোরমার মত দ্বিপ্রকৃতিক লোক বিরল নহে। এক এক সময়ে তাঁহাদের অদ্ভুত সরলতা বা অজ্ঞানতা দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে, আবার এক এক সময়ে তাঁহাদেরই জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এ দৃষ্টান্তটি অতি স্থূল—সকলের চক্ষেই ইহা পড়ে, কিন্তু তাহাতে কাহারও বিস্ময় হয় না। এতদপেক্ষা আমাদিগের পূর্বকথিত রমণী-প্রকৃতিতে লোকের অধিক বিস্ময় হইয়া থাকে। কিন্তু মনোরমা পাঠ করিলে যেরূপ বিস্ময় হয়, এরূপ ইহার কিছুতেই হয় না। ইহার কারণও পরিষ্কার—মনোরমা কবির কাব্য। কবি এই প্রকার দ্বিবিধ প্রকৃতির একত্রাবস্থান মনোরমার চিত্রে আঁকিয়াছেন, এই সুন্দর রহস্যটি আরও সুন্দর করিয়া আমাদিগের চক্ষুর কাছে ধরিয়াছেন, তাই মনোরমা এত বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। আরও এক কথা। অধ্যাপকের কথাটা কারণ সহ এত সুস্পষ্ট যে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। যৌবনোন্মুখী কামিনীর সেই মিশ্র প্রকৃতিটি একটু লক্ষ্য-সাপেক্ষ ও সর্বত্র অধিক সময় স্থায়ী নহে, তাই তাহাও সকলের নিকট তাদৃক্ বিস্ময়কর নহে। মনোরমার প্রকৃতির কবি উজ্জ্বলভাবে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন, আর সমস্ত মনোরমাই এই প্রকৃতি লইয়া—তাই মনোরমা কিছু বিস্ময়োৎপাদক। মনোরমার এ দ্বিবিধ প্রকৃতির কারণ তত পরিষ্কার নহে, তাই মনোরমা অত্যন্ত বিস্ময়কর। বিস্ময়ের কারণ এই—

আবার আনন্দের কারণও এই। যখন অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় মনোরমার চরিত্রেরও কারণটি খুঁজিয়া পাই, তখন কবির মনোরমা আমাদিগের মনোহারিণী হইয়া উঠে। এখন আমরা সেই কারণ খুঁজিব।

মনোরমার আনন্দময়ী, সরলা বালিকা মূর্তির একটি কারণ পূর্ব প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে। সেটি—বয়স ও অবস্থাবিশেষের সম্মিলন। আমাদিগের মনে হয়, ইহার অন্য একটি কারণও আছে। সেটি, মনোরমার কার্যবিশেষে আত্যন্তিকী একাগ্রতা। মনোরমার তবে সেই কার্যটি কি?—ইহা বুঝিতে পারিলেই, আমরা মনোরমার সব বুঝিলাম। এখন তাহাই দেখিব।

মনোরমার কার্য আর কিছুই নহে—চিন্তা। মনোরমা দিবারাত্র কেবল আপনার চিন্তাবিশেষেই মগ্ন থাকিত। ভগবান তাহাকে এরূপ চিন্তার কারণও দিয়াছিলেন। মনোরমা বড়ই দুঃখিনী। এই চিন্তাই মনোরমার সারল্যের অন্যতর কারণ, আবার এই চিন্তাই মনোরমার প্রখর বুদ্ধিশালিনী, গম্ভীরা, তেজস্বিনী প্রকৃতির কারণ।* এই চিন্তাই মনোরমার সর্বস্ব। এই চিন্তা হইতেই প্রায় তাঁহার সেই দুই মূর্তি জাত—এক "আনন্দময়ী, সরলা, বালিকা মূর্তি"—অপর "গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী মূর্তি।" প্রথম মূর্তির কথা কিছু বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি অন্য কারণও ছিল। এখন এই শেষের মূর্তির কথা বলিব। ইহাতে সমস্ত মনোরমাই ব্যাখ্যাত হইবে।

মনোরমার কিসের চিন্তা? এ কথা যে পাঠক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে আমাদিগের পূর্বর্ণিত মনোরমার পূর্বপরিচয় আর একবার ভাবিতে বলি।

এই একটি বঙ্গীয় বিধবা করলগ্নকপোল হইয়া নির্জনে অন্য মনে কি ভাবিতেছে। পাঠক কি জিজ্ঞাসা করিবেন, উহার কিসের চিন্তা? ঐ শ্বেত-বস্ত্রপরিহিতা নিরাভরণা স্ফুটনোন্মুখযৌবনা স্নেহময়ী বালবিধবার চিন্তার বিষয়

* এই কথাটি কিছু নূতন বোধ হইতে পারে। চিন্তা হইতে যে সরলতা উৎপন্ন হইতে পারে, এ কথা সহসা কেহ বিশ্বাস না করিতেও পারেন। আমাদিগের যাহা মত ও বিশ্বাস, আমরা যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। সরলতা চিন্তা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না এরূপ কথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ স্বীকার করিতে হইবে যে চিন্তা সরলতা-বিরোধী নহে। নতুবা, মনোরমার চিত্রে সামঞ্জস্য নাই, ইহাই বলিতে হইবে। এরূপ কথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোনই তর্ক নাই।

কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে? যদি তাহা না হয়, মনোরমার চিন্তার কথাও আপনাকে না বলিলে চলিবে। ঐ মূর্তি মনোরমার চিন্তার প্রথম মূর্তি। মনোরমা প্রথমে নিজের নিকটে এইরূপ বালবিধবা বলিয়া পরিচিতা।

যখন মনোরমার চিন্তাস্রোত এইরূপে প্রবাহিত, তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে তিনি বাস্তবিক বিধবা নহেন—তাঁহার স্বামী পশুপতি এখনও জীবিত আছেন। কথা ফিরিল, বিধবা সধবা হইল, কিন্তু চিন্তা ত থামিতে পারিল না। ক্ষণিক হর্ষোচ্ছ্বাসে এ চিন্তাস্রোত মন্দগতি হইল বটে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস থামিলে আবার যে স্রোত বহিতে লাগিল! কে সেই স্বামী? কোথায় সে পশুপতি? ইত্যাকার চিন্তায় তখন মনোরমা প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তার এ প্রকৃতি সহসাই পরিবর্তিত হইল। মনোরমা ধীরে ধীরে সেই জ্যোতির্বিদের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। এ যে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে সেই ত্রিপত্রচ্যুতি! ক্রমে আরও চিন্তা—মনোরমার তবে ত সংসারে কেহই নাই! পূর্বে যে অশ্রুবিন্দু সলজ্জভাবে নীরবে গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িত, এখন তাহা অবাধে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। এ সংসারে মনোরমার কেহই নাই! মা, বাপ, ঘর, বাড়ী কিছুই নাই। পূর্বে তিনি আপনাকে বিধবা জানিতেন, কিন্তু এখন যে সধবা বলিয়া জানিয়াও তাঁহার কষ্ট কমিল না। এই যে একটু হর্ষের ভাব—তাহাও যে ঘোর-দুঃখ-মিশ্রিত। এইরূপে আর একটি তরঙ্গ মনোরমার জীবনোপরি ভাসিয়া গেল। এইখানেও যদি এ চিন্তা শেষ হইত, আমরা মনোরমাকে চিন্তাময়ী বলিয়া এত কথা বলিতে সাহস করিতাম না। এতদূর পর্যন্ত ত সে চিন্তায় অনন্যসাধারণত্ব কিছুই নাই! এর পরে মনোরমা তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট, স্বপ্নময় স্বামী পশুপতির সন্দর্শন লাভ করিলেন। একে বালবিধবার স্বামী, তাহাতে আবার সেই স্বামী পশুপতি —এ কি কম উচ্ছ্বাসের কথা? ইহার উপর আবার সেই পশুপতির সান্নিধ্যে বাস—তাহার প্রণয়-প্রাপ্তি, এ যে মনোরমার ধারণার অতীত! সেই স্বামী আবার তাহাকে কুলটার ন্যায় ভালবাসিতেছে—মনোরমা একবার বলিতে পারিতেছে না যে, সে কুলটা নহে, বিধবা নহে, পশুপতির পরিণীতা পত্নী! রমণী-হৃদয় ভিন্ন অন্য হৃদয় হইলে, এইখানেই যে তাহা ফাটিয়া যাইত! এত উচ্ছ্বাস কি ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিবদ্ধ রাখা যায়? কিন্তু মনোরমাকে তাহা রাখিতে হইয়াছিল। জ্যোতির্বিদের গণনার কথা তখনও মনোরমার হৃদয়ে জাগ্রত,

সে কি কম কথা? তার পর আরও দেখ, পশুপতি তখন রাজা - মনোরমা দুঃখিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা—বালবিধবা বলিয়া পরিচিতা, একথা শুনিলে পশুপতি কি মনে করিবেন? তিনি কি একথা বিশ্বাস করিবেন? না, দুঃখিনী বালবিধবার দুরাকাঙ্ক্ষা জনিত প্রতারণা বলিয়া ভাবিবেন? আর—আর বিশ্বাস করিলেই কি তাহা বলা উচিত? মনোরমার প্রতি পশুপতির যেরূপ প্রবল আসক্তি, না জানি পশুপতি ইহা শুনিয়া কিরূপ করিয়া বসেন? না জানি এই সুসংবাদে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে! আর পশুপতি বিশ্বাস করিলেই বা অন্যে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? অন্যে যে কত কথা বলিবে - এ জন্য পশুপতিকে যে কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে—তাঁহার বড় মুখ ছোট হইবে—মনোরমার তাহা জীবন থাকিতে বলা হইবে না। ভাবিয়া ভাবিয়া মনোরমার অন্তরের ভিতর যে অন্তর সেইখানে এ কথা লুকাইয়া রাখিল। এ কি কম কথা? এ কি কম শিক্ষা? এ কি কম অভ্যাস? এতে হৃদয় গভীর হইবে না ত কিসে হৃদয় গভীর হইবে? এতে হৃদয়ে তেজ বাঁধিবে না ত কিসে হৃদয়ে তেজ বাঁধিবে। বাধ্য হইয়া মনোরমাকে এ শিক্ষা পাইতে হইয়াছিল। এ আগুন হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে হইয়াছিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ইহা সেই হৃদয়প্রদেশকে দগ্ধ করিয়া গভীর হইতে গভীরতর করিতে লাগিল।

আরও দেখ। মনোরমা যেখানে থাকিতেন, সে একটা বৃহৎ রাজপুরী। তাহার এক কোণে বাস করিতেন। সেই বিশাল পুরীটি অন্যত্র খালি পড়িয়া থাকিত। ইহা দেখিয়া না জানি মনোরমা কত বা তাঁহার নিজের কথা ভাবিয়াছেন! শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে—স্বামিবিরহিতা দুঃখিনী চিন্তিতা রমণীর পক্ষে সে দৃশ্য কি কম ব্যাকুলতা-পরিবর্ধক, চিন্তা-উদ্দীপক? উহাতেই যেন তাহাকে ভাবিতে প্ররোচনা জন্মাইত। তাই মনোরমা ভাবিতেন, বসিয়া রাত্রিদিন কেবলই ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন হৃদয়-প্রদেশ ক্ষত বিক্ষত হইত, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইত, তখনই বুঝি তাঁহার গা জালা করিত। সেই গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ তিনি সেই বাপীজলে অবগাহন করিতে যাইতেন। কি চমৎকার কবিত্ব! সেই দীর্ঘিকা—আর সেই মনোরমা! কেমন একসুরে গাঁথা—সেই শালতমালাচ্ছন্না বিশাল দীর্ঘিকা আর সেই চিন্তাচ্ছায়াসমাকুলা মনোরমার হৃদয়? কোথায় হারেসিও—এই দীর্ঘিকার

সহিত তাহার তুলনা? সত্য সত্যই এইখানে আসিলে তাহার গায়ের জ্বালা নিবারণ হইত। এ মনোরমার অবগাহন-যোগ্য দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকার সোপানোপরি আসীন হইয়া তাহার বক্ষোদেশস্থ ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া না জানি মনোরমা কত ভাবনাই ভাবিতেন। এইরূপ চিন্তা, এইরূপ প্রকৃতির সহানুভূতিতে তাঁহার সুখ দুঃখ দুইই উৎপন্ন হইত। ইহাই তাঁহাকে অদ্ভুত সারল্যময়ী ও অদ্ভুত গাম্ভীর্যশালিনী বালিকা ও পূর্ণযৌবনা তরুণী নির্মাণ করিয়াছিল। এ কথা আরও কি বুঝাইতে হইবে?

এই আমাদিগের মনোরমা! সংসারে এমন অপূর্ব সৃষ্টি আর কখন দেখিয়াছ? মনোরমা পরগৃহে পালিতা বলিয়া তুচ্ছ করিও না—মনোরমা কাব্য রাজ্যে রাজ্ঞী।

মনোরমার দ্বিবিধ মূর্তি অবস্থাবিশেষে প্রকাশিত হইত। মনোরমার জ্ঞানমূর্তি, আন্তরিক চিন্তা হইতে উৎপন্না—তাহা হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে লুক্কায়িত থাকিত। হৃদয়কবাটে আঘাত না লাগিলে সে মূর্তি বাহির হইত না। মনোরমা তাহা এমনই লুক্কায়িত রাখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, সময়বিশেষে তিনিও তাহা ভুলিয়া যাইতেন। এই আত্মবিস্মৃতির অবস্থাতেই তিনি কপালকুণ্ডলা, মৃন্ময়ী বা অপূর্ব সরল বালিকা। আত্মস্থা মনোরমার অন্য রূপ। তিনি কুসুমনির্মিতা কপালকুণ্ডলা—অন্যরূপে তিনি চিন্তাময়ী উন্মাদিনী। এক মূর্তিতে তিনি হেমচন্দ্রের স্নেহময়ী কনিষ্ঠা ভগিনী, পশুপতির প্রেমপ্রবৃত্তি-ময়ী বালিকা ভার্যা, অন্যরূপে তিনি হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা সহোদরা—পশুপতির জ্ঞাননিবৃত্তিময়ী প্রৌঢ়া পত্নী। হরগৌরী মূর্তি—সেই আধ-শিব আধ-উমা মূর্তি দেখিয়াছি—এরূপ একাধারে যুগলমূর্তি দেখি নাই।

(৪)

এখন আমরা মনোরমার কাব্যাংশ ব্যাখ্যা করিব। তাহার অদ্ভুত বালিকা-ভাব—অলৌকিক সারল্য, তাহার অপূর্ব প্রৌঢ়ভাব—প্রখরা বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার অপূর্ব পরিবর্তন—সময়ে এক ভাব, সময়ান্তরে ভাবান্তর, গ্রন্থকার কিরূপ পাঠক-বর্গকে অনুভব করাইয়াছেন, তাহাই বলিব।

বয়সের ধর্মে মনোরমার দ্বিবিধ প্রকৃতি বিবিধ অবস্থার সংঘটনে স্বভাবতই কিছু জটিল ও রহস্যময় হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি কবি স্বীয় অপূর্ব কুহক-

দণ্ড সঞ্চালনে মনোরমাকে একটি অপূর্ব প্রহেলিকায় পরিণতা করিয়াছেন। মনোরমা আকৃতিতে প্রহেলিকা, মনোরমা প্রকৃতিতে প্রহেলিকা। মনোরমা হেমচন্দ্রের নিকট প্রহেলিকা—মনোরমা পশুপতির নিকট প্রহেলিকা মনোরমা তোমার আমার সকলের নিকট প্রহেলিকা। কুহেলিকাময়ী উষা বা ছায়াময়ী গোধূলি কেহই মনোরমার ন্যায় প্রহেলিকাময়ী নহে।

মনোরমার আকৃতিতে যে প্রহেলিকা ছিল, কবি তাহা সর্বপ্রথমেই পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হেমচন্দ্র প্রথমে ভাবিলেন কুসুমনির্মিতা দেবীপ্রতিমা, পরে মনে করিলেন—এখনও হেমচন্দ্র মুগ্ধ ও আত্মবোধরহিত—কোন 'সজীব প্রতিমা' -শেষে স্থির হইল, মনোরমা কুসুম-নির্মিতা দেবীপ্রতিমাও নহে, সজীব প্রতিমাও নহে—এক 'অপূর্ব বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।' এ প্রহেলিকা কিন্তু হেমচন্দ্রের কখনও পরিষ্কার হইল না—হেমচন্দ্র কখনও ঠিক করিতে পারিলেন না, 'মনোরমা' বালিকা না 'তরুণী'! আকৃতিতে মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি?

তারপর দেখ, পশ্চাৎ হইতে হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া "বীণানিন্দিত স্বরে সুন্দরী কহিলেন, 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন?' হেমচন্দ্র কহিলেন, 'তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে?' বালিকা কহিল 'আমি মনোরমা।'

হে। 'ইনি তোমার পিতামহ?'

মনোরমা। 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?'

হে। 'শুনিলাম ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।'

ম। 'এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?'

হে। 'আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।'

ম। 'কেন?' এ কেনর উত্তর নাই।

হেমচন্দ্র অন্য উত্তর না পাইয়া কহিলেন—'কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত; সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?'

ম। 'তুমি কি আমার ভাই?'

হে। 'আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?'

ম। 'বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?'

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী? কহিলেন, 'কেন তিরস্কার করিব?'

ম। 'যদি দোষ করি?'

হে। 'দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?'

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, 'আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?'

হে। 'না'।

ম। 'তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?'

হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, 'আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না—তাহার উপায় কি?'

ম। 'আমি বলিতেছি।' এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।"

পাঠক এখন এক এক করিয়া মনোরমার এই কার্য ও কথাগুলি পরীক্ষা কর—এইরূপ অবস্থায় অপরিচিত যুবকের সম্মুখে অপরিচিতা তরুণীর কথা ও ব্যবহারের সহিত ইহার তুলনা কর—অর্ধোমুক্ত দ্বার-প্রদেশে নিম্নস্থাপিতদৃষ্টি যৌবনোন্মুখীর কবাট খুঁটিতে খুঁটিতে অপরিচিত বা অল্প-পরিচিত অভ্যাগত সহ কথোপকথন মনে কর, দেখিবে, মনোরমার কি অপূর্ব সারল্যই এতদ্দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমে ধর, সেইরূপ করিয়া হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানার কথা। তার পরে কথাগুলি পরীক্ষা কর। বালক-বালিকাদিগের স্বভাবই এই যে তাহারা উপযাচক হইয়া কথা বলে, প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই উত্তর প্রদান করে, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। মনোরমাতেও আমরা এই বালধর্ম দেখিতে পাইলাম না কি? মনোরমা যুবতী—তিনি হেমচন্দ্রের

নিকট গমন করিয়া তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। মনোরমা ইতর-বংশজ নহে -মনোরমা ব্রাহ্মণকন্যা, যুবতী, কিন্তু তবু তিনি হেমচন্দ্রকে 'তুমি' বলিয়া কথা কহিলেন। এ কি বালিকার কার্য নহে? আবার যখন হেমচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে?'—মনোরমা কহিলেন 'আমি মনোরমা।' কি অপূর্ব বালিকার উত্তর! একদিকে দেখ, হেমচন্দ্র মনোরমাকে বলিতেছেন, 'আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।' যুবতী মনোরমা জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'কেন?' গ্রন্থকার লিখিলেন 'এ কেনর উত্তর নাই।' মনোরমার প্রশ্ন বালিকার প্রশ্ন নয় কি?

বাপীকূলের দৃশ্যটি একবার মনে করিয়া দেখুন। মনোরমা হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'তোমার এ বেশ কেন? হাতে শূল, কাঁকালে তরবারি, তরবারে এ কি জ্বলিতেছে? এ কি হীরা? মাথায় এ কি? ইহাতে যে ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি? এও হীরা? এত হীরা পেলে কোথা?'

"এত রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় যাইতেছ? চোরে যে কাড়িয়া লইবে।"

কথাগুলি কি আমাদিগের সম্মুখে একটি কৌতূহলপরায়ণা বালিকা-মূর্তি স্থাপিত করিতেছে না? মনোরমা এক নিশ্বাসে কত কথা কহিল—কত প্রশ্ন করিল। উত্তরের অপেক্ষা নাই; প্রশ্নের ঔচিত্যানৌচিত্য-বোধ নাই। মনোরমা বালিকার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে—বালিকার ন্যায় চোরের ভয় দেখাইতেছে। কত আর দেখাইব? 'তুমি কি আমার ভাই? বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া কখন তিরস্কার করিবে না ত?' এ সকলই মনোরমার মুখে কেমন সুন্দর শুনাইতেছে! যুবতী, ভাবিয়া কথা বলে; বালিকা, ভাবিয়া কথা বলে না। হেমচন্দ্রের কথা শেষ না হইতে হইতেই যেন মনোরমাকে আমরা কথা কহিতে শুনিতেছি! কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইয়া—যুবতী মনোরমা-সম্বন্ধে হেমচন্দ্র একদিন মনে করিয়াছিলেন 'এ কি বালিকা না উন্মাদিনী?'

প্রকৃতিতে, ব্যবহারে মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি? যেমন আকৃতি-প্রকৃতিতে মনোরমা প্রহেলিকা, গ্রন্থকার দুই একটি ঘটনা সৃষ্টি করিয়াও মনোরমাকে আবার তেমনি প্রহেলিকা করিয়া তুলিয়াছেন। ফলত মনোরমার

সমস্তই প্রহেলিকা—কথা, কার্য, ভালবাসা, পরিণাম, তাহার কিছুই সরল দৃষ্টিতে পরিষ্কার নহে। তাই বলিতেছিলাম, মনোরমা একটি অদ্ভুত প্রহেলিকা।

কবিসৃষ্ট সেই ঘটনাগুলির কথা এই স্থলে বলিয়া লইব।

বাপীকূলের সেই হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথা মনে কর। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এখান দিয়া কাহাকে যাইতে দেখিয়াছ?" ম। "দেখিয়াছি।" মনোরমা স্ত্রীলোক, হিন্দুরমণী—হিন্দুরাজ্যে তখনও তুরক আগমন করে নাই। তবে মনোরমা তুরক চিনিল কি প্রকারে? তারপরে দেখ—যখন মনোরমা হেমচন্দ্রকে তুরক দেখাইতে তদীয় পশ্চাদ্‌বর্তী হইতে বলিলেন—হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন—'মনোরমা কি কুমারী?' পাঠক! তোমরাও কি বিস্মিত হও নাই? ঐ ক্ষুদ্র বালিকাটি ঠিক মনের কথা বলিতে পারিল দেখিয়া চমকিত হও নাই? পূর্বের কথা সকল মনে করিয়া তোমরাও কি মনে ভাব নাই 'মনোরমা কি মানুষী'—তখন অবশ্যই মনে করিয়াছ। তখন নিশ্চয়ই তোমাকে কবির কুহকে পড়িতে হইয়াছে। এইরূপ কুহকজাল বিস্তার করিয়া কবি স্বতঃপ্রহেলিকাময়ী মনোরমাকে আরও ছায়াময়ী করিয়া পাঠকবর্গ-সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। এ সকল কথা কি বলিবার নহে?

আবার অন্য এক পরিচ্ছেদের কথা মনে কর। হেমচন্দ্র যখন শান্তশীল কর্তৃক কারারুদ্ধ, তখন মনোরমা হেমচন্দ্রের উদ্ধার সাধন করিয়া কিরূপ তাঁহাকে চমৎকৃত করিতে পারিয়াছিলেন! কিন্তু সে পরিচ্ছেদে পাঠকবর্গ প্রতারিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু হইতে পারিলে যেন ভাল হইত। সেই অধ্যায়ে বঙ্কিমবাবু লিখিয়া লইয়াছেন, "মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় লইয়া দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিলেন। পশুপতির সহিত শান্তশীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিলেন যে, এই ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন।" আমাদিগের বিবেচনায় প্রথম ঘটনায়ও যেরূপ কবি নির্বাক্ ছিলেন এখানেও সেইরূপ নির্বাক্ থাকিলে ভাল হইত। আর যদি 'ফাঁদ' ও 'মুক্ত' এই দুইটি পরিচ্ছেদ, কোন প্রকারে 'মোহিনী' ও 'মোহিতা' পরিচ্ছেদদ্বয়ের পূর্বে স্থাপন করা যায়, তবে এই রহস্যটি কঠিন হইয়া—অন্য একটি কুহক বিস্তারে সমর্থ হয়। কিন্তু আমরা আমাদিগের অভিলাষই মাত্র ব্যক্ত করিতে পারি। কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে, সে ভার শিল্পীর উপরে।

(৫)

মনোরমার বালিকাভাব কবি কিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন তাহার প্রৌঢ়ভাব কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতে হয়। কিন্তু মনোরমাকে অবিকৃতা প্রৌঢ়া আমরা কোন স্থানেই দেখিতে পাই না। সুতরাং বালিকাভাব হইতে ভাবান্তরে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার সময়েই উহা ব্যাখ্যাত হইবে। আমরা তিনটি দৃশ্য হইতে এখন এই অপূর্ব ভাবান্তরগুলি পাঠকবর্গ-সমীপে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি।

১। পশুপতি মুসলমানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র সুস্থির করিয়া অষ্টভূজাকে প্রাণামানন্তর শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিযাছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন —"অপূর্ব দর্শন! সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্যসাগরের এক অপূর্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্যের প্রখরকরমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘ সঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত প্রগল্‌ভ বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল।"

দেখিলাম অপূর্ব ভাবান্তর! তরুণী মনোরমা প্রৌঢ়া হইলেন। এখন ইহার কারণ অনুসন্ধান করা যাউক।

ইতিপূর্বে মনোরমা পশুপতির মন্ত্রণা সব স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সে কথাগুলি মনোরমার প্রীতিকর কথা নহে। স্বামী কুপথে পদার্পণ করিতেছে—স্ত্রীর নিকটে ইহা অসহ্য যন্ত্রণার বিষয়। এই কুপথ হইতে পশুপতিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য মনোরমা আজ স্বামি-সন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন। অদ্য তিনি পশুপতিকে এজন্য তিরস্কার করিবেন, কুপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করিবেন, অন্তরে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই পশুপতির গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পশুপতিকে দেখিবামাত্র তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। প্রৌঢ়া মনোরমা তরুণী হইলেন। হইবার কারণ আছে। মনোরমা পশুপতির ভার্যা—পশুপতি তাঁহার অন্তরের উপাস্য দেবতা—

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। যুবতী মনোরমা এখনও এ হেন স্বামীর সহিত মিলিতা হইতে পারেন নাই, সুতরাং মিলনের পূর্বে প্রণয়ের যে উৎকট ভাবটি সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, সে ভাবটি এখনও সম্যক্ তিরোহিত হইতে পারে নাই। মনোরমা চিত্তজয়ী—মনোরমা গম্ভীরা—মনোরমা যাহাই হউক, এই ধর্মসঙ্গত মিলনের জন্য একটা ব্যাকুলতা তাঁহাতেও ছিল। তাই যখন মনোরমা প্রথমে পশুপতিকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পূর্ব মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, "সূর্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশির ন্যায় তাঁহার সুন্দরী তরুণী মূর্তি বহিরভ্যন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল।"

কিন্তু মনোরমা সামান্য তরুণী নহে। তিনি আত্মচিত্ত সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, মুহূর্ত মধ্যে আত্মসংযম করিলেন। ক্ষণিক উচ্ছ্বাস হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেটি স্ত্রী-প্রকৃতি ও প্রণয়ের সম্মোহন ভাব প্রদর্শন জন্য। সেটি মনোরমাকে আরও মাধুরীময়ী করিয়া তুলিবার জন্য। আত্মসংযতা হইয়া মনোরমা পূর্বের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি "মেঘসঞ্চারে অম্বুরাশি যেরূপ ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়" সেইরূপ গম্ভীরা ও তেজস্বিনী হইতে লাগিলেন। প্রেমময়ী জ্ঞানময়ী হইলেন। দেখিয়া পাপী পশুপতি ভীত ও চকিত হইল। মনোরমা সেই উন্নত অন্তঃকরণের সাহস ও গাম্ভীর্য লইয়া পশুপতিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিরস্কার করিতে করিতে যখন মনোরমা বলিলেন, "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবেক না।" তখন যেন আমরা মনোরমার জ্ঞানমূর্তি পূর্ণবিকশিত দেখিতে পাইলাম। কিন্তু উত্তেজনের পর অবসাদন, সন্তাপের পর শীতলতা, প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়ম। তাই মনোরমাকে এইরূপ অবস্থায় গমনোদ্যতা দেখিয়া পশুপতি যখন কাঁদিয়া উঠিলেন, মনোরমার জ্ঞানমূর্তি দ্রব হইয়া গেল। পূর্বের কঠোর কথায় আপনি কোমল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন স্বামীর ক্রন্দনে একেবারে আত্মহারা হইলেন। তাই পশুপতি এখন মনোরমার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, "তেজোগর্ববিশিষ্টা কুঞ্চিত-ভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী-মূর্তি আর নাই। কুসুমসুকুমারী বালিকা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।"

প্রৌঢ়া তরুণী হইল, সেই তরুণী প্রৌঢ়া হইল—আবার প্রৌঢ়া তরুণী হইল। মনোরমা বহুরূপিণী নয় কি? মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি!

২। হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের সহিত কথোপকথনান্তে মৃণালিনী-চিন্তায় অধীর হইয়া অনন্যমনে তাহাই পর্যালোচনা করিতেছেন। মৃণালিনীকে দুশ্চারিণী মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় শত সহস্র বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতেছে। এমত সময়ে মনোরমা তথায় উপস্থিত হইলেন। হেমচন্দ্রকে মনোরমা প্রথমাবধিই ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, অদ্য হেমচন্দ্রকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, আজ তুমি কেমন আছ?' হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'কেমন আছি?' মনোরমা কহিলেন, তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার; চক্ষে পলক নাই কেন? আর দেখি—তাইত, চোখে জল, তুমি কেঁদেছ?' যেমন চরিত্র তেমনি কথা। কেমন স্নেহময়ী ভগিনী অথচ বালিকার ন্যায় কথা। হেমচন্দ্র এ সব কথার কোন উত্তর করিতে সহসা প্রস্তুত হইলেন না।

মনোরমা হেমচন্দ্রকে তাঁহার দুঃখের কারণ বলিতে বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। হেমচন্দ্র সুস্থ রহিতে না পারিয়া তখন কহিলেন 'আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। আমি মণিভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।' তখন—

"মনোরমা আবার পূর্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমিখ্ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। বালিকা প্রগল্‌ভতা প্রাপ্ত হইলেন। মনোরমা কহিলেন, বুঝিয়াছি! তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেমচন্দ্র (মৃণালিনী সম্বন্ধে) কহিলেন, 'ভাল বাসিতাম।' ঐ দেখ মনোরমা কি বলিয়া আপন সুন্দর অলকদাম সুন্দর চম্পকাঙ্গুলিতে জড়িত করিয়া টানিতে লাগিল। কি সুন্দর বিরক্তি-প্রকাশ—কি সুন্দর অসন্তোষ-প্রকাশ! মনোরমার সকল কার্যই মনোরম। আবার ঐ দেখ, কথা বলিতে বলিতে মনোরমা কিরূপ বাগ্মী হইয়া উঠিলেন—ঐ দেখ মনোরমার চক্ষু কেমন জ্বলিতেছে—স্বর কেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—আকৃতি কেমন জ্ঞানময়ী হইয়া উঠিতেছে। "দেখিয়া হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, 'আমি ইহাকে একদিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম'।"

বালিকাভাবে দেখিয়াছ, এইখানে প্রৌঢ়ভাবে দেখিয়া লও। সরলতা দেখিয়াছ, এইখানে শিক্ষা দেখিয়া লও। প্রেম দেখিয়াছ, এইখানে জ্ঞান দেখিয়া লও।

পাপাসক্তকেও কি ভালবাসিতে হইবে? যখন হেমচন্দ্র মনোরমার নিকটে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। "ইহার উত্তর মনোরমার উপদেষ্টা বলিয়া দেন নাই। উত্তরের জন্য আপনার হৃদয় মধ্যে সন্ধান করিলেন; অমনি উত্তর আপনি মুখে আসিল।" এইস্থল একটুকু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। মনোরমার উপদেষ্টা কে, বোধ হয় তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে কি না, একথা তিনি মনোরমাকে শিখাইয়া দেন নাই। একথা তিনি শিখাইতে পারেন না। তিনি নাই শিখাউন, মনোরমার হৃদয়ে একথার উত্তর গাঁথা ছিল। এ প্রশ্ন তাহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইল না। অবস্থাধীন পশুপতি যাহার প্রণয়-পাত্র, তাহার নিকট এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই আসিল।

অন্যত্র হেমচন্দ্র যখন মনোরমাকে তাঁহার মতে পাপ-প্রণয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য গুরুগম্ভীর ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন, "মনোরমা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিলেন—হাসি বন্ধ হয় না।"

কি সুন্দর মনোরমা। প্রণয়ী মনোরমা, জ্ঞানী মনোরমা, বালিকা মনোরমা একত্র মিশ্রিত হইয়া এই হাস্যে বিরাজ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র অপ্রস্তুত হইলেন। শেষে যখন কথার বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল—মনোরমা যখন দেখিলেন, তাঁহার অন্তরের একটি গোপনীয় কথা বাহির হয়-হয় হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার অন্তরের কবাট, জ্ঞানের কবাট, বন্ধ করিয়া দিলেন—বাইরে বালিকা মনোরমা হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—

'ভাই হেমচন্দ্র, এ ঢাল কিসের চামড়া?'

কি অপূর্ব ভাবান্তরে কি অপূর্ব কবিত্বই দেখিলাম!

এ সকল তবু এক রকম বুঝান যায়। কিন্তু সেই মনোরমার কথা—'কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী' বুঝাইয়া উঠা যায় না। কথা কহিতে কহিতে মনোরমা যেন হৃদয়স্থ অনন্ত প্রণয়-সমুদ্র দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—যত্ন-লুক্কায়িত, হৃদয়মন্দিরের চির-বদ্ধ দ্বারদেশ হঠাৎ উন্মুক্ত-প্রায় দেখিয়া সহসা ঈষৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন—নিজের আত্মসংযমের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন

দেখিয়া সহসা যেন বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। নিজের হৃদয়ের কথা নিজেই জানিতে পারিয়া যেন ক্ষণিক আত্মহারা হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। তাই উক্ত কথাকয়টি মুখ দিয়া বহির্গত হইল। কথাগুলিতে মনোরমার হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিল, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। ইহার পরেও মনোরমা প্রণয়ের কথা কহিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভাবে আর না। আবার যখন উচ্ছ্বাসের সময় আসিল, বুদ্ধিমতী মনোরমা সকল কথা চাপা দিলেন; বলিলেন—

'ভাই এ ঢাল কিসের চামড়া ?'

এ হেন মনোরমা বহুরূপিণী নয় কি ?

৩। আর একদিন মনোরমা পশুপতির অষ্টভুজার মন্দিরে পূজাবশিষ্ট কতকগুলি ফুল লইয়া বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতেছিলেন—পশুপতি প্রণাম-বন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন। পশুপতি কহিলেন, 'মনোরমা কখন আসিলে ?'—মনোরমা কথার কোন উত্তর দিলেন না। পশুপতি কহিলেন 'আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।'

মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে কহিলেন, 'আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে পড়িতেছে না।' কি বলিতে মনোরমা এখানে আসিয়াছিলেন, পাঠক বলিতে পার ?

মনোরমা মুগ্ধ হইয়া পশুপতির সে দিন পাপ-পথে অগ্রসর হইবার একমাত্র বাধাটি অপসারিত করিয়াছিলেন, মনোরমার সে মোহ কিন্তু অধিক সময় ছিল না—মোহান্তে মনোরমা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কাজটি তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই. আজ মনোরমা তাহাই কি পশুপতিকে বলিতে আসিয়াছিলেন ? পশুপতিকে পাপপথ-প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিবেন ইহা মনে করিয়াই কি মনোরমা অদ্য এখানে আসিয়াছিলেন ? পশুপতি মনোরমার প্রণয়-পাত্র। প্রণয়-পাত্রের নিকটে কত কথা বলিবার থাকে, বিশেষত মনোরমার ত কথাই নাই, তাঁহার আকণ্ঠ কথায় ভরা, তাহারই কি কোন কথা পশুপতিকে বলিবার জন্য অদ্য মনোরমা আসিয়াছিলেন ? যে কথাই বলিবার জন্য আসুন না কেন, মনোরমা বলিতে পারিলেন না কেন ? পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়াই কি

মনোরমা সব ভুলিয়া গেলেন? তাহাই বটে। পূর্ণমাত্রায় দুই ইন্দ্রিয়ের কাজ একেবারে চলে না।

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ?' মনোরমা কহিলেন, 'দেবতা প্রণাম করিতে'। গোল ফুরাইয়া গেল।

"পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, 'তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমা, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন, তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কিনা'?"

মনোরমা তখন একটা বিড়ালের গলায় মালা পরাইতেছিলেন—বিড়াল মালা পরিবে কেন? পরিশেষে সেই ছেঁড়া মালা পশুপতির গলদেশই শোভা করিল। মনোরমা বিনাসূত্রে গাঁথা প্রণয়ের মালা পশুপতিকে পরাইলেন। পশুপতি কিছু বুঝিলেন না। নাই বুঝুন, সেই সময়কার মনোরমার চিত্তভাব যেরূপ সৌন্দয প্রকাশ করিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল।

"তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইলেন—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইলেন। পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন, ক্ষণেক মনোরমার মুখের প্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন মনোরমা প্রৌঢ়বয়সী মহিমময়ী সুন্দরী। পশুপতি কহিলেন, 'মনোরমে, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী, আমাকে বিবাহ কর।' মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—

'পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায়?'

পাঠক! মনোরমার এ অপূর্ব ভাবান্তরের কারণ বুঝিলে কি? যাই পশুপতি মনোরমাকে আলিঙ্গন জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন অমনি বালিকা মনোরমার হৃদয়ের দ্বার বন্ধ হইল; প্রৌঢ়া, জ্ঞানী মনোরমা বাহিরে উপস্থিত হইলেন। যখন যাহার আবশ্যক যে সময়ের যাহা, এক মনোরমা হইতে সে সময়ে তাহাই প্রকাশিত হয়। অদ্য পশুপতি আত্মসংযমে অপরাগ হইয়া তাঁহার বিবেচনায় বিধবা রমণীকে আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন হিন্দুরমণী মনোরমা পতিকে এহেন কুকার্য করিতে কি প্রশ্রয় দিতে পারেন? আর হিন্দুরমণী কি কুলটা বলিয়া পরিচিতা হইয়া সোহাগ কামনা করিতে পারে? তাই

মনোরমা অমন চকিত হইয়া ফিরিলেন। জ্যোতির্বিদের কথাটিও তখন মনে হইয়া থাকিবে। এ সকলই পূর্বচিন্তিত কথা। পশুপতির সহিত মনোরমা যখন অত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছেন তখন পশুপতি ঐরূপ অধীর হইলে মনোরমা কিরূপ কার্য করিবেন তাহা মনোরমার স্থিরই রহিয়াছে। সেই ভাবনা, সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইল, তাই মনোরমা চকিতের ন্যায় পশুপতির নিকট সরিয়া গেলেন। পূর্বের সিদ্ধান্ত না থাকিলে, আত্মসংযমী মনোরমার পক্ষে পশুপতির এ উচ্ছ্বাসের সময় স্থির থাকা কষ্টকর হইত। যেরূপ পশুপতির উক্ত কার্যে তাহার অন্তরস্থ জ্ঞান-প্রদীপ হঠাৎ বাহিরেও জ্বলিল—কারণ বাহিরে তাহার উপকরণ প্রস্তুত—বাহিরে তাহার কার্যের সময় উপস্থিত।

এ হেন মনোরমা প্রহেলিকা নয় ত কি?

(প্রচার, ১২৯৫)

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী

(আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম)

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

বঙ্কিমচন্দ্র গোড়ায় যেমন ভাবে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে শেষের তিনখানি উপন্যাস লেখেন নাই। গোড়ায় তিনি কাব্যসৃষ্টি, ভাবসৃষ্টি এবং রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষে একটা উদ্দেশ্য লইয়া তিনি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্বে গুরুশিষ্যের কথোপকথনে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে অনুশীলন-তত্ত্ব একটা কল করিয়া বুঝাইয়া দিব। সে কল উপন্যাস; সে কল তাঁহার শেষের তিনখানি উপন্যাস। এই তিনখানি উপন্যাসের বিন্যাস বুঝিতে পারিলে, বুঝা যাইবে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-তত্ত্ব কি ভাবে এবং কোন দিক দিয়া বুঝিতেন।

গোড়ায় বলিয়া রাখি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি হিসাবে পেটরিয়ট ছিলেন। তিনি সমাজের মঙ্গলকামী কবি ছিলেন। তিনি সমাজকে ইউরোপের আদর্শে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গড়িতে কখনই চেষ্টা করেন নাই। তিনি Iconoclast পুরাদস্তুর ছিলেন না; Eclecticism-এরও তিনি ষোল আনা সমর্থন করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সজ্ঘাতে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে আচার-ব্যবহারগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্তনকে দেশের ও জাতির প্রকৃতির অনুকূল করিয়া পরিচালিত করা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীরই কর্তব্য। কম্‌টি-র পজিটিভিজম তাঁহার মনীষার উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, প্রতিবেশ-প্রভাব আমরা এড়াইতে পারিব না, আমাদের অতীতের ইতিহাস এবং তজ্জন্য শ্লাঘা-বুদ্ধি আমরা পরিহার করিতে পারিব না, আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং যে উপায়ে জাতিকে ধরিতে পারি, জাতির নিম্নস্তরগুলিকে টানিয়া, সঙ্গে করিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি সেই উপায়ই আমাদের অবলম্বনযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার প্রাদেশিকতার ভাবটা সর্বপ্রথমে ফুটাইয়া তোলেন। তিনি অনেকবার বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বাঙ্গালী প্রথমে নিজেকে চিনিতে শিখুক, নিজের জাতির দোষগুণ বিশ্লেষণ করিতে পারুক, তবে সে গোটা ভারতবর্ষের চিন্তা করিতে পারিবে ও জানিবে। কবি রঙ্গলাল হইতে হেমচন্দ্রের প্রথম দশা পর্যন্ত বাঙ্গালার আধুনিক কবিগণ গোটা ভারতবর্ষ লইয়া দেশহিতৈষণা বা দেশাত্মবোধের চর্চা করিতেন। তখন বাঙ্গালার কবি রাজস্থান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, পুরাণ ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয় নাই, তখন বাঙ্গালী ইংরেজের দেওয়া কাপুরুষতার দুরপনেয় কলঙ্ক-লেপে কলঙ্কিত ছিলেন। এ কলঙ্কের ভঞ্জনের চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বাগ্রে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রই আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম লিখিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্কাপনোদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। "বন্দে-মাতরম্" বাঙ্গালার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে; এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কথা আছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ইঙ্গিত মাত্র নাই। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালার পরিচায়ক, বাঙ্গালিত্বের পরিচায়ক, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বাঙ্গালী; দেবীচৌধুরাণী বাঙ্গালী কুলাঙ্গনা, সীতারাম বাঙ্গালী ভৌমিক, চন্দ্রচূড় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এই তিনখানা উপন্যাসই বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছে। "বন্দেমাতরম্" গানই বাঙ্গালীকে বঙ্গভূমিকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গভঙ্গের সময়ে, যখন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালার উপর বজ্র নিপতিত হইল, তখনই "বন্দে মাতরম্" গান বাঙ্গালীর কোটি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মালমসালা বঙ্কিমচন্দ্র তৈয়ারি করিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। বঙ্গভঙ্গে সে সময় ও সুযোগ দেখা দিল, আর আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম নূতনভাবে বাঙ্গালার লোক-লোচনের গোচর হইল। এই তিনখানি উপন্যাস বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের ত্রিপদ বেদী।

এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা

সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন ; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা state বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে তাহার পর্যায় দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত, জাতিগত এবং সংস্কার-গত দোষে বা চ্যুতির ফলে কেমন করিয়া আদর্শ সৃষ্ট হইল না, তাহাও তিনি অপূর্ব চরিত্রোন্মেষ সাহায্যে দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। তন্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তকে মান্য করিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যায়ে একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তন্ত্র বলেন যে, সর্বাগ্রে ব্যষ্টি বা সাধককে তৈয়ার করিয়া তুলিতে হইবে, পরে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির প্রভাবে সমাজকে আদর্শের অনুকূল করিতে হইবে, শেষে সমন্বয় সাধন করিয়া মাতৃরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র কম্‌টি-র ফিলজফির প্রেরণায় সর্বাগ্রে Environment বা প্রতিবেশ-প্রভাব ঠিক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জাতির সহিত কাজ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। মায়ের খাস তালুকের প্রজা হইতে হইলে গৈরিক বসন ধারণ করিতে হইবে। সমাজ-সংস্কার, ধর্মপ্রচার বা জাতির উদ্বোধন বাঙ্গালায় সর্বত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী ছাড়া কেহ করে নাই, কেহ পারে নাই। তাই সন্ন্যাসীর গৈরিক লেখা তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা-গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। আনন্দমঠে মহেন্দ্র সিংহ সন্তান বটে, কিন্তু তিনি সন্ন্যাস পান নাই। দেবী চৌধুরাণী ব্রাহ্মণকন্যা ; সীতারাম কায়স্থ ভৌমিক ও সেনাপতি। আনন্দমঠে তিনি ঠিক সাম্প্রদায়িক ভাবে সমাজের সংস্কার চেষ্টা করিয়াছেন ; দেবী চৌধুরাণীতে শক্তিকে সর্বসিদ্ধির আধারভূতা করিয়া বঙ্গীয় মানবতার উন্মেষ-সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন ; সীতারাম উপন্যাসে শক্তি বিরূপা হইলে, পুরুষ মোহান্ধ হইলে, কেমন বাড়া ভাতে ছাই পড়ে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালিত্বের শ্লাঘা ও অপহ্নব ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।

মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আদিরসের মহাকবি। তাঁহার সকল উপন্যাসেই আদি-রসের নানা অবস্থাগত বিশ্লেষণ আছে। তিনি বাঙ্গালার ইংরেজি-নবীশ বা

উদ্ধত নায়কনায়িকাই ভাল করিয়া আঁকিয়াছেন. মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সখা অন্য কোন ভাবের কথাই ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বিলাতের যে আদিরসের Romanticism বায়রণ হইতে ব্রাউনিং পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। শেষের তিনখানা উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াও তিনি আদিরসের হাত এড়াইতে পারেন নাই। আদিরসের মৈনাকের উপর তাঁহার অনেক ভাবের নৌকা ফাঁসিয়া গিয়াছে। যেন তিনি বাঙ্গালীকে বার বার বলিয়াছেন যে, এই আদিরসের গুপ্ত পর্বতের সংঘাতে তোমার তন্ত্র ধর্ম, তোমার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম—তোমার সকল ধর্ম, সকল সম্প্রদায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, —চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যদি ইউরোপের আদর্শে দেশাত্মবোধের অর্ণবযান বাঙ্গালার ভাবের লহরের উপর ভাসাইতে হয়, তাহা হইলে সাবধান —আদিরসের চোরা বালির উপর, ডোবা পাহাড়ের উপর দিয়া নৌকা চালাইও না ; পূর্বেকার অনেক সাধের সামগ্রীর মতন উহাও ফাঁসিয়া যাইতে পারে। ভবানন্দের কল্যাণীর রূপে মোহ, দেবী-রাণীর ব্রজেশ্বরের প্রতি মোহ ও ঘর-গৃহস্থালীর প্রতি অনুরাগ, সীতারামের শ্রীর জন্য উন্মত্ততা, শ্রীর ভ্রাতার—গঙ্গারামের—রমার রূপে মোহ,—এ সকলই উদ্ভট হইলেও ঐ এক কথাই বুঝাইতেছে,—ঐ রিরংসার হলাহল-বিস্তারের পথ ও প্রণালী দেখাইয়া দিতেছে। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় dramaকে নষ্ট করিয়া, উৎকটের আশ্রয় লইয়া উপদেশের সার্থকতা সাধনে অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি যে situation সৃষ্টি করিতে যাইয়া এতটা প্রমাদ করিবেন, ইহা ত বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না!

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক ইতিহাস-কথা ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতটা প্রচারিত হয় নাই। তিনিই বরং বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার ইতিহাস জানিতে ও বুঝিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার অনেক বিস্মৃত কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার নারী চিরদিন এমন বিহ্বলা ও অবলা ছিল না। তিনি ত জানিতেন না যে, বাঙ্গালার অধ্যাপক-গৃহিণী স্বামীর অনুপস্থিতিকালে ছাত্রদের ন্যায় ও অলঙ্কার পাঠ দিতেন। তিনি ত বাঙ্গালার ভৈরবী দেখেন নাই, এমন কি বাঙ্গালার শেষ ভৈরবী বিন্দুবাসিনীকেও দেখেন নাই। তিনি জানিতেন না যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঘরের মেয়েরা

এখনকার মতন কাপড় পরিত না, তাহাদের অনেকের হিন্দুস্থানী বা দাক্ষিণাত্যের ঢঙের কাপড় পরা ছিল। এখনকার কাপড় পরা ইংরেজের আমলের কিছু পূর্ব হইতে ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে যে সত্যই লড়াই করিতে পারিত, পাঠানদের সহিত লড়াই করিয়াছিল, রঘু-ডাকাতকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে খবর তিনি ঠিক মত জানিতেন না। অর্থাৎ এ সকল সমাচারকে তিনি historical truth বলিয়া গ্রহণ করিবার অবসর পান নাই। ডেপুটী ম্যাজেষ্টারী চাকরী করিতে করিতে বাঙ্গালার অনেক জেলায় তাঁহাকে ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেকের মুখে অনেক গাল গল্প, অনেক কিম্বদন্তী তিনি শুনিয়াছিলেন। তাহারই উপর স্বীয় অপূর্ব কল্পনা চড়াইয়া তিনি শান্তি, শ্রী, নন্দা, প্রফুল্ল প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়াছেন। ঐ সকল চিত্র ঠিক বাঙ্গালার নহে, অথচ উহাদের উপরে বাঙ্গালিত্বের মোটা পালার রঙ, বেশ জোর করিয়া বসান আছে। শ্রীকে বা শান্তিকে দেখিলে মনে হয়, যেন উহারা বাঙ্গালার ভৈরবী, বাঙ্গালার কুলাঙ্গনা, অথচ একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় বাঙ্গালায় এমন চরিত্র ফুটিবার নহে; তথাপি কিন্তু উহাদের উপর এমন একটা বাঙ্গালিয়ানা মাখান আছে, যাহার মোহ এড়ান যায় না। এইভাবে কতকটা কাল্পনিক, কতকটা আধুনিক উপাদান লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষের তিনখানা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

এই তিনখানা উপন্যাসের situation বা ঘটনা-সঙ্গতি ফুটাইতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সাহায্য লইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ঐতিহাসিকতা বজায় রাখেন নাই। আলেখ্যের ground-work বা ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যত্যয় ঘটান যায় বটে। উপন্যাস ইতিহাস নহে, একথাও ঠিক বটে; কিন্তু তিনি এই তিনখানা উপন্যাসের কোন খানাতেই ground বা ক্ষেত্র তৎকালোপযোগী করিতে পারেন নাই। Detail বা খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে তাঁহার আলেখ্যের ক্ষেত্র আধুনিকতা-দোষে দুষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে এ দোষ পরিহার করিতে পারিতেন না তাহা নহে; তিনি উপন্যাসের purpose বা উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ক্ষেত্রের প্রতি, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি, আলেখ্যের আলো ও ছায়ার প্রতি তিনি তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কপালকুণ্ডলা যিনি লিখিয়াছেন, তিনি যে কারিকর মন্দ

ছিলেন, এমন কথা বলা অসাধ্য। কিন্তু এই তিনখানা উপন্যাস লিখিবার সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, চিত্রকলার প্রতি তেমন নজর রাখিতে পারেন নাই; অথবা ইচ্ছা করিয়াই রাখেন নাই। এই তিনখানা উপন্যাসে যে সকল চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহাদের mentality বা মানস-উন্মেষ আধুনিকতা দোষে একটু দূষিত হইয়াছে। এ দোষ কতকটা অপরিহার্য। কারণ যাহাদের উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই তিনখানি উপন্যাস লিখিত হইয়াছিল তাহারা যে আধুনিক স্ত্রী-পুরুষ। তাহাদের সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, সন্দেহ-নিরসনের জন্যই তিনি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার অঙ্কিত নরনারীর চিত্রে আধুনিকতার দোষ অপরিহার্য হইয়াছে। উদ্দেশ্যসমন্বিত উপন্যাস লিখিতে যাইলে এ দোষ ঘটিবেই। বঙ্কিমচন্দ্রকে এজন্য দোষী করা যায় না। কিন্তু এক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী নির্দোষ; তিনি সন্ন্যাসীর চিত্র অনেকটা নিখুঁত করিতে পারিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি ভাল সন্ন্যাসীর সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শ ভাল ছিল। ফলে চিত্রও তাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর চিত্র তিনি তাঁহার সকল উপন্যাসেই লিখিয়াছেন, এবং সে সকল চিত্রে সন্ন্যাসীর বৈশিষ্ট্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কয়টা মোটা কথা গোড়ায় বলিয়া রাখিয়া এই তিনখানি উপন্যাসের এক একখানি করিয়া আমার বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

(২)

নানাভাবে অনুশীলন-তত্ত্বটা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ অনুশীলন তত্ত্বটা কিন্তু খাঁটি ইউরোপের সামগ্রী। জর্মণ পণ্ডিত ফিক্‌তের (Fichte) 'Individual and Communal Culture' ব্যষ্টি এবং সংহতির অনুশীলনটাই তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া, বাঙ্গালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় আছে, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তাহার কোন আদর্শের অনুকূল নহে। উহা যেন বিলাতের Lake Poet-দিগের Susquehanna প্রদেশে Utopia সৃষ্টির জন্য আদর্শ,—প্রটেষ্ট্যাণ্ট Monk-দিগের অনেকটা অনুরূপ। গেরুয়াও থাকিবে এবং ঘরে পত্নীও থাকিবে, ব্রত-উদ্‌যাপনের পরে সে পত্নীকে লইয়া ঘর করিবার আশা তুষানলের

মতন হৃদয়ে সদা জ্বলিতে থাকিবে, এমন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ছিল না—হয় নাই। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাহারা শক্তি রাখিত বা শৈব বিবাহ করিত তাহারা গেরুয়াবসন পরিত না, রক্তাম্বর ধারণ করিত। গৌড়ীয় ভেক-ধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে গৈরিকের প্রচলন নাই; উহারা গেরুয়া বা রক্তবস্ত্র পরিধান করিত না। এই সস্ত্রীক সন্ন্যাসীর দল গড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটু গোলে পড়িয়াছিলেন। সে গোল শান্তির জবরদস্তি, ভবানন্দের কল্যাণী-মোহ আদি উদ্ভট ব্যাপারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য মনীষা বুঝিয়াছিল যে, তেলে-জলে মিশ খায় না; পত্নী থাকিবে, অথচ স্বামী ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজিবে; আর পত্নী জাগান দেওয়া আমটির মতন পাতায় ঢাকা হইয়া চিরজীবন কাটাইবে - অন্ততঃ যৌবন কাটাইয়া দিবে—এমন অঘটন ঘটাইতে হইলে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী উভয়ের পতন ও ব্রতভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। গৃহানুরাগ বা domesticity বজায় রাখিয়া, বাঙ্গালিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন চিত্র পূর্ণাঙ্গ করা যায় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের চরিত্র-চিত্রণে গোটাকয়েক কলঙ্করেখা স্পষ্ট রাখিয়াছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, সমষ্টির কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিবিশেষের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। যখন আনন্দমঠ রচিত হয়, তাহার পূর্বে জর্মণ জাতির সমন্বয় বা 'জলভরীণ' হইতে National cohesiveness বা জাতি-সংহতি হইয়া ইউরোপে এবং আমেরিকায় খুব আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের ফলে একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কার্ডিন্যাল নিউম্যান এপক্ষে অনেক কথা সে সময়ে কহিয়াছিলেন। আমার অনুমান হয় যে, আনন্দমঠের গড়নে নিউম্যানের ভাবের মালা অনেকটা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখিয়া বাঙ্গালীকে এই কথাটা যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন যে, ইউরোপের ভোগপ্রচুর শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে জাতির মঙ্গলকামী কর্মী হইতে হইলে দেশীয়ভাবে ত্যাগী হইতে হইবে। তেমন কর্মীকে সর্বাগ্রে এমন পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, যাহা দেখিলে বাঙ্গালার আপামরসাধারণে চিনিতে পারে; এবং চিনিয়া স্বেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিতে পারে। এইটুকু ইশারা করিয়া গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের জর্মণ জাতির প্রচারিত সমাজতত্ত্ব ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া বলিতে হইতেছে বলিয়া আনন্দমঠের সন্ন্যাসী না পুরা তান্ত্রিক, না পুরা বৈষ্ণব। উহারা মানুষও মারিতেছে, আবার "ধীর সমীরে যমুনাতীরে" গান করিতেছে।

উহাদের তান্ত্রিকী সাধনা নাই, বৈষ্ণবের জপযজ্ঞ এবং কীর্তন-আনন্দও নাই। উহারা পরোপকার করিতেছে · কোম্পানীর মাল লুটিয়া, কোম্পানীর নিরীহ সিপাহীকে খুন করিয়া উহারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাকে ক্ষুধার অন্ন দিতেছে। পরোপকারের এমন উৎকট আদর্শ আমাদের শাস্ত্রে নাই, ধর্মে নাই; বিশেষতঃ কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-ধর্মে নাই। কারণ আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর আদর্শের তলায় বিলাতী পেট্রিয়টিজম্ আছে, ইউরোপের outlawryর মোহন অংশটুকু অঙ্কিত আছে। এই অপূর্ব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কাঠামোর উপর বঙ্কিমচন্দ্র এক অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন। এ কাব্যে বৈষ্ণবের মাধুরী আছে, তান্ত্রিক শক্তির তেজস্বিতা আছে এবং আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের idealism-এর মোহ আছে। এই তিনের সমবায়ে আনন্দমঠের গল্পটা খুব জাঁকাল হইয়াছে বটে; কিন্তু সিদ্ধান্ত বাক্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। হয়ত বা অন্য নানা কারণে তিনি ইচ্ছা করিয়া তাহা ফুটান নাই। তাই আনন্দমঠের অনেক কথা ঢাকা আছে; সেই কারণ উহার নাট্যাংশ ও উপদেশাংশ উভয়ে উভয়ের অনুবাদী (complementary) হয় নাই। আনন্দমঠে জীবানন্দ ও শান্তিই কেন্দ্রচরিত্র। এই দুই চরিত্র যে ভাবে ফুটান হইয়াছে, সে ভাবে চরিত্রোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত-কথাগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে সত্যানন্দকে আনিয়া সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে, অনেক কথা মহাপুরুষের উপর বরাত দিয়া রাখা হইয়াছে। আনন্দমঠের মহিমা চরিত্রোন্মেষে নহে, চিত্রাঙ্কণে নহে, উহার মহিমা "বন্দে মাতরম্" গানে এবং মাতৃমূর্তি-প্রদর্শনে। শক্তি-প্রতিমাকে কেমন ভাবে দেশাত্মবোধের প্রতীকে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে আনন্দমঠে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাই আনন্দমঠের বিশিষ্টতা।

(৩)

দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার culture বা অনুশীলন-তত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ পরিস্ফুট। দেবীচৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে। দেবীচৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তি-মূর্তি —কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে; অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব বৈষ্ণবঠাকুরাণী। যখন শক্তি-মূর্তি তখন পুরুষ সম্মূঢ়, ব্রজেশ্বর পিতৃশাসনে

সম্মূঢ়, প্রফুল্লর রূপে সম্মূঢ়। এই পুরুষের তৃপ্তি-তুষ্টি সাগর বৌ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান বৌ এবং ঐশ্বর্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রফুল্ল বা দেবীচৌধুরাণী। প্রফুল্লকে সর্বৈশ্বর্য-শালিনী করিতে যাইয়া কবি গোলে পড়িয়াছেন। প্রফুল্লকে একরাত্রির জন্য স্বামিসঙ্গে সুখী করিয়া কবি সর্বৈশ্বর্যের পথে একটা কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিণাম দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের গৃহে আসিয়া বাসন মাজা ঘর-সংসার দেখা! যেমন কর্মী তেজস্বী ব্রাহ্মণ ডাকাতের হাতে দিয়া কবি দেবী-রাণীকে গড়িয়া তুলিলেন, সে গড়নের ফলে পুরুষ ব্রজেশ্বর সোনা হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু কবি প্রফুল্লের সংস্পর্শে ব্রজেশ্বরের মানবতার উন্মেষ ভঙ্গী দেখান নাই। যেন প্রফুল্ল আসাতেই নয়ান বৌয়ের ঝগড়া থামিল; সাগর বৌয়ের অভিমান দূর হইল, আর ব্রজেশ্বর যেন "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" পুরুষের হিসাবে, প্রফুল্লের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রফুল্ল, সাগর ও নয়ান বৌ—এই তিনগুণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই তিনের সমাধান করিলেন প্রফুল্ল, সংসারে একটা negative সুখের বা স্বস্তির লহর তুলিলেন প্রফুল্ল, ফলভোগী হইল ব্রজেশ্বর। এইটুকুর জন্য প্রফুল্লকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান সবই শিখিতে হইল, কুস্তী করিতে হইল, লাঠি খেলিতে হইল, নানা ভঙ্গীতে ত্যাগের মক্স করিতে হইল, দেবীরাণীর দোকানদারী বসাইতে হইল, ডাকাতের দলের সর্দার হইতে হইল। ভবানী পাঠকের গুরুগিরির পয-বসান হইল, সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর-গৃহস্থালীর কার্যে—বাসনমাজায় ও সপত্নী-বশীকরণে। আদিরসের কবি আদিরসটুকু ভুলিতে পারেন নাই, domesticityর লোভটুকু সামলাইতে পারেন নাই। এতটা শিক্ষার পরেও প্রফুল্ল বৈষ্ণবী হইতে পারিলেন না, তান্ত্রিক মতে শাক্ত ভৈরবী হইতেও পারেন নাই। ঝান্সীর রাণী বা রাণী দুর্গাবতীর বা বাঙ্গালার সোনাবিবির এত শিক্ষা হয় নাই, তথাপি তাঁহারা শক্তিরূপিণী ছিলেন, অঘটন ঘটাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বহু গ্রামে অপূর্ব শক্তিশালিনী ও সংযমপরায়ণা বহু ভৈরবী ও বৈষ্ণবী পূর্বে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শও প্রফুল্লের পরিণতি অপেক্ষা অতি উচ্চ স্তরের। গীতার হিসাবে সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাইয়া, নিষ্কাম ধর্মের ছবি আঁকিলে ব্রজেশ্বরেও প্রফুল্লর স্বামি-বোধ থাকিবে না; ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিশালতায় মিশিয়া যাইবে। তাই প্রফুল্ল-চরিত্র একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়; উহাকে শাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে কিংবা ইউরোপীয় দর্শনের মাপ-কাঠিতে

মাপিলেও পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ব্রজেশ্বরে শিবত্বের আরোপ করিয়া প্রফুল্লকে শক্তিরূপে খাড়া করিতেন, তাহা হইলে ব্রজেশ্বরের চিত্র অন্য প্রকারের হইত, প্রফুল্লও আরও একটু ফুটিত। অথবা যদি প্রফুল্লকে বৈষ্ণবী সাজাইতেন তাহা হইলে উহাতে হয় সুভদ্রার নহে ত রুক্মিণীর ছায়া পড়িত। দুইয়ের কোনটাই প্রফুল্লে পরিস্ফুট হয় নাই। এত করিয়াও যখন প্রফুল্লের স্বামীর ঘর করিবার আকাঙ্ক্ষা ঘুচে নাই, যখন সাগর বৌকে বজরায় ডাকিয়া রসভঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই, তখন প্রফুল্লে নিষ্কাম ধর্মের, গীতাতত্ত্বের স্ফূরণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ গীতার সিদ্ধান্ত-সকলের ছড়াছড়ি দেবী-চৌধুরাণীতে করা হইয়াছে। সাধক ভবানীপাঠকের আলেখ্যে কোন বিষম দোষ দেখি না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ব্রজেশ্বরের মতন পিতৃভক্ত বাঙ্গালী যুবক অনেক ছিল, ব্রজেশ্বরের জনকের মতন বিষয়ী বাঙ্গালী কর্তাব্যক্তি অনেক দেখিয়াছি, সাগর বৌ, নয়ান বৌ যে দুই একটা দেখি নাই তাহা নহে; কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্র অপূর্ব; উহা বাঙ্গালার নহে, অথচ বেশ বাঙ্গালিয়ানা-মাখান। উহা বাঙ্গালীর ঘরে কখনও ছিল না, বাঙ্গালীর ঘরে কখনও হইবে না। যে উদ্ভটতা শান্তিতে আছে, সে উদ্ভটতা প্রফুল্লেও ফুটিয়াছে। কোনটা বাঙ্গালার নহে, ভারতবর্ষের নহে, অথচ কোনটাকেই বাঙ্গালিত্বের গণ্ডি হইতে বাহিরে রাখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এইটুকুই কারিগরী—এইটুকুই শিল্প-নৈপুণ্য।

(৪)

সীতারাম উপন্যাসে যেন দেবীচৌধুরাণীর obverse proposition solve বা কতকটা বিরোধী ভাবের ব্যঞ্জনা দেখান হইয়াছে। এখানে পুরুষ প্রকট; সীতারাম রায় কর্মী ও তেজস্বী পুরুষ। তাঁহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা এবং রমা শ্রী যেন ঐশ্বর্য, নন্দা যেন হ্লাদিনী, রমা যেন হ্রী বা মেদিনী। রাজার রাণী যেমন হইতে হয়, ঘরণী গৃহিণী যেমন হইতে হয়, নন্দা তেমনই। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমতী, স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিতা, স্বামীর মর্যাদা-রক্ষায় সদা নিরতা; বাঙ্গালার গৃহস্থ কুলাঙ্গনার এক দিকের একটা আদর্শ নন্দা। রমা যেন মোমের পুতুল, সোহাগের খুঁচি, যেন আদিরসের মঞ্জুষা; স্বামীর সোহাগে সদাই যেন গলিয়া পড়িতেছেন; স্বামীর মহত্ত্বে বা গৌরবে গৌরবান্বিতা হইবার শক্তি নাই, স্বামীকে লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি বেশ আছে। ফলে, রমা সদা ভীতা

ও সঙ্কুচিতা ; সে স্বামীকে পাইলে পুতুল খেলা করিতে ভালবাসে, স্বামীর রাজা-গিরির, দেশাত্মবোধের কোন ধারও ধারে না। এমন চীনের পুতুল, মোমের খেলনা, রাজা-বাদসা ধনীর ঘরে অনেক পাওয়া যায়। ইহাতে অস্বাভাবিকতা নাই। কিন্তু শ্রী—সে কেমন নারী। প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবার আশঙ্কায় শ্রী স্বামিবর্জিতা ; সে বর্জনকালে, কিশোর বয়সে তাহার কেমন শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল তাহার কোন পরিচয় গ্রন্থকার দেন নাই। শ্রী ফুটিল গঙ্গারামের রক্ষা ব্যাপারে, দ্বিদণ্ড বটশাখায় দাঁড়াইয়া লোক-সমাহরণে ও উৎসাহ দানে শ্রী ফুটিয়া উঠিল—বিদ্যাদিগ্গজের মত ভ্রাতা ও স্বামীর প্রাণ-সংশয় বুঝিয়া একবার শ্রী বাঙ্গালী মেয়ের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর শ্রী একটা প্রহেলিকা ; সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বটে, কিন্তু জগন্নাথের রথের দড়ির টানের মত তাহার হৃদয়ে স্বামি-ঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে। অথচ যখন সীতারাম তাহার দ্বারস্থ, তাহার জন্য পাগল, সে পাগলামীর ফলে রাজ্য যায়, স্বাধীনতা যায়, তখন শ্রী পাষাণী। এই পাষাণ ভাবটাই সীতারামের পুরুষকারের তাসের ঘর শেষে ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীকে allegory বলিতে পারি না কারণ allegoryর হিসাবে শ্রী চরিত্রোন্মেষ ঘটনা হয় নাই। শ্রী একটা abstractionও নহে ; কারণ অমন ভাবে abstraction ফুটিয়া উঠে না। সীতারাম হেন পুরুষ যে দেশের জন্য জাতির জন্য পাগল, যে স্বীয় পুরুষকারের প্রভাবে অঘটন ঘটাইয়াছিল, যাহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান মামুদাবাদ ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা,—তেমন একনিষ্ঠ সাধক এমন মোহে পড়িবে কেন? একনিষ্ঠার এমন পরিণাম হয় না। যাহার একনিষ্ঠা আছে, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে, নিশ্চিন্ত না হইলে, তাহার মন অন্য দিকে যাইবে না। সীতারাম বিপদ্‌বেষ্টিত হইয়াও পতঙ্গের ন্যায় শ্রীর রূপে পুড়িয়া মরিল। শ্রীই বা এমন কোন্ দেশের ভৈরবী যে ধর্মরাজ্য ছারেখারে যাইতেছে দেখিয়াও টলিল না, সর্বনাশ করিয়া তবে বাহির হইল। এমন allegory আমি বুঝিতে পারিলাম না। সাধন-শাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে ইহা বুঝি না, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের মাপকাঠি লইয়া ইহার পরিমাণ করিতে পারি না। তাহার পর গঙ্গারাম ও রমা—এক অপূর্ব ব্যাপার। গঙ্গারাম সীতারামের কৃপায় সব পাইয়াছিল, জীবন, পদ, ঐশ্বর্য, মান-সম্মান, তাহার ইহজীবনের সর্বস্বই সীতারাম-দত্ত। সেই গঙ্গারাম নগরপাল, অবশ্যই বীর ও যোদ্ধা। নগরপালের হিসাবে, শ্রীর ভাইয়ের হিসাবে

রমা তাহাকে ডাকিতে পারে। তাই বলিয়া গঙ্গারামকে সহসা রমার রূপে পাগল করিয়া তুলিতে কোন আদিরসের কবি পারেন না, সাহসে কুলায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে লাভ হইল কি? সিদ্ধান্তবিকাশের পক্ষে উহা সহায়তা করিল না, আদর্শ ফুটাইবার পক্ষে উহা কাজে লাগিল না, ক্ষেত্রের মার্জ্জনা পক্ষে উহার কোন প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের প্রেম এবং শ্রীর প্রতি সীতারামের মোহ যেন allegoryর হিসাবেও ঠিক খাপ খায় না। অথচ এই উপন্যাসের এই দুইটি ঘটনাই মহাপ্রাণ, গল্পটা এই দুইটি ঘটনার উপরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পের Tragedy এই দুই ঘটনা হইতেই পরদায় পরদায় খুলিয়াছে। ফলে, এই দুইটা ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায় না; বর্জন করা চলে না। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, গল্পের বনিয়াদের সহিত এই ঘটনা দুইটি খাপ খায় না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধের অনেক কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী চরিত্রের কোথায় কতটা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। Art-এর হিসাবে তিনখানা উপন্যাসে দোষ থাকিলেও, উপদেশের হিসাবে উহা পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ। সে উপদেশ-কথা সেই বলিবে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার শেষ পরিণতি বুঝিয়াছে, যে ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তসকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। শুশ্রূষু না হইলে তত্ত্ব-কথা বুঝান যায় না। তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালীর সম্মুখে বহুকাল পড়িয়া আছে; উহাদের পর্যাপ্তভাবে অভিনয় হইয়াছে, বহু লোকে উহা পাঠ করিয়াছে, কিন্তু উহাদের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা ঠিকমত হয় নাই। দেশ, কাল, পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি বলিতে বাধ্য যে, উহাদের বিশ্লেষণের সময় ও শুভ অবসর এখনও দেখা দেয় নাই। যে ভাবে "বন্দে মাতরম্" মহাগীতি ফুটিয়াছিল সেই ভাবে এই তিনখানা উপন্যাসের তত্ত্বকথাও ফুটিয়া উঠিবে। সেই বিধাতার কৃপা-সাপেক্ষ। তাই আমি উহাদের নাম দিয়াছি – ত্রয়ী। ত্রয়ী ইষ্টের করুণা ছাড়া বুঝা যায় না। এই তিনখানিও বুঝিবার দিন-কাল আছে। এখন আমি বাহিরের মোটা কথা কয়টার উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলাম।

নারায়ণ, ১৩২২)

বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ

বীরেশ্বর পাঁড়ে

(১)

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রভাবে এ দেশের শিক্ষিতগণের মতিগতি অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। শিক্ষিতগণ বুঝিয়াছেন, এ দেশের রীতিনীতি অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতি অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট। সেই সংস্কার-প্রভাবে যাহাতে অশিক্ষিত জনগণ তাঁহাদের মতানুবর্তন করে, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য মতের সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন। সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদিতে সচরাচর এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। এরূপ প্রবন্ধ কুপথ-প্রদর্শক হইলেও তাদৃশ অনিষ্টকর নহে; কারণ তাহাতে তর্কযুক্তি আছে, বুদ্ধিমান লোকে সেই সকল যুক্তির আলোচনা করিয়া সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে পারেন। আমাদের জাতিভেদ-প্রথা, আমাদের বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য, আমাদের বিবাহ-প্রথা প্রভৃতি আমাদের অধঃপতনের কারণ, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা প্রভাবে এই তত্ত্ব অবগত হইয়া আমাদের শিক্ষিতগণ নানাবিধ তর্কযুক্তি দ্বারা সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অনিষ্ট হইলেও, পরিণাম শুভকর হওয়া সম্ভব। যুক্তিপথের অনুসরণ করিতে করিতে একদিন নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্য নির্ণীত হইবে এবং পূর্ব প্রথামধ্যে অপ্রচ্ছন্নভাবে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে সমধিক আলোচনা প্রভাবে তাহাও পরিত্যক্ত হইবে। সেই জন্যই বলি, তর্কযুক্তিময় প্রবন্ধ অনিষ্টকর নহে। কিন্তু যাঁহারা কাব্যনাটকাদিতে ঐ সকল অমীমাংসিত বিষয় মঙ্গলময়ভাবে সুরঞ্জিত করিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা দেশের অতিশয় অনিষ্ট সাধন করেন। অশিক্ষিতগণ যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করে না, কেবল নাটক নবেলই তাহারা পড়িয়া থাকে। তাহারা সে সকলের অনিষ্টকর ভাগ দেখিতে পায় না, কাজেই সুন্দর অংশের সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহার পক্ষপাতী হয় ও তদনুরূপ আচারপরায়ণ হইতে সযত্ন হইয়া উঠে। এই জন্য দূরদর্শী গ্রন্থকারগণ কাব্যনাটকাদিতে জাতীয় ভাবের বিরোধী বিষয়ের বর্ণনা

করেন না, কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আজিকালি লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারগণের দৃষ্টি সে দিকে কিছু মাত্র নাই।

এই স্থানে আমরা কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লিখিত কাব্য হইতে এই বিষয়ের সমালোচনা করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি। প্রখ্যাতনামা রাজা রামমোহন রায়কেই আমাদের নব্য সাহিত্যের প্রথম পদপ্রদর্শক করিতে হয়। তিনি অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কৃত কোন কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পরে সর্বপরিচিত বিদ্যাসাগর বঙ্গসাহিত্য-সংসারের নেতৃত্বপদে অধিরোহণ করেন। তিনিও কোন মূল কাব্য লিখেন নাই, যে সকল কাব্য লিখিয়াছেন, তৎসমস্তই গ্রন্থবিশেষের অনুবাদবিশেষ। তাহার পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পদ্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গদ্য কাব্যের পদপ্রদর্শক। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহারাই বঙ্গসাহিত্যকে প্রথমে নূতন পথে চালিত করেন। কিছু কিছু মৌলিকতা ইঁহাদেরই কাব্যে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন রামায়ণ মহাভারতাদি অবলম্বন করেন, ইংরাজী গ্রন্থের ছায়া বঙ্কিমের অবলম্বনীয় হয়। মধুসূদনের হৃদয় পাশ্চাত্ত্যভাবে এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি স্বীয় পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন, এবং পূর্ণ পাশ্চাত্ত্যভাবে বিচরণ করিতেন। তথাপি তাঁহার কৃত গ্রন্থাবলী মধ্যে আমাদের আচার-বিরুদ্ধ বিষয়ের আধিক্য দেখা যায় না। তাঁহার ভাষা, ভাব ও লিপিপ্রণালী পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন হইলেও পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতির প্রলোভনজনক নহে। বরং "একেই কি বলে সভ্যতা"-নামক প্রহসনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্ত্য প্রণালীর প্রতি ঘৃণাই দেখান হইয়াছে। এই গ্রন্থ আমাদের পতনোন্মুখ সমাজের অনেক উপকার সাধন করিয়াছে।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য ভাবে গঠিত হইয়াছিল। শেষকালে তাঁহার মত সমস্ত পরিবর্তিত হইলেও, প্রথমে তিনি গোঁড়া পাশ্চাত্ত্যবিষয়ানুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কাব্য হিন্দু রীতিনীতি ও হিন্দুভাবের বিরোধী নহে। প্রত্যুত তাঁহার কাব্যগুলিতে তিনি অহিন্দু ভাবের অপকর্ষই সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য অনেক পরিমাণে মৌলিক, অর্থাৎ তৎকৃত কাব্যসকলের মধ্যে যে সকল স্ত্রী-পুরুষের বর্ণনা আছে, তাহার অধিকাংশেরই চিত্র তাঁহার নিজের

অঙ্কিত। তিনি যেমন ইচ্ছা করিতেন, সেই প্রকারেই তাঁহার গ্রন্থোক্ত স্ত্রী-পুরুষগণের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। সমসাময়িক যুক্তিগর্ভ প্রবন্ধাদিতে তিনি পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতি সকলের উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন কাব্যে কোন বিরোধী বিষয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার সমস্ত কাব্যেই জাতীয় ভাব পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। যেখানে সেখানে কোন নায়ক-নায়িকার চিত্রে পাশ্চাত্ত্য ভাব দেখা দিয়াছে, সেইখানেই অমনি তাহার কুফলের সঙ্গে অপকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থগুলি হইতে ঐ সকল বিষয়ের সমালোচনা করিয়া দেখাইতে হইলে, একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এই স্থলে তাহা নিতান্ত অসম্ভব। বঙ্কিমবাবুর মত শেষ বয়সে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল। অর্থাৎ শেষে তিনি অনেক পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য আমরা তাঁহার শেষ বয়সের লিখিত পুস্তকের কথা কিছু বলিব না; যে সময়ে তিনি পাশ্চাত্ত্যভাবে নিমগ্ন, কেবল সেই সময়ের লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু দেখাইবার চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমবাবু যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ গুরুর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তৎসমস্তই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন, সকলেরই কিছু না কিছু যোগবল আছে, সকলেই মহাপণ্ডিত, সকলেই পরিণামদর্শী ও আপাতসুখসেবনে সকলেই বিরত। তাঁহার মাধবাচার্য, তাঁহার রমানন্দ স্বামী, তাঁহার চন্দ্রচূড়, সকলেই বিলক্ষণ ভক্তির পাত্র। তাঁহাদের অধ্যবসায়, তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, তাঁহাদের স্বজন-হিতৈষণা অতি অদ্ভুত ও হিন্দুভাবাপন্ন, সকলেরই তাহা শিক্ষণীয়। ইহসংসারে স্বার্থপরতাজনিত সামান্য সুখ তাঁহাদের প্রদর্শিত সুখের নিকট নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি যে সকল স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎসমস্তই হিন্দুনারীর চরিত্র। বিমলার চরিত্রে কিয়ৎ পরিমাণে পাশ্চাত্ত্যভাবের সমাবেশ হইয়াছে অর্থাৎ বিমলা কিছু স্বাধীনা, কিছু প্রগল্‌ভা; কিন্তু বিমলার সেই স্বাধীনভাবে বিচরণেই বীরেন্দ্রসিংহের সর্বনাশ সাধিত হইল। বিমলা যে রজনীতে জগৎসিংহের সহিত দেখা করিবার জন্য শৈলেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন, সেই রজনীতে বিমলা কর্তৃক মুক্ত বাতায়ন-পথে কতলু খাঁর সেনানী ওস্‌মান খাঁ বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গে প্রবেশ করেন এবং বল-প্রদর্শনে বিমলার নিকট হইতে দুর্গের সমস্ত চাবি লইয়া দুর্গ অধিকার করেন।

বঙ্কিমবাবুর কোন নায়ক-নায়িকারই অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই, কোন বিবাহই অহিন্দু মতে সম্পন্ন হয় নাই। তিনি যে কেবল শাস্ত্রসম্মত ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহা নহে, সামাজিক নিয়মেরও কোনখানে ব্যভিচার হইতে দেন নাই। বীরেন্দ্রসিংহ বিমলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির আশায় চোরের ন্যায় অন্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তথাপি শূদ্রগর্ভজাত বলিয়া বিমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই; দাসীভাবে বিমলা চিরকাল বীরেন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বিমলার গর্ভে কোন সন্তানও জন্মগ্রহণ করে নাই। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের হস্ত হইতে নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য কাপালিকের আবাসে কপালকুণ্ডলার আর স্থান হইবে না, প্রত্যুত দর্শন পাইলে কাপালিক নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণসংহার করিবেন। নবকুমারের সঙ্গে যাওয়া ভিন্ন তাঁহার প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ই নাই। কিন্তু অপরিচিত যুবকের সঙ্গে যুবতী কপালকুণ্ডলার যাওয়াও ত উচিত নয়। সুতরাং সে সময়ে উহাদের পরস্পরের বিবাহ ভিন্ন কপালকুণ্ডলার ধর্ম ও প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ই ছিল না। এ অবস্থায় আধুনিক অনেক গ্রন্থকার তাঁহাদের জাতির কথা যে তুলিতেন না এবং বিবাহ যে গন্ধর্ব বিধানেই সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্কিমবাবু এরূপ প্রয়োজনীয় স্থলেও তাহা করেন নাই। তিনি অধিকারীকে কন্যাকর্তা করিয়া তাঁহার দ্বারা যথানিয়মে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অধিকারী অগ্রে নবকুমারের পরিচয় লইলেন, তাঁহার গাঁই, গোত্র প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া যখন জানিলেন, বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে, তখন নবকুমারের নিকট বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, পরে অধিকারী পুঁথি দেখিয়া লগ্ন স্থির করিলেন এবং তাঁহাদের উভয়কেই যথাবিধানে উপবাসাদি করাইয়া তাঁহাদের পরিণয়-কার্য সম্পাদন করিলেন। "এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদূর যথাশাস্ত্র কার্য হইল।"

মাধ্যাকর্ষণ যেমন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ভালবাসা সেইরূপ আমাদের সমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভালবাসা বা প্রণয় না থাকিলে সমাজের স্থিতি হয় না। এই প্রণয় পাত্রভেদে ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, স্নেহ, প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রণয় এক পক্ষের মধ্যে জন্মিলে সে প্রণয় দ্বারা কোন কার্য হয়না, উভয়পক্ষে প্রণয় জন্মিলে তবে সে প্রণয়ে মনুষ্যের সুখ ও কার্য হয়। কিন্তু প্রণয় সকল অবস্থায় স্থায়ী হয় না, অনেক সময়েই কোন

কারণ ঘটিলে প্রণয়ভঙ্গ হইয়া যায়। অতি গভীর প্রণয়ও সামান্য কারণে ভাঙ্গিয়া যায়। যেখানে প্রণয়ীদিগের উভয় পক্ষে সাম্যভাব সেইখানেই ঐরূপ প্রণয় ঘটে। যেখানে এক পক্ষের প্রণয় অন্য অপেক্ষা, গভীর, সেখানে সহজে প্রণয়-ভঙ্গ হইতে পারে না। মাতা পুত্রকে ভালবাসেন, পুত্রও মাতাকে ভালবাসে, কিন্তু পুত্রের ভালবাসা অপেক্ষা মাতার ভালবাসার পরিমাণ অনেক অধিক। এজন্য, মাতা-পুত্রের প্রণয়ভঙ্গ প্রায়ই হয় না। পুত্র অপেক্ষা পিতার ভালবাসা অধিক, কিন্তু মাতার তুল্য নহে। সেই জন্য পিতা-পুত্রকে কখন কখন বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায়। অনেক পিতা অযোগ্য পুত্রকে ত্যাগ করেন, কিন্তু মাতা কখন পুত্রকে ত্যাগ করেন না। "কুপুত্র হয়েছ তুমি, কুমাতা হব না আমি" ইহা চিরকালের প্রবাদ। ভাইয়ে ভাইয়ে যে প্রণয়, তাহা প্রায়ই উভয় পক্ষে সমান-ভাবাপন্ন সেই জন্য সামান্য কারণে, বিষয়ের সামান্য প্রলোভনে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ঘটে।

উপরে যে সকল প্রণয়ের কথা বলা হইল, তৎসমস্তই জন্মসম্বন্ধজাত বা সহজ। কিন্তু গুরুভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, বন্ধুপ্রীতি ও দাম্পত্য প্রেম,—এগুলি সহজ নহে, কারণ, এগুলি কারণজ প্রণয়, গুণ ও রূপসাপেক্ষ। তন্মধ্যে দম্পতী-প্রণয় সংসারবন্ধনের মূলীভূত কারণ। দম্পতীপ্রণয় স্থায়ী না হইলে সংসার সুখের স্থান হয় না, এমন কি সংসারই হয় না। কেন না কি পিতৃমাতৃভক্তি, কি সৌভ্রাত্র সমস্তই দম্পতীসাপেক্ষ। সেই জন্য দাম্পত্য প্রণয়কে দৃঢ় ও স্থায়ী করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু যে প্রণয় রূপ বা গুণের জন্য উৎপন্ন, তাহা রূপের ও গুণের অভাবই লোপ পাইবে। আজ যাহাকে রূপ-বা গুণ-সম্পন্ন দেখিলাম, কিছুদিন পরে তাহার সে রূপ বা গুণ না থাকিতে পারে, অথবা পরে অধিকতর রূপ-গুণসম্পন্ন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। তখন ত প্রণয়ের ব্যাঘাত জন্মিবে। এই জন্য যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রণয় সমান, সেখানে একের সামান্য দোষে বা রূপ-গুণের অল্পতা হইলে প্রণয় ভঙ্গ হইয়া যায়; কিন্তু একের প্রণয়ের গভীরতা যদি অধিক হয়, তবে সহজে সে প্রণয় ভঙ্গ হইতে পারে না। পুত্র অতিশয় মন্দ হইলেও মাতার প্রণয় টলে না, সেইজন্য কোন পুত্রই মাতার সে প্রণয়বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না, বার বার ইচ্ছা করিলেও পুত্র মাতাকে এককালে ছাড়িতে পারে না। ঐরূপ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যদি একের প্রণয় অধিক হয় তাহা হইলে

অধিক প্রণয়ীর যত্নে অল্প প্রণয়ীর প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে না। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা যাহাতে স্ত্রীর প্রণয় স্বামীর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহার ব্যবস্থা ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের নারীগণ পতিকে দেবতার ন্যায় দেখেন—পতিকৃত অনেক অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজের নিয়ম ভিন্নপ্রকার। পাশ্চাত্ত্য সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রণয় ঠিক সমান হওয়া চাই, ইহার নাম love (প্রেম)। একটু ইতর-বিশেষ হইলে তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায় না। এক্ষণে আমাদের যুবকেরা প্রেম প্রেম করিয়া পাগল হইয়াছেন, তাঁহারা আর গৃহিণীকে দাসীপদে রাখিতে চাহেন না। এখনকার যত কাব্য, প্রায় সমস্তই ঐ প্রেম লইয়া। জাতিভেদ উঠাইতে না পারিলে, বিধবা-বিবাহ চালাইতে না পারিলে এবং আপন আপন পছন্দ মতে বিবাহ করিবার প্রথা চালাইতে না পারিলে প্রেম জন্মিবার সুবিধা হয় না, সেই জন্যই অনেক কাব্যকার ও পাঠক ঐ সকল চালাইবার জন্য এত যত্নশীল। আমাদের বঙ্কিমবাবুর কাব্যে সে ভাব বড় নাই। তিনি স্পষ্টই প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু বলেন, "প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে ভালবাসা, স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশ-কুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক-যুবতীগণের মনোরঞ্জন কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।"

(২)

সূর্যমুখী ও ভ্রমরের চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিমবাবু ঐটি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়সাম্যে কি ভয়ানক অনিষ্ট, তাহা ভ্রমরের চিত্র দ্বারা এবং স্ত্রীর দাসীভাবে কি উপকার, তাহা সূর্যমুখীর চিত্র দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছেন। এই দুইটি চিত্র পাশাপাশি করিয়া দেখিলে স্পষ্টই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। ভ্রমর ও সূর্যমুখী, উভয়েই সমান গুণবতী, উভয়েই স্বামীর প্রতি সমান অনুরাগিণী এবং উভয়েই স্বামীগত-প্রাণা। তাঁহাদের স্বামী

গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ, উভয়েই প্রভূত ধনশালী; উভয়েই শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র এবং উভয়েই পত্নীগত-প্রাণ—উভয়েই প্রাণাপেক্ষাও পত্নীকে ভালবাসিতেন। পরে ঘটনাবশত গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ উভয়েরই মনে আর একটি রমণীর চিত্র অঙ্কিত হইল ও সেই রমণীর সহিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা জন্মিল। ভ্রমর ও সূর্যমুখী, উভয়েই তাহা জানিতেন। জানিয়া ভ্রমর পাশ্চাত্ত্য সাম্য-পথ অবলম্বন করিলেন, সূর্যমুখী হিন্দু স্ত্রীর ভাবে রহিলেন। দুইজন দুই পথে গেলেন ফলও দুই স্থানে দুই প্রকার হইল। ভ্রমর চিরদুঃখিনী হইলেন; গোবিন্দলাল উচ্ছিন্ন হইলেন এবং তাঁহার সংসার একেবারে রসাতলে গেল। সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ, কিছুদিন দুঃখ পাইলেন বটে, কিন্তু শেষে উভয়েই যেমন সুখী ছিলেন, তেমনি সুখী হইলেন। ভ্রমর যদি সূর্যমুখীর পথ অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি সূর্যমুখী অপেক্ষাও সুখী হইতেন। সূর্যমুখী কিছুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন, ভ্রমরকে একদিনও কষ্ট পাইতে হইত না; কেন না গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে অধিক দোষ জন্মিয়াছিল। ঘটনাবলী গোবিন্দলালের চরিত্রদোষ জন্মিবার পক্ষে যত সহায় হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের তত হয় নাই। রূপ-যৌবন-সম্পন্না রোহিণী হরলালের জন্য উইল চুরি করিয়া আনিয়াও, হাজার টাকার লোভ সম্বরণ করিয়া, সে উইল হরলালকে দেয় নাই, পরে গোবিন্দলালের হিতের জন্য আপনার নিতান্ত বিপদ-সম্ভাবনা জানিয়াও, উইল যথাস্থানে রাখিতে গিয়া ধরা পড়িল। সেই অবস্থায় গোবিন্দলাল রোহিণীর আসক্তি জানিলেন, তৎসঙ্গে তাহার অতুল রূপরাশি দেখিলেন এবং তাঁহারই জন্য তাহার যে ঈদৃশ দুর্দশা, তাহাও বুঝিলেন। রূপ, যৌবন ও ভালবাসা এক সঙ্গে পাইলেন; তাহার সঙ্গে দয়ার অবসর উপস্থিত। কয়জন লোক এ অবস্থা এড়াইতে পারে? গোবিন্দলাল কিন্তু এ অবস্থাতেও ভিজিলেন না। তিনি জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায়, বুদ্ধিমানের ন্যায়, ভবিষ্যতে অনিষ্ট-সম্ভাবনা বুঝিয়া, রোহিণীকে স্থানান্তর করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তাহা ঘটিল না; রোহিণী স্পষ্টই বলিল যে, গোবিন্দলালকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে অকপটে সমস্ত কথা বলিলেন, ভ্রমর দাসীদ্বারা রোহিণীকে বারুণীর পুকুরে ডুবিয়া মরিতে বলিয়া পাঠাইলেন। সেই কথায় রোহিণী মরিতে গেল। ঘটনাবশত গোবিন্দলাল তাহার শেষ অবস্থায় তাহাকে জলতলে নিমগ্ন দেখিতে

পাইলেন ; একজন মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করা উচিত, কেবল এই বিবেচনায় তাহাকে তুলিলেন এবং বহু যত্নে তাহাকে বাঁচাইলেন। তদুপলক্ষে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই রূপযৌবনসম্পন্ন রমণী অসাবধান অবস্থায় তাঁহার নিকট থাকিল। তাঁহাকে না পাইয়াই সে এইরূপে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে, তাহা মনে হইল, তৎসঙ্গে তাহার লাবণ্যরাশি অজ্ঞাতসারে তাঁহার মন আকর্ষণ করিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন, সাবধানও হইলেন। রোহিণী দূরবর্তী হইতে অসম্মত হইয়াছে, আপনিই দূরবর্তী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, বুঝিলেন একটি সুন্দরী যুবতী তাঁহাকে যে প্রাণ ভরিয়া আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাঁহার বিষয় রক্ষা করিয়াছে এবং তাঁহারই জন্য আপন জীবন তুচ্ছ করিয়াছে, সে রমণী নিকটে থাকিলে তাহাকে ত্যাগ করা বড় কঠিন হইবে। বাস্তবিক অতি অল্প লোকে ওরূপ অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে। এই ভাবিয়া একটি উপলক্ষ করিয়া দূরদেশে আপন জমিদারীতে গেলেন ; নিতান্ত ইচ্ছা, স্বীয় চরিত্রকে দূষিত করিতে দিবেন না।

এই ঘটনাবলী গোবিন্দলালকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিবার জন্য যত প্রবল আকর্ষণ করিতেছিল, গোবিন্দলালও ততই সাধ্যানুসারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভ্রমরের কর্ণে মিথ্যা সংবাদ আসিয়া পড়িল। যখন ভ্রমর গোবিন্দলালের বিচ্ছেদে বড়ই অধৈর্য হইয়াছেন, সেই সময়ে তিনি শুনিলেন, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রেমে মজিয়াছেন। তিনি প্রথমে কিছু যেন বিশ্বাস করিলেন না ; কিন্তু যখন বিশ্বাস করিলেন, তখন একেবারে অধৈর্য হইলেন। তিনি গোবিন্দলালকে এই মর্মবিদারক পত্র লিখিলেন ;—"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমার ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমার বিশ্বাস ; এখন তোমার প্রতি আমার ভক্তিও নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই। তুমি যখন বাটী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিও, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।" ভ্রমর যে তাঁহাকে এরূপ পত্র লিখিতে পারেন, তাহা গোবিন্দলাল প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সেই সময়ে রোহিণীর খুড়ার লিখিত আর এক পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা আছে, (ভ্রমর) রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি (গোবিন্দলাল) রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য কথা বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে লজ্জা করে।

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন যে, ভ্রমর রটনা করিয়াছে। মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সেই দিনই তিনি বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মনে ভাবিলেন, সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া গোল মিটাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। গোবিন্দলাল বাটী আসিতেছেন সংবাদ পাইয়াই,—ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল বাটী আসিয়া ভ্রমরকে পাইলেন না, অধিকন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে রোহিণীর খুড়ার কথাই সপ্রমাণ হইল। তাঁহারই প্রণয়িনী তাঁহার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইল, আবার তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিল, দেখিয়া ক্রোধ ও অভিমান ভরে গোবিন্দলাল বলিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল!" (কোন্ হিন্দু স্বামীর এরূপ অবস্থায় আপন স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা না জন্মে? বিশেষ তিনি একজন জমিদারের পুত্র।) হৃদয়স্থ ভ্রমরমূর্তি একটু মলিন হইল, "রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা গোবিন্দলালের হৃদয় ত্যাগ করে নাই, গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। রোহিণী প্রেতিনী দিবারাত্রি গোবিন্দলালকে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু এখন সে স্থান পাইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।" তিনি যে যোগসাধন করিতেছিলেন, সে যোগ সাধিবার আর উপায় থাকিল না। তথাপি গোবিন্দলাল সহজে রোহিণীকে স্থান দেন নাই, তাহাকে দেখিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। তিনি ইহাও মনে করিলেন যে, ভ্রমরের বড় স্পর্ধা হইয়াছে; ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, তাহাকে একটুকু কাঁদাইব। নিজেও কাঁদিতে ছাড়িলেন না, শূন্য গৃহ দেখিয়া কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া কাঁদিলেন, ভ্রমরের সঙ্গে কলহ করিতেছেন ভাবিয়া কাঁদিলেন, আবার চক্ষের জল মুছিয়া রাগ করিলেন। এরূপ কষ্টে কয়দিন গেল। "রোহিণীর কথা স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিলেন। একদিন বারুণী-তটে পুষ্পবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছেন। বৃষ্টি হইতেছিল, বর্ষাপ্রযুক্ত ঘাটে বড় পিছল হইয়াছিল, সেই সময়ে একটি স্ত্রীলোক ঘাটে নামিতেছিল বুঝিতে পারিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কে গা তুমি? আজ ঘাটে নামিও না, বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে। সে স্ত্রীলোক অন্য কেহ নহে, রোহিণী—গোবিন্দলাল কি বলিলেন,

বুঝিতে না পারিয়া, সে নিকটে গিয়া বলিল, আপনি কি আমাকে ডাকিলেন? গোবিন্দলাল বলিলেন, 'না', অধিকন্তু বলিলেন, তোমাকে আমার নিকট দেখিলে লোকে কি বলিবে? রোহিণী বলিল, যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছে। এ পর্যন্ত রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের দেখা হয় নাই—রটনা সম্বন্ধেও তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। এইক্ষণে সুযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে একথা রটাইয়াছে? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?" বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য গোবিন্দলাল তাহাকে তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। যে রোহিণী প্রতিবেশীর নিকট হইতে বারাণসী শাটী ও গিলটির গহনা চাহিয়া লইয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, এ সকল ও তিন হাজার টাকা গোবিন্দলাল তাহাকে দিয়াছেন, সে রোহিণী যে ভ্রমরের বিরুদ্ধে কত কথা আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্য বলিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। এই ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরের উপর আরও ক্রুদ্ধ ও তৎসঙ্গে রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনও যদি ভ্রমরকে পাইতেন এবং "এ সময় যদি দুইজন একত্র থাকিতেন, তাহা হইলেও বিপদ ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত, উভয়ের এ সবনাশ ঘটিত না।" এইক্ষণ গোবিন্দলাল সহায়শূন্য, যে মনোমোহিনী ভ্রমরচিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, তাহা দিন দিন মলিন হইতেছে, নিকটবর্তী রোহিণীর মূর্তি উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিতেছে। গোবিন্দলাল তখন ভাবিলেন, কেবল রূপে মুগ্ধ হইয়াছি বৈ ত নয়, তাহাতে দোষ কি? কে কার রূপে মুগ্ধ না হয়, আমি তো রোহিণীকে ভালবাসিতেছি না। ইচ্ছা করিলেই তাহাকে ত্যাগ করিব। পাপের পথ যে বড় পঙ্কিল, সেটি ভাবিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহার পদস্খলন হইল।

ঐ সময়ে আর এক ভয়ানক অবস্থা তাঁহার প্রতিকূল হইল। কৃষ্ণকান্ত মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কৃষ্ণকান্ত পীড়িত অবস্থায় রোহিণী ও গোবিন্দলাল সম্বন্ধীয় কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, গোবিন্দলালকে অনুযোগ করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না, হঠাৎ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইল। তখন গোবিন্দলালকে সুপথে আনিবার অভিপ্রায়ে তিনি উইল পরিবর্তন করিয়া ভ্রমরের নামে করিলেন। গোবিন্দলাল নিবারণ করিবার কোন চেষ্টা করিলেন না, প্রত্যুত আপনি উপযাজক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন, সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ পর্যন্ত গোবিন্দলাল

এককালে অধঃপাতে যান নাই। কিন্তু এই ঘটনায় গোবিন্দলালের ভ্রমরের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। যে প্রাণাধিক ভ্রমরের জন্য তিনি এত সহিয়াছেন, অথচ সেই ভ্রমর বিনা দোষে দশের নিকট তাঁহার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া ও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া, গর্বভরে পিত্রালয়ে গেল, সেই ভ্রমরের এইক্ষণ বিষয় হইল, তাহার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে, এটি গোবিন্দলালের অসহ্য হইল। ভাবিলেন, ভ্রমর তাঁহাকে আর আপনার ভাবে না ; সেই দিন হইতে তিনিও ভ্রমরকে পর ভাবিলেন ।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর গৃহে আসিলেন। সে শোকের সময় পরস্পরের সহিত দেখা মাত্র হইল, বিশেষ কথা কিছুই হইল না। পরে শ্রাদ্ধান্তে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে উইলের কথা শুনাইলে ভ্রমর বলিলেন, "বিষয় তোমারই, আমি তোমার নামে দানপত্র লিখিয়া দিব।" গোবিন্দলাল স্ত্রীর দান গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, ভ্রমর অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু তখন আর সে গোবিন্দলাল নাই ; একে ত তখন রোহিণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহার উপর তিনি আপনাকে বড়ই অপমানিত মনে করিয়াছেন। তিনি ভ্রমরের কোন কথাই শুনিলেন না। ঐ সময়ে যদি আর একটি প্রতিকূল ঘটনা না ঘটিত, তাহা হইলে দুদিন পরে এ বিবাদ মিটিয়া যাইত। কেন না গোবিন্দলাল মনে মনে এ বিষয়ের অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। কখনও ভাবিয়াছেন, ভ্রমরকে ক্ষমা করিবেন, কখনও ভাবিয়াছেন, ভ্রমর ক্ষমার অযোগ্য (কুমতি ও সুমতির কথোপকথন পাঠ করিবেন), কিন্তু এই প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইবার সহায় হইল এই সময়ে গোবিন্দলালের মাতা কাশী যাইবার উদ্যোগ করিলেন। পুত্র বিষয় না পাইয়া পুত্রবধূ বিষয় পাইয়াছেন দেখিয়া তিনি ভ্রমরের উপর চটিয়া গেলেন. পুত্র ও বধূর মধ্যে যে আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিয়াও তিনি তাহা নিবারণের কোন চেষ্টা করিলেন না। তিনি চেষ্টা করিলে "ফুৎকারমাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত," কিন্তু তাহা করিলেন না, অধিকন্তু এই সর্বনাশের সহায় হইলেন। কেন না গোবিন্দলাল তাঁহার সঙ্গে কাশী গেলেন আর ফিরিলেন না। তিনি যদি তখন কাশী না যাইতেন, তাহা হইলে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিলেও মিটিয়া যাইত। আপনা হইতে গোবিন্দলাল মাতাকে ত্যাগ করিয়া গৃহে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না ; কাজেই এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে মনের

গতি ফিরিতে পারিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে আবার ইচ্ছা করিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে গেলেন। ভ্রমরের অজ্ঞাতসারে গোবিন্দলাল বাটী হইতে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তিন দিন মাত্র থাকিতে ভ্রমরকে আনা হইল। ভ্রমর শাশুড়ীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কাশী যাইতে নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্রবধূর অন্নদাস হইয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তখন যদি ভ্রমর সকল কথা বুঝাইয়া বলিতেন ও তিনি যে দানপত্র লিখাইয়া আনিয়াছেন, তাহা শাশুড়ীকে দিতেন, অথবা আপন ননদকে সমস্ত বলিতেন, তাহা হইলে কাশী যাওয়া বন্ধ হইত। ভ্রমর তাহা করিলেন না, গোবিন্দলালকে কিছু বলিলেন মাত্র। পরে যখন গোবিন্দলাল বিদায় লইতে ভ্রমরের কাছে গেলেন, সেই সময়ে দানপত্র দিয়া অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। তখন গোবিন্দলাল অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, ফিরিতে পারিলেন না। প্রিয়তমা পত্নীকে ব্যথা দিয়াছেন ভাবিয়া একটু কাঁদিলেন, এবং ইচ্ছা করিলেন যে ফিরিয়া গিয়া বলেন, "ভ্রমর আমি আবার আসিতেছি," কিন্তু লজ্জাপ্রযুক্ত পারিলেন না। শেষে ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি, যখন মনে করিব, তখনই ফিরিব।

গোবিন্দলাল মাতার সহিত কাশী যাইয়া তথায় কিছু দিন বাস করিলেন। বাটীতে যে পত্র লিখিতেন, তাহা আমলাদের নামেই লিখিতেন, ভ্রমরের নামে লিখিতেন না, ভ্রমরও কোন পত্র লেখেন নাই। বরাবরই ভ্রমরের সাম্য ভাব। তাহার পর গোবিন্দলাল ২।৩ মাস পরে বাটী যাই বলিয়া কাশী হইতে চলিয়া গেলেন, এ পর্যন্ত রোহিণী গৃহেই ছিল। ইহার পরেই তারকনাথে হত্যা দিবার নাম করিয়া সে বাটী হইতে চলিয়া গেল। সেই সময় হইতেই গোবিন্দলালের প্রকৃত অধঃপতন আরম্ভ হইল। এ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই গোবিন্দলালের সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই, প্রতিকূল ঘটনাস্রোতেই তিনি ভাসিয়া চলিতেছিলেন। ভ্রমরও আত্মহারা হইয়া কোন চেষ্টা করেন নাই। কয়জন এইরূপ স্রোতে গোবিন্দলালের মত ভাসিয়া না যায়?

(৩)

গোবিন্দলালের অধঃপতনের যে কারণপরম্পরা ঘটিয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের পক্ষে সেরূপ কিছুই ঘটে নাই। সত্য বটে, কুন্দনন্দিনীকে তিনি একাকী নৌকাযোগে কিয়ৎক্ষণ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কুন্দ বালিকা,

তখন তাহার কটাক্ষে বিষের সঞ্চার হয় নাই। তাহার পরে যখন কুন্দ নগেন্দ্রের বাটীতে আসিল, তখনও সে বালিকা; তাহার পরেই তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ হইল—পরস্ত্রী হইয়া সে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। তাহার পরে কুন্দনন্দিনী বিধবা হইয়া যখন তাঁহার বাটীতে আসিল সেই সময়ে নগেন্দ্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, আপনার আশ্রিতা পরস্ত্রীর প্রতি কেবল রূপের মোহে ভুলিয়া গেলেন। এরূপ অবস্থার সংযোগ সকলেরই ঘটিয়া থাকে, অনেক গৃহস্থেরই বাটীতে সুন্দরী যুবতী কোনরূপ আত্মীয়তা বা দারিদ্র্যবশত বাস করিয়া থাকে, অতি পামর ভিন্ন প্রেমময়ী যুবতী স্ত্রী ঘরে থাকিতে এবংবিধ আশ্রিতা যুবতীর প্রতি কেহই আসক্ত হয় না। ভ্রমর যে দোষে গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিয়াছিল, এ দোষ তাহার তুলনায় শতগুণ অধিক। তথাপি সূর্যমুখী ভ্রমরের পথে না গিয়া কমলমণিকে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরাগের যে সমস্ত লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, সমস্ত লিখিলেন, এবং তাহার সদুপায় করিবার জন্য কমলমণিকে আসিতে লিখিলেন। কিন্তু সে পত্রে নগেন্দ্রের প্রতি রাগ বা ঘৃণা, কিছু প্রকাশ করিলেন না, বরং তাঁহার প্রশংসা করিলেন। লিখিলেন, "তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না, তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন।" কমলমণি সেবার পত্রের উত্তরে লিখিলেন, স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না, তাহার মরাই মঙ্গল। ইহার দিন কয় মধ্যে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্তিত হইল। কিন্তু সূর্যমুখী কমলমণির লেখা মত নগেন্দ্রের চরিত্রে অবিশ্বাসভাব না দেখাইয়া, কোনও রোগ হইয়াছে প্রকাশ করিয়া, ডাক্তার দ্বারা ঔষধ আনাইয়া নগেন্দ্রকে খাইতে দিলেন। নগেন্দ্র ঔষধের শিশি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন সূর্যমুখী বলিলেন, "কি অসুখ!" সূর্যমুখী দর্পণ আনিয়া তাঁহার শরীর কি হইয়াছে, দেখিতে বলিলেন, নগেন্দ্রনাথ দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল। সূর্যমুখীর চক্ষে জল পড়িল। নগেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেই রাগে বহির্বাটীতে গিয়া একজন ভৃত্যকে প্রহার করিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র মদ্যপান ধরিলেন। প্রতিদিন মদ চলিতে লাগিল। সূর্যমুখী নগেন্দ্রের চরণে হাত দিয়া অনেক অনুরোধ

করিয়া বলিলেন, "কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র দুই এক কথার উত্তর-প্রত্যুত্তরের পরে বলিলেন, "সূর্যমুখী, আমি মাতাল মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে গ্রহণ করিও, নচেৎ আবশ্যক নাই।" ক্রমে নগেন্দ্রের অত্যাচার বাড়িয়া গেল, বিষয় না দেখায় বিষয় যায় যায় হইল। এ অবস্থাতেও সূর্যমুখী ভ্রমরের পথ অবলম্বন করিলেন না, তবুও তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পুনরায় কমলমণিকে পত্র লিখিলেন, কমলমণি আসিয়া সমস্ত বুঝিয়া কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া স্থির করিয়া কুন্দকে সম্মত করিলেন। নগেন্দ্র জানিতে পারিয়া সেই দিন সন্ধ্যাকালে কুন্দের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর পারি না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না, বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"

সেই দিন দেবেন্দ্র, বৈষ্ণবী-বেশে আসিয়া কুন্দের সহিত গোপনে অনেক কথা বলিতেছিল দেখিয়া, সূর্যমুখী তাহাকে ছদ্মবেশী পুরুষ সন্দেহ করিয়া হীরা দাসীকে তাহার সন্ধান জানিতে পাঠাইয়াছিলেন। হীরা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়া প্রকাশ করিলে, সূর্যমুখী কুন্দকে দুশ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এমন লোককে বাটীতে স্থান দিই না, তুই বাটী হইতে দূর হ।" কুন্দ সেই রাত্রেই বাটী হইতে পলায়ন করিয়া হীরার বাটীতে গোপনভাবে থাকিল। কুন্দের পলায়ন সংবাদ শুনিয়া নগেন্দ্র তাহার অনুসন্ধানে নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন এবং সূর্যমুখীর দোষ না জানিয়াও তাহার সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। সূর্যমুখীও কুন্দের পলায়ন-সংবাদে অত্যন্ত কাতর হইলেন ও তাহার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। পরে নগেন্দ্র যখন শুনিলেন, কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীর অন্যায় তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন নগেন্দ্র সূর্যমুখীর নিকট গিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সূর্যমুখী দেবেন্দ্র-ঘটিত সমস্ত ঘটনা বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, কুন্দকে তাড়াইয়া তিনি বড় ব্যথা পাইয়াছেন; তাহার অনুসন্ধানের জন্য দেশে দেশে লোক পাঠাইয়াছেন। তখন উভয়ে ঐ সম্বন্ধে অনেক বাকবিতণ্ডা হইল। সূর্যমুখী অনেক কাঁদিলেন, অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র জ্ঞানহারার মত নিজ মুখেই কুন্দের প্রতি আপনার গাঢ় অনুরাগের পরিচয় দিয়া, হৃদয়ের দারুণ ব্যথা জানাইলেন। সূর্যমুখী শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া

বলিলেন, "আমার সম্মুখে আর উহা বলিবেন না, আমার বুকে শেল বিদ্ধিতেছে।" নগেন্দ্র সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি বলিলেন, "তোমাতে আমার আর সুখ নাই। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা হইয়াছ, আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। কুন্দকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ-দেশান্তরে ফিরিব।" (ভ্রমর! একবার তোমার গোবিন্দলালের সহিত নগেন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া দেখ।) সূর্যমুখী শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রস্তরমূর্তিবৎ রহিলেন। পরে বলিলেন, "এক ভিক্ষা আমার অনুরোধে আর একমাস অপেক্ষা কর, আর একমাস মধ্যে যদি কুন্দকে না পাওয়া যায়, তখন দেশত্যাগ করিও।" নগেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন, গৃহত্যাগ করিলেন না। পরে কুন্দ গোপনীয় স্থান হইতে নগেন্দ্রনাথের গৃহে আসিলে, সূর্যমুখী নগেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। নগেন্দ্র শান্ত হইলেন। তখন সূর্যমুখী কর্তব্য-কার্য সমাধান করিয়া রজনীযোগে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সূর্যমুখী চলিয়া গেলে নগেন্দ্রনাথের জ্ঞানসঞ্চারের সূত্রপাত হইল ও ক্রমে পূর্ণ জ্ঞান জন্মিল। তখন অনুতাপসহকারে নিজে দেশে দেশে সূর্যমুখীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। এ দিকে সূর্যমুখী আবার ধৈর্য অবলম্বন করিয়া পতির প্রতি কর্তব্যপালনে অবহেলা করিয়াছেন ভাবিয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কুন্দ আপনার অন্যায় কার্য বুঝিতে পারিয়া বিষ ভক্ষণ করিল। নগেন্দ্র পূর্ববৎ সূর্যমুখীকে লইয়া সুখী হইলেন, সংসারে সুবাতাস বহিল।

গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্র কি স্ত্রীর প্রতি অধিক দুর্ব্যবহার করেন নাই তবে নগেন্দ্র ফিরিলেন, গোবিন্দলাল ফিরিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার মূল কারণ সূর্যমুখী সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন, ভ্রমর এক বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন। সূর্যমুখী স্বামীকে দেবতা দেখিতেন, ভ্রমর স্বামীকে প্রেমের পাত্র দেখিতেন। সূর্যমুখী ভাবিলেন, স্বামী কুপথগামী হইলেও তাঁহার ভক্তিপাত্র, প্রাণপণে তাঁহার সংশোধন আবশ্যক; ভ্রমর ভাবিলেন, স্বামী যখন প্রেমের ধর্ম রাখিলেন না, আমি রাখিব কেন। সেইজন্য সূর্যমুখী প্রতিনিয়তই স্বামীর সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভ্রমর পাড়ার লোকের কথা শুনিয়াই নির্দোষ গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিলেন ও পত্রে লিখিলেন, 'তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই।' আর সূর্যমুখী কি করিলেন? যখন নগেন্দ্রনাথ একেবারে অধঃপাতে গিয়াছেন, যখন তিনি কুন্দকে বিবাহ

করিয়া সুখী হইয়াছেন, সেই সময় কমলমণি ও সতীশ তাঁহাদের বাটীতে আসিলে, "বাবা, আশীর্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণবান্ হও, ইহার বাড়া আশীর্বাদ আমি আর জানি না," ইহা বলিয়া সূর্যমুখী সতীশকে (ভাগিনেয়) আশীর্বাদ করিলেন। এই স্বামীভক্তি হইতে—স্ত্রীর এই দাসীভাব ও মাতৃভাব হইতে নগেন্দ্রের উদ্ধার। ভ্রমরের যে প্রণয়, সেটি পাশ্চাত্ত্য love, এবং ভ্রমরের পূর্বোক্তরূপ বাক্যাবলী ও ব্যবহার পাশ্চাত্ত্য divorce-এর মত। সত্য বটে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া দেশে দেশে আমোদ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন; নগেন্দ্র সেরূপ করেন নাই, কিন্তু যদি সূর্যমুখী এরূপ যত্ন না করিতেন ও এক মাস মধ্যে কুন্দকে আনিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা না করিতেন এবং ঐ সময় মধ্যে কুন্দের সহিত তাঁহার বিবাহ না দিতেন তাহা হইলে অন্তত সূর্যমুখীকে কুন্দের দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিতেন। কেন না গোবিন্দলালের বিষয় তাঁহার নিজের নহে, নগেন্দ্রের সমস্ত নিজের। কেহই গোবিন্দলালের দোষ শোধনের চেষ্টা করেন নাই, বরং অবস্থাগুলি সমস্তই তাঁহাকে বিপরীতভাবে চালাইবার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে সুপথ দেখাইবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কমলমণি, শ্রীশ, হরদেব প্রভৃতি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন এবং সূর্যমুখী প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। গোবিন্দলাল পাড়ার একজন বিধবার ধর্ম নষ্ট করিতে বসিয়াছিলেন, আর নগেন্দ্রনাথ আপনার আশ্রিতের, আশ্রিতের স্ত্রীর এবং যাহার ধর্ম ও প্রাণরক্ষা করিবার তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই, তাহারই ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে, চরিত্র রক্ষা করিবার শক্তি গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের অনেক অল্প।

কেহ কেহ বলেন, ভ্রমরের প্রণয় পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন নহে, ভ্রমর বড় অভিমানিনী—দেশীয় স্ত্রীর ন্যায় অভিমানিনী—সেই অভিমানভরেই তিনি এ অকার্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেন না আমাদের স্ত্রী-জাতিরা যখন অভিমান করে, তখন দৃষ্টি রাখে, একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কি না। ভ্রমর সেদিকে কয়বার তাকাইয়াছিলেন? তিনি আপনার গোঁ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন, একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন নাই। কেবল একবার নহে, যখন গোবিন্দলালের কুক্রিয়ার প্রায়শ্চিত্তের সময় হইয়াছে, যখন তিনি রোহিণীর প্রাণ বধ করিয়া ধৃত ও প্রমাণাভাবে দণ্ড

হইতে অব্যাহতি পাইয়া, কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন, যখন অর্থ ফুরাইয়াছে, জ্ঞানও কিছু জন্মিয়াছে, সেই সময়ে পুনর্মিলনের আশায় গোবিন্দলাল ভ্রমরকে এক পত্র লিখিলেন। প্রথমেই লিখিলেন, "কয়েক বৎসর পর পত্র লিখিতেছি, প্রবৃত্তি হয় পড়িও, প্রবৃত্তি না হয় ছিঁড়িয়া ফেলিও।" পরে আত্মদুষ্কৃতি ও ভ্রমরের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিষয় লিখিয়া যথেষ্ট পরিতাপ করিলেন। শেষে লিখিলেন "পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় লইতেছি, দিবে না কি?" কোন্ হিন্দু স্ত্রীর মন স্বামীর এবংবিধ ব্যবহারে গলিয়া না যায়? যাহার না গলে, হিন্দু তাহাকে রাক্ষসী বলেন। ভ্রমরের ইহাতেও অভিমান গেল না। তিনি উত্তর লিখিলেন, সেবিকা পাঠ লিখিলেন না, প্রণাম লিখিয়া লিখিলেন—"বিষয় আপনারই, পূর্বে দানপত্র রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছি, আপনি সচ্ছন্দে বাটী আসিয়া সমস্ত গ্রহণ করিয়া সুখে ভোগ করুন। আমি যে টাকা জমাইয়াছি, তন্মধ্য হইতে আট হাজার টাকা লইয়া গঙ্গাতীরে বাটী নির্মাণ করিয়া অবশিষ্ট টাকায় জীবন অতিবাহিত করিব। আপনার সহিত ইহজন্মে আর সদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি তুষ্ট, আপনার দ্বিতীয় পত্র পাইলে আপনার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব।" এই কি হিন্দু স্ত্রীর উক্তি! যে স্বামী ইহকাল পরকালের সাথী, তাহার প্রতি এই ব্যবহার! ইহাকে পাশ্চাত্ত্য প্রেম না বলিয়া কি বলিব? এখনও যদি ভ্রমর হিন্দুভাব ধারণ করিতেন, তাহা হইলে এখনও গোবিন্দলাল ভাল হইতেন, ভ্রমরও সুখী হইতেন, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। তিনি তাহা করিলেন না। এই দয়াশূন্য, নীরস পত্র পাইয়া গোবিন্দলাল দেশে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, খরচ ভিক্ষা করিলেন। ভ্রমর তাঁহার ৫০০৲ টাকা মাসহারা ধার্য করিয়া দিলেন, লিখিলেন ইহার অধিক দিলে অপব্যয় হইবে। গোবিন্দলাল মাসহারা ভোগী হইয়া কলিকাতায় রহিলেন। ভ্রমর আর কোন অনুসন্ধানও করিলেন না। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর যে সময় গোবিন্দলাল ও ভ্রমর কিছুদিন একসঙ্গে ছিলেন, সে সময়ে ভ্রমর গোবিন্দলালের পা ধরিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সময় প্রেমের পাত্রের প্রতি যেরূপ করিয়া থাকে সেইরূপ—সূর্যমুখীর মত নহে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এরূপ পামর স্বামীর মুখ না দেখিয়া ভ্রমর ভালই

করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে প্রায় কোন স্ত্রীকেই স্বামীর মুখ দেখিতে হয় না। পদস্খলন হয় না, এমন লোক অতি বিরল। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষের বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন, "কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাহার চিত্ত রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। যিনি আপনার উচ্ছলিত বৃত্তি সংযত করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই মহাত্মা।" কোন স্ত্রীই কি মহাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিবেন না? কি উচিত, কি অনুচিত, এ প্রবন্ধে সে বিষয়ের বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে; সে বিচারের ভার পাঠকের উপর রহিল। আমাদের কেবল ইহাই বক্তব্য যে, বঙ্কিমবাবু পাশ্চাত্ত্য প্রণয়ভাব ভাল নয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভ্রমরের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং সেই জন্য তিনি ভ্রমরের কার্যফল দুঃখময় ও সূর্যমুখীর কার্যপরিণাম সুখের করিয়াছেন। বস্তুত একজন ক্ষমাপরায়ণ না হইলে, কোন বিবাদের মীমাংসা হয় না। প্রবাদ এই যে, এক হাতে তালি বাজে না, পাশ্চাত্ত্য মতে উভয় হস্তই তালি বাজাইবার জন্য উদ্যোগী হিন্দুমতে এক হাত উঠাইলে আর এক হাত পিছাইয়া যায়, কাজেই তালি বাজে না। তালি বাজাইবার জন্য গোবিন্দলাল হাত তুলিলেন—ভ্রমরও সেইরূপ হাত তুলিলেন, তাই সেখানে তালি বাজিল। নগেন্দ্র হাত তুলিলেন, সূর্যমুখী হাত পিছাইলেন, তাই সেখানে তালি বাজিল না। এই তালি-বাজা নিবারণ করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা স্ত্রী-চরিত্রের গঠন করিয়াছেন। স্ত্রীতে দাসী বা মাতৃভাব দিয়াছেন। ভ্রমরের মাতৃভাব ও দাসীভাব কিছুমাত্র ছিল না, কেবল ছিল সখীভাব। আমরা একটি বিষয় লইয়া অনেক সময় নষ্ট করিলাম। হয়ত সকলেই বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু বিষয়টা বড় গুরুতর, ইহা হিন্দু-গৃহস্থের মূল ভিত্তির কথা।

(৪)

তারাচরণ কুন্দের সহিত দেবেন্দ্র প্রভৃতির আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সূত্রে দেবেন্দ্র কুন্দের প্রতি লোভপরবশ হইয়া বৈষ্ণবীবেশে কুন্দের সর্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া, বঙ্কিমবাবু স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণ যে ভাল নয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। জাতীয় ধর্ম ও রীতিনীতি পরিত্যাগ

করা বা পরিত্যাগের জন্য প্রবৃত্তি দেওয়া ভাল নহে, তাহা কু-স্বভাবাপন্ন দেবেন্দ্রের চরিত্রের চিত্র দ্বারা, তারাচরণের চরিত্র বর্ণনদ্বারা ও অমরনাথের উক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন। তারাচরণের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার কিয়দংশ যথা—"তারাচরণ মুখে সর্বদা বলিতেন, তোমরা ইটপাটকিলের পূজা ছাড়, খুড়ী জেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবারালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোক-শূন্য; তাঁহার বিবাহ হয় নাই" ইত্যাদি। অমরনাথের উক্তি যথা—"এই রোগের আর এক প্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক্। আমার গরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নই, আমি ততদূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, তাহার কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলে-পুলেরা আইবড় থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর যন্ত্রণায় খুসী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।"

আমাদের দেশীয় বিবাহ-প্রথা অর্থাৎ পিতামাতা পাত্র-পাত্রী স্থির করিয়া যে বিবাহ দেন, তাহা যে ভাল, তাহা বঙ্কিমবাবু অনেকগুলি চিত্রে দেখাইয়াছেন; কমল ও শ্রীশ তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। নির্বাচন-প্রথানুসারে মিলিত কয়টি দম্পতী শ্রীশ ও কমলের ন্যায় প্রণয়সম্পন্ন? ভ্রমর ও গোবিন্দলাল এবং সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রের মধ্যে যে মালিন্য জন্মিয়াছিল, তাহা দেশীয় বিবাহ প্রথার দোষে নহে। নির্বাচন-প্রথায়ও যে যে দোষ আছে, তাহাদের প্রথম অবস্থার সুচরিত্র ও গাঢ় প্রণয় দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অমরনাথ, প্রতাপ ও শৈবলিনী চিত্র দ্বারা বরং নির্বাচন-প্রথার দোষই দেখাইয়াছেন। ঐ চিত্রগুলি দ্বারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে, অধিক বয়সে বিবাহ হইলে, যুবক-যুবতী পিত্রাদির অনভিমত পাত্রে মন অর্পণ করিয়া চিরদুঃখী হয়। রজনী যে অন্ধ, তাহার চিত্রও শচীন্দ্রনাথ-রূপ অমূল্য রত্ন প্রার্থনা করিয়াছিল।

দৈব অনুকূল ছিল বলিয়াই, রজনীর কুফল ফলিল না, নচেৎ রজনী ত জলে ঝাঁপ দিয়াছিল।

কুন্দনন্দিনী ভিন্ন আর কোন বিধবারই কথা বঙ্কিমবাবুর কোন পুস্তকে নাই। কিন্তু কুন্দকে তিনি বিষবৃক্ষের মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং যাহাতে উহা না ঘটে, তজ্জন্য প্রথম হইতেই, কুন্দকে সাবধান করিতেছেন—স্বপ্নযোগে মাতাকে দেখাইয়া তাহাকে দিয়া সাবধান করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। মন্ত্র পাঠ হইলেই যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, সে বিবাহ আর কখন ছেদনযোগ্য নয়, তাহা মনোরমার ও হিরণ্ময়ীর চিত্রে দেখাইয়াছেন। মনোরমা তাদৃশ পতিরও সহগামিনী হইলেন এবং হিরণ্ময়ী যখন জানিলেন, প্রিয় পুরন্দরই বিবাহের পতি, তখন তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

ব্রজেশ্বরের উদাহরণে হিন্দুর পিতৃভক্তি দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য মত এই যে, পিতার ন্যায়সঙ্গত আজ্ঞা পালন করিবে; অর্থাৎ পিতা ভাল হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিবে, নচেৎ পিতা ভক্তির পাত্র নহেন। কিন্তু ইহাকে পিতৃভক্তি বলে না, ইহার নাম গুণভক্তি। ন্যায্য কথা কেবল পিতার কেন, সকলেরই ন্যায্য বাক্য পালন করিতে হয়। গুণবান্ হইলে সকলেই ভক্তির পাত্র হয়। হিন্দু বলেন, যত গুণদোষভাবাপন্ন হউন, পিতা, পিতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। মন্দ পিতাও পিতার ন্যায় ভক্তির পাত্র। ব্রজেশ্বর যে স্ত্রীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন, পিতার আজ্ঞায় সে স্ত্রীকেও ত্যাগ করিলেন। তাহার বিচ্ছেদে তাঁহার প্রাণান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তথাপি পিতার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা হয় নাই। পরে সেই স্ত্রীকে দেবী চৌধুরাণী রূপে পাইয়া তাহার নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া বিষয় ও পিতার মান রক্ষা করিয়াছেন; তদীয় পিতা নিতান্ত নৃশংশের ন্যায় সেই উপকারকারিণীর প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রজেশ্বর পিতার উপর বিরক্ত হয়েন নাই, কখন তাঁহার অবাধ্য হয়েন নাই। সর্বদাই তিনি "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥'—এই মহাবাক্যটি বলিতেন।

পুরুষকার অবলম্বনীয় হইলেও নিয়তি যে পরিহার্য নহে, হিন্দুর এ কথাটি বঙ্কিমবাবু প্রত্যেক গ্রন্থেই দেখাইয়াছেন। কোথাও স্বপ্ন দ্বারা, কোথাও জ্যোতিষ-গণনার দ্বারা, কোথাও বা ভগবতীর অর্ঘ্য গ্রহণ বা ত্যাগ দ্বারা পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের

সত্যতা ও দেবতার মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কাব্যে নায়ক-নায়িকাকে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন করিতে হয়। অথচ গুণবান্ নায়ক-নায়িকার কার্যের পরিণামফল শুভ না হইলে মনুষ্যকে গুণবান্ হইতে প্রবৃত্তি দেওয়া হয় না, এই জন্য আমাদের কাব্যগুলি মিলনান্ত বা সুখান্ত। বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত কাব্য নিতান্ত অল্প। কিন্তু যদি কোনও কাব্যের নায়ক-নায়িকা অসদ্‌গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুঃখান্ত না করিলে মানুষকে কুকার্যে অপ্রবৃত্তি দেওয়া হয় না। বঙ্কিমবাবুর কাব্যের মধ্যে কপালকুণ্ডলা ও কৃষ্ণকান্তের উইল ভিন্ন সমস্তই সুখান্ত। গোবিন্দলাল অসদ্‌গুণসম্পন্ন নায়ক ছিলেন, এবং ভ্রমর তাদৃশী পত্নীগুণসম্পন্না ছিলেন না, কাজেই কৃষ্ণকান্তের উইলকে দুঃখান্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা দুঃখান্ত হইল কেন? নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা উভয়েই ত সদ্‌গুণসম্পন্ন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে তিনটি কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ, নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার যখন বিবাহ হয়, তখন অধিকারী নবকুমারের পরিচয় লইয়াছিলেন বটে কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলার কোন পরিচয় লয়েন নাই। অধিকারী বলিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা; সেই কথায় বিশ্বাস করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করেন নাই। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ না করিলে তাহার প্রাণ ও ধর্ম রক্ষা হয় না বলিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণ-কন্যা না হইলেও নবকুমার আপন প্রাণদাতার প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহাকে বিবাহ করিতেন। সেজন্য তাঁহাকে যদি পতিত হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও তিনি স্বীকার করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বঙ্কিমবাবুর ইচ্ছা নহে যে, অপরিচিতার সন্তান সমাজে মিশ্রিত হয়। দ্বিতীয় কারণ, নবকুমারের পূর্বপত্নী পদ্মাবতী সেই সময়ে আপনার পাপবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নবকুমারের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু নবকুমার সেই যবনীকে, সেই স্বেচ্ছাবিহারিণী রমণীকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না—গ্রহণ করিলেনও না। কিন্তু সে শরণাগতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নারীসহ সুখভোগ বঙ্কিমবাবুর ভাল লাগিল না। তৃতীয় কারণ বা প্রধান কারণ এই যে, বঙ্কিমবাবু হিন্দুধর্মের কোন অংশই এককালে মিথ্যা, তেজোহীন বলিতে চাহেন না—কাপালিকের উপাসনাপদ্ধতি

হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। তাহা যে সাধারণের প্রয়োজনীয় নহে, এ কথা তিনি বুঝাইয়াছেন; কিন্তু তাহাতে যে কিছুমাত্র সত্যতা নাই, তাহার যে কোন শক্তি নাই, এ কথা তিনি প্রতিপন্ন করিতে রাজি নহেন। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের নিকট হইতে নবকুমারকে ফাঁকি দিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ক্রোধে কাপালিক কপালকুণ্ডলার মৃত্যুর জন্য হোম করিয়াছিলেন, সেই হোমের ফল দেখাইবার জন্য—মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড যে একান্ত মিথ্যা, এ বিশ্বাস কাহারও মনে না জন্মিতে পারে, তাই কাপালিকের প্রভাব দেখাইবার জন্য নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে ইহ-সংসার হইতে বিদায় দিলেন। বঙ্কিমবাবু আমাদের নিজের বিষয়ে এতই দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু নহেন, প্রত্যুত সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন ছিলেন, তথাপি তিনি ঋষিগণের মহিমা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি কেবল পাশ্চাত্ত্যভাবে শিক্ষিত হইয়া, শাস্ত্রগ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া, একটা ওলট-পালট করিতে রাজি নহেন। সে মীমাংসার ভার ভাবীকালের হস্তে রাখিলেন।

(সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২)

কবি বিহারীলাল

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

(১)

বাঙ্গালা সাহিত্যের সঘন কোলাহল হইতে দূরে, লোকসাধারণের অপরিজ্ঞাত জনৈক বাঙ্গালী কবি জন্মিয়াছিলেন। স্বতঃ সৌন্দর্য-ধ্যান-নিরত স্বভাবের অতি নিভৃত সারস্বত শিবিরে, এই কবি সৌন্দর্যের ধ্যানে সতত নিমগ্ন থাকিতেন। সে ধ্যান প্রশান্ত, প্রগাঢ়, পবিত্র ; এবং এই অপরিজ্ঞাত কবিপ্রকৃতির সর্বপ্রধান অংশ, উপাদান, প্রাণ বা যথা সর্বস্ব ছিল। এই কবি, কবিজনোচিত গীত না গাইতেন, না গাইয়াছিলেন, এমন নয় ;—আত্মভাবে বিভোর হইয়া, বিগলিত এবং বিমোহিত হইয়া, ইনি আপন মনে আপনি গাইতেন,—সে গান মিষ্ট ও মহানও বটে, কিন্তু গান, অপেক্ষা ধ্যানই অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল ; পরন্তু, গান অপেক্ষা ধ্যানেই ইঁহার বিশেযত্ব ও ব্যক্তিত্ব অধিকতর অনুভবনীয়। ব্যক্তিত্ব খুব বৃহৎ নয়, বিশেযত্বও বেশী বিস্তীর্ণ নয় ; কিন্তু বিশেযত্ব ও ব্যক্তিত্ব ইঁহার কিছু ছিল। তাহা ছিল গানে, ততোধিক তাঁহার ধ্যানে। গান ধ্যানেরই ক্ষণিক অনিবার্য উচ্ছ্বাস স্বরূপ উত্থিত হইত। কবি ক্বচিৎ আত্ম সংযমে যেন অসমর্থ হইয়াই গান গাইতেন ; সে গান কতক কেহ কেহ শুনিয়াছিল ; তাহার অনেক অদ্যাপি অশ্রুতও আছে ; অশ্রুতই হয়ত থাকিবে। ধ্যানশীল কবি-সম্প্রদায় তাঁহাদের সব গান শুনাইতে চাহেন না। এই কবি এমন অনেক গান গাইতেন, যাহা লোককে শুনাইবার জন্য গীত হইত না—গীতের জন্য গীত হইত, অর্থাৎ স্বভাবের ঐকান্তিক উত্তেজনা নিবারণার্থে গীত না হইলেই চলিত না। গানশীলতা গীত শুনায় ; ধ্যানশীলতা গান গোপন করে। গান গোপন করা এই অজ্ঞাত কবির অভ্যাস ছিল। তিনি গান গোপন করিতেন এবং শুনিয়াছি গোপনে গান করিতেন। সে গান কত সময়—সূত্রহীন, সংসার-সঙ্গতি-হীন, আদ্য-মধ্য-অন্তহীন—

> "অচেতনে চেতন ! ঘুমন্তে জাগা।
> সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড। গোড়া নাই আগা !"

সে গান অশরীরী সৌন্দর্যের "airy nothing," অজ্ঞাত দেশের অস্ফুট বার্তা ; অপরিজ্ঞাত বীণার অপরিচিত ধ্বনি ;—তাহা

"The forms of things unknown."

সে গান কবি-কথিত (Aerial kisses of shapes that haunt thought's wildernesses") কল্পনা-কানন-বিহারী অশরীরী অঙ্গের সমীর-চুম্বন—এক অতি সুমধুর সত্তা ; অস্থি-মজ্জা-মেদ-মাংসহীন, আকার-অবয়বহীন, অথচ সম্মুখস্থ সজীব মনুষ্য-দেহ অপেক্ষা অধিকতর অস্তিত্ব-সম্পন্ন, দৃঢ়তর-সত্য-প্রত্যক্ষ, তাহা অমর—

More real than living man, nurslings of immortality.

কবি গোপনে, অল্লাধিক পরিমাণে, এই প্রকৃতির গীত গাইতেন ; কখনও কখনও এই গীতের অশরীরী স্বরূপের শরীর "ছন্দোবন্ধ" দ্বারা গঠিতও করিতেন। যাহা গঠিত হইত, তদীয় গীত-স্বরূপের সর্বাঙ্গ গঠনে তিনি সমর্থ ছিলেন, এমনও বলিতে পারি না। গান শান্ত, সঙ্কীর্ণ, ধ্যান অসীম, অনন্ত। অসীম সৌন্দর্য সসীম দ্বারা সুব্যক্ত করিতে কে কবে পারিয়াছে? কবি তদীয় আত্মার আভ্যন্তরীণ ভাব-স্রোতে ভাসিয়া অজ্ঞাতে ইন্দ্রিয়াতীতের এক মহা দেশে, কল্পনার কি এক মায়ারাজ্যে, কিম্বা স্বপ্নের কেমন এক ছায়া-রাজ্যে চলিয়া যাইতেন ;—শরীরী ও অশরীরী উভয় রাজ্য ব্যাপিয়া এক অবিমিশ্র অতি কোমল, তরল এবং শীতল সৌন্দর্যস্রোত প্রবাহিত হইত ; ধ্যান-মগ্ন কবি আত্মস্থ বা আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহা উপভোগ করিতেন ; তাহাতে অবগাহন করিতেন, ইহ সংসারের কোলাহলের সহিত সংস্রব রাখিতে চাহিতেন না ;—গান তিনি অতি অল্পই গাইয়াছিলেন।

সে গান সাঙ্গ হইয়াছে। সে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতের সহিত মিশিয়াছে। জীবন-সঙ্গীত সাঙ্গ করিয়া, লোক-অপরিজ্ঞাত আমাদের এই কবি, যেমন লোক-দৃষ্টির অগোচরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং লোক-দৃষ্টির বাহিরে কবি-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি লোক-বিখ্যাতির অতীত ভাবেই অন্তর্হিত হইয়াছেন!

কবি গিয়াছেন। কবিতা কিছু আছে। সে অতি কোমল কবিতা। কোমলাদপি কোমল। মিষ্ট, মসৃণ, মোলায়েম। আবেশময়ী ;—ইথরবৎ আকাশ-বিহারিণী।

"সুকোমল চরণ কমল দুটি
ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি
করে পদ্ম-ফুল
করে ঢুল-ঢুল,
অলসিত আঁখি-সম আধো আধো ফুটি"

কঠিন মাটির কর্কশ স্পর্শ সহে না। অতি সাবধানে তাহা ছুঁইতে হয়। নহিলে নবনীতবৎ এলাইয়া যায়—নক্ষত্রবৎ ছুটিয়া পলায়। এই ধরি ধরি ধরিলাম, ভাবিতেছি, অমনি তখনি কোথায় চলিয়া গেল, সে সূত্র নাই—সে সৌন্দর্য নাই, অপর এক অলক্ষ্য-সূত্র সহযোগে ভিন্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত। একই মুহূর্তে বহুমূর্তিমতী,—বহুরূপিণী, বহুভাবময়ী এই কবিতা। স্বপ্নরাজ্যের সূত্র দ্বারা যেন ইহা গ্রন্থিত, সন্ধি ও মিলন-স্থল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেন ভিত্তিহীন এক অপরূপ অট্টালিকা ; শূন্যের পরে কুসুম-সৌরভের সমুন্নত সৌধ সৌন্দর্য-গ্রন্থিতে স্তরে স্তরে গাঁথা! সৌন্দর্য-রাজ্যের রসাভিজ্ঞেরই তাহা উপভোগ্য। উপভোগের সন্ধান ও সঙ্কেত না জানিলে সৌধ খসিয়া পড়ে ; সৌরভ সরিয়া যায়। সে কবিতা খাঁটি সৌন্দর্যের খাদহীন স্বর্ণ ; সুতরাং তাহাতে গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী বাসন-কোষণ বা গৃহিণীর গহনা গঠিত হইবার উপায় নাই। এ হিসাবে, তাহা একান্ত অব্যবহার্য ; কারণ খাদহীন। কিছু খাদ মিশ্রিত থাকিলে লোকের ব্যবহারোপযুক্ত হইতে পারিত। খাঁটি সোনা মানুষ-মানুষীর সৌন্দর্য-স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে ; কিন্তু ঘর-সংসারে ব্যবহারে আসে না ;—সেকরা সোনায় খাদ মিশাইলেই তবে তাহা সুন্দরীর সংস্পর্শ-যোগ্য হয়, তিনি তাহার অস্তিত্ব মঞ্জুর করেন।

কবি গিয়াছেন। কবিতা আছে। চিরকাল থাকিবে। তাহা অতি জীবন্ত কবিতা। অথচ তাহার কবি অপরিজ্ঞাত। অপরিজ্ঞাত ছিলেন ; তদ্রূপ গিয়াছেন। অমর কবিতার কবি লোক-সাধারণের অজ্ঞাত ;—হেতু কি ?

তদীয় কবিতা অমর, উজ্জ্বল, কোমল, মিষ্ট, হৃদয়ে সুধা-সিঞ্চিনী। কিন্তু সৌন্দর্য-রাজ্যের এমন সূক্ষ্ম কথায় পূর্ণ সে কবিতা যে, তাহা প্রচলিত সাহিত্য-সমালোচকের অনায়ত্ত, সাহিত্য-ব্যবসায়ের অবিজ্ঞাপিত ; তাহা সৌন্দর্য মন্ত্রে অদীক্ষিত লোক-সাধারণের অবোধগম্য ; অথচ সংসারে সেইরূপ লোকের

সংখ্যাই অধিক। অতএব এই কবিতা সাহিত্য-বিপণিতে বিরল, অবিক্রেয়। কবি অপরিজ্ঞাত।

কিন্তু ইহাও এই কবির সৌভাগ্য। কারণ আমি বিবেচনা করি, তাঁহার কবিতা জনসাধারণের মধ্যে বহু বিস্তার লাভ করিলে তাহা নিশ্চয়ই ইতরীকৃত হইত; তাহার আত্মার অপবিত্রতা স্পর্শিত।

কিন্তু এই অপরিজ্ঞাত কবি কে? অভিজ্ঞের পক্ষে ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্মশানে, শতকরা অন্ততঃ একজন করিয়া লোকও এখনও থাকা অসম্ভব নহে, যাহারা অনুশাসনে ও উদারতায় অবস্থাজ্ঞ। অবস্থাজ্ঞ ইঙ্গিতেই বুঝিয়াছেন, এই কবি কে? কিন্তু সকলে বুঝিবেন না। বিশেষতঃ গৌড়ীয় সাহিত্যের উপস্থিত অতিসার অবস্থায় অধ্যাপক ও ছাত্রেরা যদি ঘটনাক্রমে এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাঁহাদের সাহায্যার্থে সবিস্তারে আমার বলা কর্তব্য, এই কবি কে? এই কবি, যেমন বিখ্যাত নহেন, তেমনি বৃহৎও নহেন, আমি অগ্রেই বলিয়াছি। খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং বৃহত্ব, ইনি বুঝিতেনও না তেমন। এই কবি কলিকাতা রাজধানীর সঙ্কীর্ণ অবস্থাপন্ন কোনও গৃহস্থ-সন্তান। কিন্তু, রাজধানীর রাজা, রাজার রাজা অপেক্ষাও অতুল ঐশ্বর্যশালী। সে অলীক বা অমূলক ঐশ্বর্য নহে, অধিকারস্বত্বে তিনি তাহা অতিমাত্র উপভোগ করিতেন। এবং সে উপভোগ রাজৈশ্বর্যের আরাম অপেক্ষা অধিকতর সুখপ্রদ, তাহা শান্তি-রাজ্যের সৌন্দর্যোপভোগ। সৌন্দর্যের সংখ্যাতীত মূর্তি। সে মূর্তি সন্দর্শন করিয়া এই সঙ্কীর্ণ অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ শান্তি-সম্পদে, আপনাকে "ব্রহ্মাণ্ডের পতি" বিবেচনা করিতেন। নিঃস্বার্থ সৌন্দর্যানুভব-আনন্দ, হায়! এমনই বটে! এখনকার কোনও গৃহী লোক ধন-মানের মায়া কাটাইয়া কোনও একটি মানসিক আনন্দে একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারে, চিরজীবন তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। বিশ্বাস ত বিশ্বাস; ইহা এখন বিদ্রূপই আকর্ষণ করে। কথাটা শুনিলে আমরা হাসিয়াই খুন হই। তা হউক। এই ব্যক্তি বস্তুতঃই সৌন্দর্য-সাগরে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন—তিনি আত্মহারা হইয়া তাহার উপাসনা করিতেন, তাহাকে উপভোগ করিতেন, তাহার সহিত যেন মিলিত হইয়া যাইতেন :—

ক্ষুধা তৃষা দূরে রাখি,
ভোর হয়ে বসে থাকি,

নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী—সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার!"

সৌন্দর্যের শান্তি-সম্ভোগে ইঁহার এই প্রকারের উক্তি। এরূপ উক্তি আরও অনেক আছে এবং আমি যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে এই ব্যক্তির জীবনকার্য, সেই সকল উক্তির সম্পূর্ণ অনুরূপ। অথচ ইনি খুব সেকালের লোক নহেন খুব একালেরও নহেন, মধ্য সময়ের, বরং নাতি-মধ্য সময়ের লোক। এই সম্ভ্রম-সমালোচনা-সম্পদ-পিপাসাতুর সময়েরই লোক! ধর্মযোগী বা কর্মযোগীও নহেন। কাব্য-কবিতার উপাসক লোক, অপরিজ্ঞাত কবি। ইঁহার নাম ছিল বিহারীলাল চক্রবর্তী। নেহাৎ অজ্ঞাত নাম নয় কি?

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে আমি স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার কখনও পরিচয় ছিল না। তৎকৃত কবিতা কখনও কখনও পাঠ করিয়া এবং তদীয় শান্তি-সেবিত জীবনের ও সৌন্দর্য-ধ্যান-নিমগ্নতার কোন কোনও কথা ক্বচিৎ শুনিয়া, আমি তাঁহাকে মানসচক্ষে যেরূপ দেখিতে পাইতাম, উপরে তাঁহার তদনুরূপ একটি প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হইতে পারে উহা প্রকৃত প্রতিরূপ নহে; হইতে পারে উহা অতিরঞ্জিত বা অপূর্ণ। তাহা হইবারই সম্ভাবনা। আমি নিজের চক্ষে যেমন দেখিতাম, তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু পাঠককে পরের চক্ষে দেখার অনুরোধ করি না। সহৃদয়ের হৃদয়ে এই কবিকে কিঞ্চিন্মাত্রায় প্রতিভাত করিবার জন্য, তদীয় কবিতা এক্ষেত্রে, অল্পাধিক পরিমাণে, আলোচিত হওয়া আবশ্যক। উহার এ আলোচনা যতটুকু করিয়াছি এবং যেরূপভাবে করিয়াছি, তাহা পর্যাপ্ত নহে।

(২)

বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রকৃতির প্রতি কোমল অংশের উপাসক। সে অংশ বিশাল স্বভাবের সুকুমার সৌন্দর্য। চক্রবর্তী মহাশয় সেই সৌন্দর্যের কবি।

খাঁটি অবিমিশ্রিত নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য অথবা সেই সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে, ইঁহার ধ্যান ধারণা ও উপাসনার বিষয়ীভূত; এবং সেই উপাসনা অর্চনা হইতেই ইঁহার সঙ্গীত উদ্ভূত। সৌন্দর্য বা সুকুমার কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এ-দেশীয়েরা বলেন, সরস্বতী, ইয়ুরোপীয়েরা বলেন, "Muse"। গ্রীসে ইহার অপর নাম ছিল "Grace"। সৌন্দর্যের সারভূতা এই মহাদেবী, দেশীয়, বিদেশীয় সকল কবি কর্তৃকই সেবিতা;—আমাদের এ কবিও অবশ্য ইঁহারই সেবক। কিন্তু এই সৌন্দর্যেশ্বরীকে সাধারণত অন্যান্য কবি যেরূপভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্রভাবে, এই কবি তাঁহার সত্তানুভব করিতেন। সে অনুভূতি কিছু অসাধারণ এবং অভিনব। পরন্তু সেই অনুভূতিই এই কবির একমাত্র আইডিয়া—তাঁহার যাবতীয় কাব্যের যথাসর্বস্ব। সেই অনুভূতির আকুঞ্চন, প্রসারণ হইতে উৎপন্ন বিবিধ সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য, তাহাদেরই সমাবেশ এবং অতি মহৎ চিত্র এই কবির কাব্যে। একদিকে সৌন্দর্য সাধারণত এই কবি কর্তৃক গীত; পক্ষান্তরে পার্থিব সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিকৃতি, রমণী জাতির মাহাত্ম্য-মাধুরী ইঁহার সঙ্গীতে প্রতিভাত। দ্বিতীয়, প্রথমেরই রূপান্তর। কিন্তু, এরূপভাবে, একাধারে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং জগদ্ধাত্রীরূপিণী রমণীকে, জগতের অতি অল্প কবিই অর্চনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে একজন ব্যতীত অপর কেহ নারীজাতি সম্বন্ধে ইঁহার ন্যায় উচ্চ আদর্শ কখনও অনুভব ও অভিব্যক্ত করেন নাই; অন্তত আমার এইরূপ ধারণা।

এখন মোটের উপর কথা এই যে, প্রথমত সৌন্দর্য এবং দ্বিতীয়ত পার্থিব সৌন্দর্যের সারভূতা রমণীজাতি এই কবির কবিতার বা সঙ্গীতের উদ্দীপনা ও উপজীব্য। অতএব তাঁহার কবিত্বানুভবকল্পে কেবল এই দুই বিষয় অনুধাবনীয়। কিন্তু বড়ই বিস্তৃত এই বিষয় দুইটি।

বিহারীলাল চক্রবর্তী নিছক সৌন্দর্যের কবি। তাঁহার কবিতা ও কবিত্ব কি প্রকারের, বুঝাইতে হইলে, সৌন্দর্য পদার্থের স্বরূপ কি বুঝাইতে হয়। কিন্তু তাহা সহজ নহে। তাহা সহজ তো নহেই, তাহা আদৌ সাধ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহা মনোবিজ্ঞানের একটি জটিল তত্ত্ব। সাংখ্য পতঞ্জলি বা প্লেটো পিথাগোরাস হইতে একাল পর্যন্ত কোনও মনস্বী এ তত্ত্বের সম্যক্ মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা নিজেই

সংশয়ী।* অধ্যাত্মবাদী (Idealist) দার্শনিকদিগের মতে সৌন্দর্যের আদৌ কোন বহিঃসত্তা নাই; তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তরের বস্তু। মনুষ্যের মনে সৌন্দর্যানুভব-শক্তি না থাকিলে বাহিরের কোন বস্তুতেই তাহা অনুভূত হইত না। সৌন্দর্য-মাধুরী মনেরই সৃষ্টি মাত্র; কুৎসিত কদাকারও তাহারই সৃষ্টি। সে সৃষ্টি স্বতঃনিহিত ও অনুশীলন-মার্জিত মানসিক শক্তিসম্ভূত। বস্তুগত দ্রব্য-স্বরূপের কোন স্বাধীন সত্তা নাই; কেন না, মনের অনুভব-শক্তি ব্যতীত তাহা অনুভূত হইবার উপায়াভাব। অগ্নির উত্তাপ বা শর্করার মিষ্টত্ব তোমার অনুভূতি ও স্বাদ-গ্রহণ-শক্তির পরিচায়ক অথবা উক্ত দুই দ্রব্যের বস্তুগত উত্তাপ ও মিষ্টত্ব স্বরূপ বিদ্যমান আছে। দার্শনিক বলেন, অগ্নি নিজের উত্তাপ যখন নিজে অনুভব করে না, এবং শর্করা যখন নিজের মিষ্টত্ব স্বাদ নিজে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তখন বস্তুগত ঐ সকল গুণ উহাদেরই, ইহা বলিতে পারি না। পরন্তু, উহাদের স্বরূপ যখন তোমা কর্তৃক অনুভূত হইতেছে, দেখিতেছি, তখন ঐ স্বরূপ তোমারই মানসিক শক্তিসম্ভূত অবশ্যই বলি।** অনুভূতি-উত্তেজনার্থে বহিঃপদার্থ কেবল উপলক্ষ মাত্র; আর কিছুই নহে। মানুষের যদি মিষ্ট-রসাস্বাদশক্তি না থাকিত, তবে শর্করের শর্করাত্ব সম্ভবিত না। বহিঃদ্রব্যের স্বরূপ মাত্রেই এই কথা। সৌন্দর্য সম্বন্ধেও কথা এই। তোমার যদি সৌন্দর্যানুভব-ক্ষমতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই কোনও দ্রব্য সুন্দর হইতে পারে

*The Science of Aesthetics—the causes or conditions of beauty and sublimity – seems to be still unsettled. Plato and Leibnitz, Hutcheson and Hogarth, Burke and Reynolds, Diderot and Alison have attacked the subject theorising and refuting, composing and criticising and they have done well, for any man who has anything to offer on such an issue is bound to put it forth and let it go for what it is worth."

—*The Science of Beauty* by A. W. Holmes Forbes.

**Applied to beauty the Idealism would show that beautiful qualities are mental creations; that they have no more existence in the objects themselves than heat in the fire or sweetness in sugar." —*The Science of Beauty.*

না। সৌন্দর্য কুসুমেও নহে, কামিনীর কোমল কটাক্ষেও নহে, উহা তোমার মনে।

ইয়ুরোপীয় আইডিয়ালিজিম্ বা অধ্যাত্মবাদের অভিমত এইরূপ। এদেশীয় দার্শনিক মতও এতদনুরূপ। জড়বাদের মত ইহার বিপরীত। কিন্তু জড়বাদের কঠোর আক্রমণে এবং বহুকালের তর্কযুদ্ধেও আইডিয়ালিজিমের উপরোক্ত অভিমত অদ্যাবধি খণ্ডিত হয় নাই। ইয়ুরোপে বার্কলে এই মতের অধিনায়ক। এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি-তর্ক একরূপ অখণ্ডনীয়। জড়বাদী হিউম্ বলেন, দ্রব্যস্বরূপের স্বাধীন সত্তাভাব সম্বন্ধে বার্কলের যুক্তিতর্ক (admits of no answer) খণ্ডন করিয়া কোনও উত্তর দেওয়া যায় না। পরন্তু, আলেক্‌জেণ্ডার বেইন বলেন,—"All the ingenuity of a century and a half has failed to see a way out of the contradiction exposed by Berkeley." ইহার তাৎপর্য হিউমের উক্তিরই অনুরূপ। ফলত আইডিয়ালিজিম্ এতাবৎ কালাবধি অখণ্ডনীয়। তথাচ ইহাই যে পূর্ণ সত্য, এমনও বলা যায় না। কোনও ইয়ুরোপীয় লেখক বলেন, "Idealism is but the moiety of a more comprehensive truth."

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সর্ববাদিসম্মত হইলেও, তাহার অবস্থিতি-স্থানের থিয়োরী সম্বন্ধে প্রথমেই মহা বিতণ্ডা। পরন্তু সৌন্দর্যের উপাদান কি, তাহা কি কি উপকরণে গঠিত, তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বভাব কি প্রকার, এক কথায় প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্দর কি অথবা সৌন্দর্য কেমন পদার্থ, এ বিষয়েও দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণ্ডগোল আরও বেশী। দ্রব্যের উপকারিতা ও উপযোগিতায় সৌন্দর্য, তাহার পূর্ণতায় অথবা উচ্চতায় কিম্বা একমাত্র মনোহারিতার উপরেই মাধুরী নির্ভর করে? তাহা বর্ণে, রূপ-রস-গন্ধে অথবা ভাব-বৈচিত্র্যে—এই সকল প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর আছে এবং তাহাদের মধ্যে সত্যাসত্য উভয়ই অল্লাধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সৌন্দর্য-তত্ত্ব-বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে। এবং তদ্দ্বারা উপস্থিতক্ষেত্রে ফলও যে কিছু হইবে, তাহাও নহে। সৌন্দর্যকে তাহার উপাদান, আধার ও আধেয়কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহার শিরা-ধমনী, নাড়ী-নক্ষত্র, নখ-দর্পণে রাখিলেও হয় ত বুঝা যাইবে না, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পদার্থটি কি? পরন্তু, তাহা যদিও বুঝা যায়, তথাচ শক্তির বিরহে

তাহা সম্যক্ অনুভব করিয়া আরাম অনুভব করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সৌন্দর্য যত না বুঝিবার বস্তু, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অনুভব ও উপভোগের বস্তু। তাহা বরং বুঝান যায়, কিন্তু অনুভব করাইয়া দেওয়া যায় না। কবি ও ভাবুক, দর্শনে ও বিজ্ঞানে সৌন্দর্য-তত্ত্ব পাঠ করিয়া কবি ও ভাবুক হয়েন না। স্বাভাবিক সৌন্দর্যানুভব-শক্তি অনুশীলনে উন্নত ও মার্জিত হইয়া কবিকে কবি ও ভাবুককে ভাবুক করে। ফলত সৌন্দর্য কি, তাহা বরং বুঝাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু কেহ কাহাকেও তাহা অনুভব করাইয়া দিতে পারে না। সৌন্দর্য বস্তুগত বা হৃদয়গতই হউক, তাহার উপাদান-কারণ যাহাই হউক, তাহা আত্মশক্তি দ্বারা অনুভবনীয়। সে শক্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। স্বয়ং কবিগুরু বাল্মীকি আসিয়া অজগর গর্দভের পেটে সে শক্তি পুরিয়া দিতে পারেন না। কালিদাস পণ্ডিত যেমন এক গণ্ডূষে কবিত্ব-সাগরটা সটান উদরস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত, এখনকার অনেক কুষ্মাণ্ডচন্দ্রেরা তেমনি ক'য়ের আঁকুড়ি টানিতে শিখিয়াই কাব্য-কবিতার সৌন্দর্য-সুখানুভব করা সম্ভব মনে করেন, সেটা সম্ভব হয় না; সুতরাং কাব্য কবিতা ও কবি-দিগের স্কন্ধে আপনাদের কুষ্মাণ্ডত্বের অপরাধটা আরোপ করিয়াই পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে এরূপ কুষ্মাণ্ড প্রকৃতির কবিরও বাজারে অভাব নাই।

সৌন্দর্য আদৌ দ্রব্যস্বরূপগত নহে, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। তবে স্বাধীনভাবে দ্রব্যস্বরূপে তাহার সত্তা না থাকিতেও পারে। কিন্তু, সৌন্দর্য যে একেবারেই শূন্য পদার্থ, এমনও নয়। তাহা পদার্থের স্বরূপগত বটে। কিন্তু, তাহা হইলেও ত সেই স্বরূপগত সৌন্দর্য অনুভব করিবার শক্তি চাই। সৌন্দর্য এক দিকে পদার্থের স্বরূপ-সাপেক্ষ বটে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে উহা অনুভব-শক্তির অস্তিত্ব, উপযুক্ততা এবং তীক্ষ্ণতা সাপেক্ষ। দ্রব্যস্বরূপে হৃদয়ে একটি আঘাত মাত্র করে; সেই আঘাতজনিত হৃদয়ের যে ভাব, অর্থাৎ সৌন্দর্যানুভূতি ও তজ্জনিত, সুখানুভব, প্রীতি, বিস্ময়, প্রশংসাদি (admiration and appreciation of beauty) তাহা হৃদয়েরই ক্রিয়া। তাহা অর্থাৎ সেই ভাব উৎপাদনার্থে বুদ্ধি-শক্তি ও হৃদয়-বৃত্তি পরিচালনার আবশ্যক। সে পরিচালনায় যে যে পরিমাণে সমর্থ, ঠিক সেই পরিমাণে সে

সৌন্দর্যানুভবক্ষম এবং সেই অনুভূতির অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী। অতএব সাধারণত বুদ্ধি-শক্তির মার্জিত বা অমার্জিত ভাব এবং হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলন বা তদ্বিরহ ভেদে সৌন্দর্যানুভূতি ও তজ্জনিত আনন্দের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে।* ইহা সহজ কথা, তথাচ আরও বিস্তারিত ভাবে এ কথাটি বুঝাইতে পারিলে ভাল হইত, কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় তাহার সবিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া বিবেচনা করি ;—কিন্তু, এক্ষেত্রে তাহার স্থান হইবে না।

সাধারণত সৌন্দর্যানুভব সম্বন্ধেই যখন এই, তখন কাব্য-সৌন্দর্যানুভব-কল্পে কি পরিমাণে অনুশীলন (culture) আবশ্যক, তাহা কেবল অনুভবনীয়। ইতর লোকে যে উচ্চতর কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না ; তাহার প্রধান কারণ, ইতরের অনুশীলনাভাব, তাহা উচ্চতর কাব্যের অপরাধ নহে। পরন্তু, সৌন্দর্য সম্বন্ধে, তথা কাব্যরসের বিষয় সম্বন্ধে বিকৃত সংস্কার যে সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাও ইতরের এই ইতরতা ও অনুশীলনের অভাব জনিত, ইহাও এ স্থলে বক্তব্য।

কবিতা ও কাব্য-রসের অর্থাৎ তদন্তর্গত সৌন্দর্যের অবশ্য নানা লক্ষণ আছে। সকল লক্ষণই যে বিষয়ের স্বরূপ-ব্যঞ্জক, তাহা নহে। এমন কি প্রায় এমন একটি লক্ষণও কচিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহা সম্যকরূপে কবিতার বা কাব্যরসের সম্যক স্বরূপব্যঞ্জক। কবি সম্প্রদায়ের নিজের এবং আলঙ্কারিকদিগের লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া, কবিতার বৈজ্ঞানিককৃত লক্ষণ কি, বারেক দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিক বলেন :—Poetry consists in the

*The appreciation of beauty * * * requires intelligence and if, upon examination, it be found that some sentient creatures do not exhibit that appreciation, we may conclude that they want requisite amount of intellgence or are possessed of a lower order of mind than those who do exhibit such an appreciation ; and further, if we find that some persons exhibit that appreciation in a lower or less perfect manner we may conclude that their intellect has been imperfectly developed."

—*The Science of Beauty*

liberation of beautiful analogies. * * * It is the people's part to experience beautiful analogies, it is the poet's province to liberate those analogies, and it is the people's again to appreciate them." বৈজ্ঞানিকের এই লক্ষণ অগ্রেই বলা আবশ্যক, বিলক্ষণ অসম্পূর্ণ;—কিন্তু তাই বলিয়া একান্ত অর্থশূন্য নহে। আলঙ্কারিক যাহা বহু কথায় বুঝাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক তাহা এক কথায় সারিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, সৌন্দর্য বৈচিত্র্যের সৌসাদৃশ্য-সৃষ্টিই কবিতা। এক কথায়, সুন্দর উপমার অভিব্যক্তিতেই, বৈজ্ঞানিকের মতে কবিতা। কথাটা শুনিতে খুব উদ্ভট বটে, কিন্তু, বিজ্ঞানবিদ্ বিশ্লেষণ দ্বারা এ কথা প্রমাণ করিতে অগ্রসর। বৈজ্ঞানিক পুনশ্চ বলেন যে, জনসাধারণে সুন্দর সৌসাদৃশ্য বা উপমেয়-উপমানের বস্তুগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, কবি সেই সৌসাদৃশ্যদিগকে স্বাধীন জীবন দেন, পুনঃ জনসাধারণ তাহা উপভোগ করিয়া আনন্দ অনুভব করে।

এখন বৈজ্ঞানিক দিক হইতে দেখা যাইতেছে,—সুন্দর সৌসাদৃশ্য-নিচয়কে স্বাধীনতা দান (অথবা সৌন্দর্য-সৃষ্টি?) কবির কার্য। তিনি ভাব-বৈচিত্র্য দেখাইবেন—কিন্তু পাঠকের মনে যদি ভাবেরই একান্ত অভাব হয়,—"এনালজির এক্সপিরিয়েন্স" যদি একেবারেই না থাকে, তবে কবি বেচারী তাহা কিছু আর উৎপন্ন করিয়া দিতে পারেন না।

বিষয়টি একদিকে যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, অপরদিকে তেমনি কঠিন ও জটিল। সৌন্দর্য পদার্থ কি এবং তাহা অনুভব করার প্রক্রিয়া কিরূপ, বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই দুষ্কর। অথচ সৌন্দর্যানুভূত হইয়া আনন্দ উপভোগ হওয়ার মত সহজ ও স্বাভাবিক আর কিছুই নাই। "আনন্দ" পদার্থটি কি, অশেষ চেষ্টা করিয়াও যেমন কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না, সৌন্দর্যের সত্তা কি, বুঝান প্রায় তদনুরূপ কঠিন। পরন্তু, সৌন্দর্য উপভোগকল্পে উহার ফলও কিছু নাই, অগ্রেই বলিয়াছি। আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতা যদি আমার না থাকে, তুমি কি আমায় বুঝাইয়া দিতে পার, আনন্দ সামগ্রীখানা কি? তাহা পাতিয়া শুইতে বা গায়ে প্রলেপ দিতে হয়? সৌন্দর্য সম্বন্ধেও প্রায় এই কথা। পরন্তু, বৈজ্ঞানিক-শীলে ছেঁচিয়া গুঁড়া গুঁড়া করিলেও সুন্দরের টিকা সম্ভবে না। সৌন্দর্য যদি আদৌ উপভোগ্য হয়, তাহা অখণ্ডভাবেই উপভোগ্য, কাটিয়া চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া নহে।

(৩)

আমাদের আলোচ্য কবির কবিতা সৌন্দর্যময়ী এবং সৌন্দর্যের কবিতা। কিন্তু সৌন্দর্য কি পদার্থ, আমি তাহা বুঝাইতে অক্ষম। পরন্তু, তদীয় কবিতার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়াও আমি তাহার ব্যাখ্যা করিব না. সেইরূপ ব্যাখ্যা এস্থলে নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। এই কবি কিরূপভাবে সৌন্দর্যানুভব করিয়াছিলেন এবং সৌন্দর্যেশ্বরী সারদাকে অবলোকন করিতেন তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র আভাস তাহার কবিতা হইতে দেওয়া যাইবে। সৌন্দয পদার্থ কি. পুনঃ বলিতেছি, আমরা বুঝাইতে অক্ষম। কবি নিজেও বুঝার পর তবে তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি বলেন,—

"বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তায়"

প্রাজ্ঞ গণনাপর বটেন। সকল বিষয়েই তিনি পূর্বাপর-নিরূপণ ও "কার্য-কারণ সম্বন্ধ-নির্ধারণ" করিয়া কার্য করিতে চাহেন। কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া, ঘসা মাজা করিয়া বোধ হয় রূপ-লাবণ্য দেখা চলে না, প্রণয় পীরিতি করাও সম্ভবে না। প্রাজ্ঞ যাহাই করুন প্রেমিকের রীতি স্বতন্ত্র।

অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি, ধ্যানই এই কবির কবিত্বের প্রাণ, পরমাত্মা। কিন্তু, সে ধ্যান, প্রকৃত প্রস্তাবে, কাহার উদ্দেশে,—সে ধ্যান কি প্রকারের এবং কিসের জন্য? ইহসংসার হইতে পরিত্রাণার্থে, পারলৌকিক নির্বাণ-মুক্তি কামনাতেই কি কবি ধ্যান-নিমগ্ন? না, তাহা নহে। তবে কি? কি, তাহা কবি নিজেও বলিতে অক্ষম। কেন না, তাহার কারণ-নির্ণয়-কল্পে তিনি কখনও উদ্যোগ করেন নাই, তাহার অবসর পান নাই; সে কথা, তাঁহার মনেই কখনও উদয় হয় নাই। কাজেই বলেন,—

"ধেয়াই কাহারে দেবি! নিজে আমি জানি না"

ইহা ভিন্ন আর কি বলিবেন? আর কিছুই ঠিক বলিবার নাই। কবি ধ্যান-নিমগ্ন! কাহার ধ্যান করেন, ঠিক জানেন না। কিন্তু ধ্যান নিমগ্ন তাঁহাকে রাখে কিসে?—কবি আত্মপ্রকাশে কাতর নহেন। সরলভাবে আপাদমস্তক আত্মপ্রকাশেই তাঁহার কবিতা। কবি এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

মধুর মাধুরী-বালা
কি উদার করে খেলা!
অতি অপরূপ রূপ!

কবি এই রূপে মোহিত, ধ্যান-মগ্ন! এরূপ 'কেবল হৃদয়ে দেখেন সম্যক্‌রূপে 'দেখাইতে পারেন না'; সে রূপ জগতে, অতি জগতে ব্যাপ্ত—বিস্তৃত।

কহে সে রূপের কথা
বসন্তের তরুলতা,
সমীরণ ডেকে বলে নির্জনে কানন-ফুল ;
শুনে, সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুল্ ঢুল্।
হাসি হাসি ইন্দ্রধনু নীল গগনে ভায়,
শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চায়!
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমা'য়ে ঘুমা'য়ে হাসে, জানি না কি কারণে।
ভোরে শুকতারা রাণী
কি যেন দেখায় আনি,
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তা'য়।

সুষুপ্ত শিশু কি স্বপ্ন দেখে, কি স্বপ্ন দেখিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসে, কেহ জানেন কি? জানিবার কিছু উপায় আছে কি? যদি না থাকে, তবে এই কবির স্বপ্ন কি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা জানা অসম্ভব। স্বভাবের সরল শিশু সৌন্দর্য-মগ্ন; স্বপ্ন-সেবিত সুপ্তবৎ হাসেন, কাঁদেন। চেতনার অচেতনে, স্মৃতি বিস্মৃতিতে, ইহলোক পরলোকে, যেন এক সঙ্গম-সূত্রে সংমিশ্রিত হইতেছে, স্মৃতি সুপ্ত, সজাগ, যেন কেমন ছায়ালোকের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে, সব কথা স্মরণ হয় না, অথচ বিস্মৃতিও নহে; আত্মার এই অনির্বচনীয় অবস্থায় কবি বলিতেছেন—

প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন আমাকে ডাকে,
ভুলিবার নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কাকে।

সৌন্দর্য-মাধুরীর যত মূর্তি এই কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কোথাও একটি নির্দিষ্টসূত্রবদ্ধ নহে। যখন যে মূর্তি হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, ঠিক তাহাই চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুন্সিয়ানার মাপে সৌন্দর্যটাকে সার্ভে করিয়া, তিনি তাহার ছবি তুলেন নাই। সুতরাং পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে পরে পরে তাহা সাজান নহে। এই দেখিলাম,—

চলেছে যুবতী সতী
আলো কোরে' বসুমতী,
স্নানান্তে প্রসন্ন-মুখী, বিগলিত কেশপাশ,
প্রাণপতি-দরশনে
আনন্দ ধরে না মনে
বিকচ আননে কিবে মৃদুল মধুর হাস।

ইহার পর পর্যায়েই সৌন্দর্যের এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্তি—

উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই!
বল, কা'রে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই!

তুমি, সৌন্দর্যের এই মহান বিশাল মূর্তি ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে না করিতেই, তাহার অপর মহীয়সী মাধুরী তোমার সম্মুখে প্রতিভাত! কবি সহসা সৌন্দর্যেশ্বরীকে উপস্থিত করিলেন;—

অহো! বিশ্ব পরকাশি
উদার সৌন্দর্যরাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত;
যে দিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্যে ডুবিয়া যাই;
অত্যুল্লাসকরী, অয়ি
পরম আনন্দময়ি!—
কে তুমি, মা! কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাসিত?

ইহা উন্নত, মহৎ, সুব্লাইম, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই আবার ললিত, মধুর, মনোমোহিনী মূর্তি—

সৌন্দর্য-সাগর মাঝে
কে গো এ সুন্দরী রাজে
আকাশের নীল জলে প্রফুল্ল নলিনী!

পরে পরে সর্বত্রই সৌন্দর্যের এইরূপ স্বতন্ত্র মূর্তি। অপর্যায়ে কখনও কোমল, কখনও করুণ, কখনও ললিত মধুর, কখনও বিরাট, বিস্ময়কর, সুব্লাইম সৌন্দর্য! ইহা যেন মনুষ্য-মনের সচরাচর পরিলক্ষিত ভাব-যোগের (associa-

tion of ideas) অতীত এক অভিনব নিয়মে উদ্ভূত। কবি মধুর হইতে পুনঃ মহানে উপস্থিত। সৌন্দর্যদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

কে তুমি জননী, পিতা
নন্দিনী, রমণী, মিতা
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস ?
কে তুমি মা জল স্থল,
মহান অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ ?
কে তুমি ? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?

* * * *

নিতি নিতি তরুলতা
নধর নূতন পাতা,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর !
ঝরে যায় পরক্ষণ
ব্যথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর।

* * * *

আকাশ, পাতাল, ভূমি
সকলি, কেবল তুমি।
এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয় ;
ভীষণ প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশদিকে পায় স্ফূর্তি,
তোমার মহান মূর্তি
অনাদি অনন্তকাল লোটে পদতলে !

* * * *

প্রত্যক্ষ বিরাজমান
সর্বভূতে অধিষ্ঠান
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;

এই দেবী, সৌন্দর্য বিধায়িত্রী,—ইহাকে সারদাই বল বা সর্বমঙ্গলাই বল, মিউজই বল, আর মহেশ্বরীই বল,—ইনিই এই কবি কর্তৃক অর্চিত, পূজিত, ইঁহারই মঙ্গলগীতি তিনি গাইয়াছেন। তাঁহার সর্বপ্রধান কাব্য "সারদামঙ্গল"-এ ইঁহারই মঙ্গলগীতি; তাঁহার সব কয়খানি কাব্যেই এই একই আইডিয়ার অপূর্ব সম্প্রসারণ।

(৪)

কবির শেষ এবং অসম্পূর্ণ খণ্ডকাব্য "সাধের আসন" হইতে উপরের সমস্ত কবিতাগুলি উদ্ধৃত। "সাধের আসন"-এর সর্বপ্রথম অধ্যায় হইতে আমরা যাহার আভাস দেখিয়াছি, "সারদামঙ্গল"-এ তাহারই বিবিধ বিকাশ ;—"সারদামঙ্গল" এক অপূর্ব কাব্য। অপূর্বত্বের কারণ উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। সৌন্দর্যের অসাধারণ তীক্ষ্ণানুভূতি, তাহার সূত্রহীন সুধা-সিঞ্চিনী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র ; পরন্তু, সারদাকে এক অভিনবভাবে অর্চনা, আমরা "সারদামঙ্গল"-এ দেখিতে পাই। জীবনের যত কিছু কোমল, করুণ ও মধুর বন্ধন আছে,—তাহার সবই সারদা। এই কবির নিকট সারদা কখনও জননী, কখনও নন্দিনী, কখনও প্রণয়িনী—প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরী ! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, প্রায় সকল রসেই এই কবি সৌন্দর্যেশ্বরীর সেবা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের প্রেমোচ্ছ্বাস কোমলতায় পৃথিবীর কোনও প্রধান কবি অপেক্ষা ন্যূন নহে। "সারদামঙ্গল" কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কবিতার সমষ্টি। এ কবির সব রচনাই এইরূপ। কিন্তু এখন "সারদামঙ্গল" হইতে কিছু সৌন্দর্য চয়ন করা যাউক।

"সারদামঙ্গল"-এর আরম্ভে, চক্রবর্তী মহাশয়, আদি কবি বাল্মীকির পুণ্য তপোবনে করুণ-কবিতা-সমভিব্যাহারিণী সারদাদেবীর আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। গভীর নিশীথকাল—বসুমতী তিমির-বসনাবৃতা ;—

নাহি চন্দ্র সূর্য তারা,
অনল-হিল্লোল ধারা ;
বিচিত্র-বিদ্যুৎ-দাম-দ্যুতি ঝলমল ;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।

পরন্তু, বসুন্ধরা ধীরে ধীরে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন গুটাইতেছেন, উষা আসিয়া তাঁহার অধরপ্রান্তে মৃদু চুম্বন করিতেছে। তমঃ-অবসানে উষার আবির্ভাব সহিত, তাহার সেই কোমল কিরণে স্নাত হইয়া সরস্বতী আদি কবির কবিত্ব-সম্পদ হস্তে দেখা দিতেছেন। সারদার শুভাগমনের ইহা অতি প্রশস্ত সময় বটে, পাঠক প্রথমতঃ উষার কোমল-কান্তি উপভোগ করুন,—

হিমাদ্রি শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবন।
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,
তামসী, তরুণ উষা কুমারী-রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণ।
হাসির অম্বর তলে
পারিজাত দলে দলে
হাসিল মানসসরে কমল কানন।

কবির রচনা-ঐশ্বর্য পাঠক অনুধাবন করিবেন। একদিকে উষার কোমল কিরণ; অপরদিকে ক্রৌঞ্চ-বধে ক্রৌঞ্চীর কাতর ক্রন্দন;—তপোবন করুণার স্তন্য-দুগ্ধে প্লাবিত! কবিতা দেবী, সর্বপ্রথম, করুণ রসেই, আদি কবির ললাটে উদিতা হইলেন!

সহসা ললাট-ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে!
কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি ভুবন উজলে।

চন্দ্র নয়, সূর্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে

কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে !

কবি-প্রতিভার আদ্যাশক্তি,—সৌন্দর্য-মাধুর্যের জননী ইনি। আমাদের কবির অস্তিত্ব এই দেবী-মন্দিরে বিলুপ্ত। তিনি আর কিছুই চাহেন না, আর কাহাকেও চাহেন না। সংসারীর সর্বশুভদায়িনী লক্ষ্মীকে পর্যন্ত তফাৎ হইতে বলেন ;—

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগী-জন-তপোবন-স্থলে ?

কবি লক্ষ্মীকে চাহেন না। সারদা বা সৌন্দর্য-দেবীকে বলেন ,—

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে।
গিরিমালা কুঞ্জবন
গৃহ নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই যাও আগে আগে।
জাগরণে জাগ হেসে
ঘুমালে ঘুমাও শেষে
স্বপনে মন্দারমালা পরাইয়া দাও গলে।

থাক হৃদে জেগে থাক
রূপে মন ভরে রাখ
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে।

কবি, প্রকৃতই, "এ নগর কোলাহলে" তপোবন-তপস্বীর মত ধ্যান-মগ্ন ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে সম্বোধন করিয়া "বন্দে মাতরম্" অমর গীত গাইয়াছিলেন। চাই কি, এই একটি মাত্র গীতে স্বদেশীয় সাহিত্যে চিরজীবী হইতে পারিতেন। গ্রে এক "এলিজি'তে ইংরেজী সাহিত্যে অমর। বাঙ্গালার কোনও ব্যক্তি তাঁহার "যমুনা-লহরী" সঙ্গীতে বিখ্যাত। বঙ্কিমবাবুর "বন্দে মাতরম্" ইহাদের সমশ্রেণীস্থ সুমহান সঙ্গীত। "বন্দে মাতরম্"-এর একটি চরণে গীত হইয়াছিল—

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে;

বঙ্কিমের এই মহাগীতির বহুপূর্বে বিহারীলাল সৌন্দর্য-জননীকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন ;—

তুমিই নয়নের তৃপ্তি
তুমিই নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হলে আমি প্রাণহারা হই ,

* * * *

যে ক'দিন আছে প্রাণ
করিব তোমার ধ্যান
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙ্গা চরণতলে।

কভু বিরহ, কভু বিলাস,. কভু উপাসনা, কখনও অভিমান—কবি ভাবুক ভক্তের এবং অত্যুগ্র অনুরাগী প্রেমিকের যাবতীয় আবেগে উন্মত্ত। হৃদয়-বাসিনীর বিলাসে এই তিনি সর্বপৃথিবীর সম্রাট অপেক্ষাও সুখী,—পরক্ষণেই হৃদয়েশ্বরী যেন কোথায় লুকাইলেন, কবির করুণ ক্রন্দনে দারুণ পাষাণ গলিতেছে। কিন্তু কাতরতার মধ্যেও তিনি কর্তব্যপরায়ণ, ধীর ;—তিনি "অমরাবতীর বরমালার" কামনায় মনুষ্যত্বের কর্তব্য বিস্মৃত নহেন ; স্বর্গের মোহে তিনি নরকের জীবের প্রতি উদাসীন নহেন ;—

যাই যার রসাতলে

চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী

*　*　*　*

নরকে নারকী-দলে

মিশিগে মনের বলে

পরাণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায় ;

মরি যদি মরা চাই মানুষের মত ;

থাকি বা প্রিয়ার বুকে,

যাই বা মরণ-মুখে,

এ আমি, আমিই রব ; দেখুক জগত।

মহান মনেরি তরে

জ্বালা জ্বলে চরাচরে,

পুড়ে মরে ক্ষুদেরাই পতঙ্গের প্রায় ;

জ্বলুক যতই জ্বলে

পর জ্বালা-মালা গলে,

নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি ;

হিমাদ্রিই বক্ষোপরে

সহে বজ্র অকাতরে,

জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায় ;

অস্তাচলে চলে রবি,

কেমন প্রশান্ত ছবি !

তখনো কেমন তাহা উদার বিভূতি !!

এ গীতি অসাধারণ। বিশেষত বাঙ্গালা সাহিত্যের বক্ষপরে এরূপ গীতি মরকতমালার অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান।

কোমল, করুণ, মহান, মহিমান্বিত সৌন্দর্য-মঙ্গল-সঙ্গীত মন্দাকিনী-প্রবাহবৎ অমৃতলহরী ছুটাইয়া চলিয়াছে? কখনও মধুর, মোলায়েম, মৃদু, মলয়-নিশ্বাস, কখনও উচ্চ, উচ্চাদপি উচ্চ, প্রীতি-বিস্ময়কর, সুন্নাইম সঙ্গীতোচ্ছ্বাস ! কত উদ্ধৃত করিব, কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি শুনাইব? কবি হিমালয়ের বিশালত্ব বর্ণনা করিতেছেন ;—

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার।

* * * *

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে !

* * *

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে !
জ্বলন্ত-অনল-ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে !

* * *

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতূহলে মত্ত করিগণ।
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন-বিজলী-ঝলা বিলসে কেমন !

* * *

ফেনিল সলিলরাশি
বেগভরে পড়ে খসি
চন্দ্রালোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে ;

সুধাংশু-প্রবাহ পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে।

পরন্তু, এক স্থানের এক বিন্দু মোলায়েম ভাব অনুভব করুন :—

মধুর রজনী
মধুর ধরণী
মধুর চন্দ্রমা মধুর সমীর।
ভাগীরথী বুকে
ভাসি ভাসি সুখে
চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর।
আলু থালু কেশ
আলু থালু বেশ
ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির।
অপরূপ হাস
আননে বিকাশ
অধর-পল্লব অলপ অধীর!
না জানি কেমন
দেখিছে স্বপন
মধুর-মধুর মূরতি মদির।

পুনশ্চ, সৌন্দর্য-প্রীতিতে বিভোর হইয়া সৌন্দর্যকে সম্বোধন করিতেন :—

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি-ফুলহার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম ঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!

এ সোহাগ স্বর্গের! পৃথিবীর ময়লা মাটির নহে। কিন্তু এই কবি, সৌন্দর্য

সর্বাঙ্গীণ উপভোগ করিয়াও, পরিতৃপ্ত নহেন। সৌন্দর্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতে চাহেন ;—

সেই তুমি, সেই আমি
সেই এ স্বরগ ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন,
সেই প্রেম, সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ,
কেন মন্দাকিনী-তীরে দুপারে দুজন ?

সেক্সপীয়র বলেন "সৌন্দর্যের বদন-সরোজের উপরে ভগবানের আদেশাবলী সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অঙ্কিত।" কবি কীটস্ বলেন, "সৌন্দর্যই সত্য, সত্যই সৌন্দর্য, জগতে ইহাই তুমি জান, ইহাই জ্ঞাতব্য, ইহাই জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।" বায়রণ বলেন, "সৌন্দর্যের স্বর্গীয় জ্যোতির কণিকামাত্র অঙ্কিত করা সুকঠিন।" টেনিসন বলেন, "সৌন্দর্যই জগৎ-কর্ত্রী।" বিদ্যাপতি সৌন্দর্য-সন্দর্শন-স্বল্পতায় অতৃপ্ত হইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল
মেঘমালা সঙে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

চণ্ডীদাস (?) সৌন্দর্যের অসীমতায় মগ্ন হইয়া গাইয়াছিলেন ;—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

রস্কিন বলেন, "পাপ-প্রলোভন সংস্পর্শ-শূন্য স্বাস্থ্যকর বিমলানন্দ কেবল সৌন্দর্য সন্দর্শনে।" বঙ্কিমবাবু বলেন, "সৌন্দর্যস্পৃহা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া ও পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, ইহা পবিত্র, নির্মল, পাপসংস্পর্শ-শূন্য ; সৌন্দর্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ; কিন্তু সৌন্দর্য-জনিত সুখ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইতে ভিন্ন।"

ফলত সৌন্দর্য অপার্থিব বা পার্থিব হউক, সৌন্দর্য-সম্ভোগজনিত যে সুখ, তাহা অপার্থিব। পৃথিবীর ময়লা এক বিন্দুও তাহার সহিত মিশ্রিত নহে।

অপার্থিব সৌন্দর্যের পূর্ণপ্রভা, পরম রমণীয় শোভা কবিকল্পনায় ও জ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টিতে, কেবল সেইখানে তাহা অভিব্যক্ত, যেখানে—

'রূপ আছে, নাহি রিপু দুরন্ত'

সক্রেটিস সমস্ত সৌন্দর্য সমাহার করিয়া বলেন,—"পর্যায়ক্রমে সৌন্দর্যের অনুধাবন ও ধ্যান করিয়া সৌন্দর্যের প্রতি যাহার প্রেম নিয়মিত ও কেন্দ্রীভূত হয়, তিনি অকস্মাৎ এক অতি আশ্চর্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের আকর সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। সে সৌন্দর্য অসীম অনন্ত, অব্যয় ও অবিনশ্বর,—সে সৌন্দর্যের ক্ষয় নাই, তাহা কোনও প্রকার পদার্থেরই অনুরূপ নহে; আংশিক সুন্দর ও আংশিক অসুন্দর নহে, তাহা কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে সুন্দর, কোনও দ্রব্য সম্বন্ধে অসুন্দর নহে; তাহা এক স্থলে সুন্দর, অপর স্থলে অসুন্দর নহে, * * * সেই সৌন্দর্যেরই প্রভাবে সংসারের ও স্বর্গের অন্যান্য দ্রব্য সুন্দর। * * * সে অনন্ত সৌন্দর্য-সাগরের ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই; অল্পত্ব, আধিক্য ও পরিবর্তন নাই। যখন মনুষ্য প্রকৃত সৌন্দর্য-প্রেমের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া সেই অপার সৌন্দর্য সন্দর্শন ও তাহার ধ্যান ধারণা করিতে সমর্থ হয়, তখনি তাহার জীবনের সার্থকতা ঘটে। * * * বহুবিধ বিশ্বাস ও ধর্মের অনুষ্ঠান তৎকালাবধি, যে কাল পর্যন্ত সৌন্দর্য প্রেম প্রস্ফুট না হয়; তাহা প্রস্ফুটিত হইলে তাহারই জ্ঞানে ও তাহারই ধ্যানে, মনুষ্য অনির্বচনীয়, অনন্ত আরাম লাভ করে।"

এ "আরাম" আমাদের এই কবি কি পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, অনন্ত অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতাই বলিয়া দিতেছে।

(৫)

আমি উপরে বলিয়াছি, সৌন্দর্যের অদ্বিতীয় পার্থিব প্রতিকৃতি রমণী জাতি এই কবির কবিত্বের অন্যতম এক অতি প্রধান উদ্দীপনা। ইঁহার সর্বপ্রথম কাব্য এই উদ্দীপনা হইতে উদ্ভূত এবং তৎপরবর্তী কবিতা-নিচয়েও ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমি এ সম্বন্ধে, বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ এই;—

"নারীজাতির প্রতি কবি-হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্র প্রীতি, আধ্যাত্মিক স্নেহভক্তি, অনুরাগ এবং আন্তরিক উদারতা, স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ব্যতীত কেবল

বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রদর্শন করিয়া গেলেন। রমণীকে অনেকেই, অনেকেই কেন, সকলেই সচরাচার, দেবী বলে; কিন্তু দেবী বলিয়া অর্চনা, আরাধনা, প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীবৎ ব্যবহার তাঁহাকে কয়জন লোক করিয়া থাকে,—এই পাপ পৃথিবীতে একাল পর্যন্ত ছোট বড় কয়জন লোক করিয়াছে? অস্মদ্দেশীয় আর্যশাস্ত্রে নারী-পূজার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু পূজকের পবিত্রতা, এবং আন্তরিকতার অভাবে তাহার আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইয়া, সে ব্যবস্থা ক্রমে কৃত্রিম, প্রাণশূন্য এবং শুষ্ক লোকাচারে কিম্বা জঘন্য, বিকৃত ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছিল;—পরিণত হইয়াই আছে। পরন্তু, পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীতে পুরাকালের পণ্ডিতসমাজের মধ্যে নারীসমাজ বা সমষ্টিগত নারীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক অনুরাগের অভিমত আমরা দেখিতে পাই কেবল প্লেতোতে। পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে প্লেতো রমণী-পূজার প্রবর্তক। সে পূজা ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শে-শূন্য, প্লেতনিক-প্রণয়-সম্ভূত। পরবর্তী কালে মহাত্মা অগস্ত কোমৎ এ পূজার আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠাতা, মহামনস্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিলেও আমরা এই অনুরক্তির আভাস পাই। ইঁহারা সকলেই দার্শনিক। কিন্তু, কবিকুলে এই মহামন্ত্রের উপাসক লোক কই? মহাজন বৈষ্ণব কবিগণ? হাঁ, এ কথা অসত্য নহে। বৈষ্ণব-কবি-সম্প্রদায় এবং শাক্ত কবিদিগেরও কেহ কেহ বটে, রমণী-মাহাত্ম্য অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। রমণীর সর্বাঙ্গীণ শক্তিও তাঁহারা অনুভব না করিয়াছিলেন, এমন নহে। কিন্তু তাহা সুরলোকের আদর্শ বা অবতাররূপিণী দেবী-মাহাত্ম্যের বিবৃতি মাত্র, ক্বচিৎ আন্তরিক অনুভূতিও বটে। এই সকল কবিদিগের কেহ নরলোকের নারীজাতির সমষ্টিতে জগদ্ধাত্রী ও জগৎ-পালয়িত্রী মূর্তি সন্দর্শন করিয়া সম্যক রূপে মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করিয়া কবিতা-উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন, এমত বলা যায় না। পক্ষান্তরে কালিদাস হইতে একালের কালাচাঁদ পর্যন্ত সকলেই কেবল রমণীর রূপ-বর্ণনা ও রমণীকে লইয়া ফষ্টি-নষ্টি মাত্র করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ভাবে রমণী-মাহাত্ম্য প্রায় কেহই সর্বাঙ্গীণ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের মধ্যেও প্রায় এই ভাব! রমণীসমাজের মাহাত্ম্যানুভবকল্পে শেলির সুনাম আছে বটে, কিন্তু সুনামের সহিত দুর্নামও জড়িত। অতএব, কিঞ্চিৎ আত্মগর্ব প্রকাশিত হইলেও আমরা সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, আমাদের এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন

দুইটি কবি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদের অকৃত্রিম কাব্যোচ্ছ্বাস রমণী-মাহাত্ম্য-মূলক এবং সে উচ্ছ্বাস, করুণ ও অকৃত্রিম, মর্মস্পর্শী এবং সার্বভৌমিক ; সুতরাং পৃথিবীর কোনও কবির গীতি-উচ্ছ্বাস অপেক্ষা হীন নহে। আমরা উপরেই বলিয়াছি, এই দুই কবির একজন 'মহিলা' নামক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থের চিরস্মরণীয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ; অপর 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' প্রণেতা বিহারীলাল চক্রবর্তী।"

কিন্তু কবির এতৎসম্বন্ধীয় সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতে স্থান নাই। এ বিষয়টিও বিস্তৃত। ইহার বরং স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া উচিত।

(৬)

১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ বিহারীলাল চক্রবর্তী জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী। নিবাস কলিকাতা। প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে।

ইহার অধিক আমরা আর কিছুই জানি না। তবে ইহা জানি বটে যে, বিহারীলাল চক্রবর্তী মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পরবর্তী প্রধানদিগের মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই উভয় চক্রবর্তীই প্রকৃতির 'মঙ্গল'-গীতির কবি। বিহারীলাল অমঙ্গল বা বিষাদ-সঙ্গীতের গায়ক নহেন। আনন্দ-মঙ্গল ইঁহার মজ্জাগত, মর্মে মর্মে প্রতিভাত। অতৃপ্তি-জনিত অথবা সংসার-সংগ্রামের নীচতা ও নিষ্ঠুরতাজনিত অমঙ্গল, অশান্তি কোথাও কোথাও কবি-হৃদয়ের একটা প্রবণতা বটে, উদাহরণ ;—হেনরিচ হায়েন, কাউপার প্রভৃতি। কিন্তু ইহা যে খুব স্বাভাবিক, তাহা নহে। বরং বিকৃত ও মানসিক অস্বাস্থ্যজনিত বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু এ আলোচনাও বিস্তারসাপেক্ষ। অতএব আপাততঃ ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। এ সম্বন্ধে বিহারীলাল বাবুর দুই একটি উক্তি এই ,—

এত যে কঠিন ধরা
বজ্জাতি-বিষের ভরা ;
মনের আনন্দে আছি অন্তরে যন্ত্রণা নাই।

*　　*　　*　　*

এস বোন, এস ভাই
হেসে খেলে চলে যাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ-কাননে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !

বিহারীলালের দুইখানি সম্পূর্ণ ও একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য বিদ্যমান আছে। ঘটনাক্রমে এই তিনখানি কাব্যই প্রথমত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "বঙ্গসুন্দরী" "অবোধবন্ধু"তে এবং "সারদামঙ্গল" "আর্যদর্শনে" প্রকাশিত হওয়ার পর পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। "সাধের আসন" এই প্রবন্ধের লেখক কর্তৃক এক সময় সম্পাদিত একখানি মাসিক পত্রে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

বিহারীলাল চক্রবর্তী মৃত্যুর পর অন্য কাহারও কর্তৃক অর্চিত না হউন, এ সময়ের শ্রেষ্ঠতর কবির হস্তে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাবু সুদীর্ঘ সমালোচনায় চক্রবর্তী মহাশয়ের গুণকীর্তন করিয়াছেন। স্বভাব-কবির হস্তে স্বভাব-কবির সমালোচনা কবির পক্ষে সামান্য সৌভাগ্য নহে। কবি-হৃদয় কবির ন্যায় আর কেহই বুঝিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাবু এই কবির নিকট আত্মঋণ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ইহা তাঁহার মত মহতের মাহাত্ম্যেরই পরিচায়ক। বিহারীবাবুর কাব্য রবীন্দ্রবাবুকে বাল্যকাল হইতে প্রভাবিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রবাবু বলেন,—

"বাল্যকালে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জনসমাগম' নামক সম্মেলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে, তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এর আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।"

পুনশ্চ

"বর্তমান সমালোচক এক কালে 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল'-এর কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ ; ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।"

সর্ববিধ প্রাথমিক শিক্ষাতেই অনুকরণ আবশ্যক। অতএব রবীন্দ্রনাথ বাবুও বিহারীলালের অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য নহে। রবীন্দ্রবাবু তাহাতে "কতদূর কৃতকার্য" হইয়াছেন, তাহা বলিবার স্থান ইহা নহে। প্রসঙ্গক্রমে কেবল ইহাই বলিতে পারি যে অনুকরণে কৃতকার্য হওয়ার আবশ্যকতা রবীন্দ্রনাথ বাবুর কিছুমাত্র নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্রবাবু কাহারও অনুকারী কবি বলিয়া আমার মনে হয় না। তদীয় কবিপ্রতিভা নিজেই মৌলিক-ভাবাপন্না।

বাঙ্গালা ভাষার উপর বিহারীলাল চক্রবর্তীর অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল। ছন্দশৃঙ্খলায় তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহার ছন্দের সুর তদীয় সৌন্দর্যের নিজেরই সুর। ভাব-সম্পদের নিজেরই সুর, নিজেরই নূতন নূতন ছন্দ থাকে। অন্ততঃ আমার ইহা ধারণা। ভাষা ভাবের অভ্যন্তর হইতে স্বতঃ-নির্মিত হইয়া আসে। ভাবের সহিত তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্মিলিত। যে কাব্যে ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তাহা শাব্দিক কবির কবিতা।

এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনা, রবীন্দ্রবাবুর সহিত সকল বিষয়ে এক মতাবলম্বী না হইলেও, তাঁহার নিকট অশ্রদ্ধা নহে।

(নব্যভারত, ১৩০১)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন বিখ্যাত ইংরেজী সমালোচক বলিয়াছেন যে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনই রোমান্সের আদিম উৎস। এই উক্তিটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সম্বন্ধেও প্রায় তুল্যভাবে প্রযোজ্য। বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়ের প্রথম ফল আশ্চর্য-রসপ্রধান সাহিত্যের উদ্ভব, দ্বিতীয় ফল বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের আবির্ভাব। প্রথম পরিচয়ে প্রেমের মোহাবেশ, নেত্রে বিস্ময়ের অঞ্জন-প্রলেপ; অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে মোহভঙ্গের তিক্ততা ও বৈপরীত্য অনুভূতি হইতে প্রসূত হাস্যরসের উৎসার। যে মিলন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, যাহাতে কোন বাধ্যতামূলক বন্ধন নাই, যাহা কেবল চিত্তকে আকর্ষণ করে কিন্তু স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে না, তাহা অভিনব কাব্যসৌন্দর্যের হেতু হইতে পারে। কিন্তু যেখানে এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাধীন চিত্ত-বিনিময়ের গণ্ডি ছাড়াইয়া অনুচিত অভিভবের রূপ ধারণ করে, যেখানে অতিথি গৃহস্বামীর অধিকার কাড়িয়া লইয়া নিজেই মনিব সাজিয়া বসে, যেখানে তুলাদণ্ডের একদিকে নিয়ন্ত্রণের স্পর্ধা ও অন্যদিকে অধীনতার গ্লানি সঞ্চিত হয়, সেখানে রোমান্সের নেশা টুটিতে বেশী সময় লাগে না। আতিথ্যের এই অপব্যবহার মনে যে প্রতিবাদ স্পৃহা, যে ক্ষোভের উদ্রেক করে তাহাতে সাধারণের মধ্যে জাগে জাতিবৈরমূলক রাজনৈতিক আন্দোলন ও অসাধারণ পরিহাস-রসিকের মধ্যে জাগে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অম্লমধুর রসনির্ঝর। দেশব্যাপী উত্তেজনার মধ্যে পরিহাস-রসিক মাথা ঠাণ্ডা ও সমদর্শিতাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন, রাবণের চিতার অগ্নি-বেষ্টনীর মধ্যে তিনি শীতল বায়ুপ্রবাহের জন্য একটু সুরঙ্গপথ খুঁজিয়া পান; সার্বভৌত তিক্ততা ও গ্লানিবোধকে তিনি হাসির উপাদানে রূপান্তরিত করেন। এইখানেই তাঁহার অসাধারণত্ব। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ যখন মধ্যযুগে তীর্থস্থান উদ্ধারের জন্য প্রাচ্যদেশীয় মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিল, তখন তাহারা আরব্য উপন্যাসের অলৌকিক উপাখ্যানের মায়া-ইন্দ্রজাল প্রচুর পরিমাণে আহরণ করিয়া ঘরে ফিরিয়াছিল ও সাহিত্য-ভাণ্ডারে এই বৈদেশিক ঐশ্বর্য মজুত রাখিয়াছিল। ইহারাই

যখন আবার আধুনিক যুগে মিশর অভিযান করে, তখন সেখান হইতে লইয়া আসে তপ্ত বালুকা-রাশির দাহজ্বালার ন্যায় দেশবাসীর অসহ্য ঘৃণা ও মেহেদির ধর্মোন্মাদ-পুষ্ট জিঘাংসা। 'চন্দ্রশেখর'-এ সুন্দরী যখন ভীমা পুষ্করিণীর তটদেশে অকস্মাৎ আবির্ভূত লরেন্স ফষ্টরের প্রতি প্রথম দৃষ্টিক্ষেপ করিল, তখন তাহার ভীতি-কৌতূহলমিশ্র মানস উত্তেজনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রোমান্সের উপাদান আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু সেই ফষ্টর যখন শৈবলিনীকে দস্যুবৃত্তির দ্বারা অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, তখন শৈবলিনীর মনে যাহাই থাকুক, সুন্দরীর দৃষ্টিতে যে তীব্র ভাবান্তর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

ইংরেজ-বাঙ্গালীর দুই শতাব্দীব্যাপী সংস্রবের মধ্যে পরিবর্তনের এই সমস্ত স্তরগুলিই উদাহৃত হইয়াছে। বিস্ময়, মোহভঙ্গ, বিমুখতা, বিরাগ ও প্রবল বিরোধিতা পর্যায়ক্রমে উভয় জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়মিত করিয়াছে। বিরাগ ও তীব্র বিরোধের মধ্যবর্তী কোন স্তরে যে হাস্যরসের নির্ঝর ফল্গুধারার মত লুকান ছিল, তাহা হাস্য-রসিকের মায়াদণ্ড-প্রভাবে ভূগর্ভস্থ আত্মগোপন-শীলতা হইতে সূর্যালোকে উৎসারিত হইয়াছে। এই হাস্যরসের প্রধান অভি-ব্যক্তি 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গবাসীর সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর রচনাকে আশ্রয় করিয়াছে। আজকাল রুচি ও মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের রচনা আধুনিক বাঙ্গালীর প্রায় অজ্ঞাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের দুই-একখানি উপন্যাস এখনও সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এই দুই হাস্যরসিকের অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। জাতিবৈরের বিদ্বেষ-প্রধান মনোভাবের মধ্যে হাস্যরসের প্রবাহ ছুটাইয়া, উৎকট, উদগ্র উত্তেজনার ও বিজাতীয় শাসনের মর্মজ্বালার মধ্যে রসিকসুলভ তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়া, তীক্ষ্ণ আঘাতকে কপট-শিষ্টাচার ও ছদ্ম-সমর্থনের মখমল-আবরণে মণ্ডিত করিয়া ইঁহারা রাজনৈতিক সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছেন।

(২)

প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের যে একে-বারে অভাব আছে তাহা নহে, তবে ইহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আদর্শ সাম্যের যুগে কেন্দ্র-বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত বিরল। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদূষকই প্রায় একমাত্র হাস্যরসপ্রধান চরিত্র। তাঁহার ঔদরিকতা ও ক্ষাত্রধর্ম-বিরোধী শ্রমবিমুখতা ও আরামপ্রিয়তা হাস্যরসের উপাদান যোগাইয়াছে। সখি-সমাজে নায়িকার প্রণয়াবেশ লইয়া মৃদু হাস্য পরিহাস ও কতকটা লঘু সরসতার সৃষ্টি হইয়াছে। তাছাড়া কোন কোনও কবির মন্তব্যের গূঢ়ার্থতা, বিপরীত বিষয়ের সমাবেশ-কৌশল, ইঙ্গিত-সংকেত প্রয়োগে পটুত্ব বিস্ময় চমক জাগাইয়া তাঁহাদের রসিক মনোভাবের পরোক্ষ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সবশুদ্ধ মিলিয়া ইহাতে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তাহা পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও হাস্যরস-প্রাচুর্যের বিশেষ নিদর্শন মিলে না। মুকুন্দরামের ভাড়ুদত্ত ও ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী এই দুইটি মাত্র চরিত্রই সহস্র বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে হাস্যরস-প্রধান চরিত্র-সৃষ্টির সার্থক উদাহরণ। বাসরঘরে রমণীবৃন্দের অনেকটা সুরুচিবিরোধী রসিকতা বা চাঁদসদাগরের ব্যবসায়-শাঠ্য ও কায়িক লাঞ্ছনা এক আধটু ক্ষীণ হাস্যের উদ্রেক করে। কিন্তু মোটের উপর মরুভূমে জলবিন্দুবৎ এই হাস্যরস আমাদের জীবনের গাম্ভীর্য ও শুষ্কতাকে সরস করিবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। আসল কথা, সংস্কৃত সাহিত্যে আদিরসের প্লাবনে কৌতুকরস ভাসিয়া গিয়াছে। আর বাংলা সাহিত্যে উৎকেন্দ্রিকতার প্রতিষেধক সমাজ-শাসনের সদা-উদ্যত দণ্ড ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সূচীবেধকে অপ্রয়োজনীয় ও নিষ্কর্মা করিয়া রাখিয়াছে।

ইংরেজের সহিত পরিচয়ের ফলে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অকর্ষিত, ঊষর ভূমিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রথম প্রয়োগে হাস্যরসের নির্ঝর বহিয়া গেল। 'নব-বাবু-বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এই নব-জাগ্রত কৌতুক-রসের অফুরন্ত ফোয়ারা। ইংরেজের বিলাস-ব্যসন ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর মত্ত অনুকরণের আতিশয্যে যে উদ্ভট, হাস্যরস প্রধান পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল, তাহাতে ব্যঙ্গাত্মক রচনার প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হইল। বিদেশী শাসকবর্গের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ও সমর্থনে এই অনাচারীর দল সমাজ শাসনকে সহজেই উপেক্ষা করিতে পারিল বলিয়াই ব্যঙ্গ-অনুশীলনের অবসর মিলিল। এই যুদ্ধে ভীমের গদা প্রয়োগ করা চলিল না বলিয়াই অর্জুনের তীক্ষ্ণ শরক্ষেপের প্রয়োজন অনুভূত হইল। সামাজিক শাসনের শৈথিল্যের রন্ধ্রপথেই টিটকারীর নল স্থাপিত

হইয়া কর্দমবৃষ্টির হোলিখেলা সুরু করিয়া দিল। প্রথম যুগের এই সমস্ত রঙ্গ-রচনার অবস্থিতি-ভূমি কলিকাতা মহানগরী ও তাহার উপকণ্ঠ-অঞ্চল। এই-খানেই সমাজবন্ধনমুক্ত নাগরিক জীবনের প্রথম সূত্রপাত, এইখানেই বিপুল জনসমাবেশ ও ঐশ্বর্যস্ফীতি মদের নেশার মত চিত্তকে অধিকার করিয়া অমিতাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার নানাবিধ নূতন প্রণালী ও প্রকরণের প্রবর্তন করিল। ইয়ারকি-স্ফূর্তির বহুবিস্তৃত শোভাযাত্রায় মাতাল-মোসাহেব-বাইজী প্রভৃতির পশ্চাতে ব্যঙ্গ-প্রহসন-রচয়িতাও স্থানগ্রহণ করিলেন। ভোগরসিক অনিবার্যভাবে ব্যঙ্গরসিককে আমন্ত্রণ করিল। ফিঙ্গের অনুযায়ী কাকের ন্যায় নিমচাঁদের উৎকট আতিশয্য দীনবন্ধুর মর্মভেদী শ্লেষের দ্বারা অনুসৃত হইল। ভক্তিপ্রধান যুগে জগাই-মাধাইএর অনাচার প্রেম ও ক্ষমা ধর্মকে আহ্বান করিয়াছিল; বাস্তবতাপ্রধান যুগে অনুরূপ কারণে ব্যঙ্গাত্মক সংস্কার-প্রচেষ্টার উদ্ভব হইল।

এই স্তরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রযুক্ত হইয়াছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে নহে, ইংরেজের অনুকরণ-দুষ্ট স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরবর্তী স্তরে বৈদেশিক শাসনযন্ত্র ও শোষণ-ক্রিয়ার পেষণ যত তীব্রভাবে অনুভূত হইতে লাগিল, ততই ইংরেজ এই ব্যঙ্গপ্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট জাতীয়-ভাবহীন সরকারী কর্মচারী, স্বাধীনতা আন্দোলনের হাস্যকর অন্তঃসার-শূন্যতা ও ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতমূলক দুর্নীতি ও মৌখিক উদারতার অন্তরালে উৎকট স্বার্থপরতা ব্যঙ্গরসিকের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিবার প্রচুর উপাদান যোগাইল। এই সময় একদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইবার জন্য কংগ্রেসের উৎপত্তি, অপর দিকে শাসননীতি ও উহার বিরুদ্ধে জনমতের প্রতিবাদ উভয়কেই বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া উহাদের উপহাস্য দিকটা উদ্‌ঘাটন করার জন্য পঞ্চানন্দের আবির্ভাব। অসন্তোষের উগ্রতা ও পরিহাসের তীক্ষ্নতা একই কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়া জীবন ও সাহিত্যের দুই পাশাপাশি প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়া চলিল।

(৩)

ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে ভারতের রাজনৈতিক ও বাংলার সামাজিক জীবনে যে অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্যের সুপ্রচুর সমাবেশ হইয়াছিল, পঞ্চানন্দের শ্যেন-

দৃষ্টি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বাদ দেয় নাই। ইংরেজ শাসনের বিচারবিভ্রাট ও অসাধুতা—সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড ও ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন —দেশহিতৈষিতার বহিরাড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতা, সামাজিক দুর্নীতি ও ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণ, ব্রাহ্মধর্মের শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ ও কেশব সেনের সর্বধর্মসমন্বয়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, বিধবা-বিবাহ ও নারীপ্রগতির প্রভাবে সমাজসাম্যের বিপর্যয়—এই সমস্ত বিষয়ই পঞ্চানন্দের পরিহাস-প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইয়াছিল। যেখানেই মেকী ও ভণ্ডামী সাধু উদ্দেশ্যের মুখোস পরিয়া ও আত্মপ্রসাদস্ফীত হইয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের রাজকর দাবী করিয়াছে, সেইখানেই পঞ্চানন্দ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্রে তাহার ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া, তাহার কৃত্রিম গৌরবস্ফীতির বুদ্‌বুদ্‌ নিষ্কাশন করিয়া, তাহাকে পদমর্যাদার উচ্চ সিংহাসন হইতে উপহাস্যতার ধূলি-শয্যায় পাতিত করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপরিচয়-দানে ও নানা হাস্যকর প্রসঙ্গ ও তথ্যের অবতারণা দ্বারা পঞ্চানন্দ নিজেকেও একটি জীবন্ত চরিত্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। পঞ্চানন্দ কমলাকান্তের মত উদাসীন, দার্শনিক ভাবের ভাবুক নহেন; তিনি সাধারণ ছা-পোষা গৃহস্থ, সংসার-কার্যে যে সমস্ত রঙ্গলীলার অভিনয় হইতেছে তাহার মর্মভেদে অসামর্থ্য হেতু তিনি যেন হতবুদ্ধি ও বিমূঢ়। এই বিস্ময়-বিমূঢ়তার মনোভাবই তাঁহার রসিকতার ভিত্তিভূমি। সাময়িক ঘটনাবলী আলোচনায় পঞ্চানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী এমন একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিল ও তাঁহার জনপ্রিয়তার পরিধি এতদূর প্রসারিত হইয়াছিল যে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়কে অতিক্রম করিয়া একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয়ই বাঙ্গালীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। পঞ্চানন্দের সাঙ্কেতিক অভিধানের অন্তরালে ক্ষুরধারবুদ্ধি বিষয়ী ও ব্যবহারজীবী ইন্দ্রনাথ চাপা পড়িয়াছেন!

বিশ্লেষণের সূচীমুখে রসিকতার সার-নির্যাস উঠে না; ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলি দেখাইতে গেলে জীবন্ত দেহের শব-ব্যবচ্ছেদ করা হয়। রসিকতা সম্বন্ধে গভীর আলোচনা এক প্রকার অনভিপ্রেত কৌতুকরসেরই সৃষ্টি করে। সমগ্র রচনাটির মধ্য দিয়া যে একটি অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ, তির্যক-রেখাঙ্কিত মনোভাব রূপ পরিগ্রহ করে তাহার সহৃদয় উপলব্ধিতেই ইহার সার্থক রসাস্বাদন। ইহার রসটি লেখক হইতে পাঠকে সংক্রামিত হয় সহজ অনুভব-শীলতার সাহায্যে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় নহে। বধিরকে সঙ্গীতমাধুর্য বুঝাইবার মত অরসিককে রস-নিবেদন-প্রয়াস ব্যর্থ

প্রচেষ্টার উপহাস্যতার একটি চরম দৃষ্টান্ত। এই সতর্কবাণী উচ্চারণের পরে ইন্দ্রনাথের রসিকতার প্রকরণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে।

ইন্দ্রনাথের হাস্যরস যদিও অধিকাংশ স্থলেই মৌলিকতায় ভাস্বর, তথাপি কোথাও কোথাও ইহা অনুকরণাত্মক; কোথাও বা পল্লবিত সচেষ্টতা ও কেন্দ্রচ্যুত ভাবালম্বনহীন বুদ্‌বুদ্-বিলাস ইহার লক্ষণ বলিয়া ঠেকে। সুরুচি ও মাত্রাজ্ঞানের মর্যাদাও যে সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে এরূপ দাবীও করা যায় না। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র উভয়েরই হাস্যরসে অতিরঞ্জন অনেক সময় বীভৎসরসের সীমা স্পর্শ করিয়াছে। এই সমস্ত দোষ সত্ত্বেও ইঁহাদের মধ্যে হাসির একটা অসংশোধিত উচ্ছলতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। সময়-অসময়ে তুচ্ছতম উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া ইহার কর্দমাক্ত প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উচ্চাঙ্গের শিল্পবোধ ও অতন্দ্র রুচিপরায়ণতার সঙ্গে হাস্যরসের সমন্বয় সমস্ত উৎকৃষ্ট যৌগিক পদার্থের মতই দুর্লভ। ইউরোপীয় সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ ও আমাদের ব্যবসায়ক্ষেত্রে অংশীদারত্বের ক্ষণভঙ্গুরতার মত এই উভয়বিধ উপাদানের মধ্যে সহজেই যোড় ভাঙ্গে।

পঞ্চানন্দের কতকগুলি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুপরিস্ফুট। "পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ" ও "দুষ্টের দমন-বিধি" বঙ্কিমচন্দ্রের আইন-প্রণয়নের ব্যঙ্গ-প্রহসনের অনুকারী। 'নববর্ষে' বর্ষফল-কথনের মধ্যে পঞ্জিকায় উল্লিখিত বিভিন্ন বিভাগের অধিপতি ও রাশির সহিত সমসাময়িক শ্রেণীর বা সম্প্রদায়বিশেষের সংযোগস্থাপন কমলাকান্তের 'মনুষ্যফলের' স্মারক হইলেও নূতন আবিষ্ক্রিয়ার মত কৌতুকাবহ। ১২৮৮ সালে বায়ু-অধিপতি সদ্বক্তা সম্প্রদায়, মেষরাশি, বাঙ্গালী, কন্যারাশি বাঙ্গালা ভাষা, কেননা "কন্যাপি পালনীয়া শিক্ষণীয়াপি যত্নতঃ" শাস্ত্রের এই অনুশাসন ইহার সম্বন্ধে কার্যতঃ উপেক্ষিত; তুলা উপাধিগ্রস্ত লোক, কেননা এত লাঘব কেহই স্বীকার করিতে পারে না; ধনু মফঃস্বলের হাকিম, কেননা গুণ থাক আর না থাক্, কখনও সোজা দেখা যায় না; আর কুম্ভ বাঙ্গালা কাব্য, কেননা শূন্য বা পূর্ণ ইহার যে কিছু আদর রমণীকক্ষে। অপ্রত্যাশিত সাম্যের আবিষ্কার যদি রসিকতার লক্ষণ হয় তবে এই সমস্ত দৃষ্টান্তের রস-আবেদন অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধাশীল অনুকারক হইলেও পঞ্চানন্দ কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সাম্যবাদকে উপহাস বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন; সকল অসাম্যের মূল উৎস স্ত্রী-পুরুষের ভেদ

যতদিন অবলুপ্ত না হয় ততদিন সাম্যস্থাপনের চেষ্টা সচ্ছিদ্র-কুম্ভ-পূরণের ন্যায়ই পণ্ডশ্রম।

বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টই ইন্দ্রনাথের আক্রমণের প্রধান বিষয় এবং তাঁহার ব্যঙ্গের মূলে আছে তাঁহার তীব্র স্বাজাত্যবোধ ও পরাধীনতার মর্মজ্বালা। ইংরেজ শাসনতন্ত্রের সমালোচনায় তাঁহার ব্যঙ্গ শ্লেষ ও বক্রোক্তির তীব্রতর পর্যায় উন্নীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গগুলিতে তাঁহার মর্মভেদী খোঁচা কপট সমর্থন ও আনুগত্য-প্রদর্শনের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কাবুলযুদ্ধে সেনাপতি রবার্টসের ন্যায়নিষ্ঠা ও দয়ার প্রশংসায় পঞ্চানন্দ পঞ্চমুখ হইয়াছেন। যেখানে শতবার ফাঁসি দেওয়া সভ্যজাতির নিয়মানুমোদিত, সেখানে মাত্র একবার ফাঁসি দেওয়া দয়াশীলতার পরাকাষ্ঠা; কিন্তু হতভাগ্য কাবুলীজাতি এমনি শক্তিহীন যে একবার ফাঁসি দেওয়াতেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, কেননা দুর্ভিক্ষ হইলে ভারতবাসীর বক্তৃতা-স্রোতের প্রবাহ অবরুদ্ধ হইত। কাবুলযুদ্ধের কারণ হইল কবি লিটন বড়লাটের বীর রসাশ্রিত কাব্যের বিষয়-সংগ্রহের প্রয়োজন। সমস্ত কাবুলী মাত্রই সশস্ত্র; কেননা আর্ম মানে হস্ত ও অস্ত্র দুইই। কাজেই আততায়ী-বধের নিয়ম প্রত্যেক কাবুলীর উপরেই প্রযোজ্য। ইংরেজশাসনের গুণ না মানা বাঙ্গালীর পক্ষে চরম কৃতঘ্নতা। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ-নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়, কেননা জনসংখ্যা হ্রাস হইলেই খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কমিবে ও বাড়তি খাদ্য বিলাতে রপ্তানি করা চলিবে।

(৪)

পঞ্চানন্দের ব্যঙ্গের দো-ফলা ছুরি একদিকে ব্রিটিশ শাসন, অপর দিকে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের শূন্যগর্ভ ভাববিলাসের বিরুদ্ধে যুগপৎ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহার 'ভারত-উদ্ধার কাব্য', 'ভলাণ্টিয়ারী কাব্য' ইত্যাদি অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার ব্যঙ্গানুকরণে সিদ্ধহস্ততার চূড়ান্ত নিদর্শন। গুরুগম্ভীর ভাষার সঙ্গে লঘুভাবের বৈপরীত্য-মূলক সমাবেশ অনিবার্য হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। এ যেন মাইকেলের ছন্দের বায়ব্যস্ফীতির মধ্যে উপহাসের সূচ ফুটাইয়া উহাকে চুপসাইয়া দেওয়া। এই অনুকরণের মধ্যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভাবন ও বিষয় ও রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য-কৌশলের সঙ্গে সময় সময় উচ্চাঙ্গের

কবিকল্পনার সংমিশ্রণ বিসদৃশতার চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে। ইংরেজী ভাবাপন্ন বাবু-সমাজ, বক্তৃতাবিলাসী নেতৃবৃন্দ ও সহজেই বিভ্রান্ত জনসাধারণ—এই সকলের উপর পঞ্চানন্দের বিদ্রূপের পিচ্‌কারী তুল্যরূপে কর্দম বর্ষণ করিয়াছে। 'দুর্গোৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধ ও কবিতাগুলিতে পাশ্চাত্ত্য সুরুচির আদর্শে চির-প্রথাগত আচারের উল্লঙ্ঘনে পঞ্চানন্দের খেয়ালী কল্পনা ও উচ্চহাস্য উতরোল হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি সাময়িকতার বেড়া ডিঙ্গাইয়া স্মরণীয়তার প্রকোষ্ঠে স্থান পাইবে।

ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র উভয়েরই তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ পঞ্চানন্দের আক্রোশ কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ডিকেন্সের উপন্যাসে রাজা চার্লসের মাথার মত পঞ্চানন্দের রচনায় সময়ে-অসময়ে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি সবিদ্রূপ উল্লেখ উঁকি মারিয়াছে। এমন কি, কাবুলযুদ্ধ প্রসঙ্গে ও কাবুলীদের গোঁয়ার্তুমির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি মন্তব্য করিতেছেন যে একমাত্র যদি "যীশুর ছোট ভাই, সিদ্ধার্থের হাঁড়িফেলা জ্ঞাতি, চৈতন্যের খুড়া সেনজা" কাবুলে পদার্পণ করেন তবেই তাহাদের ভ্রান্তির অপনোদন ও উচ্চতর নৈতিকতার স্ফুরণ সম্ভব। কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা, তাঁহার কীর্তননিষ্ঠার সহিত যীশু ও মহম্মদের সাধনা-প্রণালীর যুগপৎ সমাবেশ, পৌত্তলিকতাকে অস্বীকার করিয়া ভগবানকে মাতৃমূর্তিতে অনুধ্যান, সাধন ভজনের ক্লেশ স্বীকার না করিয়া ফলপ্রাপ্তির দাবী ও কোনও কোনও স্থলে নীতি ও আচরণের মধ্যে অসামঞ্জস্য—এই সমস্তই অপর্যাপ্ত ব্যঙ্গের উপকরণ যোগাইয়াছে। বর্তমান সময়ে ধর্মপথ সম্বন্ধে অধিকতর উদারতা বা ঔদাসীন্যের জন্যই ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড বিক্ষোভ আমাদের নিকট অনেকটা নিরর্থক শক্তি ও ভাবাবেগের অপব্যয় বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ইহার সাহিত্যিক প্রেরণা যে কত উগ্র ছিল তাহার নিদর্শন যোগেন্দ্রচন্দ্রের "মডেল ভগিনী" হইতে রবীন্দ্রনাথের "গোরা" পর্যন্ত সাহিত্য-রচনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে।

কয়েকটি প্রবন্ধে পঞ্চানন্দ ছন্দগাম্ভীর্যের সহিত বিপরীত মতবাদের সমর্থন দ্বারা হাসির উদ্রেক করেন। এই সমস্ত স্থলে তাঁহার শ্লেষ অনেকটা ইংরেজ ব্যঙ্গরসিক সুইফ্‌টের রীতির অনুকারী। সুইফ্‌ট যেমন গম্ভীরভাবে

Dissenter-এর শিশু-সন্তানদের তেলে ভাজিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া তৎকালীন ধর্মান্ধতার প্রতি প্রচণ্ডতম আঘাত হানিয়াছিলেন, পঞ্চানন্দও সেইরূপ মাঝে মাঝে অত্যন্ত অসঙ্গত মতবাদের পক্ষাবলম্বনের ভান করিয়া উহার উপহাস্যতা প্রকটিত করেন। 'বিজাতীয় বর্ণমালায় স্বজাতীয় ভাষা লিখিবার বক্তৃতা' ও 'মোটে বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই জাতীয় রচনার সুন্দর উদাহরণ। প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান লিপির প্রবর্তন-প্রস্তাবকে সোৎসাহে সমর্থন করিবার ভান করিয়া পঞ্চানন্দ যে সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে উহার অন্তঃসার-শূন্যতাই আরও দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "কোট-পেণ্টুলানধারী তেঁতুলে বাগ্দীর সম্ভ্রম রেলওয়ে ষ্টেসানে যে দেখিয়াছে, ইংরেজী বর্ণমালায় সজ্জিত দাশু রায়ের পাঁচালীর গৌরব সেই বুঝিতে পারিবে।" দুঃখের বিষয় পঞ্চানন্দের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এখনও পণ্ডিতম্মন্যতার স্থূলচর্ম ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

(৫)

পঞ্চানন্দ যদিও দুই একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, তথাপি তিনি প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিকগুণসম্পন্ন নহেন। চরিত্র-সৃষ্টি ও আখ্যান-সমাবেশ-কৌশল অপেক্ষা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য ও চিন্তাধারার অনুসরণেই তাঁহার অধিকতর প্রবণতা। রসিকতার নেশায় তিনি উপন্যাসের যাথার্থ্য বা পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে উদাসীন। যে ঝি দরজা খুলিয়া দিতে আসিল তাহার হাব-ভাব-কলা-ন্যাকামির বর্ণনার প্রহসনোচিত বিস্তারে তিনি নায়ক-নায়িকাকে দাঁড় করাইয়া রাখিতে দ্বিধাবোধ করেন না; আর নায়ক-নায়িকাও উহার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। তাঁহার রচনাবলী সদ্য-আরব্ধ উপন্যাসের অসম্পূর্ণ খণ্ডাংশে প্রচুরভাবে আকীর্ণ. দুই একটি অধ্যায়ের পরিহাস-রসটি সম্পূর্ণ নিষ্কাশন করিয়া চর্বিত কমলালেবুর খোসার মতই তাহাদিগকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গল্প বলিবার ধৈর্য তাঁহার নাই; উহাকে তিনি চাটনীর মত আস্বাদন করিয়া রসনার ক্ষণিক তৃপ্তি বিধান করিয়াছেন। তাছাড়া নানা চুট্‌কি গল্প ও মজলিসি কৌতুকের অবতারণায় তিনি, যে স্থূল রসিকতার ধারা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ গোপাল ভাঁড়ের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাকে আধুনিক যুগের সমস্যাসঙ্কুল, গাম্ভীর্য-প্রধান প্রতিবেশ পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন।

এ পর্যন্ত পঞ্চানন্দের যে সমস্ত রচনার আলোচনা হইল, তাহার মধ্যে উচ্চাঙ্গের humour-এর বিশেষ নিদর্শন মিলে না। সাময়িক ঘটনার অতিরিক্ত কোন একটি চিরন্তন মানবস্বভাবকে রসিকতার মধ্যে ফুটাইয়া তোলার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কয়েকটিমাত্র প্রবন্ধে—'সুনীতির কথা', 'মোটা রসিকের প্রবন্ধ,' 'ভূমিকা,' 'সুরুচির সাঁকো' ইত্যাদিতে এই উচ্চতর শক্তি উদাহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঘটনা-নিরপেক্ষ সরস আলোচনা লেখকের মননশীলতা ও অপ্রত্যাশিতরূপে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। এই রচনাগুলি কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের লক্ষণাক্রান্ত, অবশ্য কমলাকান্তের ভাব-গভীরতা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎকর্ষ ইহাদের অনধিগম্য। 'মোটা রসিকের প্রবন্ধে' স্থূলতার সহিত রসিকতার নিত্য সম্বন্ধ কৌতুকাবহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "যাহার রস আছে তাহার ভার আছে, রস আর ভার থাকিলেই মোটা। বৈষ্ণবদের গ্রন্থে যত রস, তত আর কোথাও নাই, বৈষ্ণবদের গোঁসাইরা যেমন মোটা, তেমন মোটাও ভূভারতে নাই। রসিকের আর এক নাম রসগ্রাহী, আয়তন না থাকিলে কি গ্রহণ করা যায়?" "চটুল চরণে চুটকি পরিয়া খেমটাওয়ালী নাচে, তাহাতে যদি রসিকতা ভরপূর হইত, তাহা হইলে মোটা মোটা দর্শককে আদর করিয়া আসরের সম্মুখে সকলের আগে বসাইয়া দিবার নিয়ম হইত না। মোটারাই সে প্রশস্ত আসরের ভারকেন্দ্র, সেই রস-জগতের সূর্য, সেই রস-কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডব।" 'ভূমিকা'তে পরিহাস-রসিকতার মধ্য দিয়া সমালোচনার সূক্ষ্মদর্শিতা প্রকটিত হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'গ্রাবু' প্রবন্ধে যে অধ্যাত্ম তাৎপর্য গ্রহণের রীতি উদাহৃত হইয়াছে তাহাই এক নূতন ধরণের রস-রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছে। "লোকে বুঝিল যে বস্তুত মর্ম বস্তুর গায়ে মাখান থাকে না, মর্ম থাকে মজ্জায়। লোকে শিখিল যে খেলা খেলা নয়; খেলার ভিতরেও খালি তত্ত্বকথা। সেইদিন হইতেই লোকের চক্ষু ফুটিল। লোকে জানিল যে যাহা দেখি তাহা নয়, আর একটা কিছু বটে। বেদান্তের বীজে অঙ্কুরের উদ্গম হইল।" এই প্রবন্ধগুলি প্রমাণ করে যে পঞ্চানন্দের রসিকতার মধ্যে একটা উচ্চতর সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। সাময়িকপত্রের দাবী মিটাইতে না হইলে, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনার উপর সস্তা ফষ্টি-নষ্টিতে অপব্যয়িত না হইলে এই রসিকতার ধারা দার্শনিক পরিপক্কতা ও রসগাঢ়তা লাভ করিতে পারিত।

পঞ্চানন্দের যুগ সময়ের দিক দিয়া আমাদের সন্নিহিত ; কিন্তু মনোভাবের পরিবর্তনের দিক দিয়া মনে হয় যেন ইহা একটি সুদূর অতীতের ব্যাপার। বাঙ্গালী আর হাসিতে জানে না। সমসাময়িক ঘটনা তাহাকে এত তীব্রভাবে গভীরভাবে অভিভূত করিতেছে যে, ইহার মধ্যে হাসির উপাদান সে আর খুঁজিয়া পায় না। আজ তিক্ত, বিস্বাদ মনোবৃত্তি লইয়া সে তাহার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আজ সর্বত্র তীব্র, উগ্র প্রতিবাদ, গুরু-গম্ভীর বচন-বিন্যাসে মনোভাবের অভিব্যক্তি, ব্যর্থতাবোধের গ্লানি, বিরুদ্ধ মতবাদের ক্ষমাহীন সংঘাত। আজ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহাই সমস্যা হইয়া তাহাকে শ্বাসরোধ-কারী বজ্রমুষ্টির ন্যায় টানিয়া ধরিতেছে—তাহার সমাধান-চেষ্টাতেই তাহার প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ! জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মিটানই আন্তর্জাতিক সমস্যার গুরুত্ব ধারণ করিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারের লাঞ্ছনা-দুর্গতি ইহার হাস্যকর অসঙ্গতির দিকটাকে চাপা দিয়াছে। হাসিতে পারিলে যে জীবনের অনেক ভার লঘু করিতে পারা যায় বাঙ্গালী এ সত্য বিস্মৃত হইয়াছে। জানি না আবার জীবন-প্রবাহ সরল হইলে, ইহার বিচলিত ভার-সাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙ্গালীর মুখে আবার হাসি ফুটিবে কিনা। জাতির জীবনধারার সুস্থ সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইলে হাস্য-রসিকের প্রয়োজন—ক্রন্দনশীল দার্শনিক ও বিবদমান রাজনীতিকের অতি-প্রাদুর্ভাব সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে। পঞ্চানন্দের ভবিষ্যৎ সংস্করণ আগামী যুগের বঙ্গবাসীকে আমাদের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবে, ব্যঙ্গের কষাঘাতে তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিবে এই আশা পোষণ না করিলে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করা হয়।

ডাকঘর

অজিতকুমার চক্রবর্তী

"We live within the shadow of a veil that no man's hand can lift. Some are born near it, as it were, and pass their lives striving to peer through its web, catching now and again visions of inexplicable things ; but some of us live so far from the veil that we not only deny its existence but delight in mocking those who perceive what we cannot"

— Laurence Aulma Tadema.

উপরের কয়েকটি ছত্র পাঠ করিয়া সমালোচনা লিখিতে আর ভরসা হয় না, কারণ 'veil'-এর কাছাকাছি আছি এমন কথা তো বলিতে সাহস হয় না, অবগুণ্ঠনের ভিতরকার কথা তো কিছুই জানি না। তবে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের পরিহাস করিতে আনন্দ পাই, এত বড়ো বর্বরতার অপবাদ ঘাড়ে করিতে রাজী নই।

যাঁহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাঁহারা ফুলকে ছিঁড়িয়া তাহার অংশ প্রত্যংশের কোন্‌টার কী কাজ তাহা বুঝাইয়া দেন। কিন্তু সাহিত্যের বাগানে যে ভাবের ফুলটি ফুটে তাহার সম্বন্ধে কি সেই একই প্রণালীতে তত্ত্ব খবর লওয়া যায়? সে বাগানে যাহারা যায় তাহারা কি তত্ত্বের জন্য যায়, না আনন্দের জন্য যায়? অনেকগুলি দল যে একটি বাঁধনে ধরা দিয়া অখণ্ড একটি ফুল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতেই তো আনন্দ, আবার যদি ছুরি ধরিয়া সেই অখণ্ডতাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় তবে আনন্দ থাকে কেমন করিয়া?

আমার মনে হয় যে, ভাল কাব্য বা সাহিত্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এইটুকু বলাই পর্যাপ্ত যে, ইহা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে বা ইহা পড়িয়া আমি বড়ো আনন্দ পাইয়াছি। কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজন

করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা। কবি যে ফুল ফোটান সমালোচক ঠিক তারই পাশে তারই অনুরূপ আর একটি ফুল ফোটান, ভালো সমালোচনা সেই জন্যেই এক রকমের সৃষ্টি। কিন্তু হায়, তেমন সমালোচনা শক্তি কিংবা সুযোগ কোথায়? ইচ্ছা থাকিলেও ঠিক মনের আনন্দটুকু জ্ঞাপন করিয়া এখন বিদায় লওয়া যায় না। তাহার কারণ কবির সঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে এখন বোঝাপড়া নাই। কবির আসরে পাঠকেরা স্থান পায় না; কবি থাকেন "hidden in the light of his thought"—আপনার চিন্তার আলোকে আপনি আবৃত। কাজেই বেচারা সমালোচককে মধ্যস্থের কাজ করিতে হয়। একবার কবির দরবারে, একবার পাঠকের আড্ডায়, দুই জায়গায় ঘুরিয়া তাহাকে সংবাদ বহন করিয়া বেড়াইতে হয়। যদি লেখকে-পাঠকে কোন ব্যবধান না থাকিত তবে সমালোচকও আপনার কাজ সহজে করিতে পারিতেন। অনেক কথার জঞ্জাল জড়ো করিবার উপদ্রব তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না।

'ডাকঘর' ও তাহার পূর্ববর্তী 'রাজা' যে ধরণের নাটক এ ধরণের নাটক বঙ্গ সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন, বলা বাহুল্য এ দুইটিই হেঁয়ালী শ্রেণীভুক্ত। ইহার পূর্বে বোধ হয় 'সোনার তরী' এবং 'পরশপাথর' ধরণের কবিতা ছাড়া কবি আর এমন কিছুই লেখেন নাই, যাহার জন্য তাঁহাকে লোকে দুর্বোধ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। ঐ কবিতাগুলিই ঠিক কোনো নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে ধরা দিতে নারাজ।

অথচ সেই পূর্বের রূপকজাতীয় কবিতার সঙ্গে আর এখনকার এই নাটকগুলির সঙ্গে আমি ভারী একটি মিল এক জায়গায় দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, ইহাদের মূল ভাব একই, কেবল রূপ স্বতন্ত্র। কতকগুলি রস যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু তাহাদের মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত ইমোশন্ অর্থাৎ হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত হয়, তাহা নহে। প্রেম ভক্তি করুণা সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায়, তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট হইবার নহে। কারণ সেই বিশেষ অনুভূতিটাই কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে—তাহাকে

ভাষায় প্রকাশ করা আরও কঠিন হইয়া বসে। তখন symbol অথবা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়; অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইশারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।

'সোনার তরী' মানেই কোনো বিশেষ রূপ নয়, কিন্তু অপরূপ। কালিদাস বলিয়াছেন যে, "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্'—রম্য দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মন যখন পর্যুৎসুক হয়, তখন "জননান্তরসৌহৃদানি", জন্মজন্মান্তরের ভালবাসার কথা মনে পড়ে। এই যে একটি রস ইহাকে কী নাম দিব? উপলক্ষটা হয়ত কোনো বিষয়ে রূপ বা বিশেষ ধ্বনি, কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া মন যে উতলা হয় সে এমন একটি অপরূপ সুন্দরের জন্য, যাহার কোন নাম নাই, রূপ নাই, বর্ষার ভরা নদী হয়তো 'সোনার তরী'র উপলক্ষ্য, কিন্তু সে যে বিরহকে জাগায় তাহা আর তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে না।

কিন্তু কেনই বা symbol লইয়া এত বকাবকি করিতেছি? আমাদের দেশে এটা তো অপরিচিত জিনিস নহে। হিন্দুর ধর্মকর্ম, আচার অনুষ্ঠান, শিল্প সমস্তই ভাবের বিগ্রহে আগা-গোড়া মণ্ডিত। হিন্দু তো এ কথা বলে না, যে ভাবকে কোনোদিন কেহ জানিয়া ব্যবহার করিয়া শেষ করিয়া দিতে পারে। সেইজন্যই তো সে চিহ্ন মানে, বিগ্রহ মানে—সে জানে যে, ভাব অসংখ্যরূপে আপনাকে ক্রমাগতলীলায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সেই সমস্ত রূপরূপান্তরকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ করে। হিন্দুর চিত্ত কেন না বলিবে যে 'সোনার তরী' বল 'চিঠি' বল, 'পরশ পাথর' বল, 'রাজা' বল ও সমস্তই ছল!—অনন্ত সৌন্দর্যকে একটি মূর্তির মধ্যে ক্ষণকালের মত বাঁধিবার আয়োজন;—ও যে ছিল এইটুকু উহাকে দিয়া বলানোই উহার চরম সার্থকতা?

আসল কথা, অনন্তের রসবোধ যখন সাহিত্যের দরবারে আসিয়া রূপ প্রার্থনা করে, তখন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে পণ করিতে হয় কি করিয়া রূপ দিয়াও রূপ না দেওয়া যায়, কারণ রূপ যে সীমাবদ্ধ সে এমন ভাবকে কী করিয়া প্রকাশ করিবে যাহা সীমায় ধরা দিবে না? তখন তাহার একমাত্র সম্বল হয় উপমা বা রূপক। উপমা খানিকটা বাঁধে খানিকটা আল্‌গা রাখে। সে বাঁধন এতই সুকুমার যে তাহার আবরণ সরাইয়া ভাবকে দেখা কিছুমাত্র কঠিন হয় না।

আশা করি, আমি কেন পূর্ব পূর্ব কোন কবিতা এবং আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছি তাহা পাঠকের নিকট স্পষ্ট হইয়াছে। আমি বলিতে চাই এই যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপের ভিতরে অপরূপকে দেখিবার জন্য একটা বেদনা আছে বলিয়াই তাঁহাকে অপরূপের ভাবটিকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে যাহাতে সে নির্দিষ্ট না হইয়া উঠে। অর্থাৎ, তাঁহাকে symbol আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

Symbol লইয়া এত ব্যাখ্যা বাহুল্য করিবার আর একটু কারণ আছে। Symbol-এর ঠিক অর্থটা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অনেকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, তবে 'সোনার তরী'টা কী? তাহার উদ্দিষ্ট মানুষটি কে? সোনার ধানটা কী? অমল কি তবে মানবাত্মা? চিঠি মানে কি মুক্তি? অর্থাৎ তাঁহারা একেবারে সুনির্দিষ্ট করিয়া লইতে চান। আধ্যাত্মিক সত্যকে এই সকল লোকই বৈজ্ঞানিক সত্যের মত পরিষ্কার না দেখিতে পারিলে অধীর হইয়া উঠেন এবং ধর্মকে কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে উদ্যত হন। ইঁহারা একটা কথা মনে রাখেন না যে বুদ্ধির উপরেও মানুষের একটা intuition, একটা সহজ প্রত্যয় আছে; বুদ্ধি যেখানে নাগাল পায় না, সেইখানে তাহার শরণাপন্ন হইতে হয়।—

'ডাকঘর'কে symbolical অর্থাৎ বিগ্রহরূপী নাট্য নামকরণ করা গেল। এটা ঠিক নাম নয়; কিন্তু নির্দেশমাত্র। এখন দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহা নাটিকা বটে, অথচ ইহার মধ্যে নাটকত্ব কিছুই নাই। অর্থাৎ কোন গল্প নাই, ঘটনাও বড়ো নাই। তবে ইহাকে 'সোনার তরী' গোছের কবিতার মত করিয়া লিখিলেই হইত, নাটিকা বলিয়া আড়ম্বর করিবার কী প্রয়োজন ছিল?

একটি রুগ্ন বালকের সৌন্দর্য-মুগ্ধ কল্পনাপীড়িত চিত্ত বিশ্বের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল, শুধু এই ভাবটুকু যদি থাকিত তবে তাহা গীতে ব্যক্ত করা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু অমলের সঙ্গে সঙ্গে মাধবদত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, সুধা প্রভৃতি যে মানুষগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কেহ বা অনুকূল, কেহ বা প্রতিকূল। সুতরাং ঐ মূলভাবটুকুকে সূত্রের মত করিয়া এই সকল বৈচিত্র্যকে তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়া একটি স্ফটিক ব্যূহ রচনা করিতে হইয়াছে। এই বিচিত্রতার

সমাবেশই তো নাট্যরস। শুধু একটিমাত্র ভাবের রস হইলে গীতি কবিতার রূপ গ্রহণ করা উচিত ছিল। সুতরাং এই নাটিকার শেষ পর্যন্ত না পড়িলে পুরা রসাস্বাদন হয় না, ইহা মাঝখানে পড়িয়া থামিবার জো নাই।

ঘটনার পর ঘটনা সাজাইলেই কি সব সময়ে ঔৎসুক্য বেশি করিয়া জাগে? আমার তো মনে হয় ভিতরের চিন্তা কল্পনা ও অনুভূতি একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ, বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যেমন ধরো 'গোরা' উপন্যাসটি। তাহার উপাখ্যান অংশটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করা যায়। কিন্তু মানবহৃদয়ের কী বেগমান্ প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত ঐ উপন্যাসে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে—অধ্যায়ে অধ্যায়ে, এমন কি ছত্রে ছত্রে, যে ঔৎসুক্য খাড়া হইয়া জাগিয়া থাকে—এমন কোন ঘটনা বহুল উপন্যাসে থাকে আমি তো জানি না।

এই নাটিকাটিতেও কবি-জীবনের যে সকল নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে সকল সূক্ষ্ম অনুভাব নানা স্থানে মূর্তিলাভ করিয়াছে, কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা পাঠ করিতে করিতে পদে পদে বিস্ময় অনুভব করিতে থাকিবেন। ঠিক যেন একটি অজানা দেশের মত। তাহার পথের প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক বাঁকে নব নব বিস্ময়—তাহা ছাড়া তাহার নানা গলি ঘুঁজির তো কথাই নাই। সেই বিস্ময়ের আলোড়নেই সমস্ত নাটিকাটি সজীব হইয়া আছে।

মাধবদত্ত সংসারী লোক, সে তাহার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো অমলকে পোষ্য লইয়াছে। ছেলেটি রুগ্ন—শরতের রৌদ্র আর হাওয়া যাহাতে ছেলেটি না লাগায়, সে বিষয়ে কবিরাজ মাধবদত্তকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। অমলের মন বাহিরে যাইতে না পারিয়া ছটফট করিতেছে। সে তাহার বাড়ীর জানালার নিকটে বসিয়া থাকে—দূরে পাহাড় দেখা যায়—পাহাড়ের নীচে ঝরণা, ঝরণাতলায় ডুমুরগাছ। জানালার সামনেই রাজপথ—ফিরিওয়ালা সুর করিয়া ফিরি করে, রাজার প্রহরী মধ্যাহ্নের স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজায়। ঐ দূর পাহাড়, ঐ ঝরণা, ঐ ফিরিওয়ালার সুর, ঘণ্টার ঢং ঢং তাহাকে আনমনা করিয়া দেয়—কোন সুদূরের একটি ডাক তাহার বুকের মধ্যে বহন করিয়া আনে।

'জীবনস্মৃতি' এবং 'ডাকঘর' প্রায় একই সময়ে বাহির হইয়াছে; সুতরাং

এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারি না কি? সেই ফিরিওয়ালার ডাক, রাত্রে ঘণ্টার শব্দ, সেই কল্পনাভারাক্রান্ত মন এ তো কোনমতেই আমাদের অপরিচিত নয়?

'ক্ষণিকা'য় 'কবির বয়স' কবিতায় কবি তাঁহার কেশে পাক ধরিয়াছে শুনিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি সকলের সঙ্গে এক বয়সী। প্রৌঢ় বয়সে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছেন—

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে"—

তাহার সুরের সঙ্গে বাল্য জীবন স্মৃতির সুর মেলে এবং ডাকঘরেরও সুর মেলে। কবির বয়স যে চিরকাল সমানই থাকিয়া যায়, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যায় বটে।

বাস্তবিক এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটি ডাকঘরের মূলভাব।

কবির মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, তিনি অনেক সময় এই পৃথিবীর পরিচিত দৃশ্য শব্দ গন্ধকে এমন ভাবে অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যেন এই পৃথিবীতে তিনি সদ্য আসিয়াছেন। এখানে সমস্তই যেন নূতন, কিছুই যেন তাঁহার পরিচিত নহে। এই যে নিকটতম, অভ্যস্ততম, পরিচিততম জিনিসকে বহু দূরের একটি বিরলব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে ছাড়া দিয়া দেখা—ইহাতেই অভ্যাসের ও পরিচয়ের জড় আবরণ তাহার মুখের উপর হইতে সরিয়া যায়—সে আশ্চর্য সুন্দর হইয়া উঠে

এমন করিয়া দেখিলে সমস্তই কী রহস্যময়! দইওয়ালা যে রাস্তা দিয়া দই হাঁকিয়া চলিয়াছে, সে তো একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়। তাহার চারিদিকে কত দূর-দূরান্তরের কত সৌন্দর্য ঘিরিয়া আছে—সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় সৌন্দর্য, সেই শামলী নদীর সৌন্দর্য, সেখানকার সেই লালমাটীর রাস্তাটি, বড় বড় গাছের ছায়া, পাহাড়ের গায়ে যে গরু চরিতেছে তাহাদের সৌন্দয, সেই যে গোপবধূরা ডুরে শাড়ি পরিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের সৌন্দর্য, সেই গ্রামের সমস্ত স্নেহ-প্রেম-মাধুর্যের কত সৌন্দর্য! এই সবই সেই দইওয়ালাকে বেষ্টন করিয়া আছে তাই তো সে

এমন রমণীয়। তাই তাহার ফিরির সুরটিকে বিশ্ব-বাঁশির মত সকরুণ করিয়া দিয়াছে। বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মাহাত্ম্যই নাই।

তেমনি ঐ যে সম্মুখের পথটি, তাহারও রহস্য ঐখানে—সে যে বহুদূরের যাত্রীকে ক্ষণিকের মত, চকিতের মত, একবার ঐ একটি জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেখাইতেছে—বলিতেছে, অনন্ত প্রবাহের একটিমাত্র পরিপূর্ণ মুহূর্তের ছবিখানি দেখ! অনন্ত সমুদ্রকে একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যে দেখ, ইহার পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র—সেই সমস্ত প্রবাহ যেন এই একটি তরঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তার মানে কি? তার মানে এই যে, আমরা এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি বা পাইতেছি তাহা ক্রমাগতই চলিবার মুখে সরিবার মুখে! আমরা তাহার আদিও জানি না, তাহার অন্তও জানি না, জানি শুধু তাহার মাঝখানের খণ্ড একটুখানি কালের কথা। সেই খণ্ড কালে যেটুকু যাহা দেখিতেছি, তাহাকেই বাস্তব বলিয়া সত্য বলিয়া যে আমরা চাপিয়া ধরি, তাহাতেই তাহাকে হারাই, তাহার যথার্থ সত্তাকে পাই না। যদি সেই খণ্ডকালের খণ্ড জিনিসের উপর তাহার অনাদি অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের একটি আলো ফেলিয়া সে খণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডের পরিচয় পাই, তবেই সেই জিনিস আশ্চর্য অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহা তখন একদিকে ব্যক্ত, অন্য দিকে অব্যক্ত, একদিকে সসীম অন্যদিকে অসীম; একদিকে রূপ, অন্যদিকে অপরূপ। তখন সে কী বিস্ময়, কে তাহা বর্ণনা করিবে?

এ তত্ত্বের কথা নয়, কিন্তু দৃষ্টির কথা। এই দৃষ্টি লইয়াই কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধি যে মানুষের শেষ সম্বল নয়, তাহার সঙ্গে যে কেবল বহির্বিষয় মাত্রের যোগ, মানুষের অধ্যাত্মপ্রকৃতির গভীরতা পরিমাপ করিতে বুদ্ধি যে অক্ষম, এ সকল কথা আধুনিক যুগে ইউরোপের তত্ত্বজ্ঞানীদল স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। দার্শনিক শ্রেষ্ঠ আঁরি বের্গসঁ (Henry Bergson) বলেন, "আমাদের বুদ্ধি এবং বাহিরের বিষয় পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে (Creative Evolution, ১৯৭ পৃঃ); চৈতন্যকে যদি বুদ্ধির গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখ তবে তাহা বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িবে।" সুতরাং বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি—আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমগ্রতা তাহার নাই। কিন্তু যাঁহারা মানবচিন্তা যে কত-

দূর অগ্রসর হইতেছে তাহার কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা সকল বড় জিনিসকেই পরিহাস করিতে থাকিবেন। ইহাদেরই জন্য কি ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ কে 'ফিলিস্টাইন' কথাটা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল?

ডাকঘরের মূলভাব না হয় বুঝা গেল কিন্তু 'ডাকঘর', 'চিঠি', 'রাজা', প্রভৃতি ব্যাপার কী? এই যে কল্পনা-ব্যাকুল সৌন্দর্যানুভূতিময় চিত্ত ইহাকে রুগ্ন করিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবারই বা তাৎপর্য কী এবং রাজার চিঠির জন্য উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিবারই বা অর্থ কী?

আমরা যে রুগ্ন এবং বদ্ধ কেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার কী প্রয়োজন আছে? আমরা বাহির হইতে চাই, এ কথাটা যতখানি সত্য ততখানি সত্য এই কথাটাও যে আমাদের অন্তরে বাহিরে নানা বাধা জড়াইয়া আছে। বারবার কি আমাদের বদ্ধ ঘরে অভিসারের বাঁশির ডাক আসে না? কিন্তু হায়, বাঁধন কি একটি, নিষেধ কি সামান্য?

মাধবদত্ত-কবিরাজরূপী সংসার তো আছেই, সুধাও আসিয়া যে আধখানা দরজা খোলা আছে তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে চায়!

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাসরি"

কিন্তু কল্পনা তো বাঁধ মানে না, সে যে পাখা মেলিয়া সর্বত্র উড়িতে চায়! তার পণ, সে সব দেখিবে, সব কিছুর আনন্দ সম্ভোগ করিবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তাহাকেও কুলায়ে ফিরিতে হয়! তখন বলিতে হয়—

"অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা?
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।" — খেয়া

এইরূপে কবির জীবন যখন গিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে মিলিয়া যায়, তখন ঐ একটি মাত্র ইচ্ছা প্রাণ জুড়িয়া বাজে যে, তাঁর চিঠি চাই—তিনি কবে আসিবেন? সেইখানেই যে সমস্ত বিচিত্রতার অবসান, সেইখানেই সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি!

নাটিকার মধ্যে এই যে এক ভাব হইতে আর এক ভাবে গিয়া

পড়িতেছি (Progression of thought)—ইহাতেই তাহার মধ্যে একটি গতিসঞ্চার হইয়াছে। এখন আর পথের ধারে অনেকের সনে দেখা নয়, এখন ঘরের মধ্যে চিঠির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা, এখন আর বহু বিচিত্রতাময় দিন নয়, এখন শীতল অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি।

নাটিকার পরিণামটা আমার স্পষ্টতই মৃত্যু বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠকমাত্রই জানেন যে তিনি জীবনকে এবং মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন না, তিনি মৃত্যুকে জীবনেরই পূর্ণতর পরিণাম বলিয়া মনে করেন। 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে এই ভাব, 'ঝরণাতলা' কবিতাটিতেও এই একই ভাব, যে জীবনে যেটা ঝরণারূপে সাত পাহাড়ের সীমানার মধ্যে রহিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহাই সেই সীমা অতিক্রম করিয়া নদী হইয়া বহিয়া গিয়াছে, মৃত্যু ছেদ নয়—সে পরিপূর্ণতা।

শুধু তাই নয়। পূর্বের কোন কোন কবিতাতে কবি মৃত্যু-মাধুরীর কথাও বলিয়াছেন।

"পরাণ কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর
এই নীলাম্বর একি তব অন্তঃপুর ?" —চৈতালি

মৃত্যু যেন একটি পরিপূর্ণ সুদূর—সমস্তই তাহাতে বিলম্বিত হইয়া সীমা-আবরণ উন্মোচন করিয়া মধুর হইয়া উঠে। আমরা একটু আগে ডাকঘরের যে মূল ভাবটির কথা আলোচনা করিয়াছি, মৃত্যুকে এমন পরিপূর্ণ ও মাধুর্যময় করিয়া দেখিলে সে ভাব মৃত্যুর সংগে দিব্য সংগত হয়।

কারণ, কিছুই যে থাকিবে না, সেইজন্যেই তো বাস্তবিক সমস্তই এমন সকরুণ, এমন সুন্দর। মৃত্যু আছে বলিয়াই জগতের কোথাওকোন ভার নাই। সমস্তই একটি সুদূরের ব্যাপ্ত বিষাদে বেদনার মত বাজিতেছে। সুতরাং এখানে মৃত্যু যদি পরিণাম হয় তবে তাহাকে কোনমতেই খাপছাড়া বা আকস্মিক বলা চলে না। কবি যে বলিয়াছেন,

"সে এলে সব আগল যাবে ছুটে—
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে !"

মৃত্যু যেন সেই একটি বন্ধনমোচনের আনন্দ হইয়া উঠিবে।

তবে কি রাজার চিঠির জন্য অমলের যে ব্যাকুলতা সে এই মৃত্যুর জন্য ব্যাকুলতা ?

না। সে কথা বলিলে রাজার চিঠিকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখা হইবে।

রাজা যে অমলের মত ছোট মানুষের কাছে আসিতে পারেন এই কথাই তো মোড়লজাতীয় লোক বিশ্বাস করে না - তাহারা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা জানে যে তিনি রাজা—তিনি কেবল বড় বড় মানুষকেই দেখা দেন। কিন্তু তাঁহার যে কি আনন্দ ঐ ছোট বালকের উপরেও অনন্ত হইয়া আছে, উহার নামে যে তিনি কোন্ অনাদিকাল হইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কতবার যে সেই লিপির আহ্বান কত প্রভাতে সন্ধ্যায় বহিয়া গিয়াছে,—তাহা কি মোড়লজাতীয় বুদ্ধিজীবী অবিশ্বাসীরা জানে? না মাধবদত্তের মত ঘোর সংসারীরা জানে? একমাত্র লোক যে সেই বার্তা জানে সে ঠাকুরদা।

'শারদোৎসব' নাটকের সময় হইতেই এই ঠাকুরদাকে কবির প্রয়োজন হইয়াছে। এই একটি মুক্তপ্রাণ মানুষ—সে সকলের সঙ্গে সব হইয়া আছে, যে পরিপূর্ণ আনন্দকে জানে—ইহাকে নহিলে কবির কল্পনাগুলি সমর্থন পাইবে কেমন করিয়া? সোনার তরী, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, হাল্কা দেশ প্রভৃতি ব্যাপার যে সত্য-সত্যই আছে—সে কথার সাক্ষ্য ঠাকুরদা ভিন্ন দিবে কে? ফিলিস্টাইন দলকে শাসাইয়া সংযত করিয়াই বা রাখিবে কে?

ঠাকুরদা বলিতেছেন—'শুনেছি তো তার চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু কবে?

"আমার মিলন লাগি তুমি—
আস্‌ছ কবে থেকে?"

* * *

অমল উত্তর করিতেছে—তা আমি জানি নে। "আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি—সে অনেক দিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলি নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলি চলে আসচে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত, তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলি আসচে তারপর আখের ক্ষেত।

সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চলে আসচে—রাতদিন একলাটি চলে আসচে; * * * যতই সে আসচে দেখচি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশী হয়ে হয়ে উঠছে।

সুতরাং এ চিঠি কখনই সে চিঠি নয় যে, অমুক দিন অমুক সময়ে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এ চিঠি সেই চিঠি যে, 'আমি তোমাকে বড়ো আদর করিয়া আমার এই আহ্বানলিপি পাঠাইলাম। তুমি আমার, তোমাতে আমার আনন্দ আছে।'

আমি এই জায়গায় আমার পাঠকদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠি' নামক কবিতাটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। সে চিঠিখানিও বিশ্ব চিঠি, তাহার লিখন কবি জানেন না, কে লিখিয়াছে তাহাও জানেন না—কিন্তু পাইয়াছেন এই সুখেই তিনি খুশী তাঁহার বুকের ভিতরটা আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে।

অমল তাই ঠাকুরদাকে বলিতেছে যে, প্রথমে যখন তাহাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, এখন ডাকঘর দেখিয়া অবধি প্রত্যহই তাহার ভালো লাগে. "ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভাল লাগে।" 'একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছিবে সে কথা মনে করলেই আমি খুশী হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারি।'

এইবার পরিণামে আসা গিয়াছে। চিঠি পাইবার ভরসার পর পরিণাম সেই পরিণাম, পরিণাম পরিপূর্ণতা।

প্রথমে আমরা বিশ্বে বাহির হইবার ব্যাকুলতা দেখিলাম, তারপর রাজার চিঠির প্রত্যাশায় ঘরে চুপ করিয়া থাকিতেও ভাল লাগে দেখিলাম।

এখন দেখি * * * "চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হ'য়ে আসচে। কথা কইতে আর ইচ্ছা করচে না। রাজার চিঠি কি আসবে না?"

বোধ হয় জগতের কোন কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পনা করেন নাই—জীবনে মৃত্যুতে যে বিবাহের অতি নিবিড় সম্বন্ধ সে কথা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মাঝের বয়সের কবিতায় জীবন ছিল 'বালিকা বধূ', তখন তাহার বরকে ভয় করিত—'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় তাই তিনি আরও কিছু দিনের মত খেলাধূলার ঘরের মধ্যে বাস করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু শেষ বয়সের কবিতায় ক্রমাগতই তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ
পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও
আমারে কথা!"

সুতরাং রাজদূতকে তিনি যদি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে উপস্থিত করেন তাহাতে কিছুই আশ্চর্য নাই!

তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংশয় যায় না। বাহির হইতে মোড়লের অবিশ্বাসের পরিহাসের খোঁচাও আছে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে সত্যকেই অবিশ্বাস করে কি না, সে হাঁ-কেই না বলিতে চায় কি না, তাই তাহার অবিশ্বাসই তাহার বিশ্বাসকে যথার্থরূপে পাইবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। সত্যকে সে যত আঘাত করে, ততই তাহার নিজের অবিশ্বাসের প্রাচীর একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যায়, শেষে সে দেখে যে সে পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য সত্যই ঘটে। সে জানে না যে, অক্ষরশূন্য কাগজেই রাজার চিঠি আসে। কারণ, তাঁহার চিঠির তো বাহ্যিক কোন নিদর্শন নাই, সে চিঠি আমাদের আশা এবং নির্ভরের ভিতরে আসিয়া যে পৌঁছায়। মুড়িমুড়কি খাইতেও তিনি সামান্য লোকের ঘরেই আসেন—কারণ, তাঁহার আসা যে নিঃশব্দ গোপন—তিনি তো আগে ভাগে জানাইয়া কাহাকেও দেখা দেন না। সে একেবারেই আচমকা হঠাৎ আবির্ভাব, তাহার জন্য কেহই কখনই প্রস্তুত থাকে না।

মোড়লের পরিহাসের মধ্যে ঠাকুরদা এই সত্যটিকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি অমলকে ইহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতেই দিলেন না। রাজারই চিঠি আসিয়াছে। রাজাই—স্বয়ং আসিতেছেন! হাঁ, এই কথাই সত্য!

তারপর রাজদূতের প্রবেশ এবং রাজ-কবিরাজের আগমন। দ্বার ভাঙিয়া গেল, প্রদীপ নিবিয়া গেল, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা এক নিমেষে খুলিয়া গেল; অর্ধরাত্রে রাজা আসিবেন শোনা গেল। অমল স্থির করিল যে, সে তাঁহার ডাকহরকরার কাজটি প্রার্থনা করিবে। বাস্তবিক কবি কি সেই কাজই করেন না? শূন্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো তাঁহার প্রধান কাজ!

নাটিকা সমাপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য কৃতিত্ব যে, তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন-নাট্যের নানা অঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি সূত্রের মধ্যে ভরিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা, সৌন্দর্যব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, অপেক্ষা, শান্তি সমস্তই এই নাটিকায় কোথাও হয়ত একটি ছত্রে বা আধখানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন ;—কোথাও বা সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন সব রহস্য ছড়াইয়াছেন যে, বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যেমন সুধার কথা। সে অমলের আধখানা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল ,—তাহার সেই ক্ষণিক মোহটুকু সে অমলের মৃত্যুর পরেও রাখিয়া গেল,—সে বলিল—"ও যখন জাগবে তখন বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।" এই এতটুকুর মধ্যে সমস্ত নারী প্রকৃতির একটি রহস্য কবি কৌশলে ছুঁইয়া গিয়াছেন। শেষ ক'টি কথা ব্রাউনিং-এর Evelyn Hope-এর শেষ ছত্রগুলি মনে করাইয়া দেয়—মৃত Evelyn-এর প্রণয়ী বলিতেছে—"এই একটি পল্লব আমি তোমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলাম, ঘুমাও, যখন জাগিবে তখন তোমার মনে পড়িবে, তখন সব বুঝিতে পারিবে।" এমন ইঙ্গিত কতই আছে !

ইউরোপেও Symbolical নাটকের যুগ শুরু হইয়াছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাটি—মেটারলিঙ্কের নাট্যগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। লরেন্স আ্যাল্‌মা টডেমা প্রভৃতি মেটারলিঙ্কের সমালোচকবর্গ তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রাচীন ধর্মের জীর্ণ ভিত্তির নূতন অধ্যাত্মবোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কি সে চেষ্টা নাই ? তিনিও আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না—স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধকে কোন গোপন পন্থায় হারাইতে না দিয়া তাহাকেই বিশ্বের দিকে ব্যাপ্ত করিবার, সত্য করিবার জন্য কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও একটি একান্ত প্রয়াস নাই ?

গোরা

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

(১)

বঙ্কিমচন্দ্র যে সময় স্বদেশপ্রেমের বাণী তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া দেশময় ছড়াইয়া দিতেছিলেন, সে সময় আমাদের দেশে দেশপ্রেমের আদর্শ কোন একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। উহা তখনও পর্যন্ত একটা অশরীরী ধ্যানবস্তুমাত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে সময় 'গোরা' লেখেন, সে সময় বাঙ্গালীর জীবনে দেশপ্রেম একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

চোখের সম্মুখে যাহার কোন শরীরী অস্তিত্ব নাই, অথচ যাহা স্বভাবতই বড়, তাহাকে আমরা উচ্ছ্বসিত আবেগভরে পূজা করি।—তাহা আমাদের চোখের সম্মুখে একটা আসাধারণ দীপ্তি ও বর্ণোজ্জ্বলতা লইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'আনন্দমঠ' লেখেন, সে সময় দেশপ্রেম ছিল একটা সুমহান আদর্শ, একটা অশরীরী ধ্যানবস্তু। উহা তখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতির ভিতর দিয়া শরীরী হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' কিন্তু যে সময়ে রচিত হয়, সে সময় দেশপ্রেম বাঙ্গালীর জীবনে একটা কর্মপদ্ধতির ভিতর দিয়া শরীরী হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে তখন 'স্বদেশী আন্দোলন'-এর ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই আন্দোলনের ফলে নবজাগ্রত বাঙ্গালী দেশসেবার একটা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ছকিয়া ফেলিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যাহা একটা সুমহান আদর্শ ছিল, রবীন্দ্রনাথের যুগে তাহা একটা বিশেষ কর্মপদ্ধতির ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আদর্শকে মানুষ পূজা করে, কর্মকে মানুষ করে বিচার, করে বিশ্লেষণ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া দেশপ্রেমের সুমহান আদর্শকে চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের সমসাময়িক প্রত্যক্ষ কর্মরূপকে বিচার করিয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের সমসাময়িক প্রত্যক্ষ কোন কর্মরূপ স্বচক্ষে দেখেন

নাই, তাঁহাকে কল্পনার সাহায্যে দেশপ্রেমের আদর্শচিত্র যত্নসহকারে আঁকিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের সমসাময়িক স্পষ্ট রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুতরাং উহা তাঁহার নিকট ধ্যানের বস্তু নয়, উহা তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ এবং স্থূল। দেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ কর্মরূপ তাঁর আদর্শের মত কোনদিন পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত হইতে পারে না;—তাহার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিবেই।

অতীতের মধ্যে একটা মহিমা আছে। সে মহিমা দূরত্বসঞ্জাত। দূর হইতে যে জিনিসকে আমরা দেখি, তাহার খণ্ডাংশগুলি স্বতন্ত্র করিয়া আমাদের চোখে পড়ে না, এবং তাহার ফলে একটা সমগ্রতার মহিমা লইয়া উহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সমগ্রতার সহিত আমাদের এই পরিচয়—ভাবের পরিচয়—রসের পরিচয়, তাই অতীতকে লইয়া যতকিছু রোমান্সের সৃষ্টি। বর্তমানের কোন ঘটনা বা ব্যাপার কিন্তু আমাদের নিকট দেখা দেয় তার ছোট ছোট অংশগুলির পারম্পর্যের ভিতর দিয়া। তার খণ্ডাংশগুলিকে আমরা স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পাই;—তাহারা নিতান্ত কাছের জিনিস;—তাহাদের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের স্বার্থ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত। সুতরাং তাহাদিগকে আমরা শুধু নির্লিপ্ত রসদৃষ্টিতে দেখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না,—সেই সঙ্গে সেগুলিকে বিচার করিয়া লই, যাচাই করিয়া লই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়া দেশপ্রেমকে চিরদিন ভক্তের মত, ভাবুকের মত পূজা করিয়া গিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়া দেশপ্রেমের সমসাময়িক প্রকাশরূপকে যাচাই করিয়া লইবার জন্য সদাই ব্যস্ত।

এতক্ষণ যে সকল কথা বলা হইল, তাহার মধ্যে সত্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাই একমাত্র সত্য নয়। কেন না দেখা যায়, বাঙালীর জীবনে দেশপ্রেম যখন বিশেষ কোন কর্মপদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া শরীরী হইয়া উঠে নাই, সে সময়ও রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহিমার দীপ্তি এতটুকু নাই। আমরা 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর কথা বলিতেছি। এই উপন্যাসখানির মধ্যে আমরা প্রতাপাদিত্যের দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাই, তাহা যেমন বীভৎস, তেমনি কদর্য।

প্রতাপাদিত্য ত আর রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ব্যক্তি নন, এবং তাঁহার

কার্যকলাপও তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ নয়। সুতরাং অতীতের এই মানুষটি এবং তাঁহার কার্যকলাপ একটা কাল্পনিক ঔজ্জ্বল্য এবং মহিমা লইয়া তাঁহার চিত্তে অনায়াসে জাগিয়া উঠিতে পারিত।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, অতীতকে কোন্ চোখে দেখিতে হইবে, তাহার কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। মানুষের কল্পনার গতিও কোন একটা নির্দিষ্ট বাঁধা পথ ধরিয়া চলে না। দূরের জিনিষ দূরের জিনিষ বলিয়াই তাহাকে কতকটা ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যায়, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, সে ভাবে অঙ্কিত করার স্বাধীনতা তাঁহার সম্পূর্ণই আছে। সেদিক হইতে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। আমরা কেবল এই কথা বলিতে চাই যে, দেশপ্রেমের সমসাময়িক প্রত্যক্ষ কর্মরূপেরই তিনি কেবল সমালোচনা করেন নাই, অতীত যুগের দেশপ্রেমিকের কার্যকলাপও তাঁহার কঠোর সমালোচনার দ্বারা জর্জরিত।

অনেকে বলিতে পারেন, প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের মধ্যে এমন একটা দিক আছে, যাহাকে সমর্থন করা যায় না। বসন্তরায়ের হত্যা-ব্যাপার আমাদের মনকে সত্যই তিক্ত করিয়া তুলে।

বেশ, তাহাও না হয় মানিয়া লইলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে এ প্রশ্নও কি মনে জাগে না যে আমাদের দেশে এত দেশপ্রেমিক থাকিতে রবীন্দ্রনাথ এমন চরিত্র বাছিয়া লইলেন কেন, যাহার মধ্য দিয়া দেশপ্রেমের চিত্র তার স্বাভাবিক গৌরবদীপ্তি হারাইয়া লজ্জায় নতশির হইয়া পড়ে?

তাহার পর আর এক কথা, প্রতাপাদিত্যের দেশপ্রেম যদি সত্যকার দেশ-প্রেম নাই হয়, তাহা হইলে আর একটি সত্যকার দেশপ্রেমিকের চিত্র আঁকিয়া তাহার নিকট এই চরিত্রটিকে হীনপ্রভ করিলেই চলিত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বসন্তরায় নামক একটি কর্মবিমুখ, কল্পনাপ্রবণ ভাবুককে সম্মুখে ধরিয়া তাঁহারই পার্শ্বে এই দেশপ্রেমিকটিকে নিতান্ত ম্লান এবং দীপ্তিহীন করিয়া অঙ্কিত করিলেন কেন?

এই সকল উক্তির ভিতর দিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত করিতেছি, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। আমরা কেবল তাঁহার বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচিত হইবার জন্যই এই সকল কথা তুলিলাম।

আসল কথা রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমকে কোনদিনই খুব উচ্চাসন দিতে পারেন নাই। তাঁহার মনের গঠনটাই বোধ হয় ইহার প্রতিকূল। তাঁহার অতিউদার বিশ্বপ্রেমিক মনের সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে দেশপ্রেমের সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট পরিধি যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তাই যেখানেই তিনি দেশপ্রেমিকের চিত্র আঁকিয়াছেন, সেইখানেই তাহার মধ্যে নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির স্পষ্ট আভাস দিতে ছাড়েন নাই, এবং এই সকল দেশপ্রেমিকের অসম্পূর্ণ ভ্রান্ত জীবনের ধ্যানধারণা ও চিন্তাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সকল চরিত্রকে সম্মুখে ধরিয়া, তাঁহারা কেহই পূর্ণতর দেশপ্রেমিক নন, তাঁহারা উদারচিত্ত, সংস্কারমুক্ত বিশ্বমানব।

(২)

'গোরা' উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এতক্ষণ ইহার বাহিরের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম ; এইবার উপন্যাসখানির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হইতেছে গোরা। এই অসাধারণ মানুষটির চরিত-কথাকে আমরা দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি। উপন্যাসখানির মধ্যে গোরার সহিত প্রথম যেদিন আমরা পরিচিত হই, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার হাজতবাসের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তাহার চরিত্রের যে পরিচয় পাই, তাহা, প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত ; এবং তাহার হাজতবাসের পর হইতে গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তাহার চরিত্রের যে পরিচয় পাই, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে, অর্থাৎ হাজতবাসের পূর্ব পর্যন্ত আমরা গোরা-চরিত্রের যে পরিচয় পাই, তাহা সহজ, সরল, অজটিল। তাহার চরিত্রে প্রচুর উচ্ছ্বাস আছে, ভাবুকতা আছে, কিন্তু জটিলতা নাই। তাহার মধ্যে একমুখী ভাবুকতার তরঙ্গোচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সংঘাত-জনিত ঘূর্ণাবর্ত নাই। যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন হৃদয়বৃত্তির যে সংঘাত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র-গুলিকে জটিল করিয়া তুলে, প্রথম অধ্যায়ের গোরার মধ্যে তাহার আলোড়ন নাই বলিলেই চলে। এই অধ্যায়ে তাহার ধ্যানের জগতের সহিত বাস্তব জগতের কোথাও বিরোধ ঘটে নাই। আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত তাহার

চিত্তকে কোনদিন সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে নাই। এই অধ্যায়ে গোরার চরিত্রাঙ্কনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা যেন বেশি কৃতিত্ব দেখাইয়া ফেলিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে গোরার ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত জীবনে একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্য তার অন্তস্তলবাসী সুপ্তযৌবন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাহার এই প্রথম চেতনার মধ্যে জাগরণের রূঢ় স্পষ্টতা নাই, আছে অর্ধজাগরণের অস্পষ্ট স্বপ্নমাধুরী।

গ্রন্থকার এই জিনিসটির আভাস দিয়াছেন সেইখানে, যেখানে গোরা পরেশ বাবুদের বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নীরব সন্ধ্যায় নির্জন গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়া কি একটা অনাস্বাদিত, নূতন সূক্ষ্ম চেতনা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছে। গ্রন্থকার গোরার ভিতরকার সুপ্ত গোপন মানুষটির এই প্রথম জাগরণ অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

"প্রকৃতি কোন দিন গোরার মনকে আকর্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই। তাহার মন নিজের সচেষ্টতার বেগে নিজে কেবলই তরঙ্গিত হইয়াছিল;— যে জল স্থল আকাশ অব্যবহিতভাবে তাহার চেষ্টার ক্ষেত্র, তাহাকে সে লক্ষ্যই করে নাই। আজ কিন্তু নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রলোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ, কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে, আর কতকগুলি দীপহীন নিস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতিগ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মত তিমিরভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।"

"আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর-মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়া ছিল—আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন্ দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্তের মধ্যে এই দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল।"

"পথের ধারে সদাগরের আপিসের বাগানে কোন্ বিলাতী লতা হইতে একটা অপরিচিত ফুলের মৃদুকোমল গন্ধ গোরার ব্যাকুল হৃদয়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। নদী তাহাকে লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্মক্ষেত্র হইতে

কোন্ অনির্দেশ্য সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল ; সেখানে নির্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মেলিয়া কি ফুল ফুটাইয়াছে—কি ছায়া ফেলিয়াছে !—সেখানে নির্মল নীলাকাশের নীচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া। চারিদিক হইতে মাধুর্যের আবর্ত আসিয়া হঠাৎ গোরাকে যে একটা অতলস্পর্শ অনাদি শক্তির আকর্ষণে টানিয়া লইয়া চলিল পূর্বে কোনদিন সে তাহার কোনো পরিচয় জানিত না।"

এইভাবে এই ভাবজগতের ধ্যানমগ্ন মানুষটির প্রথম চিত্ত চাঞ্চল্যের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে নিপুণ হস্তে সূক্ষ্ম তুলি চালাইয়াছেন, পাছে তাহার রসরূপ স্পষ্ট বিশ্লেষণের স্থূলত্বের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়।

আসল কথা হাজতবাসের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রটিকে ঠিক খাঁটি ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণধর্মী সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করেন নাই, দেখিয়াছেন কবির পরিপূর্ণ অখণ্ড দৃষ্টি লইয়া। তাই তিনি এই চরিত্রটিকে মনস্তত্ত্বের বন্ধুর, দুর্গম, জটিল পথে পরিচালিত না করিয়া হৃদয়াবেগের প্রশস্ত, উদার, উন্মুক্ত সোজা পথে মুক্তি দিয়াছেন।

হাজতবাসের পর হইতে আমরা গোরার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এতদিন তর্ক ও বক্তৃতার কোলাহলে যাহার কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পায় নাই, কারাজীবনের সঙ্গিহীন, কর্মহীন অলস নির্জনতার মধ্যে গভীর চিত্তগুহার ভিতরকার সেই গোপন মানুষটির কাতর কণ্ঠস্বর সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। নির্জন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যার স্বপ্নময় আবছায়ার মধ্যে যে চেতনা একদিন অস্পষ্ট কাব্যময় অশরীরী রসানন্দের আবেশে তাহার চিত্তলোকে একটা অভূতপূর্ব, অনির্দিষ্ট, অপরিচিত পুলকশিহরণ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, আজ তাহা একটি বিশেষ এবং নির্দিষ্ট নারীমূর্তিকে আশ্রয় করিয়া স্পষ্ট এবং শরীরী হইয়া উঠিয়াছে। এই শরীরী চেতনাটিকে সে আজ মন হইতে জোর করিয়া তাড়াইতে চেষ্টা করিল না। তাহার কারাজীবনের একঘেয়ে, কর্মহীন মুহূর্তগুলিকে সে ইহারই মাধুর্যস্পর্শে সুমধুর করিয়া তুলিল।

গ্রন্থকার তাহার এই পরিবর্তন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"একদিন সুচরিতার সংস্রব হইতে গোরা পলায়ন করিয়াছিল। যতদিন পর্যন্ত সে নানা কষ্ট এবং কাজ লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, ততদিন সুচরিতার কথা

মন থেকে অনেকটা দূরে রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু জেলের অবরোধের মধ্যে সুচরিতার স্মৃতিকে সে কোনমতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।.. গোরা মনে করিয়াছিল কল্পনা-মূর্তিকে ভয় করিবার কোন কারণ নেই। এই জন্য একমাসকাল ইহাকে একেবারেই সে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল।"

এই 'পথ ছাড়িয়া দেওয়া'র ফলে সুচরিতার মূর্তি তাহার চিত্তফলকে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; এবং জেল হইতে বাহির হইবার পর গোরা পরেশ বাবুদের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করিয়া দিল। পূর্বে সে এই ব্রাহ্মগৃহে যাইত তর্ক করিতে, বক্তৃতা করিতে, এখন সে সেখানে যাইতে লাগিল অন্য কারণে। গোরা পূর্বে এই ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েদের সহিত তর্ক করিত জিদের বশবর্তী হইয়া। সে তর্কের মধ্যে বিপক্ষদলকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইবার একটা দুর্দমনীয় তাগিদ ছিল। সুতরাং সে তর্কের মধ্যে সকল সময়েই একটা নীরস রূঢ়তা এবং কর্কশ পৌরুষ প্রকাশ পাইত। জেল হইতে বাহির হইবার পর হইতে গোরার তর্কের মধ্যে জিদ বা জবরদস্তি নাই। তখন সে মানুষের দিকে চাহিয়া তর্ক করিত না, অশরীরী মতবাদের দিকে চাহিয়া তর্ক করিত। অপরের মতের সহিত নিজের মতের যে অশরীরী সংঘাত, তাহার মধ্যে দয়া, মায়া, ভদ্রতা, শিষ্টাচারের প্রয়োজন কোথায়? দয়া, মায়া, শিষ্টতা, ভদ্রতা ত মানুষকে লইয়া। অথচ গোরা চিরদিন মানুষকে বাদ দিয়া তার অশরীরী মতকেই আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে। তাই শুধু পুরুষ নয়, ভদ্রমহিলার সম্মুখেও শিষ্টাচার রক্ষা করার কোন প্রয়োজন সে এতদিনে মনে মনে অনুভব করে নাই। কিন্তু জেলখানা হইতে বাহির হইবার পর সুচরিতার সহিত তাহার যে সকল তর্ক-যুদ্ধ হইয়াছে সে যুদ্ধে সে যে শুধু অশরীরী একটা মতবাদের বিপক্ষেই অস্ত্র ধারণ করে নাই, এবং তাহার নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ যুক্তিবাণগুলি যে শুধু কয়েকটা অশরীরী মতবাদকেই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, সেই সঙ্গে একটি কোমল নারীবক্ষেও আঘাত হানিবে—সে কথা আজ সে অনুভব করিতে শিখিয়াছে। তাই দেখা যায়, তর্কের ঝোঁকে সুচরিতার প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিবার পরেই গোরা কেমন যেন অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গোরার মনে করুণার সঞ্চার হইল। সে একটুখানি থামিয়া গলা নামাইয়া কহিল—"আমার কথাগুলো আপনার কাছে হয়ত কঠোর দেখাচ্ছে—কিছু

আমাকে একটা বিরুদ্ধপক্ষের মানুষ বলে মনে কোনো বিদ্রোহ রাখবেন না। আমি যদি আপনাকে বিরুদ্ধপক্ষ বলে মনে করতুম, তাহলে কোন কথা বলতুম না।"

এইভাবে গোরার অন্তস্তলবাসী স্বাভাবিক মানুষটি যেন তার ভাবুকতার স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

পূর্বে সে সুচরিতার সহিত তর্ক করিত তাহার মতকে খণ্ডন করিবার জন্য, এখন সে তাহার সহিত তর্ক করে তাহাকে আপনার করিয়া লইবার জন্য। আগে সে তর্ক করিত সমগ্র জাতির দিকে চাহিয়া, এখন সে তর্ক করে ব্যক্তি-বিশেষের পানে চাহিয়া। আজ তাই তার তর্কের মধ্যে হইতে একটি গোপন আকুল আহ্বান সুচরিতাকে বার বার সচকিত করিয়া তুলে। সুচরিতার মন আজ আকুল আগ্রহে বার বার প্রশ্ন তুলে—

"সকলকে ঠেলিয়া কেন সে (গোরা) তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল! সকলকে ছাড়িয়া কেন সে তাহাকে আহ্বান করিল। কোনো সংশয় করিল না, বাধা মানিল না! বলিল, "তোমাকে নহিলে চলিবে না, তোমাকে লইবার জন্য আসিয়াছি, তুমি নির্বাসিত হইয়া থাকিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না।"

ইহার পর গোরা সুচরিতার মুখের পানে যখন চাহিল, তখন—"সেই দৃষ্টির সম্মুখে সুচরিতা তাহার অশ্রুবিগলিত দুই চক্ষু নত করিল না। চিন্তাবিহীন শিশিরমণ্ডিত ফুলের মতো তাহা নিতান্ত আত্মবিস্মৃতভাবে গোরার মুখের দিকে ফুটিয়া রহিল। সুচরিতার সেই সঙ্কোচবিহীন সংশয়হীন অশ্রুধারাপ্লাবিত দুই চক্ষুর সম্মুখে, ভূমিকম্পে পাথরের রাজপ্রাসাদ যেমন টলে তেমনি করিয়া গোরার সমস্ত প্রকৃতি যেন টলিতে লাগিল।"

এমন করিয়া গোরার মধ্যে রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষটি ক্রমেই যেন গা-ঝাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

পূর্বে সুচরিতার পানে সে কোন দিন স্বতন্ত্র করিয়া তাকায় নাই—বহু নরনারীর জনতার মধ্যে এই বিশেষ মেয়েটি তাহার চোখে কোন দিন আলাদা করিয়া জাগিয়া উঠে নাই। হাজত-বাসের পর হইতে কিন্তু গোরা তাহাকে মানুষের জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে চাহিয়াছে। এই দেখার ভিতর দিয়া তাহার ব্যক্তিগত চেতনা যেন জাতিগত চেতনার বিশাল অরণ্যের মধ্যে নিজের হারাইয়া-যাওয়া নির্দিষ্ট স্বরূপটিকে সহসা খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এইখানেই ইহার শেষ নয়। ইহার পর এই মেয়েটির উপর অধিকারের দাবি গোরা তার নিজের অলক্ষ্যে মনে মনে কল্পনায় প্রতিদিন বাড়াইয়াই চলিয়াছে, এবং অবশেষে একদিন এই মেয়েটিকে সে স্ত্রীপুরুষের নিকটতম সম্পর্কের নিবিড়তম বন্ধনের মধ্যে ধরিবার জন্য নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে ব্যগ্রবাহু প্রসারিত করিয়াছে।

এইরূপ কোন অভিপ্রায় যে তাহার মনের মধ্যে গোপনে অলক্ষিতে বাসা বাঁধিয়াছে, তাহা সে প্রথমে জানিতে পারে নাই। সে মনে করিয়াছিল, এই মেয়েটির মধ্য দিয়া সে ভারতবর্ষের কল্যাণরূপিণী নারীমূর্তিকেই বুঝি পূজা করিতে শিখিয়াছে, এবং তাহার অন্তস্তল মথিত করিয়া যে আনন্দরস উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহা তীর্থবারির মতই একান্ত পবিত্র।

এ ভুল তাহার সেইদিন ভাঙ্গিল, যেদিন হরিমোহিনী কোন এক হিন্দু সন্তানের সহিত সুচরিতার বিবাহের কথা পাড়িলেন এবং এ বিষয়ে সুচরিতাকে রাজি করাইবার জন্য তাহার সাহায্য ভিক্ষা চাহিলেন। গোরাকে নিরুত্তর দেখিয়া হরিমোহিনী সেদিন যখন তীব্রস্বরে বলিলেন—"তোমার মনের ভিতরকার ইচ্ছাটা তাহলে খুলে বল না।"—তখন গোরা সে কথার উত্তর দিতে পারে নাই। "সে মনের মধ্যে তলাইয়া দেখিল, হরিমোহিনী সত্য কথাই বলিতেছেন।"

গোরা এখন আর সে গোরা নাই। ধ্যান-জগতের আত্মভোলা এই মানুষটি একটু একটু করিয়া মাটির জগতে নামিয়া আসিয়াছে। প্রচারকের উচ্চ বেদী হইতে নামিয়া সে আজকাল কতকটা মানুষের বাস্তব জীবনক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছে।

তাই বিনয় যেদিন ললিতার সহিত নিজের বিবাহের কথা তুলিয়া উচ্ছ্বাস ভরে বলিল, "কোনো কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া একটি অনির্বচনীয় অসামান্যতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে;"—তখন সে কথা সে মনে মনে নীরবে মানিয়া লইয়াছিল। গ্রন্থকারের ভাষায়—"গোরা পূর্বের ন্যায় সে কথাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। গোরা মনে মনে স্বীকার করিল, তাহা সামান্য মিলন নহে।......বিনয়ের হৃদয় গোরার হৃদয়ের পরে একটি অখণ্ড একতান সঙ্গীত বাজাইয়া দিয়া গেল। সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়,—তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপর আসিয়া

প্রভৃতি তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল। গোরা যাহাকে কোনো প্রকার বাধা দিয়া আড়াল দিয়া ক্ষীণ করিয়া নিজের অগোচর রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাই আজ কূল ছাপাইয়া আপনাকে সুস্পষ্ট ও প্রবল মূর্তিতে ব্যক্ত করিয়া দিল। তাহাকে অবৈধ বলিয়া নিন্দা করিবে এমন শক্তি আজ গোরার রহিল না।"

"সমস্ত দিন এমনি করিয়া কাটিল; অবশেষে অপরাহ্ণ যখন সায়াহ্ণে বিলীন হইতে চলিয়াছে, তখন গোরা একখানা চাদর পাড়িয়া লইয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। গোরা কহিল—'যে আমারই, তাহাকে আমি লইব। নহিলে পৃথিবীতে আমি অসম্পূর্ণ, আমি ব্যর্থ হইয়া যাইব।"

এমনি করিয়া গোরার হাজত-বাস তাহার জীবনের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ইহা সমগ্র উপন্যাসখানির মধ্যেও একটা পরিবর্তনের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে।

(৩)

গোরার হাজত-বাসের পূর্ব পর্যন্ত উপন্যাসখানি চলিতেছিল নিতান্ত মন্থর গতিতে। গোরার বক্তৃতা এবং পরেশবাবুর পরিজনবর্গের সহিত তর্ক-বিতর্কের গুরুভারে উপন্যাসখানি যেন আগাইতে পারিতেছিল না। গোরাকে না সরাইলে, তাহার বক্তৃতা না থামাইতে পারিলে, উপন্যাসখানি একই স্থানে দাঁড়াইয়া অনবরত পাক খাইতে থাকে,—তাহার অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত হয়। তাই গোরাকে হাজতের মধ্যে আটকাইয়া রাখার প্রয়োজন শুধু ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটই অনুভব করেন নাই, সেই সঙ্গে স্বয়ং গ্রন্থকারও অনুভব করিয়াছেন।

গোরার হাজত-বাসের সুযোগ লইয়া গ্রন্থকার অন্যান্য চরিত্রগুলির দিকে ভাল করিয়া নজর দিবার অবকাশ পাইয়াছেন। এই ভাবরাজ্যের অদ্ভুত মানুষটি তাহার চারিদিকে এমন একটি অপার্থিব মহিমা এবং স্বপ্নজাল বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল যে, তাহা ভেদ করিয়া আমাদের দৃষ্টি উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের উপর পতিত হইতে পারিতেছিল না। তাই ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত

গ্রন্থকারকেও লোকালয় হইতে দূরে কারাপ্রাচীরের মধ্যে গোরাকে নির্বাসিত করিতে হইয়াছে।

রক্তের চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গেলে দেহের সমস্ত রক্ত যেমন মাথায় গিয়া ঠেলিয়া উঠে, সেইরূপ হাজত-বাসের পূর্ব পর্যন্ত উপন্যাসখানির সমস্ত গতি-প্রবাহ গোরার উচ্ছ্বাসময় ভাবুকতার মধ্যে গিয়া অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার অনুপস্থিতিতে উপন্যাস-শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তপ্রবাহ আবার স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গোরা মাত্র একমাস কারাগারের মধ্যে বন্দী ছিল। এই এক মাসের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার উপন্যাসখানিকে পূরা দেড় শত পৃষ্ঠা আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

এই সময়টুকুর মধ্যে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলি রীতিমত সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সুচরিতার জীবনে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। গোরার কারাদণ্ডের কয়েকদিন পূর্বে সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, "হারাণকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে যোগ দিবার জন্য সে মনকে কঠোরভাবে প্রস্তুত করিবে।" হারাণবাবুর প্রতি তাহার যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তাহা নহে,—ব্রাহ্মসমাজকে সুমুখে ধরিয়া এই বিবাহের মধ্যে সে একটা আত্মত্যাগের মহিমা খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এমন সময় গোরার কারাদণ্ডের সংবাদ তাহার এই কঠোর সঙ্কল্পের সুদৃঢ় দুর্গচূড়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গেল। হারাণকে বিবাহ করার কল্পনা পযন্ত তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই অন্তঃসারশূন্য, স্বার্থপর মানুষটির প্রকৃত স্বরূপ এই সময় তাহার নিকট এমন স্পষ্ট এবং নির্লজ্জ-ভাবে প্রকাশিত হইল যে, তাহাকে সহ্য করা সুচরিতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুচরিতা এখন হইতে তাহার আত্মসমাহিত শান্তভাব কাটাইয়া যেন সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। কি যেন একটা নূতন পরিবর্তন তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে। কারাগারবাসী গোরার জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ আত্মত্যাগের মহিমা তাহার পূর্বেকার বক্তৃতাগুলিকে যেন মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা আজ আর বক্তৃতামাত্র নয়, তাহারা আজ গোরার প্রত্যক্ষ জীবনের সহিত একাকার হইয়া গিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্বে হারাণবাবুর গতানুগতিক বক্তৃতা এবং উপদেশ আজ নিতান্ত প্রাণহীন, অন্তঃসারশূন্য এবং পঙ্গু বলিয়া মনে হইতেছে। এই সময় সুযোগ বুঝিয়া গ্রন্থকার সুচরিতার মাসী

হরিমোহিনীকে আনিয়া হাজির করিয়াছেন। হিন্দু ঘরের এই বিধবাটি অন্য সময় আসিলে সুচরিতার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিত না, আজ কারাবাসী গোরার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাবলী একটা অলৌকিক দীপ্তি লাভ করিয়া এই হিন্দু বিধবাটির আচার-বিচারের উপর পর্যন্ত একটা ঔজ্জ্বল্য আনিয়া দিয়াছে। সুচরিতার মনে হইতে লাগিল এই হিন্দু বিধবাটির আচার-নিষ্ঠার ভিতর দিয়া সে যেন গোরার স্পর্শ অনুভব করিতেছে। এই জন্য গোরার অনুপস্থিতিতে সে একান্ত করিয়া এই মাসীটিকে আশ্রয় করিয়াছিল এবং বরদাসুন্দরীর তরফ হইতে তাহার এই মাসীটির উপর যতই অত্যাচার আসিতে লাগিল, সে তত নিবিড় করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

"সুচরিতা তাহার মাসীর কাছে থাকিয়া এই সমস্ত আক্রমণ নীরবে সহ্য করিত। কেবল সেও যে তাহার মাসীর দলে, ইহাই সে যেন গায়ে পড়িয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত।"

ইহার ফলে পরেশ বাবুর সংসারে একটা রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংসারটি এখন আর বক্তৃতার সাজানো মঞ্চ মাত্র নহে, ইহা এখন প্রত্যক্ষ-জীবনের চঞ্চল কর্মক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে।

গোরার কারাদণ্ড ললিতার জীবনে একটা নূতন আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। গোরার প্রতি ললিতার কোনদিন শ্রদ্ধা ছিল না। এই উদ্ধত যুবকটিকে সে কোনদিন মনে মনে সহ্য করিতে পারিত না। এবং বিনয়ের প্রতি সে মনে মনে আকৃষ্ট হইলেও গোরার প্রতি বিনয়ের অন্ধ ভক্তিকে সে কোন দিন বরদাস্ত করিতে পারে নাই। গোরার কারাদণ্ডের পর তাহার প্রতি ললিতার এই মনোভাব সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত হইয়া গেল। সে বিনয়কে নিজ হইতেই যাচিয়া বলিল, "দেখুন, আপনার বন্ধু গৌরমোহন বাবুর প্রতি আমি মনে মনে বড়ো অবিচার করেছিলুম। তিনি বড়ো বেশি জোর দিয়ে কথা কইতেন, তাই দেখে আমার একটা রাগ হতে থাকত। কিন্তু গৌরমোহন বাবুর জোর কেবল পরের উপর নয়, সে তিনি নিজের উপরও খাটান,—এ সত্যিকারের জোর,—এ রকম মানুষ আমি দেখিনি।"

তাছাড়া গোরার কারাদণ্ড ললিতা ও বিনয়ের প্রচ্ছন্ন প্রীতির সম্বন্ধটিকে আরও স্পষ্ট এবং ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। কাহাকেও কিছু না জানাইয়া গুরুজনদিগের মত না লইয়া বিনয়ের সহিত ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় চলিয়া

আসার অবসরে এই দুইটি হৃদয় যেন অতি সহজেই পরস্পরের নৈকট্য লাভ করিতে পারিয়াছে।

বিনয় ও ললিতার এই ষ্টীমারযাত্রার কাহিনীটির উপর সুবিধামত রং চাপাইয়া চারিদিকে প্রচার করিয়া হারাণবাবু তাঁহার অপমানের শোধ তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে এই দুইটি যুবক-যুবতীকে লইয়া চারিদিকে একটা নিন্দা রটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বিনয় ও ললিতা তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে আরো বেশি করিয়া সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

এই ব্যাপার আত্মসমাহিত পরেশবাবুকে পর্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এই আন্দোলনের ঢেউ তাঁহার বিরাট চিত্তের শান্ত তটভূমিকে পর্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া গোরার কারাবাসের অবসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাস-খানিকে যথাসম্ভব প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন। বক্তৃতা ও তর্কবিতর্কের বদ্ধ কক্ষ ছাড়িয়া গ্রন্থখানি এখন মানবজীবনের কোলাহলমুখর রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার ফল হইয়াছে এই যে, কারামুক্ত হইয়া গোরা আর তাহার পূর্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সে জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—"তাহার চারিদিকে মানুষগুলি ঠিক আগের মত নাই। তাহারা আজ আর সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া তর্ক করিবার জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়, তাহারা প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তব সমস্যা লইয়া বিব্রত।"

তাহার নিজের মনও তার ভাবময় ধ্যানজগৎ হইতে প্রত্যক্ষ জগতে অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছে। সে এখন বক্তৃতা করে বটে, কিন্তু সে বক্তৃতা সুচরিতার কাছেই বেশি জমিয়া উঠে। পূর্বে সে তর্ক করিত অপরের মতকে নির্মমভাবে ধূলিসাৎ করিয়া নিজ মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। পাঁচজনের সহিত সে এখনও হয়ত সেই একই উদ্দেশ্য লইয়া তর্ক করে, কিন্তু সুচরিতার সহিত সে আজকাল তর্ক করে ইহাতে রস পায় বলিয়া। এই তর্কের মধ্যে পূর্বের সেই উদ্ধত জয়লিপ্সা নাই, আছে আত্মপ্রকাশের আনন্দ।

"এতদিন সে (গোরা) তাহার শ্রোতাদের কাছে, নিজের মধ্য হইতে কেবল বাক্যকে, মতকে, উপদেশকে বাহির করিয়া আসিয়াছে—আজ সুচরিতার সম্মুখে সে নিজের মধ্য হইতে নিজেকেই বাহির করিল। এই আত্মপ্রকাশের

আনন্দে, শুধু শক্তিতে নহে, একটা রসে তাহার সমস্ত মত ও সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।......এই আনন্দের আবেগেই গোরা কিছুই না ভাবিয়া কয়দিন প্রত্যহই সুচরিতার কাছে আসিয়াছে।"

এমনি করিয়া গোরার অলক্ষিতে তাহার অন্তস্তলবাসী সুপ্ত যৌবন ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়াছে, এবং এই নবজাগরণের পুলকানন্দ তাহার সমগ্র চেতনাকে ভিতরে ভিতরে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

এই নূতন চেতনা যে কত সত্য এবং ইহার মূলে যে তাহার যৌবনের স্বধর্ম কতখানি কাজ করিতেছে, তাহা সে সেই দিন জানিতে পারিল, যেদিন সুচরিতার মাসী তাহাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, সুচরিতার সহিত তাহার এই অবাধ মেলামেশা তিনি পছন্দ করেন না, এবং কোন হিন্দুনারীর পক্ষে ইহা বরদাস্ত করা অসম্ভব।

ইহার পর গোরা তাহার হৃদয়ের আল্গা গ্রন্থিগুলিকে আবার শক্ত করিয়া বাঁধিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। এবং সেই সাময়িক দুর্বলতাকে কাটাইয়া নিজেকে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

যে কঠোরতা, যে চিত্তসংযম, যে আত্মবিস্মৃতি একদিন তাহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক এবং সহজ ছিল, আজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য এবং কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। আজ এই সকলের মধ্যে আনন্দ নাই, আত্মপ্রসাদ নাই, আছে কেবল শুষ্ক কর্তব্যবোধের নীরস তাগিদ। এই কঠোরতাকে আজ আর সে মনে মনে চায় না, অথচ ইহার হাত হইতে আজ তাহার পরিত্রাণও নাই।

তাই যেদিন সে জানিতে পারিল, সে আইরিশের ছেলে, এবং যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মহিমা-গর্বে তাহার বুক সাতহাত হইয়া উঠিত, তাহার সহিত আজ আর তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সেদিন সে কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার চিত্তের গভীরতম প্রদেশ হইতে একটা মুক্তির নিশ্বাস আপনা হইতে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এই মুক্তিকেই সে ভিতরে ভিতরে চাহিতেছিল, কিন্তু এই মুক্তি-মন্দিরের প্রবেশদ্বার খুঁজিয়া পাইতেছিল না। আজ সহসা আপনা হইতেই সেই দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

(৪)

গোরার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই সুচরিতার কথা আপনা হইতেই মনে পড়িয়া যায়। গোরার সহিত বিনয় এবং আনন্দময়ীর সম্বন্ধও খুব ঘনিষ্ঠ, কিন্তু সুচরিতার মত এমন গভীর ভাবে গোরার চিত্তকে ইহারা কেহই নাড়া দিতে পারে নাই।

ব্রাহ্মপরিবারে প্রতিপালিতা এই শিক্ষিতা মেয়েটির চরিত্র গাম্ভীর্য এবং স্নিগ্ধতার সমাবেশে সত্যই অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। ঔপন্যাসিক চরিত্র-বিশ্লেষণের দিক হইতেও এই চরিত্রটির মূল্য আছে। নানা জটিল তর্কবিতর্ক, বক্তৃতা এবং আলোচনায় উপন্যাসখানি যখন নিতান্তই মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তখনও এই নারীচরিত্রটি সকলের অজ্ঞাতসারে আপনাকে ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

তাহার চরিত্রের মধ্যে কোথায় একটি স্বাভাবিক সংযম, স্থৈর্য এবং প্রশান্ত গভীরতা আছে বলিয়াই তাহাকে এত ধীরে ধীরে, এত সাবধানে, এত সন্তর্পণে একটু একটু করিয়া ফুটাইয়া তোলা লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে।

এই শ্রেণীর সহিষ্ণু, স্থিরবুদ্ধি, সংযত চরিত্রের নরনারীর মন এত ধীরে ধীরে কাজ করিতে থাকে, এবং ইহাদের মানসিক পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে যে, এই পরিবর্তনের প্রত্যেক ধাপটিকে আমরা গুণিয়া লইতে পারি। তাই এই চরিত্রটি যতই গভীর হউক না কেন, ইহাকে চিনিতে আমাদের একটুও কষ্ট হয় না। তাই তাহার চিন্তাশীলতা, তাহার ভাবুকতা, তাহার আদর্শপ্রিয়তা তাহাকে কোনদিন আমাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার চরিত্রে গভীরতা এবং সূক্ষ্ম মহিমার অভাব নাই, কিন্তু তাহা তাহাকে কোনদিন কাব্যের স্বপ্নলোকে উধাও করিয়া লইয়া যায় নাই, উপন্যাসের প্রত্যক্ষ জগতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

পুরুষদের তেজ এবং পৌরুষ নারীচিত্তকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট করে, এই ধারণাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন কোন নারীচরিত্রের মধ্য দিয়া রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলিকে আবার ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, উদাসীন পুরুষের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়।

সুচরিতা যে প্রথম দর্শনেই গোরার প্রতি সহসা এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার জন্ত গোরার তেজ এবং পৌরুষ যে অনেকখানি দায়ী, সে কথা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। পরে সে অবশ্য নিজেকে অনেকখানি সংযত করিয়াছিল এবং বিচারবুদ্ধির দ্বারা এই আকর্ষণের তীব্রতাকে কতকটা জোর করিয়া প্রশমিত করিয়াছিল।

এইখানেই সুচরিতা-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। তাহার শিক্ষাদীক্ষা, তাহার স্থির বিচারবুদ্ধি, তাহার শান্ত প্রকৃতি, এবং বিশেষ করিয়া তাহার চরিত্রের উপর পরেশবাবুর উদার এবং প্রশান্ত চিত্তের প্রভাব তাহাকে এই উদ্ধত-প্রকৃতির যুবকটির গোঁড়ামি এবং মত্ততার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিতে পারে নাই। তথাপি সে যে প্রথম দর্শনেই গোরার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার মূলে হয়ত গোরার পৌরুষ, তেজ এবং সবল ব্যক্তিত্ব অনেকখানি কাজ করিয়াছিল।

গ্রন্থকার সুচরিতার চরিত্র যেমন শান্ত, আত্মস্থ এবং ধৈর্যশীল করিয়া গড়িয়াছেন, তাহার মানসিক পরিবর্তনের ধারাকেও সেইরূপ মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন।

পরেশবাবুর শিক্ষাদীক্ষা তাহার চরিত্রের উপর যতটা কাজ করিয়াছিল, এই ব্রাহ্মপরিবারের আর কাহারও উপর ততটা কাজ করিতে পারে নাই। বলিতে গেলে সুচরিতা ছাড়া আর কেহই পরেশবাবুকে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সুচরিতা যে ব্রাহ্মসমাজকে খুব শ্রদ্ধা করিত তাহা নয়, সে পরেশবাবুকে শ্রদ্ধা করিত, এবং পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের একজন বলিয়াই সে ব্রাহ্মসমাজকে নিজের সমাজ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল।

এইরূপে গতানুগতিকভাবে তাহার জীবনের একঘেয়ে দিনগুলি নিরুদ্বেগে, অবাধে কাটিয়া যাইতেছিল, এমন সময় মূর্তিমান বিদ্রোহের মত গোরা আসিয়া তাহাদের সংসারে দেখা দিল।

তারপর হইতে আরম্ভ হইল সুচরিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিচারবুদ্ধি দিয়া সে বুঝিয়াছিল, গোরা যে সকল কথা এত জোর করিয়া বলে, তাহা সকল সময় সত্য নয়, কিন্তু তাহার সবল এবং সতেজ উক্তির মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব, যে নিষ্ঠা, যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা তাহাকে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট না করিয়া পারে নাই।

মানুষের শিক্ষাদীক্ষা এবং বিচারবুদ্ধি ছাড়াও যে একটা জিনিস আছে, তাহা সুচরিতার এতদিন জানা ছিল না;—গোরার সহিত সাক্ষাতের পর হইতে এই নূতন জিনিসটি সম্বন্ধে সে মনে মনে সচেতন হইয়া উঠিল। গোরার

মতের সহিত তাহার অন্তরের সত্যকার মিল না থাকিলেও এই তেজস্বী পুরুষটি যে তাহাকে ভিতরে ভিতরে একটু একটু করিয়া নিজের দিকে একটা অনিবার্য বেগে টানিয়া লইতেছে, এ সংবাদ সুচরিতার আত্মসচেতন মন ক্রমেই অনুভব করিতে পারিয়াছিল এবং তাহার পূর্বের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কারের প্রতি এবং বিশেষ করিয়া পরেশবাবুর প্রতি সে যে অবিচার করিতেছে, তাহাও সে ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

কর্তব্যবুদ্ধি এবং প্রেমের এই দ্বন্দ্বে একসময় কর্তব্যবুদ্ধিরই জয়ী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, এবং সে ঠিক করিয়াছিল ব্রাহ্ম পানুবাবুকে বিবাহ করিয়া সে সর্বান্তঃকরণে ব্রাহ্মসমাজের কাজে লাগিয়া যাইবে; কিন্তু তাহার এ সঙ্কল্প শেষ পর্যন্ত টিকিল না, অথবা গ্রন্থকার টিকিতে দিলেন না। তিনি এই সময় গোরাকে জেলে পাঠাইলেন, এবং গোরার এই স্বেচ্ছায় কারাবরণের মহিমোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া ঠিক তাহারই পার্শ্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃপাপ্রার্থী পানুবাবুর যে চিত্র অঙ্কিত করিলেন, তাহা যেমন মলিন, সেইরূপ বর্ণহীন।

যে ম্যাজিষ্ট্রেটের অবিচারের বিরুদ্ধে দুর্জয় তেজে প্রতিবাদ করিয়া গোরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিল, সেই ম্যাজিষ্ট্রেটকে তুষ্ট করিবার জন্য পানুবাবুর আগ্রহ এবং সাড়ম্বর আয়োজন শুধু সুচরিতাকেই নয়, ললিতাকে পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল।

সুচরিতা নিজের মনের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ঠিক করিয়াছিল—পরেশবাবুকেই সে মানিয়া চলিবে এবং পানুবাবুকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করিবে। গোরার কারাবরণের পর তাহার সে সঙ্কল্পের ভিত্তিমূল আল্‌গা হইয়া গেল।

ইহার পর হইতে পানুবাবুর নীচতা স্বার্থপরতা, এবং অভব্যতা এমন নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, তাহার পর এই লোকটির উপর কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। অতঃপর সে পরেশবাবুকে পর্যন্ত প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে অপমান এবং অপদস্থ করিতে পর্যন্ত ছাড়িল না। ফলে পানুবাবুর প্রতি একটা দারুণ ঘৃণায় সুচরিতার চিত্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিল এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও সে মনে মনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

সুচরিতা ব্রাহ্মসমাজকে যে এতদিন মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছিল, সে কেবল পরেশবাবুর জন্য। সেই ব্রাহ্মসমাজ যখন পরেশবাবুর নামে নানারূপ মিথ্যা

কুৎসা রটনা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল, তখন শুধু সুচরিতা নয়, ললিতাও তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না এবং এই সমাজের প্রতি তাহাদের পূর্ব শ্রদ্ধা একমুহূর্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সুচরিতা এবং ললিতাকে পরেশবাবু যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা কোন বিশেষ ধর্মসমাজের সহিত রফা করিবার শিক্ষা নয়, তাহা সত্যকে নিজের মধ্যে স্বাধীনভাবে উপলব্ধি করিবার শিক্ষা। ব্রাহ্মসমাজকে তাহারা ততদিন মানিয়া চলিয়াছে, যতদিন তাহা তাহাদের এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নাই।

এমনি করিয়া বাহিরের একটি প্রচণ্ড ধাক্কা সুচরিতাকে এক নিমেষে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে উদার সত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

ওদিকে আর একটি প্রচণ্ডতর ধাক্কা হিন্দুধর্মের অসংখ্য সংস্কারের কঠিন জাল ছিন্ন করিয়া গোরাকেও সেই একই স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল।

এমনি করিয়া দুইদিক হইতে দুইটি চিত্তস্রোত আসিয়া একই মহাসাগরে মিলিত হইল।

উপন্যাসখানির মধ্যে তর্ক, আলোচনা, এবং বক্তৃতার যতই আয়োজন থাকুক না কেন, ইহার প্রধান চরিত্রগুলির চরম পরিণতি আসিয়াছে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া, যুক্তি, তর্ক বা আলোচনার পথ ধরিয়া নয়।

শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম কোনটিই ধোপে টিকিল না; টিকিয়া রহিল শেষ পর্যন্ত উদার সত্য, যাহা সকল প্রকার সংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। এই সংস্কারমুক্ত, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ হইতেছেন পরেশবাবু। তাই গোরা এবং সুচরিতার মিলন হইল পরেশবাবুর চরণপ্রান্তে। তাই গ্রন্থকার এই দুইটি নরনারীকে মিলিত করিলেন ব্রাহ্ম-মন্দিরেও নয়, হিন্দুর বিবাহ-সভায়ও নয়, সত্যের দিগন্তপ্রসারী নীরব, শান্ত, উদার, মুক্ত প্রাঙ্গণে। তাই উপন্যাসখানির সকল আলোচনা ও তর্কবিতর্কের চাঞ্চল্য ও কলকোলাহল একটি বিরাট সমাধানের গাম্ভীর্যের মধ্যে আসিয়া শান্ত এবং নীরব হইয়া গিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(১)

প্রায় প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই এমন কতকগুলি গ্রন্থ আছে, যাহাদের গৌরব কখনও ম্লান হইবার নহে। অনন্ত মহাসাগর বা হিমাচলের মত তাহারা চিরনূতন, বিভিন্ন যুগ বা বিভিন্ন পাঠকের চক্ষে তাহাদের সৌন্দর্য একটা নূতনরূপে উদ্ভাসিত হয়। বারংবার পান করিলেও তৃপ্তি হয় না, বরং নূতন রকমের রসের আস্বাদ বা মাধুর্যের পরিচয় প্রতিবারেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থ যেন ক্ষণজন্মা, দৈবক্রমে একটা first fine careless rapture-এর মত অনন্ত সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের বিভূতি লইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। সমালোচনার বাক্‌জালে তাহারা ধরা দেয় না, যতই ব্যাখ্যা করা যাক, তবু মনে হয়, অনেক কথা বাকি রহিয়া গেল। ইহাদের বলা হয় 'ক্ল্যাসিক্‌স', ইহাদিগকে বাংলায় 'অমর গ্রন্থ' বলা যাইতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে খুব কম গ্রন্থই এই ক্ল্যাসিক্‌সের পর্যায়ে উঠিতে পারিয়াছে। 'গৌড়জন' বা বিশ্বজন 'যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' এই ধরণের গ্রন্থ বেশি নাই। আগেকার যুগে যাহাতে লোকে রসে ডগমগ হইত, তাহা এখনকার রুচিতে নীরস; যাহা এক দলের কাছে অতি উপাদেয়, তাহা আর এক দলের কাছে কৃত্রিম মনে হয়। শতাব্দীর পরিবর্তনে যাহার সৌন্দর্য নিষ্প্রভ হয় না, অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও যাহার অনন্ত বৈচিত্র্য অটুট থাকে, এ ধরণের গ্রন্থ খুব বেশি নাই। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ আছে, যাহাদের ক্ল্যাসিক্‌সের পর্যায়ভুক্ত করিতে না পারিলেও আমরা দীর্ঘকাল আদর করিয়া থাকি, যে পুস্তক পড়িতে বসিলেই কালগত রুচির পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের মানবীয় রস-প্রকৃতি পরিতৃপ্ত হয়। এ শ্রেণীর পুস্তকও বাংলায় খুব বেশি নাই। যে কয়খানি আছে, তাহার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-এর নাম করা যাইতে পারে।

(২)

হাসির বা হাস্যরসের স্বরূপ বা উপাদান কি, তাহা এখানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করিব না। সে চেষ্টা অনেক মনীষী করিয়াছেন, কিন্তু হাসির কোন 'ফর্মুলা' বা সূত্র এখন পর্যন্ত বাহির হইয়াছে বলিয়া জানি না। সুতরাং আর একবার সে চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ যাহাতে না হই, সে বিষয়ে সাবধান থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য হইবে। জীবতত্ত্ববিদ্ বলেন, হাসিতে জানে কেবল মানুষ, অন্য কোন জীব হাসিতে পারে না। স্মরণশক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনার পরিচয় ইতর প্রাণীর মধ্যেও পাওয়া যায়, কিন্তু হাসিই মানুষের নিজস্ব গৌরব। রক্তপিপাসু মানবহৃদয়ও সেই মতে সায় দেয়। ক্লাটন ব্রুক প্রভৃতি রসিক সমালোচকদের মতে হাস্যরস স্বর্গেও নাই, বিধাতাপুরুষের কাছেও ইহা অভিনব ও অদ্ভুত। ভোল্‌টেয়ারের ন্যায় হাস্যরসিক স্বর্গে গেলে স্বর্গবাসী সকলেই বিমূঢ় ও আশঙ্কিত হইয়া উঠিবে, স্বর্গের প্রকৃতি বদলাইয়া তাহা মানব-সুলভ রসে সঞ্জীবিত হইবে। এই পোড়া পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, বহু বিচিত্র রূপে হাস্যরস মানুষের জীবনে সংক্রামিত হইয়া আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ; হাসির জ্যোতি যখন বিজলির মত জ্বলিয়া উঠে, তখন "আঁধার হইবে আলা"। তখনই মাটির পৃথিবী সোনার সংসার হইবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে, রোজ এক ঘণ্টা করিয়া হাসিতে পারিলে কোন রোগ হইতে পারে না। আমরা সকলেই তাহা বুঝি ; হাসিতে পারিলে মনেরও যে কোন কালিমা থাকিতে পারে না, সমস্ত গ্লানি সমস্ত পাপ যে ধৌত হইয়া "আলো-ঝলমল" হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানুষ যখন হাসে তখনই সে সুন্দর—মহৎ। শিশু হাসে বলিয়াই সে সুন্দর ও নিষ্পাপ, ফলস্টাফ হাসির জন্যই কাপুরুষোচিত বা পাপযোচিত আচরণ করিয়াও সর্বজনপ্রিয় হইয়া নৈতিক বিচারের বহু ঊর্ধ্বে রহিয়া গিয়াছে।

হাস্যরসের যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কেন যে অদ্যাপি হয় নাই, তাহার একটা কারণ মনে হইতেছে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা যে মনোভাব লইয়া করিতে যাই, হাসি তাহারই প্রতিবাদ। যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাঁহার ধারণা যে সর্ব জিনিসেরই "তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" নহে, বিশ্বপ্রকৃতির লীলা-পারম্পর্যের মধ্যেই সব তত্ত্ব রহিয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু-

মাত্রেরই লক্ষ্য—সত্য, এবং সত্য মানেই—যাহা আছে। যাহা আছে তাহার কিম্বা প্রকৃতির, কিম্বা তথাকথিত সত্যের দাসত্ব হইতে আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় হাসি। সত্যময় জগৎ বিধাতার, আর হাস্যময় জগৎ মানুষের সৃষ্টি। ইহার মধ্যে হাস্যময় জগৎ যে উপাদেয় ও শ্রেষ্ঠ, সে মতে প্রতি মানবের অন্তরাত্মাই সায় দেয়। সেজন্যই কোন কোন ভক্ত বিধাতার গৌরব বাড়াইবার জন্য তাঁহাকেও হাস্যরসিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও বিধাতার হাস্য বা Irony of Fate খুব উঁচু দরের জিনিস নয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে, বিধাতা নিজের নিয়মে নিজেই শৃঙ্খলিত, কোন রকম হাসিই তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। হাস্যরস স্বভাবের বা প্রকৃতির নিয়মানুগ নহে, প্রকৃতির সামঞ্জস্য ও নিয়মকে ইহা তুচ্ছজ্ঞান করে বলিয়াই ইহার গৌরব। যাহা স্বাভাবিক বা নিয়মিত তাহা হাস্যকর নহে, সত্যকে অবলীলাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে বলিয়াই হাস্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব। ফল্‌স্টাফ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "as a truthcrusher he was unrivalled"—সত্যের গর্ব খর্ব করার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না, সেই জন্যই তাঁহার গৌরব। হাস্যরস সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথাই বলা যাইতে পারে। মানুষের আত্মার স্বাধীনতা, অনন্ত সৃষ্টির ক্ষমতা, তাহার ঐশ্বর্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সত্য বলিয়া একটা নিষ্ঠুর সংস্কার। "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" "কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার" বলিয়া আমরা হা-হুতাশ করি কেবলমাত্র সত্যের সংকীর্ণতার জন্য। এই বৈচিত্র্যহীন, অরুচিকর, সংকীর্ণ সত্যের হাত হইতে বাস্তবজীবনে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়—হাসি। যাহা হাস্যকর তাহাতে দেখি, স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, স্বভাবকে তাহা অতিক্রম করে বলিয়াই তাহাকে আমরা ভালবাসি। বাস্তবকে যখন মানুষের মুক্ত আত্মা পদদলিত করে, তখনই সে হাসিতে পারে। অবাস্তব কল্পনাই হাস্যরসের বাহন, হাস্যরসের মধ্যে আমরা পাই বাস্তবের বন্ধন হইতে একটা যথার্থ মুক্তির আস্বাদ। কবির ভাষা একটু বদলাইয়া বলিতে পারি, "হাস্যে তোমার মুক্তির রূপ হাস্যে তোমার মায়া, বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে হাস্যের ছায়া।" সুতরাং হাসির গান যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

(৩)

'হাসির গান'-এর হাসির কথা আলোচনা করার আগে ইহার গানের দিকটা একটু উল্লেখ করিতে চাই। এই কবিতাগুলি শুধু যে বাস্তবিক সঙ্গীতের ছাচেই রচিত এবং সুর তাল যোগে আবৃত্তির সম্পূর্ণ উপযোগী তাহা নয়। ইহাদের তাৎপর্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের রূপ ও রসের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। সাহিত্যে গীতিকবিতার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে; যে উপলব্ধি গীতিকবিতায় প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা অন্যবিধ রচনায় প্রকাশ করা যায় না। গীতিকবিতার আবেগ-বাহুল্য, উচ্ছ্বাস, ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে একান্ত তীব্রতা, ভাবের ঐক্য ও নিবিড়তা, অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত গুণই এই কবিতায় বর্তমান। 'হাসির গান'-এর মধ্যে ঘর-সংসারের সমাজের কথা অনেক আছে, কিন্তু ইহার আসল রস ইহার ব্যঞ্জনার মধ্যে, সকল কথার পিছনে ইহার সুগভীর ও নিবিড় আবেগের মধ্যে। চারুকলার মধ্যে সঙ্গীতেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, যে উপলব্ধি সঙ্গীতে প্রকাশ পায়, তাহা অন্য কলায় ব্যক্ত হইবার নহে। অনেকে বলেন যে, সঙ্গীত শুদ্ধ অনুভূতির ভাষা, এইজন্য ইহার আবেদন এত বহুবিস্তৃত। 'হাসির গান'-এর মধ্যেও সঙ্গীতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়; সকল সাংসারিকতা, সকল তর্কের পিছনে যে মানবপ্রাণ রহিয়াছে, তাহারই অস্ফুট বাণী এই সব গানের ধ্বনি-লোক সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার রস বিশেষরূপে ইহার সুরে, ইহার মূর্ছনায়। "হো—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কার্তিক গণপতি", "জীবনটা কিছু নাঃ", "সন্দেশ গজা বোঁদে মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া" প্রভৃতির অ-কার, ও-কার, বিসর্গের টান ও সুরের ভিতরেই ইহাদের ভিতরকার অনুভূতি ও আবেগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহাদের দিগন্ত-লক্ষ্য ইঙ্গিত সূচিত হইতেছে।

(৪)

এইবার ইহার হাসির কথা। বাল্যকাল হইতে অনেকবার এই হাসির গানগুলি পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, কিন্তু কোনবারই এই হাসির দীপ্তি অনুজ্জ্বল মনে হয় নাই, প্রতিবারই যেন নূতন করিয়া মনের ও প্রাণের মধ্যে সাড়া আনিয়াছে। অন্য সকলের কাছে ঠিক কি ভাবে এই হাসি আবেদন করিয়াছে

তাহা বলিতে পারি না; আমার নিজের কাছে এই হাসির সৌন্দর্য কি কি রূপে ধরা দিয়াছে, তাহাই এখানে বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম অল্পবয়সে যখন 'হাসির গান' পড়িয়াছি, তখন ইহার স্থূল রসটা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। হাস্যরসের নানা প্রকার ভেদ, নানা উপাদান আছে। অট্টহাস্য হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তের অতি সামান্য আকুঞ্চন পর্যন্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত। এক রকমের হাস্যরস আছে, তাহা অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্রের ন্যায়; তাহাকে ধরা ছোঁওয়া বা অনুভব করাই শক্ত। তাহা অনেক সময় যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোটেই নহে, কেবলমাত্র চিন্তা বা প্রণিধান সাপেক্ষ। লেখক ঠিক হাস্যরসের ইঙ্গিত করিতেছেন কিনা তাহাও বিশেষ বিবেচনা না করিলে বলা যায় না। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ন্যায় ইহা প্রায় চর্মচক্ষের অগোচর থাকিয়াও অনেক সময় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের বর্ণবিলাস সৃষ্টি করে। এই জাতীয় হাস্যরসের সৃষ্টির মধ্যে যথেষ্ট কলা-নৈপুণ্য থাকিলেও এক হিসাবে ইহাতে যেন একটু দুর্বলতা আছে বলিয়া মনে হয়। এই ধরণের হাসির আত্মা আছে, কিন্তু দেহ নাই; অশরীরী বাণীর মত ইহা ভাবুকের মনে অপূর্ব স্পন্দন আনিতে পারে, কিন্তু ইহাকে লইয়া ঘর করা চলে না। ইহা "ক্ষণিকের অতিথি"র মত "পথ বাহিয়া" "আলোক-যানে" চলিয়া যায়; ইহা সর্বদার জন্য নহে, এবং সকলের জন্যও নহে। ইহা বুদ্ধিকে স্পর্শ করে, কিন্তু প্রাণ মাতাইতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের উপকরণ এরূপ সূক্ষ্ম বা প্রণিধানসাপেক্ষ নয়। তাঁহার হাসি স্পষ্ট, উজ্জ্বল, গালভরা ও প্রাণখোলা। তাঁহার নিজের কথায় বলা যায় যে, তিনি হাসেন "জোরে, গুম্ফ ভোরে, ছেড়ে প্রাণের মায়া।" ইহার মধ্যে এমন সব উপাদান রহিয়াছে, যাহা শিশু বৃদ্ধ, সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মনেই অবিলম্বে একটা সাড়া আনিতে পারে। ইহাতে ভাষা ও কল্পনার চটুলতা, রঙ-তামাসা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মসকরা, প্রহসন, এমন কি সঙ ও ভাঁড়ামির যোগ্য উপকরণ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। তিনি রামবনবাসের পালায় "সকাল-সন্ধ্যা চা-বিস্কুটে"র কথা অবতারণা করিতে, কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদে "সাবান-মাখা"র কথা তুলিতে কিংবা তান্‌সেনের কথা উপলক্ষে "তাধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি…মেঁও এঁও" করিয়া কোরাস গাহিতে সঙ্কুচিত নহেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অতি শক্তিমান শিল্পীর হাতে পড়িয়া এই সমস্তই উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার উপাদানীভূত হইয়া গিয়াছে। যদিও চার্লস ল্যাম্ব ও

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় রস ঠিক এক নয়, তবুও ল্যাম্বের রচনাতেও স্থূল রসিকতার উপাদানকে উচ্চ শিল্পকলার অবলম্বনস্বরূপে ব্যবহার করার অনুরূপ কৌশল দেখা যায়। একটা প্রবল বিচার-শক্তি এবং একটা উদার সহানুভূতির যাদু-স্পর্শে এই সমস্ত স্থূল উপাদানই উচ্চ-সাহিত্যের অলঙ্কার হইয়াছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও একটা নিজস্ব গুণ ইহার মধ্যে আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের স্থূল রসিকতার মধ্যেই যে একটা বেপরোয়া ভাব, একটা অসংকুচিত প্রাণবন্ত স্ফূর্তির রস আছে, তাহা তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর এমন করিয়া প্রাণভরা মজার কাব্য লিখিতে কেহ সাহস করে নাই। মজা বা আমোদ জিনিসটাই বাঙালীর জীবনে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আরও দুঃখের বিষয়, এই জিনিসটাই যেন মার্জিত সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া উঠিয়াছে, হো-হো করিয়া হাসার ক্ষমতাই কমিয়া গিয়াছে। জীবনে সহজ ও সরস আমোদ কি ভাবে পাইতে হয়, ইতরতা হইতে একান্ত দূরে থাকিয়াও কি ভাবে জীবনে রঙদার স্ফূর্তি ও মজা করা যায়, তাহা সাহিত্যে ফুটাইতে দ্বিজেন্দ্র-লালের মতন আর কোন আধুনিক কবি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের জগতে একটা প্রাণমাতানো নিত্য উৎসব লাগিয়া আছে, তাহা Walpurgis Night-এর স্ফূর্তির আবিলতা হইতে মুক্ত অথচ প্রোজ্জ্বল। সে জগতে আমরা সংসারিকতার দীনতা, হীনতা ও সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির আনন্দ পাই, Puck-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচার-বুদ্ধি লইয়াও Puck-এর ন্যায় আনন্দে বিচরণ করি। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার ইহা সামান্য দান নয়।

(৫)

তাহার পর আর একটু বেশি বয়সে ভাল লাগিত এই হাসির গানগুলির মহৎ, উদার, নির্ভীক আদর্শনিষ্ঠা। ইহাদের সমস্ত রঙতামাসার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের একটা দীপ্ত আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং এই গানগুলিকে সাহিত্যের উচ্চ আসন স্থান দিয়াছে। সমাজে ও চরিত্রে যেখানে যেখানে যে গলদ আছে, যে ন্যাকামি ও ভণ্ডামি সত্যের মুখোস পরিয়া সত্যের অপলাপ করিতেছে, যে মোহ ও আত্মবঞ্চনা একান্তভাবে আমাদের চিত্তকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই দ্বিজেন্দ্রলালের উজ্জ্বল হাস্যে প্রকট

হইয়া ধরা পড়িয়াছে। বিলাতফেরতার দল, Reformed Hindoos, চম্পটির দল, নবকুলকামিনী সম্প্রদায়—কেহই তাঁহার বিদ্রূপের কশাঘাত হইতে রক্ষা পায় নাই; সৌখিন দেশসেবক, আত্মম্ভরী কবি, ধর্মত্যাগী ভোগী, কপট ধর্মব্যবসায়ী, অত্যাচারী শাসক, চতুর বিজ্ঞাপনদাতা—সকলেই তাঁহার ব্যঙ্গের লক্ষ্যভূত হইয়াছে। অনেক সময়ই দেখা যায়, তিনি সমাজের নূতনপন্থীদের মধ্যে যে সমস্ত চাল, ফাঁকি, ধাপ্পাবাজি, অসঙ্গতি আছে তাহাই বিশেষ করিয়া প্রকট করিয়াছেন; কিন্তু পুরাতনও বাদ যায় নাই, তাহাদের অন্তর্নিহিত মিথ্যা, অন্যায়ও তিনি বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। কখন কখন তিনি আধুনিক বাঙালী সমাজের দুর্বলতা নয়, মনুষ্য-প্রকৃতির অনেক মজ্জাগত দোষ—যেমন বৃথা দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদির উপর শাণিত ব্যঙ্গের আঘাত করিয়াছেন। কাপুরুষতা এবং সাংসারিক সুবিধাবাদ মানুষকে কত হীন করিতে পারে,[১] এবং এই হীনতা কিরূপে তথাকথিত ধার্মিকতার মুখোস পরিয়া মানুষকে আত্মবঞ্চনায় প্রতারিত করিতে পারে,[২] তাহাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। এক জায়গায়[৩] তিনি সামাজিক ভণ্ডামি ও আত্মবঞ্চনা উভয়কেই একযোগে বিদ্রূপবিদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কবিতায় তিনি তাঁহার কলাকৌশলের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেক সময় তিনি আজগুবি ভাবপ্রবণতার বিপক্ষে বিদ্রূপের কশা ধারণ করিয়াছেন। প্রেম[৪], প্রাকৃতিক সৌন্দর্য[৫], বিদেশ[৬] ইত্যাদি সম্পর্কে যে মিথ্যা ও অলীক ভাবপ্রবণতা সচরাচর চলতি আছে, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে অসহ্য ছিল।

এই সমস্ত কবিতায় শুধু সংস্কারকে কশাঘাত নহে, যথার্থ সাহিত্যস্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টি ও শিল্প আছে। নন্দলালকে তিনি ব্যঙ্গ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া সহানুভূতি দিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে আমাদের প্রায় প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বিদ্রূপে তীক্ষ্ণতা আছে, জ্বালাও আছে, কিন্তু তাহার চেয়েও আছে একটা অপরূপ শিল্প, যাহার ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানব-আত্মার ও বিশ্বের রহস্যের একটা তরঙ্গ। হাসিতে হাসিতে মাথা-ধরার একটা কথা আছে; দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে সমস্ত বিদ্রূপ ও

(১) জিজিয়া, ক্রুসেড। (২) গীতা। (৩) চণ্ডীচরণ (৪) বিরহযাপন। (৫) বসন্ত বর্ণনা। (৬) বিলেত।

সমালোচনার ভিতর দিয়া প্রকট হইয়া উঠিতেছে একটা অনন্ত রহস্যের আভাস ও বিশ্বনৃত্যের একটা অনির্বচনীয় ছন্দের স্পন্দন। হঠাৎ যেন মনে হয়, গণ্ডূষ-জলমাত্রে ফরফর করিতে করিতে আমাদের অজ্ঞাতে গভীর জলে আসিয়া পড়িয়াছি, সেখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আর আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইতেছে না।

যে আদর্শনিষ্ঠা এই গানগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্র-লালের অন্যান্য রচনার আদর্শবাদের ঐক্য আছে। একান্ত সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রের ঋজুতা ও দৃঢ়তা, মানুষের সাধারণ সুখদুঃখের জন্য একান্ত দরদ—এইগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের মতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি কল্পনাপ্রবণতা, ভাববিলাস মাত্রকে পছন্দ করিতেন না, পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ করিয়া পুরুষের মত সংসারের কর্তব্য সাধন করা—ইহাই ছিল তাঁহার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই আদর্শকে আপাতত অতি সাধারণ মনে হইতে পারে, অতি সূক্ষ্ম ভাবুকতা ও উচ্ছ্বাসের চেয়ে এই আদর্শই চরিত্রে ফুটাইয়া তোলা বোধ হয় শক্ত। ন্যায়বিচার, সত্য, সহানুভূতি ও কাণ্ডজ্ঞান—এই চারিটি স্তম্ভের উপর দ্বিজেন্দ্র-লাল তাঁহার আদর্শ জগৎ গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছেন; কিন্তু বাস্তব সংসার ও এই জগতের মধ্যে কত পার্থক্য! সংসারের দিকে চাহিলে মনে হয়, এ যেন দুর্লক্ষ্য একটা লক্ষ্য, তাহার জন্য একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, তাহার অভাবের জন্য বিষাদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই আদর্শ এত দুর্লভ বলিয়াই অনেক সময় দরদী দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপের সহিত একটা সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, এমন কি প্রশ্রয়শীলতা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যই যে সব "ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে", তাহাতে তিনি আত্মহারা পাগলপারা না হইয়া শুধু প্রাণ ভরিয়া হাসেন। তাঁহার তীব্র অনুভূতি ও ঐকান্তিক আদর্শপ্রীতির সহিত একটা স্থিরমতিত্ব এবং সুবিবেচনা আনিয়াছে তাঁহার হাসি।

(৬)

ইহার পর মনে হইত, যেন এই হাসির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছে, কণ্ঠ বাষ্পনিরুদ্ধ হইতেছে। প্রথম বিয়ে হওয়ার পর যে প্রণয়ী খাম্বাজের সঙ্গে বেহাগ মিশাইয়া 'বাহা বাহা রে' বলিয়া গাহিয়া উঠিয়াছিল,

তাহার মোহভঙ্গের ইতিহাস পড়িয়া হাসিয়াছি। কিন্তু হাসিতে হাসিতে যখন শেষটায় পড়ি, "বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন, রচেছিলাম যাহারে", তখন হঠাৎ হাসি বন্ধ হইয়া যায়, চমকিয়া উঠিয়া ভাবি, কি ভুলই করিয়াছি? এ যে বাইবেলের কাহিনীর মত করুণ, 'প্যারাডাইস লস্টে'র ইতিহাস, এ যে মানব-হৃদয়ের নিত্য সনাতন ট্র্যাজেডির বৃত্তান্ত। তখন মনে হইল, এগুলি হাসির গান, না কান্নার গান? তখন দেখিলাম যে, এই হাসির তাৎপর্য অতি গভীর করুণরস। 'বিষ্যুৎবারের বারবেলায়' যে হতভাগ্য জন্মিয়াছিল, তাহার দুর্ভাগ্যের কারণ-নির্দেশটা হাস্যকর হইতে পারে, কিন্তু যে হাসিটুকু দিয়া শুধু অকারণে জীবন ভরিয়া অসহায়ভাবে লাঞ্ছনাভোগের যে অবিচ্ছিন্ন তিক্ততা আছে, তাহা একটু চাপা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এই লাঞ্ছনা মানব-জীবনের করুণতম রহস্য, ইহাই বহু কবি ও ঔপন্যাসিকের লেখনীকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে, সত্য সত্যই এ সংসারে "প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত" হইতেছে ও হইবেই; মনে হয়, "হায় রে সংসার সবই অসার, বিধির মহা চুক্" এবং এখানে যে "কুমীর ধর্লে ছাড়ে তবু ধর্লে ছাড়ে না স্ত্রী"—ইহা জীবনের অন্যতম করুণ সত্য। জীবনে যেটুকু সৌন্দর্য ছিল, তাহাও "যায় যায় যায়"; "ভোলানাথও" আজ "চিৎ" হইয়া পড়িয়া গেছেন, "চৌরাশী নরকের, সপ্ত স্বরগের" সঙ্গে "গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা"ও চলিয়া গিয়াছে, এখন "ডারুইন, মিল", "জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া" প্রভৃতি অসুন্দর গন্ধময় আবর্জনায় জীবন ভরিয়া উঠিতেছে। যে ধর্মভণ্ড সুবিধামত মত বদলাইতে বদলাইতে শেষটা "Theosophyর গর্তে" পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি বিদ্রূপটা খুবই উপভোগ করিতাম, কিন্তু শেষে যখন দেখি বেচারা "Anne ও বেদাঙ্গ" প্রায় মিশাইয়া আনিয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ "ভবলীলা সাঙ্গ" হওয়াতে তাহার সমস্ত পরিকল্পনা ভস্মসাৎ হইয়া গেল, তখন মনে হয় যে, বিদ্রূপের বাণ আমার এবং প্রতি মানবের বক্ষে আসিয়া বিদ্ধ হইতেছে। আমরা সকলেই কি ঠিক ঐ কাজই জীবন ভরিয়া করি না? ঐ ভাবেই ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া জীবনের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটা সুখের স্বর্গ গড়ার চেষ্টা করি না? এবং ঠিক ঐ ভাবেই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়া, জীবনের সমস্ত আশা অপূর্ণ রাখিয়া, জগৎ-রহস্যের কোন কূলকিনারা না পাইয়া হঠাৎ একদিন বুদ্বুদের মত শূন্যে মিশিয়া যাই না? মতামত সমস্তই জীবনের খোসার মত, নির্মোকের মত,

মানুষ সর্বদাই তাহাকে ত্যাগ করিতেছে এবং নূতন মত গজাইতেছে, এই পরিবর্তন মানুষের প্রাণশক্তির লীলারই পরিচয় মাত্র। অবস্থাচক্রে পড়িয়া আমরা এ দলে সে দলে ঢুকি, এ মত সে মত গ্রহণ করি, কিন্তু সে সমস্তই "বাহ্য"। আমরা সকলেই মানুষ, "নন্দলালে"র মত আমরা সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চাই—এইটাই জীবনের প্রধান কথা। "এ ভবে রাজা প্রজা সবাই সমান, দেখলে একটু ভিতরে ঢুকে", আসলে প্রবৃত্তির দিক দিয়া মানুষে মানুষে প্রভেদ খুব কম। তখন দেখি ভণ্ডামি ও বোকামির পিছনে রহিয়াছে চিরন্তন মানবাত্মা, সে আত্মা শিশুর মত অসহায় ও সরল, একটু কৃত্রিম বা খাটি আনন্দ, সৌন্দর্য, উল্লাস দিয়া খেলাঘর সাজাইতে সর্বদা ব্যস্ত। সেই খেলাঘর বিধাতার নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া যাইতেছে, সেই জন্যই মানুষের চিরন্তন ক্রন্দন। এই ক্রন্দনের রোল 'হাসির গানের প্রতি মূর্ছনায় ও ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছে।

(৭)

অনেক সাহিত্যশিল্পী এইখানেই আসিয়া থামিয়া যান, মানব-জীবনে ব্যর্থতার ক্রন্দনই তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টির শেষ কথা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যে ইহাই চরম তত্ত্ব নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, হাসি ও কান্না পরস্পর জড়িত, একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। সাংসারে যাহা করুণ তাহাই হাস্যাস্পদ, কিন্তু তাহাই মানবসুলভ। কিন্তু তাই বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক দার্শনিক ও সাহিত্যিকের মত একেবারেই দুঃখবাদী বা অবিশ্বাসী হইয়া যান নাই। 'হাসির গানে'র মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের যে বাণী ধ্বনিত হইতেছে, সে বাণী আমাদের আশ্বাস দেয় যে, মানুষের জীবন একেবারে নিরর্থক নহে, যদিও সেই অর্থ ব্যাখ্যা করা মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে মানুষ এই ভাবেই চিরদিন চলিয়াছে ও চলিবে, তাহাতেই মানব-জীবনের যাহা কিছু বৈচিত্র্য, আনন্দ ও সার্থকতা। উঠিতে পড়িতে আঘাত খাইয়া ভুল করিতে করিতে চলাই মানব-জীবনে একমাত্র সম্ভব। এই জন্য জীবনযাত্রার রীতিতে তিনি একটা উৎকট আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন, ওমর খৈয়ামের মত সব ভাঙিয়া চুরিয়া হৃদয়ের ছাপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী নহেন। মোটের উপর তাঁহার কাছে "বাহবা

ছুনিয়া কি মজাদার রঙীন"। ছুনিয়ায় যে নানা বৈচিত্র্য, নানা রঙ ও রঙ্গ আছে, এবং সেই জন্য এখানে দুশো মজা আছে, তাহাই যথেষ্ট। বরং অনেক হিসাবে তিনি রক্ষণশীল, আপোষে কাজ চালাইবার পক্ষপাতী। "যেমনটি চাই, তেমন হয় না" তাহা তিনি জানেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার "আসে যায় নাক অধিক"; বাস্তবের সহিত রফায় রাজি না হইলে যে জীবন চলে না, তাহ তিনি বেশ জানেন, এবং তদনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে সর্বদাই প্রস্তুত এই জন্যই তিনি জীবনের সব ক্রটি জানিয়াও প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রায়-নির্বিকার মনোভাব খুব উদ্দীপক মনে না হইতে পারে। অবশ্য সিদ্ধপুরুষের সে উৎসাহ-দীপ্ত বাণী 'On to the city of God'—তাহা এখানে নাই। মানব-হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যথা আকাঙ্ক্ষা লইয়াই কবির কারবার, তাঁহার পক্ষে এ কথা বলা খুবই শক্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল গোঁজামিল কোথাও ভালবাসিতেন না, গালভরা তত্ত্বকথা শুনাইবার লোভে তাঁহার কাব্যের খাঁটি সত্যে জল মিশাইতেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে করিয়াছিল দুর্জ্ঞেয়বাদী। জীবনের রহস্যের তিনি কূল-কিনারা পান নাই, জীবন তাঁহার কাছে সুখ-দুঃখের একটা সংমিশ্রণ মাত্র, "শুধু একটা ইঃ, আর একটা উঃ, আর একটা আঃ"। ফলে তাঁহার কাব্যে পাই একটা higher Epicureanism। তাই তাঁহার উপদেশ —

"খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙে ফুকে॥
এক রকম যাচ্ছে যদি যাক না কেটে।
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে॥
আছিস তুই পেঁচার মতন বসে কেটা।
যাচ্ছিস কে উড়িয়ে ধূলো? যা না বেটা॥
দুদিনে ভবের মজা ভবের লেঠা যাবে চুকে,
বাহবা! মজাদারি! বলিহারি!
বোম্ ভোলানাথ কপাল ঠুকে।

কপাল ঠুকিয়া বোম্ ভোলানাথ করিয়া জীবন যাপন করাই একমাত্র সদ্বুদ্ধি বুঝিয়া তিনি বলেন—

"মোদের দিও নাক কেউ গালি, মোদের করো নাক কেউ মানা ;
আমরা খাব নাকো চুরি করে দুগ্ধ, ননী, ছানা ,
শুধু লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ,
শুধু নাচিব একটু, গাইব একটু আমরা পাঁচটি এয়ার।"

Ecclesiastes-এর বাণীর প্রতিধ্বনি যেন এখানে পাওয়া যায়।

(৮)

'হাসির গান'-এ যে criticism of life—জীবনের যে নিকষণ বা পর্যালোচনা আছে, তাহার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু আর এক দিক দিয়াও ইহার বিশেষত্ব আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে 'হাসির গানে'র হাস্যরস মানুষের সুগোপন ব্যথা ও নৈরাশ্যকে রূপান্তরিত করিয়া বিশুদ্ধ রঙ্গরসে পরিণত করিয়াছে। এই রসানুভূতি আমাদের সুখ দুঃখের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বন্ধন হইতে আমাদের মুক্তি দেয়। যেমন অহৈতুকী প্রীতি আছে, তদ্রূপ একটা অহৈতুক রসের আস্বাদ দেয়, মনোজগৎ হইতে বুদ্ধিজগতে আমাদের উন্নয়ন করে, বৈষম্য ও অসঙ্গতি দেখিলেই তাহার উপর অট্টহাস্যের বাণবর্ষণ করিতে শিক্ষা দেয়, হউক না সেই বৈষম্য ও অসঙ্গতি আমাদের জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। "শুদ্ধা ভক্তি"র ন্যায় ইহা একপ্রকার "শুদ্ধা" রসিকতা। ইহার কাছে "নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি আর টপ্পার সুরে হরিনাম" হইতে "জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা" ও "গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম" প্রভৃতি তুল্যমূল্য ও উপাদেয়। কখনও কখনও এই "শুদ্ধা" রসিকতা জীবন ও সৃষ্টির অসঙ্গতির সমালোচনা হইতে বিরত থাকিয়া বরং এই অসঙ্গতির মধ্যেও আনন্দ পায়। "বিলাতফের্তা টানছে হুকা, সিগ্রেট টানছে ভশ্চায্যি" কিম্বা "আলোর চাইতে আঁধার বেশী, স্থলের চাইতে সিন্ধু" ইত্যাদি অসঙ্গতিই কৌতুক উৎপাদন করে।

কখনও কখনও এই রসিকতা কেবলমাত্র জীবনের তরঙ্গদোলাতেই আনন্দ পায় ; ইহার কাছে একের পিঠে দুই বারো, দুই আর একে তিন, এবং "হাতির উপর হাওদা আবার ঘোড়ার উপর জিন" সবই সমান বিস্ময়কর ও পুলকবহ। আবার কোন কোন সময়ে ইহা বাস্তব ও সৃষ্টিকে ছাড়াইয়া উঠিতে চায়, "নতুন

কিছু করো” বলিয়া লাফাইয়া উঠে ; অসম্ভব অকল্পিতপূর্ব এবং আমাদের হিসাবে অসঙ্গত অবস্থা-সমাবেশ কল্পনা করিয়া স্বষ্টিছাড়া একটা নূতন রসলোক স্বষ্টি করে। এই শুদ্ধা রসিকতা এবং এই অভিনব রসস্বষ্টির ক্ষমতাতেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

(৯)

‘হাসির গান’-এর ছন্দ, ভাষা ও রচনারীতির মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলালের একটা নিজস্ব গৌরব ও শক্তিমত্তার প্রকাশ দেখা যায়। সকল বড় কাব্যই বোধ হয় মিনার্ভা দেবীর মত সহজাত আভরণ লইয়া জন্মায়, একটা বিশিষ্ট ছন্দ ও রীতির মধ্যে ইহার ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করে। হাসির গানের মধ্যেও এই বিশেষত্ব আছে। একটা অসঙ্কুচিত দুঃসাহস, সনাতন প্রথাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া লঘু গুরুর যথেচ্ছ সংমিশ্রণ, একটা স্বেচ্ছাবিহারী মুক্ত লঘুতা সব দিক দিয়া এখানে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার ভাষার এবং অর্থের অলঙ্কার অনেক দিক দিয়া অপূর্ব। বিলাতী অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে condensed sentence—যথা “চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে” (গীতা) - anticlimax [যথা— শশধর, Huxley & goose] প্রভৃতি অনেকগুলি অলঙ্কার আমদানি করিয়াছেন। যেখানে উপমা প্রভৃতি প্রাচীন অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানেও একটা দুঃসাহসিকতা দেখা যায়, যথা, “যেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে, যেমন গরু টানে গরুর গাড়ী।” গুম্ফ ভরিয়া হাসা প্রভৃতিতেও একটা চমৎকারিত্ব আছে। মাঝে মাঝে তিনি সাময়িক প্রয়োজনার্থ একটা অদ্ভুত শব্দ স্বষ্টি করিয়া তাহাকে হাস্যের তরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়াছেন, যেমন “রঙ্গালয়ে ছাত্রগুলো কর্ছে কোকেন চর্বনাশ।” গুরুচণ্ডালিত্ব পরিহারের সমস্ত নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া সাধু শব্দের সহিত গ্রাম্য শব্দ, সুপ্রচলিতের সহিত অপ্রচলিত, সহজের সহিত উৎকট, বাংলার সহিত ইংরেজী মিশাইয়া তিনি অপূর্ব এক ভুনি-খিচুড়ি স্বষ্টি করিয়াছেন, যাহার স্বাদ ও গন্ধ সাহিত্যের ভোজে অতুলনীয়। ‘হাসির গান’-এর রচনা রীতিতে মাধুর্য, প্রসাদ, লালিত্য, সারল্য প্রভৃতি চিরাচরিত কোন গুণ নাই। কিন্তু নির্গুণ মহাদেবের মত নিজের বিভূতিতে ইহা সব গুণের উপর উঠিয়াছে। ইহার ছন্দও লঘু ও ক্ষিপ্র ; বরাবর স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে ইহা রচিত, এই হাল্কা ছন্দের ভিতর দিয়া তিনি অতি গভীর

অনুভূতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, "টপ্পার সুরে হরিনাম" গাহিয়া কৃতকার্য হওয়ার দাবি তিনি করিতে পারেন। কিন্তু সর্বত্র এই ছন্দের নিয়মও রক্ষা করেন নাই ; দুই চারিটা "স্খলন, পতন, ত্রুটি", মাত্রাধিক্য ইত্যাদি এখানে সেখানে আছে, কিন্তু তাহাতে কাব্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বর্ষায় বেগবতী নদী যেমন কূল ছাপাইয়া ছড়াইয়া পড়ে, দুই তীরের শাসন মানে না, অথচ তাহার গতির তাল ভঙ্গ হয় না, দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-এ ছন্দ ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে।

(১০)

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা যে একেবারে সর্বতোমুখী ছিল, তাহা বলা যায় না। তিনি বাংলা নাটকের ও বাংলা গানে একটা নূতন স্রোত আনিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিক দিয়া তাঁহার প্রভাব সাময়িক মাত্র। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হইতে গেলে যে ব্যাপকভাবে জীবনের উপলব্ধি থাকার এবং তাহাকে সুস্পষ্টভাবে ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে জীবনের ছন্দ বজায় রাখিয়া নানা বিচিত্র কথায় ও কাজে ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা থাকা দরকার, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল না। আসলে তাঁহার প্রতিভা ছিল গীতিকাব্যের উপযুক্ত প্রতিভা, আকুল মানবচিত্তের ঝঙ্কার-প্রকাশের প্রতিভা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল শুদ্ধ ভাবের আকাশে উড্ডীন হইতে পারিতেন না। যেখানে তিনি সে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার গান যেন ফাঁপা বলিয়া মনে হয়। জীবনের স্থূল সত্য সম্বন্ধে তিনি একান্ত সচেতন ছিলেন। এই স্থূল সত্যের কোথায় কোন্ ফাঁক আছে, ইহার ওপারে কি অতলস্পর্শ গহ্বর আছে, তাহা তিনি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। আকুল অনুভূতি লইয়া কঠোর সত্যের সমস্ত ফাঁকি ধরাইয়া দেওয়া—এই বিষয়ে ছিল তাঁহার যথার্থ প্রতিভা, অন্যান্য রচনায় তাঁহার এই প্রতিভার কোন কোন দিক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার যথার্থ পরিচয় পাই 'হাসির গান'-এ।

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, এই প্রতিভার দান বঙ্গদেশ সম্যক গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রত্যেক বড় সাহিত্যিক তাঁহার দেশকে ও যুগকে একটা নূতন সম্পদ দান করিয়া যান, সেই দেশের ও যুগের চিন্তাধারা ও ভাবস্রোতের সহিত তাহারা অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের, মধুসূদনের, রবীন্দ্রনাথের,

শরৎচন্দ্রের দান বাঙ্গালীর মনোজগতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সস্তা উচ্ছ্বাস-সর্বস্ব নাটক ও গানের প্রভাব বাংলা দেশে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু এই অমূল্য হাসির গানগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ইহারা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহাদের যোগ্য বা অযোগ্য অনুকরণ বিশেষ কিছু হয় নাই, ইহা বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর জীবনে একটা রচনা বা অনুভূতির পদ্ধতি বা ধারা আনিতে পারে নাই; কেন? আমরা কি অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ভাববিলাসী? আমরা কি কাঁদিতে জানি, হাসিতে জানি না? স্থূল সত্যের স্থূলতা কি আমাদের পীড়িত করে? জগৎরহস্যকে রহস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কি আমাদের বাধে, একটা সদ্য সমাধান না হইলে কি আমাদের চলে না? অপ্রীতিকর সত্যের ধারণা করার মত পৌরুষ, আধ্যাত্মিক বলিষ্ঠতা কি আমাদের নাই? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখানে শক্ত। কিন্তু মনে হয়, 'হাসির-গান'-এর দান যদি বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে পারিত, তবে সে অনেক বিড়ম্বনা ও মিথ্যা হইতে রক্ষা পাইত। তাহা হইলে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির রুচি ও প্রকৃতি অনেক দিক দিয়া বদলাইয়া যাইত।

তৃতীয় খণ্ড

তুলনামূলক ও প্রাচীন সাহিত্য-বিচার

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুলা বড় বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্মাণ করে। মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে, তাহাই কবির কল্পনা, আর গোঁজা-মিলন দিবার কল্পনা, না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার, না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিল্‌টি করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা। যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন, তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি। কারণ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাহাকে দশ কথা বলিতে হয়, আর যিনি সত্য বলেন, তাঁহাকে এক কথার বেশী বলিতে হয় না। তেমনি যিনি অনুভব করিয়া বলেন তিনি দুটি কথা বলেন, আর যে অনুভব না করিয়া বলে সে পাঁচ কথা বলে অথচ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়; সকলের প্রাণের মধ্যেই যে ব্যক্তি আতিথ্য পায়, ফুল বল, মেঘ বল, দুঃখী বল, সুখী বল, সকলের প্রাণের মধ্যেই যাহার আসন আছে, সেই তাহা পারে। আর বড় বড় কথার মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা সহজ, কারণ প্রাণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও তাহা পারা যায়। বড় বড় কবির কবিতা অনেকের পক্ষে কুহেলিকাময়ী কেন? কারণ তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, অধিক বকিয়া যে তাহা সহজ করিতে হইবে ইহা তাঁহাদের মনেও হয় না, এবং তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা সকলে অনুভব করে নাই; কাজেই সকলের কাছে তাঁহাদের সে সহজ কথা নিতান্ত শক্ত হইয়া পড়ে। সহজ কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই শক্ত। সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমস্তটা বলে না; পাঠকদিগকে কবি হইবার পথ দেখাইয়া দেয়, যে

দিকে কল্পনা ছুটাইতে হইবে, সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেয় মাত্র, আর অধিক কিছু করে না। নিজে যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, পাঠকদিগকেও তাহাই আবিষ্কার করাইয়া দেয়। যাহাদের কল্পনা কম, যাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হয়, তাহারা এরূপ কবিতার পাঠক নহে।

আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। দুই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের কথা পরিস্ফুট হইবে।

"এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে ?
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে।
সই কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে।
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু,
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে,
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে !"

রাধা শ্যামকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে !"

কিন্তু তাহার পরেই যে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া সখীদের ডাকিয়া কহিলেন,—

"সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে।"

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই। প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটি কোথায়? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা' কহিল, তাহা ত সামান্য, কিন্তু রাধা যা' কহিল না তাহা কতখানি! যাহা বলা হইল না পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গ ভঙ্গ, এই উত্থানপতন, কত অল্প কথায় কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই ছত্রে আবার সুখ। রাধা হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল, শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে, আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়,
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়!
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।"

"আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক্ সে।"—এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে। রাধা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর অভিশাপ খুঁজিয়া পাইল না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। সে কহিল, "আমার পরাণ যেমতি করিছে, তেমতি হউক্ সে।" ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি রাধার পরাণ কেমন করিতেছে, ঐ এক "যেমতি করিছে" শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে, সে কষ্ট বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয়, এমন আর কিছুতে না। উপরি-উক্ত পদটির মধ্যে রাধা দুইবার অভিশাপ দিতে গিয়াছে, কিন্তু উহার অপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ সে আর কোন মতে খুঁজিয়া পাইল না। ইহাতেই রাধার সমস্ত হৃদয় দেখিতে পাইলাম।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম, "কিছু কিছু সুধা, বিষগুণ আধা", তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও "বিষামৃতে একত্র করিয়া"।

"কহে চণ্ডীদাস, 'শুন বিনোদিনী,
সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই'।"

চণ্ডীদাস শতবার করিয়া বলিয়াছেন,

"যার যত জালা তার ততই পিরীতি।"

"সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার মিলয়ে পিরীতিধন।" "অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি।" ইত্যাদি। কিন্তু সেই চণ্ডীদাস আবার কহিয়াছেন,

"সই পিরীতি না জানে যারা,
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা?"

পিরীতি নামক যে জালা, পিরীতি নামক যে দুঃখ, এ দুঃখ যাহারা না জানিয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে কি সুখ পাইয়াছে? যখন রাধা কহিলেন,

'বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ!"

তখন

"চণ্ডীদাস কয়, এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!"

দুঃখই যদি ঘুচিল তবে আর সুখ কিসের? এত গম্ভীর কথা, বিদ্যাপতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই। যখন মিলন হইল তখন বিদ্যাপতির রাধা কহিলেন,

"দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল,
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল।
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ,
সো সব পূরল পিয়া-পরসাদ।
রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল,
অধরহি পান বিরহ দূর গেল।

চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ,
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ।
ভনহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি,
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি।"

চিকিৎসক চণ্ডীদাসের মতে বোধ করি ঔষধেও এ ব্যাধির উপশম হয় না, অথবা এ ব্যাধির সমুচিত ঔষধ নাই। কারণ চণ্ডীদাসের রাধা-শ্যামে যখন মিলন হয় তখন "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া!" কিছুতেই তৃপ্তি নাই,

"নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি!"

যখন কোন ভাবনা নাই, যখন শ্যামকে পাইয়াছেন, তখনো রাধার ভয় যায় না,—

"এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে।
গড়ন ভাঙ্গিতে সই, আছে কত খল,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।
যথা তথা যাই আমি যত দূর যাই,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়,
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়!
চণ্ডীদাস কহে, রাই, ভাবিছ অনেক,
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক।"

রাধা আগেভাগে অভিশাপ দিয়া রাখে, রাধা শূন্যের সহিত ঝগড়া করিতে থাকে! এমনি তাহার ভয় যে, তাহার মনে হয় যেন সত্যই তাহার শ্যামকে কে লইল। একটা অলীক আশঙ্কামাত্রও প্রাণ পাইয়া তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই রাধা তাহার সহিত বিবাদ করে। সে বলে,

"সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।"

যদিও তাহার বঁধুকে এখনো কেহ ভাঙ্গায় নাই, কিন্তু তা বলিয়া সে সুস্থির হইতে পারিতেছে কৈ?

যখন শ্যাম তাহার সম্মুখে রহিয়াছে, তখনো সে শ্যামকে কহিতেছে ;—

"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান ;
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি!
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের সেওলি,
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও।"

রাধার আর সোয়াস্তি নাই। শ্যাম সম্মুখে রহিয়াছেন, শ্যাম রাধার প্রতি কোন উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই, তবুও রাধা একটা "যদি"-কে গড়িয়া তুলিয়া, একটা "যদি"-কে জীবন দিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কহিল—

"বঁধু, যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও।"

বঁধু নিদারুণ না হইতে হইতেই সে ভয়ে সশঙ্কিত। রাধার কি আর সুখ আছে?

এক দিন রাধা গৃহে গঞ্জনা খাইয়া শ্যামের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া কহিতেছে,

"তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।"

এত করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক কি? শ্যাম কি বুঝেন না? কিন্তু তবু রাধার সর্বদাই মনে হয়, "কি জানি!" মনে হয়, শ্যামও পাছে আমাকে ডাকিয়া না শুধায়। যদিও শ্যামের সেরূপ ভাব দেখে নাই, তবুও ভয় হয়। তাই এত করিয়া আজ বুঝাইতে আসিয়াছে,—

"তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।

অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও, তোমার দেখিব চাঁদমুখ।
খাইতে সোয়াস্তি নাই, নাহি টুটে ভুক,
কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ!"

রাধার এই উক্তির মধ্যে কত কথাই অব্যক্ত আছে। যেখানে রাধা বলিতেছেন,

"অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।"

এই দুই ছত্রের অর্থ এই, "আমাকে গৃহে সকলে গঞ্জনা করে, অতএব—" সে অতএব কি, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? সেই অতএব যদি পূর্ণ না হয় তবে রাধা বিষ খাইবে। "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?" রাধা শ্যামের মুখ হইতে শুনিতে চায়, আমি তোমার জন্য ব্যথিত, আমি তোমার দুঃখ শুনিব! রাধা শ্যামকে কহিল না যে, তুমি আমার দুঃখে দুখ পাও, তুমি আমার ব্যথার ব্যথী হও, সে শুধু শ্যামের মুখ চাহিয়া কহিল, "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?"

চণ্ডীদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা' কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।

"যেমন মলয়জ ঘষিতে শীতল
অধিক সৌরভময়,
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।"

দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়। যতই ঘর্ষিত হইবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে। চণ্ডীদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা ?
বিরিখের ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে,
পিরীতি রতন লাভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে।
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি-আশ।"

পরকে আপন করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, যে তপস্যা করিতে হয়, সে কি সাধারণ তপস্যা ? যে তোমার অধীন নহে তোমার নিজেকে তাহার অধীন করা, যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তোমার নিজেকে তাহার কাছে পরতন্ত্র করা, যাহার সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার নিজের ইচ্ছাকে তাহার আজ্ঞাকারী করা, সে কি কঠোর সাধনা !

যখন রাধিকা কহিলেন,—

"পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে,
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে ?
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানে আছিল কোথা।

পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল,
পারণ-পুতলী যথা।
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইল নহে,
হিয়ায় রহিল শেল।”

তখন চণ্ডীদাস কহিলেন,—

“চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা,
পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা।”

বিদ্যাপতির ন্যায় কবিগণ যাহারা সুখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। কিন্তু চণ্ডীদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন,—

“পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।”

কিন্তু ইহা বলিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, দ্বিতীয় ছত্রে কহিলেন,

“এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।”

প্রেমের আড়ালে জগৎ ঢাকা পড়ে। শুধু তাহাই নহে,—

“পরাণ সমান পিরীতি রতন
জুকিনু হৃদয়-তুলে,
পিরীতি-রতন অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে।”

চণ্ডীদাস হৃদয়ের তুলা-দণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল। এইত জগৎগ্রাসী, প্রাণ হইতে গুরুতর প্রেম, ইহা আবার নিত্যই বাড়িতেছে, বাড়িবার স্থান নাই, তথাপি বাড়িতেছে,

"নিতই নূতন পিরীতি দু জন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়,
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়য়,
পরিণামে নাহি খায়।"

ইহার আর পরিণাম নাই।

এত বড প্রেমের ভাব চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওনা যায়? বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। তাহা শতবার উদ্ধৃত হইয়াছে, আবার উদ্ধৃত করি।

"সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিয়ে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যত রসিক জন রস অনুমগন,
অনুভব কাহু না পেখে,
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে।"

বিদ্যাপতির অনেক স্থানে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসে নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া

লিখিয়াছেন। তিনি নিজের রজকিনী প্রণয়িনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করি,—

"শুন রজকিনী রামি,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদ-বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা,
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা।
রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়,
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।"

চণ্ডীদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল! তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন "কামগন্ধ নাহি তায়"।

আর এক স্থলে চণ্ডীদাস কহিয়াছেন,

"রজনী দিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা,
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।"

দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্রে থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না।—অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্য জগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধ মাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে। যে কালে চণ্ডীদাস ইহা লিখিয়াছিলেন, ইহা সে কালের কথা নয়।

কঠোর ব্রতসাধনা-স্বরূপে প্রেম-সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে; পূর্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে, সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বারা দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাইবেন,

পিরীতি নগরে বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
তা' বিনু সকলি পর।

(ভারতী, ১২৮৮)

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(১)

ভারতবর্ষে ইংরাজী বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান উন্নতি হইবার আগে, রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণ করিয়া দিত। কথকের মুখ হইতে, গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে, বঙ্গীয় যুবক যে উপদেশ পাইতেন, তাহা তাঁহার অস্থিমজ্জায় বিঁধিয়া থাকিত। আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন ও উঁহাদিগেরই চরিত্র অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধবয়সে পুত্রপৌত্রদিগকে নিজ উপাস্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিয়া যাইতেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে দেবতা-ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিতে, ভাইকে ভালবাসিতে, প্রচলিত ধর্ম যে পথে চালায়, সেই পথে চলিতে শিখিতেন। এই দুই অগাধ সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া আপনার কার্যপ্রণালী নিরূপণ করিতেন। আজিকার বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না। যদিও পড়েন ত রাম বা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে দেন না। যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করেন, তাঁহাদের নাম বায়রণ, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র। তিন জনই যুবকদিগের চিত্ত-আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশেষ, তাঁহাদের গ্রন্থাবলী-পাঠকালে যুবকহৃদয় এমন গলিয়া যায় যে, শেষে তাঁহারা যে পথে উঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, সেই পথেই উহা ধাবিত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তখন পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। এই জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভ্রাত্র ও পারিবারিক প্রেম। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালে মনুষ্য দৌরাত্ম্যময় অসভ্যাবস্থা হইতে সবেমাত্র স্থির সামাজিক অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালীন সমাজের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় উপদেশ, তৎসমাজের বিঘ্নকারীদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব তৃতীয়। মনুষ্যগণের দুর্দমনীয়

ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া শান্তিভাব ধারণ করানই উক্ত কাব্যরত্নদ্বয়ের মূলমন্ত্র। বাল্মীকি ও বেদব্যাস অথবা তাঁহাদের অনুবাদক কাশীদাস ও কৃত্তিবাস আপন আপন উদ্দেশ্যসাধনে এতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন যে, বঙ্গীয় যুবক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরাগী ছিলেন। অসভ্যতা, পশ্বাচার তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহারা তিন চারি পুরুষ পর্যন্ত একান্নবর্তী থাকিতে ভালবাসিতেন। দেবতা-ব্রাহ্মণের তাঁহারা গোলাম হইয়াছিলেন; পরধর্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ভয়ানক প্রবল ছিল। পরধর্মের লোক তাঁহার শান্তিময় সমাজের যত কেন উপকারী হউক না, তিনি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু পশ্বাচার ও অসভ্যতা কমিতে তাহাদের শক্তিরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। যাহা দমন করিবার জন্য বাল্মীকি-বেদব্যাস হৃদয়-বিদ্রাবিণী, উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সে পদার্থ, সেই শক্তি লোপ হইয়াছিল। দৌরাত্ম্যপ্রিয়, উৎপাতপ্রিয় তেজস্বী আর্য যুবক কবিতার মোহিনীবলে মেষশাবকবৎ নিরীহ হইয়াছিলেন, বঙ্গদেশের শক্তি স্বাধীনতা তেজ গিয়া উহা কারখানার একটি একটি কলের মত হইয়াছিল। যেমন বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলে, তেমনি বঙ্গীয় সহস্র সহস্র লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একই ভাবে চলিত। চালাইত কে? কোন্ বাষ্পীয় যন্ত্রের এরূপ অসীম শক্তি? হিন্দু-সমাজের দমন-শক্তি। যেমন মধুর সঙ্গীতে বনের মত্ত হস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে, তেমনি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মনোমোহিনী বীণার বশ হইয়া দুরন্ত শূরজনবংশীয়েরাও দমন হইয়াছিল, বাঙ্গালী ত কোন্ ছার।

আদিম অবস্থায় সমাজ-শাসনের প্রধান বিঘ্ন এই যে, মনুষ্য কেহ কাহার অধীন হইতে চাহে না এবং সকলেই যাহা খুশী, তাহাই করিতে চায়, সমাজ-বন্ধন করিতে গেলে obedience প্রথম প্রয়োজন। এই জন্য যাঁহারা প্রথম সমাজ-বন্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐটি শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন। এক পুরুষে সকল উদ্ধত-স্বভাব লোককে শাসনাধীন করা যায় না, এই জন্য ১০।১৫ পুরুষ পর্যন্ত এক নিয়মে থাকিয়া সমাজমধ্যবর্তী সমস্ত লোককে বশ্যতা স্বীকার করান চাই। রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নির্মিত। বহুকাল অবধিই হিন্দুরা রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রানুকরণ করত সমাজ-শাসনের অধীন হইয়াছেন। সমাজও উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সমাজবন্ধনই ত

মনুষ্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ। এই পথে মনুষ্য সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিবে; ক্রমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করিবে, আপন জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে। প্রথম আপন জাতির, ক্রমে আপন দেশের, তাহার পর সমস্ত মনুষ্যের, তাহার পর সমস্ত জীবলোকের উপকার করিবে। যাহাতে জীবলোক জড়ের সহায়তায় দীর্ঘকাল আনন্দ অনুভব করিয়া বিনাক্লেশে দেহত্যাগ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিবে, তবে ত পথ সার্থক হইবে; নচেৎ বনমধ্যে পথ কাটিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি?

সমাজ বদ্ধ হইল, কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য কিছু রহিল না। যেমন রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন দেখিয়া মনুষ্য শান্ত হইল, সেইরূপ শান্ত হইয়া কি করিবে, বুঝিতে পারিল না। তাহাতে এই হইল যে, কতক লোক ভোগে আসক্ত হইল, আর কতক এ জন্মের ভোগ ত্যাগ করত পরলোকের ভোগের জন্য ব্যস্ত হইল। কতক সুন্দরী রমণী-সহবাসে বিচিত্র সুরাপানে রত হইয়া শীতে উষ্ণ গৃহমধ্যে গ্রীষ্মে প্রমোদকাননে, নির্ঝর-গৃহে, জ্যোৎস্নায় ছাদে, রৌদ্রে পুষ্করিণীর মধ্যে বিহার করাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিল। আবার অনেকে অগ্নিকুণ্ডোপরি ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরে তপঃ করত পরলোকে নন্দন-কাননে উর্বশী-মেনকা-পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে অনন্তকাল কাটানই মনুষ্য হওয়ার সুখ ভাবিলেন। কেহ দানে স্বর্গ, কেহ স্নানে স্বর্গ মনে করিলেন। ইন্দ্রিয় সুখই সকলের উদ্দেশ্য হইল— কাহারও ইহলোকে, কাহারও পরলোকে। কেহই এ কথা বুঝাইয়া দিল না যে মনুষ্য সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য জড়জগতের উপর মনুষ্য জাতির আধিপত্য-বিস্তার। তুমি আমি, এমন কি, আমার সমসাময়িক যে ব্যক্তি হউন, সমাজ ছাড়িয়া ধরিলে কেহ কিছুই নহেন। যেরূপ আমরা আমাদের এক পুরুষ আগেকার লোকে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভোগ করিতেছি, এইরূপ আমাদের পরে যাহারা আসিবে, তাহাদের জন্য আমাদের পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশী রাখিয়া যাওয়া অর্থাৎ জড়জগতের কিছু আধিপত্য বিস্তার করিয়া যাওয়া কর্তব্য। মনুষ্য-সমাজ বৃক্ষের পত্র। যেমন পত্র আকাশস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করে, পরে আপনার সময় আসিলে পড়িয়া যায় এবং পরবর্তী পত্রসকল যাহাতে একটু উচ্চ ও পুষ্ট হয়, তাহা করিয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্য-সমাজ বিস্তার করিয়া, সমাজ-পরিবর্তন ও সমাজ-সংস্কার করিয়া, নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া দেহত্যাগ করে। তাহাদের সন্তানের এই সকলের ফলভোগ করত আরও অধিকতর ক্ষমা প্রকাশ করে

এ কথা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই, সুতরাং সেই শান্তভাবে এই রামায়ণ ও মহাভারত শুনিয়া একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্দেশ্য সাধন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহাদের পরিবর্তে গ্রহণ করা যায়, এমন কোন গ্রন্থ হয় নাই, এই জন্য উহারাই জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন ইংরেজী বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হইল, তখন অবধি রামায়ণ ও মহাভারতের নীতি শিক্ষা সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সমালোচকেরা বাল্মীকির অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তির প্রশংসা করুন, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা রামায়ণ হইতে তৎসাময়িক বৃত্তান্ত রচনা করুন, রামায়ণ পাঠ করিয়া শত শত লোক আনন্দসাগরে মগ্ন হউক, কিন্তু রামের চরিত্র আর কেহ অনুকরণ করিতে যাইবে না। যুধিষ্ঠিরের ত কথাই নাই। পূর্বে লোকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে শিক্ষা পাইত, এখন শিক্ষিত যুবকগণ কতক পরজাতীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কতক ইতিহাস পড়িয়া, কতক নানা পুস্তক ও ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া সেই শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং এরূপ সভ্য অবস্থায় একজন লোকের বা একখানি পুস্তকের যুবক-চরিত্র নির্মাণে সর্বতোমুখী প্রতিভা হইতে পারে না। তথাপি কোমলহৃদয় যুবকের মনে যে পুস্তক ভাল লাগে, তাহা হইতেই তিনি কিছু না কিছু ভাল জিনিস চিরকাল মনে করিয়া রাখেন। যে কিছু জিনিস চিরকাল মনে থাকে, তাহা অনেক সময়ে কার্যে প্রকাশ পায়, তাহাই তাহার চরিত্র-নির্মাণে সহায়তা করে।

(২)

বঙ্গীয় যুবক যে সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহার মধ্যে সেক্সপীয়র সর্বপ্রধান। কিন্তু বোধ হয়, তাহার চরিত্র নির্মাণে সেক্সপীয়রের কোন হাত নাই। কারণ, সেক্সপীয়রের উদ্দেশ্য কেবল "to please", তাহার সৎলোকও যেমন সুন্দর, অসৎও তেমনি সুন্দর। এই দুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহা পরস্পরকে ক্যানসেল্ (cancel) করিয়া দেয়। মিল্টনে Puritanic Spirit এত অধিক যে, উহা কোন কালে লোকে অনুকরণ করিতে সাহস করিবে না। অনেকে বরং সয়তান হইতে চাহিবে ত কেহ যীশুখৃষ্ট বা সামসন হইতে চাহিবে না। ড্রাইডেন ও পোপে অনুকরণীয় কিছু নাই।

Essay on Criticism প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা উপদেশ মাত্র। চসার ও স্পেন্সারের বানান এত উল্টা রকম যে, কাহারও সাহস হয় না পড়ে, যদি কেহ পড়ে ত চসারের সেকেলে গল্প একেলে লোকের ভালই লাগে না। যাহারা বৃদ্ধ, তাহাদের বরং ভাল লাগিতে পারে—যুবকের কখনই লাগিবে না। স্পেন্সারের যে Ideal, তাহাও ইউরোপের অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মধ্য সময়ের, এখনকার লোকে তাহা ভালবাসে না। বিশেষ রূপকের দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয়, সে শিক্ষা সভ্যসময়ের নয়। সেলি চমৎকার কিন্তু সেলির লেখা এত জটিল ও উঁহার লেখার Idealism এত উচ্চ যে তাহা অনুকরণের অতীত। টেনিসনের উদ্দেশ্য পুরাণ জিনিস ভাল করিয়া দেখান, সুতরাং তাহাতে চরিত্র-নির্মাণের সহায়তা করে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভালই হোক আর মন্দই হোক নিঙড়িয়া তিত করিয়া দেন। একটি ফুল যদি তিনি ধরিলেন ত তাহার প্রতি পাপড়ির বর্ণনা হইবে, তাহার রেণুর হইবে, তবে ছাড়িবেন। বাকী বায়রণ, তিনি পীড়িতের বন্ধু, পীড়কের শত্রু, প্রণয়ের আধার, যৌবন মূর্তিমান, মহা তেজস্বী, সর্বদা চঞ্চল, আলস্যের, জনসমাজের অত্যাচারের প্রতি একান্ত চটা। যৌবনের মন আকর্ষণে যা কিছু চাই বায়রণের সব আছে সুতরাং ইংরাজী সাহিত্যে এক বায়রণই বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র-নির্মাণে অংশী।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত ত সেকেলে। বেদ-পুরাণের চর্চা নাই। থাকিলেও এখন আর কেহ গর্গ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য হইতে চাহিবে না। এ একপ্রকার ঠিক। সে সমাজ নাই, সে-কালও নাই। কালেজের ছাত্র দূরে থাক, ভট্টাচার্যদিগের টোলের ছাত্রেরাও আর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদব্যাস হইতে চাহে না। ভারবির অর্জুন, মাঘের কৃষ্ণ, নৈষধের নল, বাণভট্টের তারাপীড়, শ্রীহর্ষ সব সেকেলে, একটিও আমাদের মনের মত নয়। ভারবি মাঘ নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা-প্রণালী সমালোচকেরা ভাল বলিতে পারেন, স্থানে স্থানে ভালও আছে, কিন্তু সব সেকেলে। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উঁহাদের রসবোধ করিয়া উঠিতে পারি না। করিতে পারিলেও আমাদের চরিত্র পরিবর্তন বা শোধন ভারবি পড়িয়া হয় না। বঙ্গীয় যুবক ভবভূতিকে ভালবাসেন। ভবভূতি তাঁহাদের ভালও লাগে, উহা তাঁহার চরিত্রেও কতক প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বিষয়ে, কাজেই এস্থলে গৃহীত হইল না। দশকুমারচরিতের মধ্যে অপহার বর্মার চরিত্র সুন্দর, বড় চমৎকার, কিন্তু তিনি চোর ডাকাত ইত্যাদি

ইত্যাদি। যদি অপহার বর্মার চরিত্র হইতে বঙ্গীয় যুবক নিজে কিছু লইয়া থাকেন তাহা তিনি মানের খাতিরে লুকাইয়া রাখিবেন, কখনও প্রকাশ করিবেন না। বাকী কালিদাস,—কালিদাসের লেখা এমনি মধুর যে পড়িবামাত্র মন আকৃষ্ট হয়। তারপর কালিদাসের অনেকগুলি পাত্র (character) লোকে এত ভালবাসে যে, খানিকটা সেই রকম হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের যুবকগণের উপর কালিদাসের ক্ষমতাও অনেক অধিক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থকারেরই কিছু কিছু অংশ আমরা পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান বঙ্কিমবাবু। বঙ্কিমবাবুর পুস্তকাবলী এত লোকে পাঠ করে যে তাঁহার সকল পুস্তক হইতেই কিছু না কিছু লোকের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে। লোকে দীনবন্ধুর ইয়ারকি মুখস্থ করে, গুড়ুমের গানগুলি কণ্ঠস্থ করে, মাইকেলের কতক কতক অনুকরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ আজগুবি কথা লইয়া ভিরকুটী করে। হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত সকলের কণ্ঠস্থ আছে - বৃত্রসংহার পাঠে চরিত্র পরিবর্তন কতদূর হইবে আজ জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ দূরে থাকুক এক্ষণে অনেক লজ্জায় তাহা পড়িতেই পারে না। আরও অনেক গ্রন্থকার আছেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অতি সামান্য।

(৩)

এখন দেখিতে হইবে এই তিনজন কবির কে কতদূর ও কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা গ্রন্থকারদিগের দোষ গুণ পর্যালোচনা করিতেছি না, কেবল শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্র-নির্মাণে ইঁহারা কি প্রকার ও কি পরিমাণে মাল মসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব। ইঁহারা একজন ইংলণ্ডের, একজন মালবের, আর একজন বঙ্গের। এই তিন জনের মধ্যে একজন ফরাসী বিপ্লবের সময় শিক্ষিত, একজন হিন্দুদিগের গৌরব সময়ের ব্যক্তি, আর একজন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বকালীন ইংরেজিরূপে শিক্ষিত। একজন সমাজ ভাঙ্গিতে সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয় তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কতদূর সুখ ভোগ করা যাইতে পারে তাহাই দেখান, আর একজন সমাজের সহায়তা ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায় দেখাইয়া শেষ করেন।

তিন জনই প্রণয়ের কবি, প্রণয়গত অবশ্য তারতম্য আছে তাহা আমাদের এখানে বলার প্রয়োজন নাই। তিনজনই স্বভাবের সৌন্দর্য অনুভব করিতে শিক্ষা দেন। তিন জনই নিজে স্বভাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ এবং তিন জনেই লোককে আপন আপন মুগ্ধতায় অংশী করিতে পারেন। বাঙ্গালায় পর্বত নাই, পাহাড় নাই, কেবল এক হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে বিশালনিতম্ব স্রোতস্বিনী আর নির্মেঘ ও সমেঘ আকাশ। হঠাৎ মনে হইতে পারে বাঙ্গালায় স্বভাব-সৌন্দর্য নাই, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর প্রতি ছত্রে বাঙ্গালার সেই সৌন্দর্য প্রকটিত। বাঙ্গালার সৌন্দর্য তিনিই সর্বপ্রথম কবির চক্ষে দেখিয়াছেন ও আমাদের সৌভাগ্য আছে বলিয়া আমরাও তাঁহার হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত সেই অপূর্ব সৌন্দর্য আরও সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি। সেকালে স্বভাবের শোভানুভবের নাম দেবতার আরাধনা ছিল। প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা গঙ্গা দেবতা, আকাশ ঋষিপূর্ণ, চন্দ্র দেবতা, সূর্য দেবতা; বঙ্কিমবাবু দেবতাদিগকে অন্তরিত করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্যমাত্র দেখাইয়াছেন ও দেখিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালার যে কিছু সৌন্দর্য তাহার প্রায় কিছুই বঙ্কিমবাবু দেখাইতে ছাড়েন নাই। হীরার বাড়ীর দেওয়ালে পাখী আঁকা হইতে সূর্যমুখীর বিচিত্র-চিত্রবর্ধিত গৃহ পর্যন্ত সবই দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রে অপরিষ্কার কিছুই নাই। সব পরিষ্কার, ঝরঝরে।

কালিদাসের বর্ণনা ভারতময়। সিংহল দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্বত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শুদ্ধ পরিষ্কার নয়—বড় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়, যেন ইলেক্‌ট্রিক আলোকে (electric light) প্রতিফলিত। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি, আর কালিদাস এই সমস্ত ঘুঁটিয়া ফেলিয়াছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখান তাঁহার কর্ম নয়, সেজন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ চাই। তাঁহার দেখান বাছিয়া বাছিয়া, ভাল ভাল বস্তুগুলি তাঁহার বর্ণনায় শুদ্ধ সৌন্দর্য নয়, কিছু না কিছু অলৌকিক উহার সঙ্গে মিশ্রিত আছে। যথা রামের পুষ্পক রথ, মেঘের দৌত্য। তাঁহার ঋতুসংহার-এ স্বভাবের সৌন্দর্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। এখানকার বর্ণনায় অলৌকিকতা নাই এবং পরিষ্কার-অপরিষ্কারের জ্ঞানও বড় বেশী নাই। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু পরিষ্কার হউক আর অপরিষ্কারই হউক বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিত্ব সমানই আছে।

বায়রণের বর্ণনীয় ইউরোপ। সমস্ত ইউরোপে যা কিছু বর্ণনাযোগ্য—আল্পসের চূড়া, রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ, গ্রীসের দ্বীপমালা, মাইকেল-এঞ্জেলোর চিত্র, ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ—শিল্পে ও স্বভাবে যে কিছু মহান্ ও মনোহর, সকলই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বর্ণনা-মধ্যে এক জিনিস আছে যাহা আর প্রায় কাহারও নাই। ঐতিহাসিক দৃশ্য বর্ণনে বায়রণের অসাধারণ ক্ষমতা—ওয়াটার্লু যুদ্ধ, রুসোর নিবাসস্থানে বল্টেয়ারের গির্জা-বর্ণনায় বায়রণ তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনার পর তাঁহার উপদেশগুলি যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হয় যে তাহা আর অপনীত হইবার নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণের কথায় স্বভাবের বর্ণনা আসিল কেন? এ ধান ভানিতে শিবের গীত কেন? তাহার উত্তর এই স্বভাব-বর্ণনায়ও নীতিশিক্ষা আছে, আর সেটি দেখানও বড় সহজ, এই জন্য আগে স্বভাবের শোভা বর্ণিত দেখিয়া কি শিক্ষা পাই দেখাই, তাহার পর অন্য প্রকার শিক্ষা যথাশক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম কালিদাসের বর্ণনায় সব শান্তিময়, সব সুখময় পড়িলে মনের শান্তিময় ভাব জন্মে। যখন ভট্টাচার্য মহাশয়েরা, পাদরি সাহেবেরা ও ব্রাহ্ম মিশনারিগণ দিনরাত জগৎ দুঃখময়, পাপের ভরে ডুবলো ডুবলো বলিতেছেন, তখন ওরূপ পুস্তক পড়িলে বাস্তবিকই জগৎ দুঃখময় নহে বলিয়া বোধ হয়। এ বড় সামান্য শিক্ষা নহে। বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-বর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি হয়, তাহার উপর যেন একটু কিছু আছে, যে আনন্দ যৌবনের বড় প্রিয় সেইরূপ আনন্দ যেন বেশী আছে। বায়রণের বর্ণনায় শান্তি নাই, কেবল পরিবর্তন হইতেছে—অসংখ্য অসংখ্য পরিবর্তন, এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না, যেন একটু চটা চটা ভাব উদয় হইতেছে, যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভা দেখিতে আসিয়াছি সে সুখটুকু পাইতেছি না, কেবল কৌতূহলতৃষ্ণায় কাতর হইয়া যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেছি, দেখিতে যাইতেছি, দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে, কিন্তু সে তৃপ্তি বেশীক্ষণ থাকিতেছে না।

সংক্ষেপে তিনজনের বর্ণনায় তিনরূপ উদ্দেশ্য আর এক প্রকারে দেখান যায়। কালিদাস উপরে বসিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নীচেকার শোভা দেখিতেছেন আর দেখাইতেছেন। নিজে মনুষ্যের উপর উঠিয়া বসিয়া মনুষ্যের

কার্য, আচার-ব্যবহার নৃত্যগীত দেখিতেছেন। পাহাড়-পর্বত কেমন ছোট ছোট দেখাইতেছে, নদীটি একছড়া হারের মত কেমন পড়িয়া আছে তাই দেখিতেছেন. আর কাছে কোন ভালবাসার জিনিস আছে তাহাকে দেখাইতেছেন। যেন সাঙ্খ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্ত বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। কালিদাস বলিতেছেন, আগে মানুষের চেয়ে উচ্চ জীব হও, তাহার পর স্বভাবের শোভা দেখিও, কত আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশা বড় উচ্চ। বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউক আর অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই হউক বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারও নির্লিপ্ত দেখা। স্বভাব-শোভা মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখ, আর কাছে যদি কেহ থাকে দেখাও কেমন সুন্দর, কেমন গভীর। পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে শরীর পুলকিত হউক। বায়রণের তা নয়। স্বভাবের শোভা দেখিতে চাও ঘর দোর ছাড়িয়া বাহির হও যা তোমার সম্মুখে পড়িবে তাই দেখিয়া বসিয়া থাকিবে? তা নয়। চল যেখানে সুন্দর বস্তু সেইখানে যাইতে হইবে। তুমি নির্লিপ্ত থাকিলে সব দেখিতে পাইবে কেন? ঘরে বসিয়া দুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শান্তি সুখ ভোগ করিবে কেন? মনুষ্যের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও যত দেখিবে ততই জ্ঞান বাড়িবে, আনন্দ অধিক হইবে; এই আনন্দই আনন্দ, আর সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার। সমাজে অত্যাচার, প্রণয়ে অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভালবাসে। সবই কষ্ট—কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।

একজন উপর হইতে স্বভাব দেখিতেছেন, একজন মধ্য হইতে দেখিতেছেন, আর একজন মাতিয়া বেড়াইতেছেন। একজনের মতে মনুষ্যজীবন অপেক্ষা অন্য জীবনে সুখ অধিক। আর একজনের মতে এ জগতেও যথেষ্ট আনন্দ। তৃতীয়ের সবই এই জগতে।

(৪)

বায়রণের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর প্রজাবিপ্লবে। সুতরাং বর্তমান সমাজের উপর তঁাহার শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বর্তমান সমাজে অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট মনুষ্য-চিত্রগুলি সমাজের বাহিরে। সেগুলি সকলেই সমাজের উপর চটা। কেহ কেহ আবার সমাজের

নক, হয় দস্যু না হয় মনুষ্যবিদ্বেষী (misanthrope)। সমাজের যতগুলি নিয়ম আছে সবগুলিই তাঁহার চক্ষুঃশূল। কনরাড, লারা, ডন জুয়ান্ প্রভৃতি পাত্রগণের বাক্যে ও কার্যে এই সমাজবিদ্বেষ ভাব প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাসের সমাজ মনুর সময় হইতে এক ভাবে চলিয়া আসিতেছে তিলমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মত এই, এরূপ সমাজের সকলই সুখ।

বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। এবং করিলেই শেষে আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার, শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্বত-গুহায় ঘোর প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলালের ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

বায়রণেরও একটি মানুষ সুখী নহে, তাহার মধ্যে মধ্যে অলৌকিক, অতি মানুষিক, হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে কিন্তু দুঃখই সকলের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ঠিক জানে যে যতদিন বর্তমান সমাজ এইভাবে চলিবে তাহাদের দুঃখের অবসান হইবে না। সুতরাং তাহারা অনুতাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে চাহে না। তাহাদের আমোদ সমাজের উপর অত্যাচারে। কেহ দিবারাত্র লুঠপাঠ করিতেছে, কেহ নির্জন কারাগৃহ মধ্যে উচ্চে রোদন করিয়া সমাজ-ধ্বংসের জন্য শাপ দিতেছে, কেহ সামাজিক নিয়ম-লঙ্ঘনের জন্য দিন-রাত্রি ফিরিতেছে। তাহারা দুঃখী বটে কিন্তু দুঃখে কাতর নহে, তাহাদের দুঃখের কারণ মনুষ্যসমাজ, সুতরাং মনুষ্যসমাজ ও যাহারা সেই সমাজ চালায় তাহাদের উপর দাদ তোলা চাই। বায়রণের মানুষ মনুষ্যসমাজের উপর চটা। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি, দুর্বলের প্রতি, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। তাহারা মানুষ ভালবাসিতে চায়, কিন্তু সমাজের অত্যাচারী নিয়ম আপনার মনের মত করিয়া ভালবাসিতে দেয় না, সুখে তাহারা ঘোর চটা। কালিদাসের মানুষ মানুষ হইতে কিছু উচ্চে। সব দেবতার অংশ, কেহ দেবতার অবতার, কেহ দেবতা স্বয়ং, কেহ অপ্সরা, কেহ অপ্সরার কন্যা, কেহ ঋষি, কেহ রাজা। ঋষি ও রাজা মানুষ, কিন্তু বায়রণের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের অতিমানুষিক ক্ষমতা অধিক। এই স্বর্গে যাইতেছে,

মুহূর্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেবতার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছে, অপ্সরার সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সকলেই সেই মনুপ্রণীত সমাজের নিয়ম যত্নপূর্বক প্রতিপালন করিতেছে। মানুষের অসীম ক্ষমতা, কিন্তু যথেচ্ছাচার নাই।

"জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্লাঘা-বিপর্যয়।" এই শ্লোকে তাঁহাদের কতকটা আদর্শ পাওয়া যায়। তাঁহাদের যেমন ক্ষমতার পার নাই, মনের জোরও তেমনিই অধিক। সেই ক্ষমতা তাঁহারা সৎপথে চালাইতে জানেন. সুতরাং তাঁহাদের জীবনে কষ্ট নাই, দুঃখ নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, যেমন স্বভাবের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় তেমনি তাঁহাদের মতে সমাজের নিয়মও অলঙ্ঘনীয়। লঙ্ঘনের চেষ্টাও নাই, পীড়াও নাই, অনুতাপও নাই।

বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের, লোক, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক। শিক্ষিত যুবকের জীবন কেবল অনন্ত বিপদসঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। একপ্রকার বাড়ীতে আর একপ্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে পরস্পর বিলক্ষণ বিরোধী। এইজন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পাত্রগুলিতেও এই বিরোধী ভাব কতক কতক প্রকটিত আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। যেখানে আছে, সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙ্গালী, নিরীহ ভালমানুষ। বাঙ্গালীরা যে স্বভাব ভালবাসে তাঁহারা সকলেই ঠিক সেই স্বভাবের লোক। বুদ্ধিমান, চতুর, দয়ালু, সামাজিক ও গুণগ্রাহী,—তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। এরূপ লোকের হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ; তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইঁহাদিগের সেইরূপে দেখাইয়াছেন।

রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন পুস্তকাবলীর প্রথম শিক্ষা এই যে পিতামাতার বশ হইবে, ভাইকে স্নেহ করিবে, জ্ঞাতিদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্রয় আধিপত্য করেন তাঁহাদের পিতামাতার সঙ্গে খোঁজ নাই। বঙ্কিমবাবু একবার গোবিন্দলালের মাকে বাহির করিলেন। কিন্তু পাছে কোনরূপ গোল ঘটে চটপট উদ্যোগ করিয়া তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন বঙ্কিমবাবুর কোন নায়ক বা নায়িকার ভাই নাই। দুই একটি ভাগিনী আছে। গোবিন্দলালের পিতৃব্যপুত্র হরলাল, সেও

কলিকাতায় থাকে। বায়রণের বাপ মা ভাইএর সঙ্গে বড় সম্পর্ক নাই। ডনজুয়ানের মুখে ডনাইনেজের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। আর পারিসিনার কথার উল্লেখই আর প্রয়োজন নাই। কালিদাসের পুস্তকেও পিতামাতা বড়ই অল্প কিন্তু অপরদ্বয়ের ন্যায় লোপাপত্তি নাই। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যে দুই একবার বিশুদ্ধ সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বড় অল্প।

এই সকল পারিবারিক অনুরাগের পরিবর্তে আমাদের কবিরা প্রতিনিধি দেন দাম্পত্য প্রণয়। দাম্পত্যই বা কেন বলি? বায়রণ ত দাম্পত্যের কোন ধারই ধারেন না। শুধু প্রণয় বলি। সুতরাং বায়রণে পারিবারিক অনুরাগের কিছুই নাই। বঙ্কিমবাবুর পুস্তকে পারিবারিক অনুরাগের মধ্যে শুধু দাম্পত্য প্রণয় আছে। অন্যান্য অনুরাগের পরিবর্তে বঙ্কিমবাবুর স্বদেশানুরাগ, বায়রণের মানব জাতির প্রতি অনুরাগ। একজন অত্যাচার পীড়িত স্বদেশের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছেন, আর একজন অত্যাচার পীড়িত মনুষ্য জাতির উদ্ধারের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে শিখিয়াছেন। যাহারা ক্ষমতা-বলে অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পায় তাহাদিগকে বাহবা দিতে শিখাইয়াছেন।

কালিদাসের সমাজ ঠিক মনু হইতে এক আকারে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার যাহা কিছু আছে, সকলই শাস্ত্রসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত অণুমাত্র তফাৎ নাই, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে প্রলোভন নাই। পাপ পুণ্যের মধ্যে পাপ বড় কম, সবই পুণ্য। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ কেবল সুখের ছবি, নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আমোদের ছবি। বায়রণ পাপ পুণ্য বলিয়া দুই পদার্থ স্বীকার করিতে চান না। সুতরাং লোকে যাহাকে প্রলোভন বলে, সে বস্তু তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় যাহা করে তাহাই ঠিক, আপন ইচ্ছায় যাহাকে ভালবাসে সেই প্রণয়ের পাত্র। সুতরাং মানুষ আপনার সুখের জন্য আত্মইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কখন কৃতকার্য হয় কখন অকৃতকার্য হয়; পরের কথায় কিছুই করিতে চাহে না, সমাজের যে সকল নিয়ম আছে মানিতে চাহে না। বর্তমান সমাজের যেরূপ গঠন, তাহাতে সমাজ এরূপ স্বেচ্ছাচারীদিগকে দমন করিতে চায় সুতরাং উহারা সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যে সমাজে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকে, তাহারা সেইরূপ নূতন সমাজ চাহে, তাহা পায় না বলিয়া ঘোর সমাজদ্বেষী হইয়া পড়ে।

বঙ্কিমবাবুর একহাতে কালিদাস, আর একহাতে বায়রণ ; কিন্তু কালিদাসের আধিপত্য তাঁহার উপর অধিক। তিনি সমাজ সেই প্রাচীন রীতিতে চালাইতে চান। সেই জিতেন্দ্রিয়ভাব, সেই সুখ, সেই শান্তি, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি এক এক সময়ে দুর্দম হইয়া উঠে। এইটি বায়রণের। তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয় দেখান যে ইন্দ্রিয় বশ করিতে না পারিলে লোকের পদে পদে বিপদ ঘটে তিনি একবার প্রলোভন লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন ; দেখান সকলেই প্রলোভনে ভুলে কিন্তু কেহ অন্তরের ভাব অন্তরেই রাখে, দমন করে। ইহারাই জিতেন্দ্রিয়, যথা প্রতাপ। কেহ বা রাখিতে পারে না, দমন করিতে পারে না, যথা শৈবলিনী ও নগেন্দ্রনাথ। যেই জিতেন্দ্রিয় সেই সুখী, সাহসী, সর্বত্র প্রশংসাপাত্র। যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী, সাহসশূন্য এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ।

কালিদাসের প্রলোভন নাই। বায়রণের সবই প্রলোভন, কিন্তু তাহা হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রলোভন আছে ; তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার করিলে সুখও আছে। সুতরাং আধুনিক সমাজে আমরা বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বায়রণ হইতে আমরা মানবজাতির প্রতি অনুরাগ করিতে শিখি বটে কিন্তু তিনি স্পষ্ট শিক্ষা কোথাও দেন নাই। তিনি বর্তমান সমাজের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। অত্যাচারপীড়িতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার মতলব টের পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে আমরা যে স্বদেশানুরাগের উপদেশ পাই সে আর একরূপ। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্তিমান স্বদেশানুরাগ আছে। যথা—রমানন্দ স্বামী। এই সকল লোকের কি আশ্চর্য গঠন! তাঁহারা যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার নাম পরহিতব্রত। পীড়িত যে-ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, খ্রীষ্টিয়ান হউক, তাহার উপকারের জন্য সর্বদাই উদ্যুক্ত। ইঁহারা নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির বোধ হয় রমানন্দ স্বামীই পরাকাষ্ঠা। কালিদাস হইতে আমরা এক প্রকার অনুরাগের উপদেশ পাই। তাহার নাম সর্বভূতানুরাগ। এ অনুরাগ বুদ্ধধর্মের ফল। কালিদাসের সময়ে যদিও উক্ত ধর্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল তথাপি উহা অনেক অংশ হিন্দুদিগের মনে দৃঢ়বদ্ধ

হইয়াছিল। কিন্তু অস্মদেশীয় মাংসাশী যুবকবৃন্দ সর্বভূতে দয়ার বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের মতে মানবজাতির প্রতি অনুরাগই মুখ্য ধর্ম।

কালিদাসের শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতির প্রতি সোদর স্নেহ। আমরাও ফুলগাছ পুঁতি, গোরু বাছুর পুষি, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের সোদর-স্নেহ হয় না। কিন্তু কালিদাসের হৃদয় পশুদিগের জন্যও কাঁদিত, আমাদের কাঁদে না। বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্রনাথ প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের স্নেহ বড় জোর ঐ পর্যন্তই নামে। বায়রণ সকল মানুষেরই প্রতি স্নেহ করেন। তাহার সাক্ষী তাঁহার গ্রন্থে দুর্দশাপন্ন গ্রীকদিগের জন্য গভীর রোদন ও তাহাদের দুর্গতিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লোকের মন আকৃষ্ট করা।

আর একটি কথা। ইঁহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী কি একরূপ? সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা আজ্ঞা, পুরাণ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায়। কান্তা যেমন নানা প্রকার গল্প গুজব করিয়া মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন, যেটি বাহির করেন সেটি কিন্তু অমোঘ। কবি রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা করেন; নানারূপ বিচিত্র পদার্থ দেখাইলেন, কখন হাসাইলেন, কখন কাঁদাইলেন, শেষ একটি উপদেশ দিলেন যে, ইন্দ্রিয়-অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিলে অনেক নাস্তানে পড়িতে হয়, শেষ রাবণের ন্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে। ইঁহাদের তিন জনেরও শিক্ষা-প্রণালী মূলত তাই, কেবল কিছু তারতম্য-মাত্র আছে।

কালিদাসের উপদেশপ্রদানপ্রণালী ঠিকই এইরূপ। তিনি কোথাও preach করেন না। তাহার কাব্যের মুখে যাহা পড়ে তাহাই বলিয়া যান, কখনও উপদেশ দিব বলিয়া দোকান খুলিয়া বসেন না। বায়রণের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু না কিছু উপদেশ আছে। তাঁহার যেখানে একটি সুন্দর বর্ণনা তাহার নীচেই দুটি বর্তমান সমাজের অত্যাচারের নিন্দা। যেখানে যাও দু'পাঁচটি ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ নিশ্চয়ই পাইবে। যেমন কোন গোরস্থানে ভ্রমণকালে গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নীচে যে সকল খোদা অক্ষর দেখিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে, সেইরূপ বায়রণের খোদা কথা অন্তরের সঙ্গে গাঁথা থাকে। রাইনের ধারে রাইনের শোভা দেখিতে দেখিতে বা

আল্পসের চূড়ায় আল্পসের শোভা দেখিতে দেখিতে, বায়রণ যে-সকল গভীর নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠক-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। বায়রণের মাঝে মাঝে preachingও আছে। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর preaching বড় উচ্চ। তাঁহার 'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি preaching-এর খনি। কত নীতিশিক্ষা উহা হইতে লাভ করা যায় তাহা বলা যায় না। তাঁহার preach করার লোকও আছে, তাঁহার সন্ন্যাসীগুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বগত বাণীগুলিও প্রচারক ভিন্ন কিছুই নহে। হরদেব ঘোষালের পত্র অনেক মনোবিজ্ঞানতত্ত্বের গূঢ় সত্য আবিষ্কার করিয়াছে।

লোকে মনে করেন যে বায়রণ হইতে আবার কি নীতিশিক্ষা! বায়রণ অতি অশ্লীল কবি। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদের বায়রণ নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহাদের নীতি সেকেলে, বায়রণ—একেলে নীতিশিক্ষা দেন। তিনি রুসোর স্কুলে তৈয়ারী হইয়াছেন। মানুষ সব সমান। সমাজ-বন্ধন শুদ্ধ দু'পাঁচ জন লোকের হাত, অত্যাচারের ও যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা দিয়া তাহারা অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীকে নির্বীর্য ও নিস্তেজ করে। এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। তাহার কাব্যেও এই ভাব নিরন্তর প্রকাশিত। তাঁহার নিজের ও তৎকল্পিত মানবগণ যদিও দেখিতে মনুষ্যবিদ্বেষী, যদিও তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যুবকও অনেকে এই ভাবই বিলক্ষণ প্রাপ্ত হয়, তথাপি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এটি বাহিরে মাত্র, তাঁহার বিদ্বেষ শুদ্ধ বর্তমান সমাজের উপর, কিন্তু উহার নীচে মনুষ্যের জন্য সহানুভূতি পরিপূর্ণ।

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের পরহিতব্রত যদিও বায়রণের পরহিতব্রত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, কিন্তু উহা তাঁহার পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ স্বদেশানুরাগেই পর্যবসিত। এইজন্য আমরা তাহার পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগই বলিলাম।

উপসংহার-কালে সংক্ষেপে বলি, বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রণের মনুষ্যানুরাগ (Humanitarianism) ও সামাজিক নিয়ম-লঙ্ঘনের সুখ।

(**বঙ্গদর্শন, ১২৮৫**)

কালিদাস ও সেক্সপীয়র

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(১)

কালিদাস সৌন্দর্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ব অমানুষী সৌন্দর্যসৃষ্টি। এ কথার অর্থ কি ?

প্রথম বুঝিতে হইবে, সৌন্দর্য কি, সুন্দর কে ? জগৎ অনন্ত, সীমাহীন, সৃষ্টি অশেষ বৈচিত্র্যময়ী। জগতে কি সকলই সুন্দর ? দাব দগ্ধ অরণ্যানী, বাত্যাবিকট অশনিনির্ঘোষ, জীর্ণ ভগ্ন পর্ণকুটীর, ইহারা কি সুন্দর ? কুৎসিত মর্কটশিশু, পশু-মানব কালিবন (Tempest), শ্মশ্রু-জটিল পিশাচিনী, ইহারা কি সুন্দর ? অতএব, সাকার জগতে সকলই সুন্দর নহে। নিরাকার জগতেই কি সকলই সুন্দর ? দানব ইয়াগো (Othello), দানবী রিগণ (Lear), ইহারা কি সুন্দর ? শকারের আত্মম্ভরিতা (মৃচ্ছকটিক), সয়তানের দেবদ্বেষ (Paradise Lost), চার্বাকের নাস্তিকতা, হবসের স্বার্থবাদ, ইহারা কি সুন্দর ? নিরাকার জগতেও সকলই সুন্দর নহে। তবে কে সুন্দর ? তুষারমণ্ডিত গিরিচূড়া, পাদপসঙ্কুল গহনবন, কলনিনাদিনী নদ নদী, কুমুদ-কহ্লারকমলশোভী সরোবর—ইহারা সুন্দর। অরুণরাগলোহিত বাল তপন, কৌমুদীপ্রভাদীপ্ত নীলাকাশ, গগনবিহারী মলয় পবন, পত্রপুষ্পখচিত বসন্ত-লক্ষ্মী, ইহারা সুন্দর। যেখানে অভ্রভেদী প্রাসাদমালা মণিময় মস্তক তুলিয়া আকাশ স্পর্শ করে, যেখানে রমণীর নূপুর নিক্বণের সহিত সারঙ্গের মধুর কলধ্বনি মিশিয়া মধুরতর হয়, যেখানে কমলামোদবাহী গন্ধবহ ধীরে ধীরে বহিয়া বিরহীর আতপতাপ নিবারণ করে, সেই পৃথিবীস্বর্গ উজ্জয়িনী সুন্দর ; উগ্রপবনবেগে সংক্ষুব্ধ মেঘখণ্ডের ন্যায় যথায় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্ত হইয়া রয়, যথায় মণিময় জীর্ণ দেবভবন হিংস্র বন্যপশুর আবাসভূমি হয়, যথায় শত শতাব্দীর অতীত সমৃদ্ধি পৃথিবীর মাটিতে মুখ লুকাইয়া রয়, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ সুন্দর। যাহার বিবৃত মুখ হইতে অর্ধভক্ষিত শষ্পাঙ্কুর ঝরিয়া পড়ে, শরাঘাত-ভয়ে দীর্ঘায়ত দেহ আকুঞ্চিত হয়, সেই "গ্রীবাভঙ্গাভিরাম", প্রাণ-ভয়ে ধাবমান হরিণ-শিশু সুন্দর। ভস্মলাঞ্ছিত ললিত মধুর বীর অঙ্গে ধনুর্বাণ

ধরিয়া মূর্তিমান্ ধনুর্বেদরূপী, শৌর্য ও সৌকুমার্যের একাধার, কুবলয়দলশ্যাম বালক লব সুন্দর। যক্ষবনিতার প্রিয়ঙ্গুলতার ন্যায় অঙ্গসৌকুমার্য, চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণের ন্যায় অক্ষিপাত, শশধরের ন্যায় মুখশোভা, ময়ূরীর পুচ্ছভারের ন্যায় কেশকলাপ, পবনতাড়িত নদীর ক্ষুদ্র তরঙ্গ-হিল্লোলের ন্যায় ভ্রূবিলাস, যক্ষ-বনিতার রূপ সুন্দর। ইহা গেল সাকার জগতের কথা। নিরাকার জগতেও এইরূপ। পলিত-কেশ, বিকৃতমস্তক, নির্যাতনতৎপর, ধর্মজ্ঞান-বিরহিত, নির্বাসনকারী উন্মাদ পিতার রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে প্রাণপাত করিয়া, কর্ডিলিয়া চরিত্র সুন্দর। পিতার স্নেহ, জননীর আদর, প্রজার প্রসক্তি, অতুল বৈভব, অপার রাজ্যভোগ, ধরণীর মুকুট ছাড়িয়া রামচরিত্র সুন্দর। যাহার কামকল্পিত শঠতায় জীবনের নন্দনবন মরুভূমি হইয়াছে, সতীসাধ্বী প্রাণের প্রণয়িনী ঈর্ষা দানবীর বলিস্বরূপ হইয়াছে, সুখস্বপ্নময় মধুর ধরা নরকের কাল অন্ধকারে বিলীন হইযাছে, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশবৈরী পদানত শক্রর প্রতি পসথুমাসের (Cymbeline) ক্ষমাভার সুন্দর চিন্তাজাগরণে শরীর কৃশ হইয়াছে, উষ্ণ বিরহনিশ্বাসে অধর শুষ্ক হইয়াছে, বর্ষাজলতাড়িত তটভূমির মত মিলনাশা একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে, বেশরচনার আর স্পৃহা নাই, জগতের সুখে আর শান্তি নাই, প্রিয়তমার চিত্র প্রতিকৃতিতে আর সান্ত্বনা নাই, বিধুর দুষ্মন্তের এই বিরহভাব সুন্দর। নীলাকাশের দীপ্ত তারকায়, অস্তোন্মুখ সূর্যের অরুণ কিরণমালায়, স্ফুরণশীল মেঘবিতানে, গগনবিহারী বিহগগানে, সচল সাগরে, অচল ভূধরে, তরুলতার ফলে ফুলে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যে এক মহাশক্তির চিন্ময় বিকাশ দেখিতেন, যাহার সত্তায় জীব ও জড়জগৎ সত্তাবান্, যাহার অমর কল্পনা-সঙ্গীতে তাঁহার কবিতা প্রতিধ্বনিময়, সেই মহাশক্তি সুন্দর। গীতার মহাধ্যায়ে অর্জুন আদি-অন্ত-মধ্য-হীন, চরাচর-বিশ্বব্যাপী যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত বাহু, অনন্ত উরু, যাঁহার দীপ্তি কোটিসূর্য প্রভ, যাঁহার স্থিতি ত্রিকালব্যাপী, দেব দৈত্য নর নাগ যাঁহার ভগ্নাংশে অন্তর্ভূত, প্রলয়-সংক্ষুব্ধ যাঁহার বিশ্বোদরে, দংষ্ট্রা করাল যাঁহার কোটিমুখে মুষ্টিমেয় কৌরবসেনা অদর্শন হইয়াছিল—নদীর প্রবাহনিচয় যেরূপ সাগরে অদর্শন হয়, চঞ্চল পতঙ্গনিচয় যেরূপ অনলে অদর্শন হয়, সেই বিশ্বরূপ সনাতন পুরুষ সুন্দর।

ইহারা সুন্দর। কিন্তু কেন সুন্দর? সৌন্দর্য কি? যাহাতে রূপেন্দ্রিয়-সংযোগে আমাদের চিত্তরঞ্জিনী (Aesthetic) বৃত্তি উদ্রিক্ত হয়, তাহাই সুন্দর। ঐ বৃত্তির অনুভবই সৌন্দর্য। কথাটা একটু বুঝিয়া দেখা যাউক। ইন্দ্রিয় অর্থ জ্ঞানের সাধন। চক্ষু দ্বারা জ্ঞান হয়, অতএব চক্ষু ইন্দ্রিয়। কর্ণের দ্বারা শব্দজ্ঞান হয়, অতএব কর্ণ ইন্দ্রিয়। এইরূপ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। মনের দ্বারা সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মানস বিকারের জ্ঞান হয়, অতএব মনও ইন্দ্রিয়। এইরূপ, বুদ্ধি সত্য জ্ঞানের সাধন। বুদ্ধির দ্বারা আমরা সত্যাসত্য নির্ণয় করি, যুক্তি তর্ক বিচার করি; জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, জ্যামিতির তত্ত্ব উপলব্ধি করি; অতএব বুদ্ধি সত্যেন্দ্রিয়। বিবেক নীতি-জ্ঞানের সাধন, বিবেক দ্বারা আমরা ধর্মাধর্ম নির্ণয় করি, কি পাপ কি পুণ্য, ইহার নিশ্চয় করি, উচিত অনুচিত কর্তব্য অকর্তব্যের তত্ত্ব উপলব্ধি করি, অতএব বিবেক ধর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়, মন অন্তরিন্দ্রিয়, বুদ্ধি সত্যেন্দ্রিয় আর বিবেক ধর্মেন্দ্রিয়। সকল কয়টিই ইন্দ্রিয়, সকল কয়টিই জ্ঞানের সাধন। চক্ষুরাদি দ্বারা বহির্জগতের জ্ঞান হয়, মনের দ্বারা অন্তর্জগতের জ্ঞান হয়, বুদ্ধি দ্বারা বৌদ্ধজগতের (Intellectual) জ্ঞান হয়, এবং বিবেক দ্বারা অধ্যাত্ম-জগতের জ্ঞান হয়। কিন্তু সৌন্দর্য কোন্ জগতের অন্তর্ভূত? বহির্, অন্তর্, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম, এই চারি জগতের কোন্ জগতের অন্তর্ভূত? এই চারি বই ত আর জগতের ভেদ নাই। সৌন্দর্য যদি ইহাদের অন্তর্ভূত না হয়, তবে সে জগৎছাড়া, সৃষ্টিছাড়া। না, সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সকল জগতেই অনুভূত হয়, সৌন্দর্যের সত্তা সকল জগতেই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। কি বহির, কি অন্তর্, কি বৌদ্ধ, কি অধ্যাত্ম—সুন্দর নাই কোন্ জগতে? তবে সুন্দরের উপলব্ধি হয় কেমন করিয়া?

সৌন্দর্যের যে উপলব্ধি হয়, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ; অতএব সর্ববাদি-সম্মত। আর সৌন্দর্য যে রূপরসাদির ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, সুখ-দুঃখাদি মানসবিকারের ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, সত্যাসত্যের ন্যায় সত্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, এবং ধর্মাধর্মের ন্যায় ধর্মেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত। অথচ সৌন্দর্যের জ্ঞান সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং এই জ্ঞানের সাধন—রূপেন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। যেরূপ বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগে রূপাদির জ্ঞান হয়, অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোগে সুখদুঃখাদির জ্ঞান হয়, সত্যেন্দ্রিয়ের সংযোগে

সত্যাসত্যের জ্ঞান হয়, এবং ধর্মেন্দ্রিয়ের সংযোগে ধর্মাধর্মের জ্ঞান হয় ; সেইরূপ রূপেন্দ্রিয়ের সংযোগে সৌন্দর্যের জ্ঞান হয়। রূপাদি, সুখদুঃখাদি, সত্যাসত্য, ধর্মাধর্ম, সৌন্দর্য, সকলই বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি সুতরাং তাহাদের সাধন বহিরিন্দ্রিয়, অন্তররিন্দ্রিয়, সত্যেন্দ্রিয় ও রূপেন্দ্রিয়ও বিভিন্ন।

ইন্দ্রিয় পাঁচটি সিদ্ধ হইল ; কিন্তু জগতের ত চারটি বই পাঁচটি বিভাগ নাই। বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ এই ত চারিটি জগৎ। তবে সৌন্দর্যজগৎ কোন বিভাগের অন্তর্ভূত ?

পূর্বধৃত সৌন্দর্যের উদাহরণগুলি একবার স্মরণ করুন। গিরিচূড়া, গহনবন, নদনদী, সরোবর, বালতপন, নীলাকাশ, মলয়পবন, বসন্তলক্ষ্মী, উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধি ও ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশেষ, ইহারা কি বহির্জগতের অন্তর্ভূত নয় ? অথচ ইহারা সুন্দর। এইরূপ গ্রীবাভঙ্গাভিরাম হরিণশিশু, কুবলয়দলশ্যাম বালক লব ও প্রকৃতির শোভায় শোভাময়ী যক্ষবনিতা, ইহারা কি চেতন বহির্জগতের অন্তর্ভূত নহে ? অথচ ইহারা সুন্দর। এই জড় ও চেতন বহির্জগৎ মিলিয়া সাকার জগৎ। আর অন্তর্, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম, এই অপর তিন জগৎ মিলিয়া নিরাকার জগৎ। আবার উদাহরণ স্মরণ করুন। পদানত শত্রুর প্রতি ক্ষমাভাব এবং বিধুর দুষ্মন্তের বিরহভাব, ইহারা কি অন্তর্জগতের অন্তর্ভূত নহে ? অথচ ইহারা সুন্দর। এইরূপ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিশ্বময়ী চিন্ময়ী মহাশক্তি ও গীতার চরাচরব্যাপী বিশ্বরূপ সনাতন পুরুষ, ইহারা কি বৌদ্ধজগতের অন্তর্ভূত নহেন ? অথচ ইহারা সুন্দর। আবার দেবীমানবী করডিলিয়া-চিত্র ও নরনারায়ণ রাম-চরিত্র, ইহারা কি অধ্যাত্ম জগতের অন্তর্ভূত নহে ? অথচ ইহারা সুন্দর।

আবার দেখুন ! দাবদগ্ধ অরণ্যানী, বিকট বজ্র-নির্ঘোষ, জীর্ণ ভগ্ন পর্ণকুটীর, ইহারা জড় বহির্জগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। মর্কট শিশু কালিবন্, পিশাচিনী, ইহারা চেতন বহির্জগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। এইরূপ শকারের আত্মম্ভরিতা ও শয়তানের দেবদ্বেষ অন্তর্জগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। চার্বাকের নাস্তিকতা ও হব্‌সের স্বার্থবাদ, বৌদ্ধজগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। আবার দানব ইয়াগো ও দানবী রিগণ অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। অতএব আমরা দেখিলাম, যাহাই সুন্দর, তাহাই বহির্জগৎ, কিম্বা অন্তর্জগৎ, কিম্বা বৌদ্ধজগৎ, কিম্বা অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত ;

কি যাহাই বহির্, অন্তর, বৌদ্ধ বা অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত, তাহাই সুন্দর নহে। অর্থাৎ, এই চারি জগতের কতক অংশ সুন্দর ও কতক অংশ অসুন্দর। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, রূপেন্দ্রিয়ই সৌন্দর্যজ্ঞানের সাধন। রূপেন্দ্রিয়ের সংযোগেই সৌন্দর্যজ্ঞান হয়। অর্থাৎ বহির্, অন্তর্, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম জগতের যে পদার্থই রূপেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যে পদার্থেরই সহিত রূপেন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্ভব হয়, তাহাই সুন্দর—বহির্, অন্তর্, বৌদ্ধ, অধ্যাত্ম যে জগতের অন্তর্ভূত হউক, ঐ পদার্থই সুন্দর ; আর ঐ পদার্থ ও রূপেন্দ্রিয় সংযোগে যে মানসিক বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি তাহাই সৌন্দর্য। এখন আমরা প্রকৃত সুন্দর-লক্ষণ বুঝিব। "যাহাতে রূপেন্দ্রিয় সংযোগে আমাদের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির উদ্রেক হয়, তাহাই সুন্দর।"

অতএব আমরা দেখিলাম, কতকস্থলে একই পদার্থ বহির্জগৎ ও সৌন্দর্য-জগতের অংশভূত ; একই পদার্থ অন্তর্জগৎ ও সৌন্দর্যজগতের অংশভূত , একই পদার্থ বৌদ্ধজগৎ ও সৌন্দর্যজগতের অংশভূত ; একই পদার্থ অধ্যাত্মজগৎ ও সৌন্দর্যজগতের অংশভূত। অর্থাৎ, কতক স্থলে যাহাই জড়, তাহাই সুন্দর , যাহাই মানস, তাহাই সুন্দর ; যাহাই সত্য তাহাই সুন্দর , যাহাই ধর্ম, তাহাই সুন্দর ইহা বড় বিচিত্রও নহে। একই পদার্থের দ্বৈতভাব (Duality), ইহার দৃষ্টান্ত অন্যত্রও পাওয়া যায়। দেখুন, একই নরসিংহ, একদিক হইতে দেখিলে নর, অন্যদিক্ হইতে দেখিলে সিংহ। এইরূপ একই ব্রহ্ম মায়াযুক্ত হইয়া পরিণামীরূপে সাকার জড়জগৎ, এবং মায়ামুক্ত হইয়া চিদাভাসরূপে নিরাকার অধ্যাত্মজগৎ। অতএব, একই পদার্থ বহির, অন্তর্, সত্য ও ধর্মেন্দ্রিয় সংযোগে, যথাক্রমে রূপাদি, সুখাদি, সত্য ও ধর্ম , কিন্তু রূপেন্দ্রিয় সংযোগে সেই পদার্থই সৌন্দর্য। বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, সত্যেন্দ্রিয়, ধর্মেন্দ্রিয়, রূপেন্দ্রিয়, প্রত্যেকই আত্মার এক একটি শক্তি। আত্মা এই পঞ্চশক্তি-সমন্বিত হইলেও এক বই দুই নহে ; কিন্তু প্রতি ইন্দ্রিয়ের সহকারে এক একটি বিভিন্ন জগৎ উপলব্ধি করে—বহির্, অন্তর্, সত্য, ধর্ম ও রূপেন্দ্রিয় সহকারে যথাক্রমে বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ, অধ্যাত্মজগৎ ও সৌন্দর্যজগৎ।

ইন্দ্রিয় আত্মার শক্তিবিশেষ। শক্তি মাত্রেরই ক্ষুদ্রত্ব মহত্ত্ব পরিমাণভেদে ভেদ কল্পিত হয়। ইন্দ্রিয়শক্তিরও এইরূপ। সকলের সকল ইন্দ্রিয়শক্তি সমান তীক্ষ্ণ নহে। প্রথমে বহিরিন্দ্রিয়ের কথা ধরা যাউক। চক্ষু কর্ণ নাসিকা

জিহ্বা ত্বক, এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়, সকল জীবেই সমানভাবে বর্তমান আছে, কিন্তু সকলে সমান শক্তিশালী নহে। আমি হয়ত শত হস্ত দূরে দেখিতে পাইব না; কিন্তু বাজপক্ষী আকাশে উড়িয়া এক ক্রোশ দূরে শিকার খুঁজিয়া লইবে তুমি হয়ত বন্য পশুর পদচিহ্ন অনুভব করিতে পারিবে না; কিন্তু কুকুর তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিবে। তিনি হয়ত সঙ্গীত শুনিয়া বিরক্তিতে মুখ ফিরাইবেন; কিন্তু হরিণী বংশীধ্বনিতে আপন হারাইয়া ব্যাধের জালাবদ্ধ হইবে। এইরূপ অন্যত্র। এ সকল স্থলেই শক্তির তারতম্যই কারণ; কাহারও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল, কাহারও দুর্বল। অন্য জাতীয় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। শুনিয়াছি সুখিকাশয্যায় শুইয়া এক সুন্দরীর গোলাপ-পাপড়ার পেষণে দুঃখানুভব হইয়াছিল, অথচ শ্রমকঠোর মানুষ লোক ছাড়িয়া, আবেশময় পরীস্থানে যাইয়া, বটমের (Midsummer-Night's Dream) খেয়ালে আসে নাই। ইহা আর কিছু নয়, অন্তরিন্দ্রিয়-শক্তির তারতম্য।

এইরূপ অশিক্ষিত বালক পাসকাল্ (Pascal) অমার্জিত বুদ্ধিবলে কত গণিততত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু শত গুরুর তাড়নায় আজিও আমি একটা জ্যামিতির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না! ইহা সত্যেন্দ্রিয়ের তারতম্য বই আর কি? শিশু প্রহ্লাদ, বিষ্ণুদ্বেষী পিতার পুত্র, দিক্-হস্তি-পদতলে, অপার জলধিজলে, হুতাশনের তীব্র দহনে ও কালসর্পের তীক্ষ্ণ দংশনে মধুর হরিনাম গাহিত, কিন্তু কত পাষণ্ড ধর্মসমাজে লালিত হইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণে বৃশ্চিকযন্ত্রণা অনুভব করে। ইহার কারণ ধর্মেন্দ্রিয়ের তারতম্য বই আর কিছুই নহে। এইরূপ রূপেন্দ্রিয়ও শক্তিবিশেষ; জীবভেদে ইহারও তারতম্য অবশ্যই আছে। কবি পোপ ঈশ্বরসৃষ্ট জগতে কেবল বাকছল ও অর্থবিন্যাসের উপাদান দেখিতেন; কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সেই জগতে চিন্ময়ী মহাশক্তির বৈচিত্র্যময় ক্রীড়া দেখিতেন। ইহাও সেই ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্য।

এই তারতম্য আবার প্রকৃতি ও অনুশীলন সাপেক্ষ। প্রকৃতি মুখ্য, অনুশীলন গৌণ। শত শিক্ষায়ও বোধ হয় তুমি রাসভকে সঙ্গীতের মোহিনী বুঝাইতে পারিবে না। কিন্তু অনুশীলনও নিরর্থক নহে। অসভ্যের অপেক্ষা সভ্যের অশিক্ষিতের অপেক্ষা শিক্ষিতের বুদ্ধি পরিমার্জিত।

ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্যফলে আমরা দেখিতেছি যে, যে পদার্থ আমি রূপ বলিয়া উপলব্ধি করি না, বাজপক্ষী তাহা করে, যাহাকে তুমি গন্ধ বলিয়া উপলব্ধি কর না, কুকুরে তাহা করে। যাহাকে বটম সুখ দুঃখ বলিয়া উপলব্ধি করে না, পুষ্পশয্যা-শায়িতা সুন্দরী তাহা করে। যাহাকে মূঢ়মতি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে না, ধীমান তাহা করে। যাহাকে পাষণ্ড ধর্ম বলিয়া উপলব্ধি করে না, প্রহ্লাদ তাহা করেন। যাহাকে পোপ সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করেন না, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাহা করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি, এই উপলব্ধির ইতরবিশেষ, প্রকৃতি ও অনুশীলন সাপেক্ষ। এখানে একটা সন্দেহ উঠিতে পারে যে, রূপ রস, সুখ দুঃখ, সত্য অসত্য, ধর্ম অধর্ম, সুন্দর অসুন্দর, এই ভেদ হয়ত ইন্দ্রিয়শক্তির প্রবলতা দুর্বলতা সাপেক্ষ। হয়ত সম্যক্ স্ফূর্ত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে রসও রূপ, দুঃখও সুখ, অসত্যও সত্য, অধর্মও ধর্ম, অসুন্দরও সুন্দর। হয়ত ইহাদের ভেদ কাল্পনিক। এ আশঙ্কা অমূলক। যে হেতু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্তি হউক না, তাহাতে রূপ বই রসের জ্ঞান হইবে না। রসনেন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্তি হউক না, তাহাতে রস বই রূপের জ্ঞান হইবে না। এইরূপ অন্যত্র। অন্তরিন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্তি হউক, তাহাতে সুখ দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না। সত্যেন্দ্রিয়ের যতই স্ফূর্তি হউক, তাহাতে অসত্য সত্য হইবে না। ধর্মেন্দ্রিয়ের যতই স্ফূর্তি হউক, তাহাতে অধর্ম ধর্ম হইবে না। আর রূপেন্দ্রিয়ের যতই স্ফূর্তি হউক, তাহাতে অসুন্দর সুন্দর হইবে না। অতএব দাবদগ্ধ অরণ্য, বাত্যাবিকট অশনিনির্ঘোষ, পশু-মানব কালিবন, আত্মম্ভরিতা, দেবদ্বেষ, নাস্তিকতা, স্বার্থবাদ, ইয়াগো, রিগণ, ইহারা অসুন্দর বই কিছুতেই সুন্দর হইবে না। বরং রূপেন্দ্রিয়ের সম্যক্ স্ফূর্তিতে ইহাদের অসুন্দরত্ব আরও অসুন্দর হইবে।

আমরা এ অবধি আলোচনা করিয়া এই কয়টি কথা পাইলাম। আত্মা ইন্দ্রিয়শক্তির আধার। এই ইন্দ্রিয়শক্তি বহির্ অন্তর্ সত্য ধর্ম ও রূপ ভেদে পঞ্চবিধ। এক একটির সহকারে আত্মা যথাক্রমে বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধ-জগৎ, অধ্যাত্মজগৎ ও সৌন্দর্যজগৎ উপলব্ধি করে। এই সৌন্দর্যজগতের আর চারি জগৎ হইতে বিভিন্ন সত্তা নাই, কিন্তু ঐ জগৎ আর চারি জগতের অন্তর্ভূত। একই পদার্থ বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগে বহির্জগৎ, আবার রূপেন্দ্রিয় সংযোগে ঐ পদার্থ ই সৌন্দর্যজগৎ। পদার্থের এই দ্বৈতভাব অবশ্যই স্বীকার্য।

আর জগতে সকল পদার্থই সুন্দর নহে, কেহ সুন্দর, কেহ অসুন্দর। যাহা রূপেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, রূপেন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাই সুন্দর, যাহা অগ্রাহ্য, অবিষয়, তাহাই অসুন্দর। সুন্দর অসুন্দরের এই ভেদ কাল্পনিক নহে, কিন্তু তেজঃ-তিমিরের মত অত্যন্ত ভিন্ন।

এই রূপেন্দ্রিয়ের আবার প্রকৃতি ও অনুশীলনবশে তারতম্য দৃষ্ট হয়; কোন জীবে ইহার শক্তি প্রবল, কোন জীবে দুর্বল। যাহার রূপেন্দ্রিয়ের যত তীক্ষ্ণতা, সৌন্দর্যজগতের তত বেশী অংশ তাহার উপলব্ধি হয়। সুতরাং যাহা তুমি আমি সুন্দর বলিয়া অনুভব করি না, সে প্রবল ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে তাহার সৌন্দর্য দেখিতে পায়। অতএব, সৌন্দর্য-জগতের পরিমাণের তারতম্য, রূপেন্দ্রিয়ের স্ফূর্তির তারতম্যসাপেক্ষ। যদি ঐ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহার সাক্ষাতে সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

কিন্তু মানুষে এই শক্তিবিকাশের, এই ইন্দ্রিয়স্ফূর্তির একটা সীমা আছে; বিকাশ, স্ফূর্তি ঐ সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি চক্ষুর যতই অনুশীলন কর, কিছুতেই শত যোজন দূরে দেখিতে পাইবে না। তুমি কর্ণের যতই অনুশীলন কর, কিছুতেই সূক্ষ্মতর গীতাংশ শুনিতে পাইবে না। এইরূপই যতই বুদ্ধি পরিমার্জিত কর, ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। অতএব সকল ইন্দ্রিয়স্ফূর্তির একটা সীমা আছে; মানুষে তাহার অতিক্রম করিতে পারে না। তবে মানুষ যদি মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিতে পারে, মানব যদি দেবমানব হইতে পারে, তবে এই সীমানা-বিচার থাকে না। তখন চক্ষুর দূর-নিকট-বিচার থাকে না; দূরত্ব সূক্ষ্মত্ব ঈশ্বরত্ব, সকলই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়। এক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, অন্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। বুদ্ধি সম্বন্ধে যে কথা প্রযুজ্য, রূপেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। অর্থাৎ রূপেন্দ্রিয়ের শক্তিও সীমাবদ্ধ। ইহারও বিকাশস্ফূর্তির সীমানা আছে, যাহা সাধারণ মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না। যাহারা পারে, তাহারা মানুষ নয় অমানুষ, দেবমানব। তাহাদের সাক্ষাতে যেন সমগ্র সৌন্দর্যজগৎ অবভাত হয়, যেন, বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ, আপন আপন আবরণবসন ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের নগ্ন সৌন্দর্যস্বরূপ প্রকট করিয়া শোভিত হয়। কালিদাসের সাক্ষাতে ঐরূপ

হইয়াছিল। তিনি অমানুষ, দেবমানব। তাঁহার রূপেন্দ্রিয় সম্যক্ স্ফূত। "তিনি সৌন্দর্যের কবি, তাঁহার সৌন্দর্যদৃষ্টি অমানুষী।"

(২)

প্রথমেই বহির্জগৎ; অর্থাৎ যে জগৎ চক্ষুঃ-আদি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এ জগৎ আবার জড় ও চেতন ভেদে দ্বিবিধ। জড় জগৎ দুইভাগে বিভাজ্য—প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম; যে জড়জগতে মানুষের ক্রিয়াশক্তি প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাই প্রাকৃতিক জগৎ, যথা নগ, নদী ইত্যাদি। আর যে জড়জগৎ মনুষ্যের ক্রিয়াধীন, তাহাই কৃত্রিম জগৎ; যথা প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি। চেতন জগতের একদিকে নর-নারী, অপর দিকে পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ। জড়জগৎ ও জীবজগৎ, উভয়ই এক স্রষ্টার সৃষ্টি-কায, সুতরাং গণনায় বিভিন্ন হইলেও অনুভবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এইজন্য আমরা দেখি, প্রাকৃতিক জগতের সহিত জীবজগতের পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী অবিযুক্ত হইয়া আছে, আর কৃত্রিম জগতের সহিত জীবজগতের নরনারী সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। কালিদাসের কাব্যেও আমরা ইহাই দেখিব।

প্রাকৃতিক জগৎ অনন্ত-বিস্তার; জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এই বিস্তৃতির সীমা নাই। কালিদাসের কাব্যে এই অনন্ত বিস্তার প্রকৃতির অনন্ত-বিস্তার ছায়া বিদ্যমান। তাঁহার কাব্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্ত ভাণ্ডার; কোন পদার্থেরই অভাব নাই, যাহার সন্ধান করিবে, সেই সৌন্দর্যই মিলিবে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, শর্বরী, তপনারুণ, কৌমুদী বিভাত, তারকাখচিত আকাশমণ্ডল; ইন্দ্রধনুরঞ্জিত, তড়িৎ-উন্মেষস্ফুরিত মৃদু-পবন চালিত, মধুরনাদী মেদুর মেঘমালা; আর ফলিত তরু, পুষ্পিতা লতা, নবীন শষ্পাঙ্কুর, উজ্জ্বল ওষধি, ফুল্ল ফল, ভ্রমর-স্পৃষ্ট মুকুল, স্ফুটনোন্মুখ কিশলয়, ছায়াময় কুঞ্জবন, সুখময় উপবন, নিবিড় অরণ্য, অটল ভূধর, উত্তাল সাগর, উল্লসিত তটিনী, বীচিবিহ্বল সরোবর, ফেনিল প্রস্রবণ; আর কত বলিব, যাহা খুঁজিবে তাহাই পাইবে। দুই একটা উদাহরণ দিই। কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে কবি হিমালয় বর্ণন করিয়াছেন। সে বর্ণনা এইরূপ;—

"ভারতের উত্তরে হিমালয় নামে গিরিবর পৃথিবীর মানদণ্ডের মত অবস্থিত আছে। ইহার বিস্তৃতি পূর্ব হইতে পশ্চিমে সাগর পর্যন্ত। মহার্ঘ মণি ও

মহৌষধিতে মণ্ডিত হইয়া গিরি সকল পর্বতের শ্রেষ্ঠতম হইয়াছে। হিমালয় হিমের আলয়; কিন্তু অনন্ত রত্নের তুলনায় এক হিমদোষ লক্ষিত হয় না। গিরির উচ্চ শিখর নীরদে সংক্রামিত, অপ্সরার প্রসাধনভূত সন্ধ্যারুণ ধাতুরাগ ধারণ করে। ইহার সানুদেশে ভ্রাম্যমাণ মেঘের মেখলা; শৃঙ্গে ছায়াহীন সূর্যাতপ। সিদ্ধেরা ধারাক্লিষ্ট হইয়া ঐ শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে করিশোণিতসিক্ত কেশরীর রক্তপদ তুষার-জলে ধৌত হয়; কেবল কুম্ভভ্রষ্ট মুক্তাফল নখচ্যুত হইয়া গমনমার্গের সূচনা করে। এখানে ভূর্জদল ধাতুরাগে লিখিত হইয়া বিদ্যাধরাঙ্গনার মদনলেখের সমাধান করে। এখানে কীচক বায়ুপূরিত হইয়া উচ্চতানে কিন্নর-গায়কের সহকারিতা করে। এখানে সমীরণ করিকপোলকর্ষিত সরল তরুর রসে সুরভিত হইয়া প্রবাহিত হয়। এখানে কিরাতদম্পতী প্রদীপহীন গিরিগুহায় ওষধিপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়। এখানে কিন্নরী ঘন তুষারে ক্লিষ্টপদ হইয়াও গুরু-নিতম্ব-পয়োধর-ভারে মন্দ গতিতে গমন করে। এখানে ঘনান্ধকার যেন দিবাকরভয়ে লুকাইয়া রয়। এখানে চমরী কৌমুদীধবল পুচ্ছ আন্দোলিয়া যেন গিরিরাজকে চামর ব্যজন করে। এখানে মেঘ গুহা অবরোধ করিয়া বিবস্ত্রা কিন্নরীর লজ্জা নিবারণ করে। এখানে শীতল বায়ু গঙ্গাশীকর বহিয়া, দেবদারু কাঁপাইয়া, ময়ূর-পুচ্ছ দুলাইয়া, মৃগয়াশ্রান্ত ব্যাধের শান্তি বিধান করে। এখানে শিখরসরোজলে নলিনী সূর্যের ঊর্ধ্বমুখ কিরণ প্রস্ফুট হয়; সপ্তর্ষি মণ্ডল এই পুষ্প চয়ন করেন।"

মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, বায়রণ (Manfred), সেলি (Alastor, Prometheus), ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সকলেই পর্বত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রৈবতক, ইন্দ্রনীল প্রস্রবণ, আল্‌প্‌স্‌ (Alps), ককেসস্‌, স্কিড্‌ড—কেহই সৌন্দর্যে কালিদাসের হিমালয়ের সমকক্ষ নহে। সকল বর্ণনা তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কাহারও পর্বত ভীষণ কাহারও গম্ভীর, কাহারও প্রশান্ত, কাহারও মহান্‌, কিন্তু কোন পর্বতই কালিদাসের হিমালয়ের মত সুন্দর নহে। রঘুর সমুদ্র-বর্ণনা সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। কোন কবি (বায়রণ) প্রাকৃতিক জগতে এক বিশ্বময়ী মহাশক্তির চিন্ময় বিকাশ দেখিতেন; কোন কবি (ভবভূতি) প্রাকৃতিক জগতে প্রশান্ত গম্ভীরতার মহামূর্তি দেখিতেন; কিন্তু কেহই কালিদাসের মত, প্রকৃতিতে সুষমার, শোভার, মধুরতার, সুন্দরতার আবাসভূমি দেখিতে পাইতেন না।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। হিমালয়ের গিরিবনে বসন্তসমাগম হইল। কুসুমধনু হাতে রতিপতি রতির সহিত কাননে প্রবেশ করিলেন। অমনি মলয়-পবন দিক্‌বালার নিশ্বাসের মত বহিতে লাগিল। অশোক অকালে পল্লবিত হইয়া কুসুমিত হইল। চূত মুকুলিত হইয়া ভ্রমরসংস্পর্শে ফুলশরের মত শোভিতে লাগিল। কর্ণিকার ফুটিয়া বর্ণশোভায় শোভিত হইল. হায় সে নির্গন্ধ পলাশ বালেন্দুবক্র অর্দ্ধপ্রস্ফুট লোহিত কুসুম ধারণ করিল, যেন বসন্তলক্ষ্মী ভ্রমরের অঞ্জন তিলক পরিয়া, অরুণ প্রবালরাগে ওষ্ঠ রঞ্জিত করিলেন। তিলক তরু পুষ্পিত হইয়া মঞ্জরীপরাগে মৃগের দৃষ্টি রোধ করিল। বনস্থল অনিল-চালিত পত্রের মর্ম্মর-রবে মুখরিত হইল, কোকিল চূত মুকুল আস্বাদিয়া, মানিনীর মান টুটাইয়া, মধুর কুহরণ করিয়া উঠিল। কিন্নরার বিপাণ্ডুর আননের পত্ররচনায় স্বেদজল শোভিতে লাগিল। বসন্ত-সমাগমে প্রাণিজগতে প্রেমরস উছলিয়া উঠিল। অনুরাগে মধুকর মধুকরীর সহিত এক ফুলে মধু পান করিল। মৃগ শৃঙ্গ দিয়া আবেশে মুদিতনয়না মৃগীর গাত্র কণ্ডূয়ন করিল। করিণী পদ্মরাগ-সুরভি গণ্ডূষজল করীর মুখে তুলিয়া দিল। চক্রবাক অর্দ্ধভুক্ত মৃণালে চক্রবাকীর আরাধনা করিল। কিন্নর পুষ্পাসবপানে উদ্‌ভ্রান্ত-লোচনা, শ্রমজল লুলিতা কিন্নরীর গীতাবসানে মুখ চুম্বন করিল। তরু নবপল্লবিতা, স্তবকাভিনম্রা লতাবধূকে শাখাবাহু বেষ্টিয়া আলিঙ্গন করিল।"

কাব্যজগতে এমন সুন্দর প্রাকৃতিক বর্ণনা আর কোথাও আছে কি? দেখুন সেই পুরাতন তরু লতা, কুসুম পল্লব, মৃগ মৃগী ইত্যাদি; কিন্তু কি সুন্দর সমাবেশ! মিলটন্ কৃত স্বর্গোদ্যানের বর্ণনা ইহার তুলনায় হটিয়া যায়। মিলটন্ ত্রিদিবের চিত্র আঁকিতে বসিয়া অবশ্যই সৌন্দর্য্যজগতের সকল উপাদান একত্র করিয়াছেন, কিন্তু এমন সুন্দর হইয়াছে কি?

ভবভূতির বর্ণনাও সুন্দর, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যে ভীষণতার সমাবেশ আছে, কালিদাসের সৌন্দর্য্যে সুধুই সুন্দরতা। কালিদাসের প্রাকৃতিক বর্ণনার সমালোচনা, ঋতুসংহার সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিলে শেষ হয় না। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত, এই ছয় ঋতু যথাক্রমে ঋতু সংহারে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যজগতের অন্যত্র যাহা এখানেও তাহাই—সুন্দরের পর সুন্দর, তার পর সুন্দর। এই দাবানল-বর্ণনা দেখুন।

"ঐ দাবানল! প্রবলবেগে বনভূমে জ্বলিয়া উঠিল; ঐ বৃক্ষ হইতে

লতাগ্রে পর্যন্ত হইয়া দিকে দিকে প্রসৃত হইল। ইহার দীপ্তি বিকচ-কুসুম পুষ্পারুণ।

"ঐ বায়ু-সংক্ষুব্ধ হইমা গিরিগুহায় জলিতেছে, ঐ তৃণরাশি বিদগ্ধ করিতেছে। শুষ্ক বংশবন বিকট রবে স্ফুটিত হইতেছে; মৃগযূথ অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া ব্যাকুলভাবে পলাইতেছে।

"দাবানল জ্বলিল! শুষ্কপত্র, জীর্ণশাখ, উচ্চ পাদপ লঙ্ঘিয়া, দাবানল বন ছাইয়া জ্বলিল। বহ্নিদগ্ধ মৃগ করী কেশরী বৈরিভাব ভুলিয়া প্রাণভয়ে নদীজলে লুকাইল।"

কালিদাসের বর্ষা-বর্ণন পাঠ করুন।

"বর্ষাকাল রাজার মত সমৃদ্ধ; জলধর ইহার জয়কুঞ্জর, তড়িৎ ইহার জয়-পতাকা, বজ্র-নির্ঘোষ ইহার জয়ঢক্কা।"

"আকাশ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল; মেঘ কোথায়ও নীলোৎপলকান্তি, কোথায়ও অঞ্জনকৃষ্ণ, কোথায়ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ। মেঘ ধারাবর্ষী, জলভারে অবনত, মধুর রবে মন্থর গমনে আকাশে ভাসিয়া চলিল। তৃষাকুল চাতককুল চাহিয়া রহিল। শষ্পাঙ্কুর, কন্দলীদল ও ইন্দ্রগোপকীটে মণিময় হইয়া ধরণী মোহিনী সাজিল। উৎসবে ময়ূর মধুর কেকারবে পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতে লাগিল; নদী পূর্ণকায়ে তটতরু উপাড়িয়া পঙ্কিল সলিলে সবেগে সাগরসঙ্গমে চলিল। মৃগ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিলোল নেত্রে বনস্থলে ধাবমান হইল। অভিসারিকা অনুরাগে মেঘমন্দ্রে অবহেলা করিয়া, ঘনান্ধকার রজনীতে বিদ্যুৎপ্রভায় পথ খুঁজিয়া, প্রিয়সমাগমে চলিল। মানিনী বজ্রনির্ঘোষে চমকিয়া, অভিমান ভুলিয়া, প্রিয়কে আলিঙ্গন করিল। বিরহিণী মালা খুলিয়া আভরণ ফেলিয়া নয়ন-জলে সিক্ত হইল। নববারি ধূলিধূসর হইয়া বক্রগতিতে নিম্নাভিমুখে বহিয়া চলিল। ভেককুল আনন্দে কলরব করিতে লাগিল। ভ্রমর মধুহীন নলিনী ছাড়িয়া মধুর গুঞ্জনে ময়ূরপুচ্ছে উড়িয়া বসিল। বনকরী মদমত্ত হইয়া গভীর গর্জনে গণ্ডস্থলে মদবারি ক্ষরণ করিল। ভূধর শত প্রস্রবণে জলময় হইয়া শ্বেতাভ নীরদ শিখরে ধরিয়া, ময়ূরসমাকুল হইয়া শোভিতে লাগিল। সুরভি সমীরণ কুসুমিত কদম্ব-কেতকী-বন কাঁপাইয়া, শীকরসম্পর্কে শীতল হইয়া বহিয়া চলিল। রমণী কদম্ব-কেশর-কেতকীর মালা পরিয়া, ককুভমঞ্জরীতে কর্ণাভরণ রচিয়া মোহিনী সাজিল। মেঘ ইন্দ্রধনু ধরিয়া, মৃদু পবনে বিধূত হইয়া

বিন্ত্যদামে মন হরণ করিল। বকুল মালতী কদম্ব যূথিকা, ফুল ফুটাইয়া কামিনীর অঙ্গ প্রসাধন করিল।

"জলদকাল অনেক গুণে রমণীয়; ইহা সকলের প্রীতিপ্রদ, ইহা প্রাণীর প্রাণভূত।"

আমরা দেখিয়াছি, জড়জগৎ দুই ভাগে বিভাজ্য; প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক জগতের বর্ণনা দেখিলাম; এখন কৃত্রিম জগতের কিছু আলোচনা করা যা'ক। যে জড়জগৎ মনুষ্যের ক্রিয়াসিদ্ধ, তাহাই কৃত্রিম-জগৎ। কৃতী মনুষ্য, শোভার উপর শোভা চাপাইয়া, রুচি-বাসনা অনুসারে ইহাকে সমৃদ্ধিময় করিয়াছে; কৌশলে প্রকৃতিকে স্বেচ্ছানুসারিণী করিয়া সহকারিণী করিয়াছে।

জড় কৃত্রিম জগতের দুই ভাব। প্রথম শোভাময়, সমৃদ্ধিময় দেউল, প্রাসাদ, দ্বিতীয় শান্তিময়, বিষাদময় ভগ্নাবশেষ। আমরা দেখিব, উভয়েরই বর্ণনায় কালিদাস অতুল্য।

কুবের নগরী অলকার বর্ণনা এইরূপ:—"অলকা অদ্ভুত পুরী। এখানে মন্দ-মৃদঙ্গধ্বনি-মুখর অভ্রভেদী মণিময় সচিত্র প্রাসাদমালায় বিদ্যুৎবরণী ললিত ললনা বিহার করে। এখানে কালের শাসন না মানিয়া ছয় ঋতু একত্র বিরাজ করে; তাই যক্ষবধূ ফুলসাজে সাজিয়া, লোধ্রপরাগে মুখরাগ করিয়া, চূড়ায় নবকুরুবক বাঁধিয়া, কুন্দকুসুম কেশে গাঁথিয়া, কর্ণে শিরীষ ধরিয়া, সীমন্তে কদম্ব দোলাইয়া, হস্তে লীলাকমল লইয়া ফুলময়ী সাজে। এখানে তরু নিত্য পুষ্পিত হইয়া মধুমত্ত ভ্রমরে মুখরিত হয়, সরোবরে নিত্য নলিনী ফুটিয়া হংসসমাকুল হয়, ময়ূর নিত্য পুচ্ছ তুলিয়া কেকারব করে, প্রদোষে নিত্য জ্যোৎস্না ফুটিয়া অন্ধকার নাশ করে। এখানে শুধু আনন্দের অশ্রুজল, অন্য অশ্রুজল নাই, সুধু ফুলশরের তাপ, অন্য তাপ নাই, সুধু প্রণয়কলহে বিরহ, অন্য বিরহ নাই, সুধু অনন্ত যৌবন, অন্য বয়স নাই। এখানে নিত্য মহোৎসব; কোথায়ও যক্ষদম্পতী মণিময় পানগৃহে পুষ্পাসব পান করে; কোথায়ও মণি-প্রদীপ উজ্জ্বলে জ্বলিয়া বিবস্ত্রা যক্ষবধূর লজ্জা বিধান করে; কোথায়ও শশিকরে চন্দ্রকান্তমণি ঝরিয়া যক্ষাঙ্গনার অনঙ্গ-জ্বালা নিবারণ করে; কোথায়ও কিন্নরগণ মিলিয়া একতানে মধুর স্বরে ধনপতির যশোগান করে; কোথায়ও মন্দাকিনী-কণবাহী শীতল পবনে মন্দারছায়ায় যক্ষকন্যা মণি লুকাইয়া কনকবালুকায় কন্দুক ক্রীড়া করে। এখানে নিশীথে উদ্‌ভ্রান্ত অভিসারিকা পথ

চলিয়া যায়, তাহার কেশ হইতে মন্দার-কুসুম খসিয়া পড়ে, কর্ণ হইতে কনক-কমল ঝরিয়া পড়ে, কেশ হইতে মুক্তাজাল সরিয়া যায়, কণ্ঠ হইতে হারযষ্টি ছিঁড়িয়া যায়। এখানে ভয়ে কাম ফুলধনু গুটাইয়া থাকে, কিন্তু চতুর রমণীর ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ-শরে তাহার অভাব দূর হয়। এখানে অপূর্ব কল্পতরু বিরাজ করে; তাহাতেই যক্ষবধূর সকল প্রসাধন সিদ্ধ হয়। বিচিত্র বসন, বিচিত্র মধু-পুষ্পকিশলয়ে বিচিত্র ভূষণ, চরণকমলের বিচিত্র লাক্ষারাগ, তরু সকলই প্রসব করে।

"মণিহারে যেমন মধ্যমণি, সরোবরে যেমন প্রফুল্ল কমল, অলকায় তেমনি মনোহর যক্ষগৃহ। তাহার তোরণ ইন্দ্রধনু-সুন্দর, সম্মুখে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলভারে নত তরুণ মন্দার-তরু। অদূরে শোভাময় বাপী, বিকচ স্বর্ণকমলে সজ্জিত হইয়া মরকতসোপানমালায় শোভিতেছে। হংসকুল মানসসরঃ ভুলিয়া তাহার জলে বিচরণ করিতেছে। তীরে কনককদলী-বেষ্টিত ক্রীড়াশৈল। তাহার শিখরদেশ ইন্দ্রনীলমণিখচিত হইয়া বিদ্যুৎদীপ্ত নীরদখণ্ডের মত শোভিতেছে। নিকটে কুরুবকমণ্ডিত মাধবীমণ্ডপ, তাহার পার্শ্বে চঞ্চলদল রক্তাশোক ও মনোহর অশোকতরু। মধ্যে মণিখচিত স্ফটিকফলক কাঞ্চনের বাসযষ্টি, প্রদোষে যাহার উপর বসিয়া ময়ূর শিঞ্জিনীর তালে নৃত্য করে।"

এইবার সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষের একটা উদাহরণ দেখি; পরিত্যক্ত রঘু রাজধানী অযোধ্যার বর্ণনা এইরূপ –

"অযোধ্যার অবস্থা অতি শোচনীয়। কোথায়ও প্রাসাদ ভগ্নাবশেষ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; কোথায়ও প্রাকার ভাঙ্গিয়া ভূতলশায়ী হইয়া আছে। যেন উগ্র পবন-বেগে সংক্ষুব্ধ মেঘ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছে। অযোধ্যার রাজপথে নিশীথে আর অভিসারিকার নূপুরধ্বনি শ্রুত হয় না; এখন তথায় উল্কামুখী শিবা আহারান্বেষণে বিচরণ করে। দীর্ঘিকাজলে আর পুরমহিলা মধুর রব তুলিয়া অবগাহন করে না; এখন তথায় বন্য মহিষ শৃঙ্গ আস্ফালন করে। গৃহ-ময়ূর বাসযষ্টি হারা হইয়া মৃদঙ্গ-মন্দ্রে নৃত্য করে না, এখন দাবানলে দগ্ধপুচ্ছ হইয়া বনে বন্যভাব ধারণ করিয়াছে। সোপানমার্গে আর অলক্তরাগ দেখা যায় না, এখন তথায় মৃগরক্তাক্ত ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন লক্ষিত হয়। পটে লিখিত করিকুল পদ্মবনে হরিণীর সহিত ক্রীড়া করিত; এখন তাহা ক্রুদ্ধ কেশরীর নখাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। স্তম্ভবিলম্বী রমণীচিত্র এখন কাল

অন্ধকারে বিবর্ণ হইয়া শ্রীহীন হইয়াছে। সুধাধবল হর্ম্যতল এখন বিমলিন ও তৃণাচ্ছন্ন হইয়াছে আর তাহাতে চন্দ্ররশ্মি প্রতিভাত হয় না। বিলাসিনী যতনে যে লতার পুষ্প চয়ন করিত, এখন তাহা বানরে উৎপাটিত করিতেছে। দীপালোকহীন বরাঙ্গনাবিরহিত গবাক্ষ এখন মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সরযূ-জলে আর কেহ স্নান করে না; সরযূতীরে আর কেহ উপহার দেয় না; সরযূকূলের বাণীর-গৃহ এখন জনশূন্য।”

(৩)

বহির্জগতের মত এই অন্তর্জগৎও অনন্ত-বিস্তার; বৈচিত্র্যভেদে এ বিস্তৃতির সীমা নাই। একজন জার্মাণ দার্শনিক বলিতেন যে, দুইটি পদার্থ পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হইত: এক নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ; আর এক এই অনন্তবৈচিত্র্যময় মানুষের মন (আমাদের অন্তর্জগৎ)। অন্তর্জগৎ বৃত্তিময়, বৃত্তি মানস বিকার, এই বৃত্তি বৈচিত্র্য-ভেদে অনন্ত, তাই অন্তর্জগৎও অনন্ত বিস্তার। কিন্তু সকল বৃত্তিই সুন্দর নহে; সুতরাং সকল বৃত্তির উল্লেখ আমরা কালিদাসে পাইব না। যাহা সুন্দর, মধুর, সুকুমার, তাহারই ছায়া কালিদাসের কাব্যে দেখিতে পাইব, কারণ তিনি সৌন্দর্য্যের কবি। সেই জন্য আমরা কালিদাসে উৎকট ঘৃণা, বিকট ক্রোধ, কাম, জঘন্য লোভ, নৃশংস ঈর্ষ্যা প্রভৃতির উল্লেখ পাইব না; কিন্তু সরল প্রেম, বিমল সখ্য, মধুর স্নেহ, করুণ বিরহ, শান্ত ভক্তির ছায়া পাইব। কালিদাসে ইয়াগোর খলতা, ওথেলোর সংশয়, ক্লডিয়াসের কামিতা, ম্যাকবেথের দুরাশা, রিগনের পিতৃদ্বেষ, রিচার্ডের স্বার্থসন্ধি, ফ্যাল্‌ষ্টাফের পাশবতা, ক্রেসিডার ঐন্দ্রিয়তা, পলোনিয়সের আত্মম্ভরিতা, টাইমনের স্বজাতিদ্রোহিতা নাই। কিন্তু বিদূষকের সরসতা, রতির করুণতা, দুষ্মন্তের বিরহিতা, পুরুরবার উন্মত্ততা, উর্বশীর পূর্ব্বরাগ, প্রিয়ম্বদার প্রেমসখ্য, কণ্বের সুতাস্নেহ, শকুন্তলার প্রণয়োচ্ছ্বাস আছে। চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিয়াছে বলিয়া, তরুশাখায় বল্কল বাধিয়াছে বলিয়া শকুন্তলা একবার কৌশলে দুষ্মন্তের দিকে ফিরিলেন—এ প্রেমছলের বর্ণনা আছে। রাম স্পর্দ্ধী আততায়ী পরাজিত শত্রু পরশুরামের চরণ বন্দনা করিলেন—এ বিনয়ের বর্ণনা আছে। গিরিরাজ সপ্তর্ষির আগমনে পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়া স্বর্গারূঢ়ের মত আপনাকে

কৃতার্থ ভাবিলেন, এ সম্মাননার বর্ণনা আছে। দানববিজয়ী দুষ্মন্ত সুরসুন্দরীর স্তুতিগীতে সম্বর্ধিত হইয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিলেন, এ অবিকত্থনের বর্ণনা আছে। বালক রঘু পিতার অশ্বমেধ অশ্বরক্ষায় সুরপতি ইন্দ্রকে অবজ্ঞা করিয়া অস্ত্রধারণ করিলেন, এ স্পর্ধার বর্ণনা আছে। বিধুর দুষ্মন্ত বিরহশয্যাশায়ী, বিপন্নের আর্তস্বর শুনিয়াই বীরদম্ভে ধনু আস্ফালন করিলেন, এ উৎসাহের বর্ণনা আছে। নিরপরাধিনী নির্বাসিতা পতি-অনুপ্রাণা শকুন্তলা প্রথমস্বামিদর্শনে, অভিমান ভুলিয়া 'জয় আর্যপুত্র' বলিয়া পতি-সম্ভাষণ করিলেন, এ প্রেম-ক্ষমার বর্ণনা আছে। এইরূপ আরও কত বর্ণনা আছে, সকল কথার উল্লেখ সম্ভব হয় না।

পুরুরবা প্রেমপ্রবণ; অনেক সাধনায় প্রিয়তমা উর্বশীকে পাইয়া, বাসন অনল নিভিবার পূর্বেই প্রণয়িনীকে হারাইয়াছে। হারাইয়া সংজ্ঞাহীন, তাহার অন্বেষণে কৈলাস-গিরি-বন-কুঞ্জ পাতি পাতি করিতেছে। কোকিলের ললিত পঞ্চমে উর্বশীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশু সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছে, ভ্রমরগুঞ্জনে শিঞ্জিনীর রোল শুনিয়া উৎকর্ণের মত চাহিয়া আছে; কখন হংসের কলনিনাদে নূপুর-ধ্বনি শুনিয়া সেই দিকে ছুটিয়া যাইতেছে; কখন গজমিথুনের সরস কেলি দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছে; মৃগমৃগীর শৃঙ্গকণ্ডুয়ন দেখিয়া আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করিতেছে; চক্রবাকদম্পতীর প্রেম-অভিনয় দেখিয়া ঈর্ষ্যাকষায়িত চক্ষে চাহিয়া আছে, ফেনবসনা বীচিচঞ্চলা নদীর বক্র গতি দেখিয়া প্রেমরসে আপ্লুত হইতেছে, তখন বাহজ্ঞান হারাইয়া কেকারাবী ময়ূরকে, কুসুমখচিত পর্বতকে উর্বশীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছে, কখন কাল মেঘে বিদ্যুৎ-উন্মেষ দেখিয়া 'দুষ্ট দানব উর্বশী হরিয়াছে' এই আশঙ্কায় শরাসনে শর যোজনা করিতেছে; কখন ধারাসারে সিক্ত হইয়া বিরহাকুল প্রাণে কালের সহজ গতি রোধিয়া বর্ষাকালের প্রত্যাদেশ করিতেছে; আবার কখনও পুষ্পিতা অশোকশাখা স্তবকাভিনম্রা দেখিয়া, পীনস্তনী উর্বশী কল্পনা করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে।

এ বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী; কাব্যজগতে ইহার তুলনা বিরল। ভবভূতি মালতীমাধবে ইহার অনুকরণ করিয়াছেন; সে বর্ণনাও অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু কালিদাসের বর্ণনার সহিত তুলনীয় নহে। মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে যে অন্তর, ইহাদেরও তাহাই। সেক্সপীয়রের ট্রোইলাস্, রোমিও, অ্যাণ্টনী, জীবনের

…চক্রে এক একবার পুরুরবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কিন্তু কাহারও … এমন সুন্দর, এমন হৃদয়গ্রাহী নহে।

একজন প্রেমিক তাহার প্রিয়তমার উদ্দেশে বলিয়াছিল—'তোমারি উপমা, … তুমি এ মহীমণ্ডলে।' কালিদাসের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। এই …রবার উন্মাদবর্ণনার কালিদাসের মেঘদূতে একটা তুলনা আছে। সে যক্ষ-…র বিরহ-বর্ণন। পুরুরবা পুরুষ, যক্ষরমণী স্ত্রী; পুরুষ প্রগল্‌ভ, বহির্মুখ, …ক লাজশীলা অন্তর্মুখ। এই কথা মনে রাখিয়া মেঘদূতের বর্ণনা পাঠ …ন।

চক্রবাকবিরহে চক্রবাকীর ন্যায়, প্রিয়বিরহে যক্ষরমণী উৎকণ্ঠিত প্রাণে …রমথিত পদ্মিনীর মত পরিম্লান হইয়াছে। অবিরাম রোদনে তাহার চক্ষু …য়াছে, উষ্ণ নিশ্বাসে তাহার বিম্বাধর বিবর্ণ হইয়াছে; আলুলায়িত কেশা-…রে অবরুদ্ধ বিধুমুখ হস্তন্যস্ত রহিয়াছে। যক্ষরমণী কখন স্বামীর কল্যাণে …বলি দিতেছে, কখন পিঞ্জরের সারিকাকে প্রিয়ের কথা সুধাইতেছে; কখন …ার বিরহ-কৃশ প্রতিকৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতেছে। কখন মলিনবসনা …নাম-মধুর গীত গাহিতে গিয়া নয়নজলে বীণাতন্ত্রী আর্দ্র করিতেছে। কখন …ক একে বিরহের দিন গণিয়া মানসসিদ্ধ প্রিয়সমাগম উপভোগ করিতেছে। …ন উৎকণ্ঠায় নিদ্রা হারাইয়া আধিকৃশা ভূমিশয়নে বিরহশয্যায় অশ্রুমোচন …রিতেছে। কখন অসংযত রুক্ষ ধূসর কেশ সরাইয়া নিদ্রায় প্রিয়ের স্বপ্ন সমাগম …কাঙ্ক্ষা করিতেছে। বিরহিণী মালা ফেলিয়া একবেণী ধরিয়াছে; শীতল …দুরশ্মিতে প্রীতি ভুলিয়াছে, অঙ্গের মনোহর আভরণ খুলিয়াছে। তাহার …ত্র অঞ্জনশূন্য; ভ্রূ বিলাসশূন্য, অলক স্নেহশূন্য, জীবন সুখশূন্য।

যাহার বিরহে প্রণয়িনীর এই দশা, সে প্রিয় অতিদূরে নির্বাসিত হইয়াছে; …র প্রিয়ার উদ্দেশ না পাইয়া, সংজ্ঞাহীন মেঘকে দূত করিয়াছে। তাহার …না-দূত মেঘের সন্দেশ এইরূপ:—

সখি! তোমার সহচর যক্ষ জীবিত আছে; অতিদূরে রামগিরি আশ্রম …হইতে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছে; হায়! মানুষের জীবন বিপদ‑সঙ্কুল।

আজ বিধির বিধানে সে বড় দূরে; তাই কল্পনায় তোমার আলিঙ্গন করিয়া …তি ক্ষীণ সন্তপ্ত দেহে, উৎকণ্ঠিত প্রাণে, অশ্রুসিক্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে; …তোমারও সেই দশা।

সখীর সাক্ষাতে কথনীয় কথাও সে একদিন তোমার মুখস্পর্শলোভে কানে কানে বলিত, আজ সেই শ্রবণপথের অতিদূরে নয়নের অতীত হইয়া উৎকণ্ঠ লোকমুখে এই সংবাদ পাঠাইল—

প্রিয়ে! লতিকা তোমার দেহের মত সুকুমার; হরিণী তোমার মত চকিতনয়না; শশধর তোমার মুখের মত শোভাময়; ময়ূরপুচ্ছ তোমার কেশের মত মনোহর; নদী-হিল্লোল তোমার ভ্রূভঙ্গের মত চঞ্চল; কিন্তু কোথাও তোমার সমগ্র সাদৃশ্য নাই। যবে ধাতুরাগে শিলায় তোমার ছবি আঁকিয়া (তুমি মানিনী) তোমার চরণ ছুঁইয়া মান ভাঙিতে যাই, অমনি " আসিয়া দৃষ্টি রোধ করে, আর তোমায় দেখিতে পাই না। হায়, বিধাতার বিড়ম্বনা! যবে বহুকষ্টে স্বপ্নে দর্শন পাইয়া আকাশে বাহু তুলিয়া তোমায় আলিঙ্গন করিতে যাই—মূঢ় আমি, কোথায় তুমি? আমার দশা দেখিয়া করুণাময়ী বনদেবীরা বিরলে মুক্তাস্থূল অশ্রুজল পাত করেন। যবে দেবদারু-কিসলয় দোলাইয়া, তাহার রসে সুরভিত হইয়া অলকার পবন এদিকে বহিয়া আসে, আমি তাহাকে কতই আলিঙ্গন করি—হয়ত তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে। হায়, আমি তোমার বিরহে বিধুর; আমার অতি দীর্ঘ রজনী পলকের মত কাটিবে কেন? আমার রবি কিরণ গুটাইয়া শীঘ্র অস্তমিত হইবে কেন? হায় আমার দুরাশা। তথাপি তোমার দর্শন-আশায় কোনরূপে প্রাণ ধরিয়া আছি। কল্যাণি! তুমিও ধৈর্য ধরিয়া থাক। সুখদুঃখ চিরস্থায়ী নয় আমাদেরও শুভদিন আসিবে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়া অন্তর্জগতের সমালোচনার উপসংহার করি কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ সকলেরই পরিচিত। হরকোপানলে কাম ভস্মীভূত হইলে রতির প্রেমাধার হৃদয় হইতে যে বিষাদগীতির নির্ঝরিণী বহিয়াছিল কাব্যামোদী মাত্রেই তাহার রসাস্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস আর এক পুরুষ-হৃদয়ের যে করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনাইয়াছেন, আমার মনে হয়, রমণীর বিষাদগীতি অপেক্ষাও তাহা মধুর। সেই ক্রন্দন এইরূপ।

কুসুমের কোমল ঘায় ইন্দুমতীর সুকুমার দেহ এলাইয়া পড়িল; প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিশাইয়া গেল। অজ রাজা, প্রিয়তমার শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 'হায়, কোমল কুসুম-স্পর্শের যদি এই পরিণাম তখন আর কি না বিধাতার বধের অস্ত্র হইবে! অথবা হিমসেকে নলিনী

...উঠিয়া যায়, বুঝি সুকুমার হিংসিবার সুকুমার প্রহরণ। না, না; এ মালা ... কি প্রাণহর? কই, হৃদয়ে রাখিলাম! আমি ত মরিলাম না? হায়! ...র ভাগ্যে অমৃতও গরল হইল।

আমি ভাগ্যহীন; এ মালারূপী অশনি; তাই আমি তরু অক্ষত রহিয়াছি, ...র আমার আশ্রয়িনী লতা বিশীর্ণ হইয়াছে।

প্রিয়ে! শত অপরাধেও ত তুমি আমায় অবজ্ঞা কর নাই; বিনা দোষে ...ত আমার সহিত কথার আলাপও পরিত্যাগ করিলে? সুহাসিনি! আমায় ...ক শঠ কপট ভাবিয়াছ? তাই চিরতরে লোকান্তরে পলাইলে, একবার ...ের সম্ভাষণও করিয়া গেলে না!

প্রিয়ে! চেতনা হারাইয়া আমি ত আবার সচেতন হইলাম, তোমার চেতনা কই? ধিক্ আমার হতজীবন!

সখি! শ্রমজলকণা তোমার মুখে ভাসিতেছে, তুমি কোথায়? হায় মানবের নশ্বর প্রাণ! কই, কখন মনেও ত তোমার অপ্রিয় করি নাই, তবে কেন ছাড়িয়া গেলে? আমি নামে পৃথিবীর পতি, প্রেমে ত সুধু তোমারই অধিকার।

সুন্দরি! কুসুমখচিত ভ্রমরকৃষ্ণ তোমার কুঞ্চিত কেশজাল পবনে উড়িতেছে; মূঢ় আমি! আশা হইতেছে বুঝি তুমি ফিরিয়া আসিলে। প্রিয়ে! একবার জাগিয়া উঠ, তুমি আলোকরূপিণী, হৃদয়ের এ বিষাদ আঁধার দূর হউক্। হায়! তোমার মধুর কণ্ঠস্বর থামিয়া গিয়াছে, আজ মুখও ভ্রমর-গুঞ্জনহীন নিমীলিত পদ্মের মত হইয়াছে।

সখি! শশী আবার রজনীর সহিত মিলিত হয়; চক্রবাক-চক্রবাকীর বিরহের অবসান হয়; সুধুই তোমার আমার বিচ্ছেদে মিলন নাই। হায়! কুসুমশয়নে তোমার সুকুমার দেহে ব্যথা লাগিত, আজ সেই দেহ কঠিন চিতায় সঁপিয়া দিব।

সখি! চিরসঙ্গিনী এই মেখলা যেন শোকাতুরা। চিরতরে নীরব হইয়াছে। কোকিলা তোমার মধুর বাণী শিখিয়াছে, কলহংসী তোমার মদালস গতি শিখিয়াছে, মৃগী তোমার বিলোল কটাক্ষ শিখিয়াছে, লতা পবনকম্পনে তোমার বিভ্রম শিখিয়াছে। তুমি স্বর্গে গিয়াছ, আজ তোমার বিরহে কি সুধু ইহাদের দেখিয়া হৃদয় বাঁধিতে পারিব?

সহকার-তরু ও কলিনীলতার পরিণয় সম্বন্ধ করিয়াছিলে; কই তাহাদের ত বিবাহ দিয়া গেলে না? তোমার যতনের অশোকতরু কুসুমিত হইয়াছে, কই তাহাতে ত তোমার কেশভূষা হইল না? তোমার নিশ্বাসের মত সুরভি বকুলফুলে দু'জনে মেখলা গাঁথিতেছিলাম, তাহা ত সমাপ্ত হইল না!

প্রিয়ে! উঠ, আর ঘুমাইও না। সখীরা তোমা অন্ত প্রাণ; সুকুমার পুত্রটি নিতান্ত শিশু; আমি একান্ত অনুরক্ত; আমাদের অবহেলা করিও না।

তোমার বিরহে আজ সুখ অস্তমিত হইল; অনুরাগ হারাইয়া গেল, সঙ্গীত নীরব হইল; বসন্ত উৎসবহীন হইল, অলঙ্কার নিরর্থক হইল, শয্যা শূন্যময় হইল। তুমি কি আমার শুধুই স্ত্রী, তুমি সচিব, সখী, শিষ্যা, হায় কৃতান্ত! আর আমার কি রাখিলে!

সুলোচনে! যে মুখে মধুর আসব তুলিয়া দিতাম, আজ কি পরলোকে তাহারই উদ্দেশে অশ্রুসিক্ত জলাঞ্জলি দিব! প্রিয়ে! তোমা বিনা অজের আর কি সুখ আছে? আর ত কিছুতে তাহার হৃদয় ভরে না, 'তুমি যে তাহার সর্বস্ব।'

(৪)

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, যে জগৎ বুদ্ধির বিষয়ীভূত, তাহা বৌদ্ধ জগৎ। এই বুদ্ধিই সত্যেন্দ্রিয়, ইহার দ্বারাই আমরা সত্যাসত্য নির্ণয় করি। অতএব যে জগৎ সত্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাই বৌদ্ধ জগৎ। সুতরাং দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব, এ সকল কথাই বৌদ্ধ-জগতের অন্তর্ভুক্ত।

এই দর্শন বিজ্ঞান ধর্মনীতি সমাজতত্ত্বের কবিতাময়ী আলোচনাকে 'কাব্যে দার্শনিকতা' বলে। এই 'কাব্যে দার্শনিকতা' বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। এই প্রণালীর সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ঘোরতর আপত্তি লক্ষিত হয়। তাঁহারা বলেন যে, 'দার্শনিকতা দর্শনে থাকুক, বৈজ্ঞানিকতা বিজ্ঞানে থাকুক, সমাজনীতি ধর্মতত্ত্বের কথা সাহিত্যে থাকুক, আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের কাব্যে অনধিকার-প্রবেশ কেন?' উত্তরে তাঁহাদের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিই—'বিজ্ঞানতত্ত্বে যে এক মর্মস্পর্শী ছায়া আছে, তাহাই কাব্য।' বাস্তবিক দর্শনাদিতে যে এক অপূর্ব সৌন্দর্য নিহিত আছে, তাহার তুলনায় অন্য সৌন্দর্য আভাহীন হয়। হইবারই কথা; কি সৃষ্টিতত্ত্ব, বি

প্রকৃতত্ব, সর্বত্রই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত কল্পনার অনন্ত সৌন্দর্যাভাস জাজ্বল্যমান। জগৎ যে ঈশ্বরসৃষ্ট। জগত্তত্ত্ব যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত কল্পনা প্রসূত। দর্শন ত আর কিছুই নহে, এই তত্ত্ব-কাব্যের বিজ্ঞানময়ী আলোচনা; তবে কাব্যে এই দর্শনের কবিতাময়ী আলোচনা থাকিবে না কেন?

কালিদাসে এরূপ আলোচনা, এরূপ দার্শনিকতা বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। সে আলোচনার, সে দার্শনিকতার সর্বত্র এক অদ্বিতীয় লক্ষণ, কালিদাসের কাব্যের সকল অংশের যে লক্ষণ ইহাও তাহাই; কেহই নীরস, অসুন্দর নহে, সকলই সরস, সৌন্দর্যমাখা।

আদর্শ রাজা দিলীপের বর্ণনায় আমরা এই সৌন্দর্যই উপলব্ধি করি। সে সৌন্দর্যও বুদ্ধিগম্য। সে বর্ণনা এইরূপ—"দিলীপ আদর্শ রাজা, তাঁহার দৈহিক মানসিক নৈতিক সকল শক্তিই পূর্ণ বিকশিত। তাঁহার বক্ষ বিশাল, স্কন্ধ আয়ত, বাহু সুদীর্ঘ, দেহ উন্নত। তাঁহার বল সকলের অতিরিক্ত, তেজ সকলের অভিভবকারী, শরীর সকলের উৎকৃষ্ট, তাঁহার প্রজ্ঞা দেহের অনুরূপ, বিদ্যা প্রজ্ঞার অনুরূপ, ক্রিয়া বিদ্যার অনুরূপ, সিদ্ধি ক্রিয়ার অনুরূপ। তিনি ভীমকান্ত, মৃদু হইয়াও প্রখর। তিনি যথার্থ নিয়ন্তা, তাঁহার শাসনগুণে প্রজা ধর্মপথে অক্ষুণ্ণ থাকিত। প্রজার অভ্যুদয়ের নিমিত্তই তিনি কর গ্রহণ করিতেন, যেমন দিবাকর জলবাষ্প গ্রহণ করেন। তাঁহার সৈন্যবল কেবল শোভার্থ ছিল, বুদ্ধি ও বাহুবলেই সকল কার্য সমাধা হইত। তিনি মন্ত্রকুশল, তাঁহার গূঢ় মন্ত্রণা কেবল ফলকালে বিবৃত হইত। নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা, অরোগী হইয়া ধর্মচর্যা, নির্লোভ হইয়া ধনার্জন ও অনাসক্ত হইয়া সুখভোগ, তাঁহারই ঘটিয়াছিল। তিনি জ্ঞানী হইয়া মৌনী, শক্তিমান হইয়া ক্ষমাশীল, দাতা হইয়া শ্লাঘাহীন ছিলেন। বিষাদবিমুখ, বিদ্যাবৃদ্ধ, ধর্মপ্রাণ রাজার জরা বিনা বার্দ্ধক্য ঘটিয়াছিল। প্রজাদিগের রক্ষা, পালন ও শিক্ষার ভার লইয়া তিনিই তাহাদের পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার দণ্ডপ্রয়োগ দুষ্ট-দমনে, বিবাহ পুত্রার্থে, পুরুষার্থ ধর্মে ও প্রীতি শিষ্ট জনে ছিল। তাঁহার গুণগ্রাম পরসেবায় রত থাকিত, তিনি বিধাতার অপূর্ব রাজসৃষ্টি।"

এ বর্ণনা অতি সুন্দর, কিন্তু রঘু ও কুমারের ঈশ্বরস্তোত্র ইহা অপেক্ষাও অনেক সুন্দর। ঐ রচনা কাব্যে দার্শনিকতার আদর্শ বলিলে বলা যায়।

রঘুবংশে ঈশ্বর-স্তোত্র এইরূপ—হে দেব! তোমায় নমস্কার; তুমি জগৎ

সৃজন পালন সংহার কর ; তোমার তিন মূর্তি। তুমি নিত্য নির্বিকার, কেবল গুণযোগেই বিভেদ অঙ্গীকার কর। তুমি ভুবনের পরিমাণ জান, তোমার পরিমাণ কে জানে প্রভু? তুমি নিষ্কাম, কামনার ফলদাতা, তুমি জিষ্ণু, তুমি অজিত। তুমি সূক্ষ্ম—এই স্থূল জগতের কারণ ; তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে খুঁজিয়া পাই না। তুমি নিস্পৃহ, তোমার তপস্যা কেন দেব? তুমি দয়াময়, দুঃখরহিত ; তুমি পুরাণ, অজর ; তুমি সর্বজ্ঞ, তোমায় কে জানে প্রভু? তুমি স্বয়ম্ভূ কিন্তু জগৎকারণ ; তুমি প্রভুর প্রভু ; তুমি এক হইয়াও অনেক।

সপ্ত সাম তোমার মহিমাগীতি, সপ্ত সিন্ধু তোমার শয্যাগৃহ ; সপ্তার্চি তোমার মুখ ; সপ্ত লোক তোমার আশ্রিত। চতুর্বর্ণ চতুর্যুগ চতুর্বর্গ সকলের তুমি উদ্ভব ; দেব, তুমি চতুর্মুখ। তোমার মহিমা অপার ; তুমি অজ হইয়াও জন্মবান্ ; নিরীহ হইয়াও অরিমর্দন, স্বপ্নময় হইয়াও জাগরূক। তোমাতে সকলই সম্ভবে -বিষয়-ভোগ, তপশ্চর্যা ; ঔদাসীন্য, প্রজাপালন। তুমি কাঙ্ক্ষিত ; আগম সহস্র পথে তোমারই উদ্দেশ করে, শাখানদী যেমন সাগরের ভক্তিমান্ মুমুক্ষুর তুমিই অনন্য গতি। ক্ষিতি আদি তোমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই, তোমার ইয়ত্তা কে করিবে প্রভু? তোমার স্মরণে পাপতাপ দূর হয়, তোমার দর্শনে কি হয় দেব? জলধির রত্নের মত, সূর্যের রশ্মির মত তোমার কীর্তিকথার অবসান নাই।

কুমারসম্ভবের এক অংশের একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক। পার্বতীর পঞ্চতপে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব জটাধারী যোগীর বেশে দর্শন দিলেন। লীলাময় লীলাচ্ছলে পার্বতীর হৃদয় পরীক্ষা করিতে ছলনাময় বাক্‌জাল পাতিলেন। কপট সন্ন্যাসী নিজ মুখে নিজের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন, যদি তাহাতে পার্বতীর প্রেমময় হৃদয় বিচলিত হয়।

পার্বতী ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহার সৌন্দর্য অনুবাদে বুঝান যায় না। সে উত্তরের সৌন্দর্য বুদ্ধিগম্য (intellectual) ; কিন্তু তাহা সৌন্দর্যে বৌদ্ধজগতের সারভূত।

ঈষৎ অরুণ নয়নে কোপে ভ্রূকুটি করিয়া পার্বতী বলিলেন, "তুমি ক্ষুদ্র যোগী, লোকাতীত মহাপুরুষের অচিন্ত্য মহিমা কি বুঝিবে? হায়! যিনি জগতের শরণ্য মঙ্গলালয়, তিনি অমঙ্গলময়! কামনারহিত মহাদেবের কি ক্ষুদ্র বিলাসীর মত বেশ-রচনা দেখিতে চাও? তাঁহার মহিমা কে বুঝিবে? তিনি

ধনহীন হইয়া ধনেশ্বর, লোকনাথ হইয়া শ্মশানচারী, ভীমরূপ হইয়া কান্তবপু। তিনি বিশ্বমূর্তি—রত্নালঙ্কার বা ভুজঙ্গভূষণ, গজাজিন বা শুভ্র দুকূল, নরকপাল বা চন্দ্রকলা, তাঁহার সকলই সমান। আর চিতাভস্ম? শিবের অঙ্গ সংস্পর্শে তাহা পবিত্রতম; দেবতারাও তাহা সাদরে শিরে ধারণ করেন। তিনি বৃষভবাহন, কিন্তু ঐরাবতারূঢ় মহেন্দ্রও মস্তক নামাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। তিনি অজ্ঞাতকুলশীল? ব্রহ্মারও আদি, অনাদি পুরুষের ইহা সম্ভব নহে। অথবা বিতণ্ডায় কি ফল? আমি তাঁহার অনুরাগিণী। আমার লোকলজ্জার ভয় নাই।"

(৫)

যে জগৎ বিবেকের (conscience) বিষয়ীভূত তাহাই অধ্যাত্ম জগৎ। এই বিবেকই ধর্মেন্দ্রিয়, ইহা নীতিজ্ঞানের সাধন, বিবেক দ্বারা আমরা ধর্মাধর্ম নির্ণয় করি, কি পাপ কি পুণ্য ইহার নিশ্চয় করি, উচিত অনুচিত, কর্তব্য অকর্তব্যের তত্ত্ব উপলব্ধি করি। অতএব যে জগৎ ধর্মেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাই অধ্যাত্ম জগৎ।

এই অধ্যাত্মজগতের স্বরূপ কি? দৈহিক জীবন যেরূপ শারীরিক শক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তির নিত্য সংগ্রাম, অধ্যাত্ম জীবনও সেইরূপ পাপ ও পুণ্যের চির সমর: এ যুদ্ধে কোথাও পাপ জয়ী, কোথাও পুণ্য জয়ী, কিন্তু রণান্তে উভয়েই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষত বিক্ষত।

এই শক্তিদ্বয় আবার কখন একই মানবের অন্তরাত্মায় অবস্থিত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে। কখন ভিন্ন ভিন্ন জীবকে আধার করিয়া রণমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ প্রভুপরায়ণ সাহসী বীরপুরুষ, শত যুদ্ধে বীরদম্ভে অসি আস্ফালিয়া প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু আজ সে দুরাকাঙ্ক্ষার দাস হইল; বৃদ্ধ প্রভুর পলিত মুণ্ড ছেদন করিয়া রাজমুকুট নিজ শিরে পরিবার আজ তাহার সাধ হইল। প্রভুভক্তি ও দুরাকাঙ্ক্ষায় তুমুল সংগ্রাম বাধিল। দুরাকাঙ্ক্ষা মূর্তিমতী হইয়া পিশাচিনী বেশে আশার আলোক দেখাইয়া তাহাকে প্রলোভিত করিল, দুরাকাঙ্ক্ষা মূর্তিমতী হইয়া ম্যাকবেথ-পত্নীরূপে পৌরুষের ভান দেখাইয়া তাহাকে প্রোৎসাহিত করিল। দুর্বল প্রভুভক্তি প্রবলের নিকট পরাভূত হইল। পাপের জয় হইল, পুণ্যের পরাজয়

হইল। এ দৃষ্টান্তে পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তি একই মানবের অন্তরাত্মায় অবস্থিত। আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। গনারিল ও রিগন পিতার প্রসাদে রাজরাণী হইয়া, সেই পিতাকেই বাত্যাবিকট তিমিরময়ী রজনীতে, অন্ধকার বনপথে নির্বাসিত করিয়া, পিতৃ-প্রেমের প্রতিদান দিল; আর করডিলিয়া পিতার শাসনে নিপীড়িত হইয়া সেই পিতারই রোগে শুশ্রূষা, নিরাশায় সান্ত্বনা ও বিপদে প্রাণপাত করিয়া পিতৃদ্বেষের প্রতিশোধ দিল। এ-ও সেই পুণ্য-পাপের মহারণ। এ দৃষ্টান্তে পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তি এক মানবে অবস্থিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবকে আশ্রয় করিয়াছে। এইরূপ অধ্যাত্ম জগতের সর্বত্র। যেখানেই অধ্যাত্ম জীবন, সেখানেই পাপ-পুণ্যের মহারণ। যেমন অন্ধকার ভিন্ন আলোক থাকিতে পারে না, প্রতিযোদ্ধা ভিন্ন যোদ্ধা থাকিতে পারে না, সেইরূপ পাপ ভিন্ন পুণ্য থাকিতে পারে না।

ইয়াগো ভিন্ন দেস্‌দিমোনা চরিত্র অসিদ্ধ হয়, ক্লডিয়াস্ ভিন্ন হ্যামলেট চরিত্র অসিদ্ধ হয়; আইক্যামো ভিন্ন ইমোজেন চরিত্র অসিদ্ধ হয়; মিফিস্‌টো-ফিলিস ভিন্ন ফাউষ্ট চরিত্র অসিদ্ধ হয়; অর্থাৎ পাপ ভিন্ন পুণ্য অসিদ্ধ হয়। সেই জন্য পুণ্যের কথা বলিতে গেলেই পাপের কথা পাড়িতে হয়। পুণ্যের চিত্র আঁকিতে গেলেই পাপের চিত্রের অবতারণা করিতে হয়। কবির কাব্যের আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। কিন্তু পুণ্য সুন্দর, পাপ অসুন্দর; পাপের চিত্র কুৎসিত, পুণ্যের চিত্র সৌন্দর্যময়। ইয়াগো কুৎসিত, দেসদিমোনা সুন্দর, ক্লডিয়াস্ কুৎসিত, হ্যামলেট সুন্দর; আইক্যামো কুৎসিত, ইমোজেন সুন্দর; মিফিস্‌টোফিলিস কুৎসিত, ফাউষ্ট সুন্দর। সেই জন্য আমরা দেখি, সেক্সপীয়র, গেটে প্রভৃতি যাঁহারা অধ্যাত্ম জগতের ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহাদের কাব্যে সুন্দর ও অসুন্দরের পাশাপাশি সমাবেশ হইয়াছে; কদর্য ও সৌন্দর্য পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে; কেন না, পাপ ও পুণ্য মিশিয়া অধ্যাত্ম জগৎ; একের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইলে অপরের অস্তিত্ব ধারণা করিতে হইবে, অথচ পুণ্য সুন্দর, পাপ অসুন্দর।

কিন্তু যিনি সৌন্দর্যের কবি, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যই যাঁহার কাব্যের উপাদান, কদর্য কুৎসিত অসুন্দর যাঁহার কাব্যে স্থান লাভ করিতে পারে না, তাঁহার অধ্যাত্ম জগতের চিত্র কেমন হইবে? অধ্যাত্ম জীবন চিত্রিত করিতে হইলে ত অসুন্দর ও সুন্দর, কদর্য ও সৌন্দর্য উভয়ের সমাবেশ চাই। আমরা অনুমান

করিতে পারি যে, তাঁহার অধ্যাত্ম জগতের চিত্র পূর্ণাবয়ব হইবে না; তিনি সুন্দরের কবি, অসুন্দর কোথায় পাইবেন? পুণ্য সুন্দর বটে, কিন্তু ইহা অসুন্দর পাপের সাহায্য ভিন্ন থাকিতে পারে না। সমুদ্রের ফেনা কেমন শুভ্র, কেমন নির্মল; কিন্তু ইহা তরঙ্গে তরঙ্গে বিকট বিলোড়ন হইতে উদ্ভূত। পুণ্যও সেইরূপ। কালিদাসের কাব্যের আলোচনা করিলে এই অনুমানই প্রমাণিত হয়। সেক্সপীয়র, গেটে প্রভৃতির কাব্যে যেরূপ অধ্যাত্ম জগতের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি পাই, কালিদাসের কাব্যে তাহা পাই না; কারণ তিনি সৌন্দর্যের কবি; অসুন্দরের সমাবেশ না হইলে অধ্যাত্মজগৎ সিদ্ধ হয় না। কালিদাসের কাব্যে ত ইয়াগো, ক্লডিয়াস, আইক্যামো বা মিফিস্টোফিলিসের স্থান হইবে না; তবে দেসদিমোনা, হ্যামলেট, ইমোজেন, ফাউষ্টের সম্ভাবনা হয় কিরূপে? এরূপ অঘটন-ঘটন, প্রকৃতির বিপর্যয় কিরূপে হইতে পারে?

তবে কি কালিদাসে অধ্যাত্ম জগতের আদৌ চিত্র নাই? তা কেন? আছে; তবে সে ভিন্ন প্রণালীর।

আমরা ইতিপূর্বে অধ্যাত্ম জীবনের যত উদাহরণ দেখিয়াছি, তাহার সকলই বিরোধী পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তির সমর ক্রীড়ার দৃষ্টান্ত। শক্তিদ্বয় কোথাও একই মানবে অবস্থিত, কোথাও ভিন্ন ভিন্ন জীবকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু এমনও মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার অধ্যাত্ম জীবন স্বভাবজাত, স্বতঃসিদ্ধ, পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তি সংগ্রামসিদ্ধ নহে। দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয় রাজা, চিত্তসংযম তাঁহার চিরাভ্যস্ত। নদীর জলে স্রোত যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তাঁহারও বুঝি চিত্তসংযম সেইরূপ। দুষ্মন্ত শকুন্তলার সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে উভয়কে আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু মিলন হইল না। শকুন্তলা বিরহজ্বালায় জ্বলিয়া নলিনী-পত্র-শয্যায় শয়ন করিলেন, দুষ্মন্ত চন্দ্রকিরণে বিদগ্ধ হইয়া অনলপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। অনেক যাতনার পর মিলন হইল। কিন্তু মিলনের সুখস্বাদ না ঘটিতেই গুরুজনের আগমনে শকুন্তলা অন্তর্হিত হইলেন; দুষ্মন্ত হতাশ হইয়া তাঁহার পদ্মমুখ, রক্তাধর ও চটুল নয়নের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন চিত্তের অবস্থা কিরূপ? সহসা রাক্ষসত্রস্ত তাপসের আর্তস্বর শুনিলেন। বিরহ-বিষাদ, বিকল্প কোথায় লুকাইল; দুষ্মন্ত বীরদর্পে ভয়ার্তের ত্রাণে অগ্রসর হইলেন।

এই যে চিত্তসংযম, ইহা আধ্যাত্মিক জগতের উৎকৃষ্ট পদার্থ, ইহা অধ্যাত্ম

জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান, অতীব হৃদয়গ্রাহী, সৌন্দর্যময়। কিন্তু ইহা পাপ-সংঘর্ষজাত নহে, ইহা স্বভাবজ, স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপ অন্যত্র। যখনই আমরা কালিদাসে কোন সুন্দর, উৎকৃষ্ট অধ্যাত্মতার সাক্ষাৎ পাইব, তখনই দেখিব যে, তাহা অপকৃষ্ট অসুন্দর পাপশক্তির সহিত সংগ্রামের ফল নহে। তিনি সুন্দরের কবি, অসুন্দরের স্থান তাঁহার কাব্যে হইবে কেন? ইহা গেল বিরোধী শক্তি-দ্বয়ের এক মানবাত্মায় অবস্থানের কথা। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মাকে আধার করিয়া পুণ্য ও পাপশক্তির সমরকাহিনী কালিদাস কোথায়ও বিবৃত করেন নাই; কারণ সে বিবরণে পুণ্যশক্তির সহিত পাপশক্তির সাহচর্য অবশ্যম্ভাবী; পাপ-শক্তি অসুন্দর; অসুন্দরের বর্ণন আমরা কালিদাসে পাইব কেন? ইহার একটা ধ্রুব প্রমাণ দিতেছি। নরনারায়ণ রামচন্দ্রের অলৌকিক চরিত্রে অবশ্যই কালিদাস আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন সুন্দর চরিত্র আর কোন্ দেশে আছে? শীতল জল জমিয়া যেরূপ শীতলতাঘন তুষার হয়, রামচরিত্র সেইরূপ অধ্যাত্মতা-ঘন, আধ্যাত্মিকতাময়। বন্যার পঙ্কিল জল যেমন নভঃস্পর্শী গিরিচূড়া স্পর্শ করিতে পারে না, জগতের পাপশক্তি সেইরূপ ঐ মহাপুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই এ সুন্দর চরিত্রের বর্ণনায় কালিদাস রঘুবংশের ছয় সর্গ নিয়োজিত করিয়াছেন। তাড়কাবধ হইতে আরম্ভ করিয়া হরধনুঃভঙ্গ, ভার্গব-বিজয়, বনবাস, রাবণবধ, সীতা-উদ্ধার, মৈথিলী-বিসর্জন, পুণ্যাশ্বমেধ, লক্ষ্মণ-বর্জন, প্রভৃতি সকল লীলারই সুন্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু কৈকেয়ীর ঈর্ষ্যারূপ যে পাপশক্তিকে ভিত্তি করিয়া রামচরিত্র গঠিত, যাহার বর্ণনে বাল্মীকি বহু অধ্যায় নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার সুধু উল্লেখ বই আর কিছুই নাই, কেন না সে পাপশক্তি অসুন্দর।

(সাহিত্য, ১২৯৯)

মৃচ্ছকটিক

(ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

(১)

সংস্কৃতে যতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকখানি সর্বাপেক্ষায় অতি প্রাচীন। এই নাটক সম্রাট বিক্রমাদিত্যেরও পূর্বতন কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে এবং ইহার প্রণেতা একজন রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছিল। তাঁহার নাম বলা হইয়াছে শূদ্রক। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের কোন্ ভাগের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল তাহার কোন নির্ণয় হয় নাই।

মৃচ্ছকটিক এত প্রাচীন বলিয়াই ইহার রচনা এত সরল। ইহার ভাষায় অলঙ্কার-পারিপাট্যের জন্য যত্নের আধিক্য নাই, এবং বর্ণিত বিষয়টি বুঝাইবার দিকে ইহার যত দৃষ্টি, বর্ণন-কৌশলের দিকে দৃষ্টি তত অধিক বোধ হয় না।

কিন্তু ভাষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয় না বলিয়াই যে, মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা-কৌশল-শূন্য তাহা নহে। একটু নিপুণ হইয়া দেখিলেই, উহাতে গূঢ় রচনাকৌশলের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ সেই রচনাকৌশল এমন অতি সহজ ভাবে আসিয়াছে যে, একবারও কৌশল বলিয়া মনে হয় না।

নাটকীয় নান্দীভাগ লইয়াই দেখ। নান্দীতে দুইটি শ্লোক আছে। তাহার প্রথমটিতে দেবাদিদেব মহাদেবের পর্যঙ্কবন্ধ ভুজগবেষ্টনে দৃঢ়ীকৃত, তাঁহার ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিরোধ, আত্মমাত্র সাক্ষাৎকার, এবং স্থির শূন্যদৃষ্টি বর্ণিত; দ্বিতীয় শ্লোকটিতে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের ঘোর শ্যামবর্ণ কণ্ঠে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় মহাদেবী গৌরীর উজ্জ্বল গৌর ভুজ-লতার অবস্থান বর্ণিত, প্রথম শ্লোকে মহাদেব শ্মশানবাসী, ধ্যান-নিমগ্ন, সমাধিস্থ; জগৎ শূন্য, সংসার শূন্য। দ্বিতীয় শ্লোকে হরগৌরীরূপ একত্রে সম্মিলিত, জগৎ পূর্ণ, সংসার জাজ্জ্বল্যমান। সমুদায় নাটকটিতেই ঐ দুই কথা। এক কথা, নায়কের দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্বশূন্যত্ব; দ্বিতীয় কথা, তাঁহার প্রেমিকা প্রেয়সীর লাভ, এবং তৎসহ সমুদায় সাংসারিক-সুখ-প্রাপ্তি। অতএব মৃচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই সমুদায়

নাটকটির বীজ নিহিত হইয়া আছে। উৎকৃষ্ট রচয়িতাদিগের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা যাহা কিছু লেখেন, তৎসমুদায় পরস্পর দৃঢ়সম্বন্ধ এবং সকল কথাতেই মুখ্য বিষয়ের অনুকূলতা সাধিত হয়।

নান্দীর পরে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনাটিও বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ। প্রস্তাবনার আরম্ভে নাটক-রচয়িতার পরিচয়। রচয়িতার পরিচয় প্রদান করিবার রীতি প্রায় সকল নাটকেই প্রচলিত আছে। পরিচয়স্থলে রচয়িতার ভূয়সী প্রশংসা থাকে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রস্তাবনার ঐ ভাগ নাটক-রচয়িতা স্বয়ং লেখেন না, তাঁহার শিষ্যাদি কেহ লিখিয়া দেন। এরূপ অনুমান যে অমূলক, তাহা, ঐ পরিচয়-ভাগের রচনা-প্রণালীর সহিত অপরাপর ভাগের রচনা-প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই উপলব্ধ হয়। মৃচ্ছকটিক-এর ঐ পরিচয় ভাগে বলা হইল রচয়িতার নাম শূদ্রক, তিনি রাজা, এবং দ্বিজমুখ্যতম, ঋগ্‌বেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের শ্রেষ্ঠ, এবং হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ; তিনি শত বর্ষ এবং দশ দিন আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজ্যদান পূর্বক চিতারোহণে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন। গ্রন্থরচয়িতার এবম্ভূত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বড়ই সন্দেহ জন্মে। ইনি নামে হইলেন শূদ্র, কাজে হইলেন সমরব্যসনী ক্ষিতিপাল এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ব্রাহ্মণ। ইঁহাকে রাজা বলা হইল, অথচ কোথাকার রাজা এবং থাকিতেন কোথায়, তাহা বলা হইল না। এমন স্থলে যদি মনে করা যায় যে গ্রন্থকারের এই শূদ্রক নামটাই কল্পিত, তাহা করিলে কি নিতান্ত কষ্টকল্পনা করা হয়? আর্য গ্রন্থকারেরা বৈদিক সংস্কার বশতঃ আপনাদিগের নামরূপ পরিহারপূর্বক একমাত্র লোকোপকার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাদি রচনা করিতে পারিতেন—নাম বাহির করিতে না পারিলে তাঁহাদের বুক ফাটিত না। তাহা ছাড়া আর একটা কথা আছে। আমাদিগের কোন গ্রন্থকার সমাজের বর্ণনা করিব এরূপ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা তাহা করিয়াছেন[১]। তিনি বলিয়াছেন তাৎকালিক

১ অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহো
যুবা দরিদ্র কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা॥

"নয়-প্রচার" "ব্যবহার-দুষ্টতা" "খলস্বভাব" "ভবিতব্যতা" প্রভৃতি সমুদায় বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছেন।[১] সমাজ-বর্ণনে প্রবৃত্ত গ্রন্থকর্তৃগণ প্রায়ই স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া থাকেন। অতএব কোন নাটক-রচয়িতা সমাজের বৃহত্তমভাগ যে শূদ্র জাতি তন্নামানুসারে স্বয়ং শূদ্রক নাম পরিগ্রহণপূর্বক আপনাকেই ক্ষত্রিয়গুণ- এবং ব্রাহ্মণগুণ-সমন্বিত এবং সমুদায় সমাজের প্রতিরূপস্বরূপ দেশ-সাধারণের রাজা বলিয়া বর্ণন পূর্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও স্বমুখে খ্যাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য উল্লিখিত কল্পনার অবলম্বনে কিছু বিশদ হইতে পারে। শাস্ত্রে বলে, মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুষ্কাল শতবর্ষ; অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, এক একটি সমাজ-প্রতিরূপের বয়স একশত বৎসর। আর মৃত্যুর পর দশ দিন যে অশৌচকাল, সে পর্যন্ত মৃতব্যক্তির লোকান্তর-গতি নাই—এক প্রকার ইহলোকেই স্থিতি, এই জন্য এক একটি সমাজ-প্রতিরূপের অবস্থিতিকাল শত বর্ষ দশ দিন। সেই একশত দশ দিনের পর দ্বিতীয় সমাজ-প্রতিরূপ পূর্বগত সমাজ-প্রতিরূপের পুত্রস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এইজন্য মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা—

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং
লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং
শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

(২)

মৃচ্ছকটিক রচয়িতা নান্দীর দুইটি শ্লোকে অভিনেয় বস্তুর সমস্ত বীজ নিহিত করিয়া এবং প্রস্তাবনার প্রারম্ভে আপনি যে সমাজের প্রতিভূস্বরূপ হইয়াই তাহার একটি আদর্শ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যেন এইরূপ আভাস

[১] তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং
নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাং
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা।
চকার সর্বং কিল শূদ্রকো নৃপঃ।

প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের এবং দ্রষ্টৃবর্গের কৌতূহল উদ্দীপনপূর্বক একটি গীতির সহিত প্রস্তাবনার দ্বিতীয়ার্ধ প্রবর্তিত করিয়াছেন। গানটি এই—

শূন্যমপুত্রস্য গৃহং,
চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রং।
মূর্খস্য দিশঃ শূন্যাঃ,
সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য॥

অপুত্রের গৃহ শূন্য, সন্মিত্র-বিহীনের চিরশূন্য, মূর্খের দিক্ শূন্য; দরিদ্রের সকলই শূন্য।

নান্দীতে "শূন্যেক্ষণ" শব্দের প্রয়োগে যে বীজ নিহিত হইয়াছে, উল্লিখিত গানটিতে তাহার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইল। "সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই কথাই নাটকের সকল কথার ধুয়া হইয়া রহিল, এবং নায়কের সর্বশূন্যতা কি প্রকার বিশিষ্টরূপে তাহারও পরিচায়ক হইল। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত, তাহার "নিজ রূপগুণের অনুরূপ" রোহসেন নামক পুত্র আছে, তাঁহার "সর্বকাল-মিত্র", মৈত্রেয় নামক একজন সুহৃদও আছেন, এবং তাঁহার গৃহমধ্যে "পুস্তক-সকল" থাকায় এবং অন্যান্য প্রকারেও তাঁহার বিদ্যাবত্তা সূচিত হইয়া আছে—তাঁহার নাই কেবল ধন, এবং ধন না থাকায় ঐ সকল থাকিলেও তাঁহার "সকল শূন্য,"—"সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য"!

সমাজ-চিত্রণে যে দারিদ্র্যাবস্থার চিত্রণ অত্যাবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সকল সমাজেই দারিদ্র্যের অতি বিপুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং কোন বস্তুর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বস্তুরই হইতে পারে না।

এই জন্য উচ্চদ্বিজকুলসম্ভূত, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তির পুত্র, প্রাসাদবাসী, পরমাতিথেয়, জন্মভূমির উন্নতিসাধক, সাধারণের হিতার্থে সুবহু সরোবর, দেবভবন, উদ্যানাদির নির্মাণকর্তা এবং এবম্বিধ দানশৌণ্ডতা-নিবন্ধন স্বয়ং বিত্তবিহীন এবং দুর্গত যে চারুদত্ত, তিনিই দারিদ্র্যাবস্থার কাব্যোচিত সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া সমাজচিত্রকরণের কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক-রচয়িতার নাটকের নায়করূপে উপকল্পিত। এই জন্য বোধ হয়, উক্ত চারুদত্তের মুখ দিয়াই কবি একস্থলে উল্লিখিত ভাবটি এইরূপে ব্যক্ত করাইয়াছেন; যথা—

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষিব দীপদর্শনম্।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং।
স জীবদীপান্মরণান্ধমাপ্নুতে ॥

দুঃখভোগপূর্বক যে সুখ তাহা গভীর অন্ধকারে দীপদর্শন-স্বরূপ। সেইরূপ সুখের অবস্থা হইতে যে ব্যক্তি দুঃখের অবস্থায় পড়ে, সে জীবনের আলোক হইতে মৃত্যুরূপ অন্ধকারে পতিত হয়।

(৩)

"সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই গীতিধ্রুব দ্বারা অতি বিস্পষ্টরূপে সূচিত মৃচ্ছকটিক-এর নায়ক চারুদত্ত দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হইয়া কেমন মর্মে মর্মে এবং পদে পদে সেই দশার যন্ত্রণাসকল ভোগ করিতেছিলেন, তাহা সেই নায়কের রঙ্গভূমে প্রবেশ হইতেই প্রদর্শিত হইতে চলিল, এবং নায়ক যে সর্বতোভাবেই সদ্ভাবসমন্বিত তাহাও প্রথম হইতেই প্রদর্শিত হইল। তিনি সায়ং-সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহদেবতাদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিতেছেন এইরূপে দৃষ্ট হইলেন, এবং তৎকালে তাঁহার উক্তি হইল—

যাসাং বলিঃ সপদি মদ্গৃহদেহলীনা
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্বঃ।
তাস্বেব সম্প্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্কুরাসু,
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ ॥

যে গৃহদ্বারের সম্মুখভাগে প্রদত্ত বলি হংস-সারসাদি কর্তৃক সত্বর বিলুপ্ত হইত, এখন সেই গৃহাঙ্গনে জাত তৃণাঙ্কুর মধ্যে পতিত অঞ্জলি প্রমাণ বীজমাত্র বলি কীটগণের মুখভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে।

(নাট্যারম্ভে) উল্লিখিত কয়টি কবিতাতে আর্য নায়কের মনে দারিদ্র্যাবস্থায় যে সকল দুঃখ অতি প্রবল হইয়া উঠে, তাহাই বলা হইল। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়িলে আপনি খাবে কি, এই প্রথম চিন্তা, তাহার পর স্ত্রী পুত্র খাবে কি, এই দ্বিতীয় চিন্তা; তাহার পর আপনাদের ভাল খাওয়া ভাল পরা ভাল থাকার কি হইবে এই চিন্তা—কিন্তু আর্য নায়ক চারুদত্তের ওসকল চিন্তা নাই। অতিথি আইসে না, সুহৃজ্জনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, লজ্জা, নিস্তেজস্বিতা,

পরিভব, নির্বেদ, শোক, বুদ্ধিভ্রষ্টতা প্রভৃতি দোষ দারিদ্র্য হইতে জন্মে, এই সকল চিন্তাই তাঁহার মতে অতি বলবতী।

কবি এইরূপ আপন নায়ককে প্রথম হইতে উদাত্ত গুণে বিভূষিত করিয়া তাহার পর তাঁহাকে অতি বিস্পষ্ট আর একটি মুদ্রাঙ্কনে মুদ্রিত করিয়া তাঁহার আর্য ভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহার বয়স্য মৈত্রেয় বলিলেন, "দেবতাদিগের এরূপ পূজা করিয়াও যখন তোমার প্রতি তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন নাই, তখন আর তাঁহাদের পূজার গুণ কি?" চারুদত্ত এই কথার উত্তরে বলিলেন,—

"তা নয়, গৃহস্থের এই নিত্যবিধি। তপস্যা, মন, বাক্য এবং বলি দ্বারা পূজিত হইয়া দেবতারা শান্তিমান ব্যক্তিদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই।"

এই আর্য—এই প্রকৃত হিন্দু। পৃথিবীর অপর কোন নরকুলে আর এইরূপ বিশুদ্ধ আচরণ শিক্ষিত হয় নাই। সকলেই ধর্মে রত হয় ধর্মফলাভিসন্ধিতে। হিন্দু বিনা ফলাভিসন্ধিতেই ধর্মাচরণে শিক্ষিত। তিনি বিধি প্রতিপালনেরই কর্তব্যতা জানেন। বিধি প্রতিপালন নিবন্ধন যে সুখপ্রাপ্তি-রূপ শুভ ফল হইবে, তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে তিনি ভূয়োভূয়ঃ নিষিদ্ধ হইয়াছেন। চারুদত্তের চরিত্র এইরূপ শাস্ত্রশিক্ষার ফল।

(৪)

মৃচ্ছকটিক-এর নায়ক চারুদত্ত দরিদ্র-দশায় পতিত এবং আর্য শাস্ত্রের শিক্ষা-গুণে সর্বতোভাবে উদারচেতা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ হইয়া প্রদর্শিত হইলে রঙ্গভূমিতে নায়িকা বসন্তসেনার অবতরণ আরম্ভ হইল। এই নায়িকার চরিত্রে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। এই বৈচিত্র্যটি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে সমাজ-চিত্রই পরিষ্কাররূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয়; এবং তাহা হয় বলিয়াই সমাজ-চিত্রাঙ্কনে কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক-রচয়িতার তাদৃশ নায়িকা লইয়াই নাটক-রচনা।

বসন্তসেনা একটি গণিকা। সে বহুল ধনশালিনী। তাহার বাটী আট মহল। সে বাটীর তোরণ-দ্বার অতি উচ্চ। বাটীর ভিতরে কত পুষ্পোদ্যান, দীর্ঘিকা, কত রত্নবেদী, কত রত্নস্তম্ভ, কত গোরু, হাতী, ঘোড়া, কত লোকজন, কত কত দাস দাসী, কত পড়ুয়া পণ্ডিত, কত গান বাদ্য, কত রঙ্গ রস। তাহার বাটীর বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শিল্প-নৈপুণ্যের, কলাবিদ্যানুশীলনের, এবং

ভবশালিতার বিলক্ষণ আতিশয্য অনুভূত হয়। বসন্তসেনা যে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন, সেই নগরের সর্বপ্রধান শোভা বলিয়াই নাগরিকেরা তাঁহার উল্লেখ করিত। তিনি যেমন ধনবতী তেমনি মাননীয়াও ছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সমাজে বর্ণভেদ-প্রথার যেন একটি ছাঁচ জমিয়া গিয়াছে। এখনকার সকল ব্যবসায়ই ঐ ছাঁচে ঢালা হইয়া গঠিত হয়। এখনকার গণিকার ব্যবসায়ও ঐ ছাঁচে ঢালা হইয়া গঠিত হয়। এখনকার গণিকার ব্যবসায়ও একটা জাতি-ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য। কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, কোন গণিকার কন্যা যদি মাতৃব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, তবে রাজদ্বারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইতে পারিত। মৃচ্ছকটিক-এর নায়িকা বসন্তসেনা ঐ রূপ "কনেলা-মাতা" (অর্থাৎ অনুঢ়াগর্ভজাত) এবং মাতৃ-ব্যবসায়াবলম্বনে একান্ত অনিচ্ছাবতী; তাদৃশ অনিচ্ছার কারণ—নায়ক চারুদত্তের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। বসন্তসেনা সেই অনুরাগের বশীভূতা হইয়া সখীজনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ-সময়ে ঐ চারুদত্তের কথাই কহে। স্বয়ং একাকিনী বসিয়া চারুদত্তের চিত্রিত প্রতিমূর্তির প্রতি নিরীক্ষণ করে।

গণিকাজাতীয়া এবং এরূপ অনুরাগসম্পন্না বসন্তসেনা দেখিতে কেমন ছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বতঃ কৌতূহল জন্মে। তিনি যে বিশিষ্টরূপেই সৌন্দর্যসম্পন্না যুবতী তাহা "বসন্তশোভেব", "দেবতোপস্থানযোগ্যা" ইত্যাদি বিশেষণ-পদের দ্বারাই প্রকটিত হইয়াছে। তবে একটি কথা এই—ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং খাঁটি শূদ্র অপেক্ষা নানা প্রকার সংমিশ্র বর্ণের লোকই অধিক এবং সেই মিশ্র বর্ণের লোকদিগের মধ্যে শূদ্র বা অনার্য সম্বন্ধই অধিক। অতএব সম্ভবতঃ পূর্বকালের গণিকাজাতীয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনার্য-শোণিত-সম্বন্ধ ছিল। কবি যেন সেই কথাই কতকটা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন বোধ হয়। একজন দাস (সুতরাং শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি) বসন্তসেনাকে অত্তিকা (অর্থাৎ দিদি) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বসন্তসেনা উচ্চজাতীয়া হইলে তাঁহার প্রতি দাসের ঐরূপ সম্বোধন কোন রূপেই সম্ভবপর হয় না। অপর এক স্থলে একজন বসন্তসেনাকে গালি দিয়া "নীনাসা" (নিম্ননাসা) বলিতেছে। "নিম্ননাসা" বিশুদ্ধ আর্য স্ত্রী-পুরুষের লক্ষণ নয়—যেখানে নিম্ননাসা দেখা যায়—সেই স্থলেই অনার্য শোণিতের মিশ্রণ বুঝিতে হয়। অপর এক

স্থলে বসন্তসেনাকে গাঢ়ান্ধকারে হারাইয়া বলা হইতেছে মসীরাশি মধ্যে যে "অঞ্জিগুড়িয়া" (অঞ্জন-গুটিকা) হারাইয়া গেল। এই কথায়, বসন্তসেনার বর্ণটা গৌর না হইয়া কিছু কাল বলিয়াই বোধ হয়। কৃষ্ণবর্ণতা অনার্য সংস্রবের স্পষ্ট লক্ষণ! অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বসন্তসেনা "বিশাল-লোচনা", শ্যামাঙ্গী সুন্দরী।

বসন্তসেনা যে সমস্ত কলাবিদ্যায় বিদ্যাবতী, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি? তাঁহার স্বর-বৈচিত্র্যকরণ ক্ষমতা, পদবিন্যাসাদির লঘুতা, সবকার্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশিষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়া, তাঁহার বাটী যে সমস্ত কলাবিদ্যার আগারস্বরূপ, তাহা স্পষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে।

বসন্তসেনা অন্যান্য সংস্কৃত নাটকাদির অত্যুৎকৃষ্ট নায়িকাদিগের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন। তবে তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতা কিরূপ ছিল, তাহা কবি একটু বিশেষ কৌশল অবলম্বন-পূর্বক বড় পরিষ্কাররূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন। বসন্তসেনা কদাপি উচ্চশ্রেণীর পাত্রদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে যান না। তিনি কলাবিদ্যার শিক্ষাদাতা বিটের সহিত সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, আর বিদূষককে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে হয় তাহা সংস্কৃতে বলেন তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বাগত উক্তিগুলিও প্রাকৃত ভাষায় হয়, সংস্কৃতে হয় না। কবি এইরূপে দেখিলেন যে, স্ত্রীলোককে বিদ্যা ফলাইতে দেখিলে ভদ্রলোকের যে অশ্রদ্ধা হয় বসন্তসেনা তাহা বুঝিতেন, এবং বসন্তসেনার সংস্কৃতজ্ঞতা এমন পাকা রকমেরও ছিল না যে স্বয়ং সংস্কৃতে চিন্তা করিতে পারেন।

(৫)

মৃচ্ছকটিক-এর নায়ক চারুদত্ত, উহার নায়িকা বসন্তসেনা। নাটকোল্লিখিত অপরাপর পাত্রদিগের মধ্যে দোষ গুণে জড়িত অপর একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনা আছে। তাঁহার নাম শর্বিলক। অন্যান্য নাটকাদিতে যে সকল কাজ দৈবশক্তি বা সম্যক্ অতি-মানুষশক্তি দ্বারা নির্বাহিত হয়, মৃচ্ছকটিক নাটকে এই শর্বিলকের দ্বারাই সেই সকল কার্য নির্বাহিত হইয়াছে। ইনিই রাজার কারাগৃহ হইতে ভাবী ভূপতিকে মুক্ত করিয়া দেন, ইনিই রাজবিদ্রোহের অধিনেতা এবং ইনিই পরিশেষে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পাদন করিয়া দুষ্টের দমন এবং

শিষ্টের পালন সুসিদ্ধ করেন। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত তিনি যথার্থ হিন্দুর আদর্শ স্বরূপ। এরূপ লোককে আদর্শ জ্ঞান করিবার মানুষই এদেশে অধিক। ঐরূপ লোকের গঠন করাই আর্য শাস্ত্রের এবং আর্য শিক্ষার উদ্দেশ্য। চারুদত্তই আমাদিগের অলঙ্কারশাস্ত্র মতে ধীরোদাত্ত অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট নায়ক। নাটককারও পদে পদে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার চারুদত্ত নিজ হৃদয়ে "গুণশাস্ত্রের" বলেই শস্ত্রধারীদিগের অপেক্ষাও বলীয়ান্, তিনি জনগণের তৃষ্ণার অপনয়ন করিয়াই বিশুষ্ক হ্রদের ন্যায় নীরহীন, তিনি জনসাধারণের পক্ষে 'ভূদল মিঅংকা' (ভূতল-মৃগাঙ্ক), তিনি নির্ধন হইলেও 'ভৃত্যানুকম্পক' বলিয়া ভৃত্যদিগের প্রিয় এবং তিনি স্বভাবতঃ এমনি সুশীতল যে, অপকারী ব্যক্তিরও অপকারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, "ন চন্দ্রাদো আদবো হোদি" (ন চন্দ্রাদাতপো ভবতি)।

কিন্তু শর্বিলক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনিও ব্রাহ্মণ কুলপতির সন্তান, তিনিও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তিনিও দরিদ্র এবং তিনিও একটি যুবতীর প্রণয়-পাশে একান্ত সম্বদ্ধ। ঐ যুবতী বসন্তসেনারই একটি দাসী, তাহার নাম মদনিকা। সেই মদনিকার নিষ্ক্রয় সাধন পূর্বক "অভুজ্জিয়া" বা জনস্তভোগ্যা করিবার জন্য দরিদ্র শর্বিলকের অর্থ সংগ্রহ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

সিংহবিক্রমশরীর, প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি, পরাধীন-বৃত্তি-পরাঙ্মুখ, স্বাভাবিক প্রখরা ইচ্ছাবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত, শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা সমবলম্বিত, চৌর্য ব্যবসায়ের উৎকর্ষ খ্যাপনপূর্বক সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শর্বিলক সাহস-কার্যে রত হইয়াছেন। মৃচ্ছকটিক-প্রণেতা চারুদত্ত এবং শর্বিলক উভয়কে গঠন করিয়া নিজ গ্রন্থে চারুদত্তেরই প্রধান স্থান কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শর্বিলকের স্থান উচ্চ নয়। শর্বিলক যে সাহসের কর্ম করেন তাহা বলিয়াই গ্রন্থকার নিবৃত্ত হয়েন নাই। শর্বিলক যে কোন প্রকার ধর্মকথাই মানেন না, যাহা কিছু তাঁহার ইচ্ছার গতিরোধ করে, তাহাই উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত, নাটককার তাহাও পদে পদে দেখাইয়া দিয়াছেন। শর্বিলক চৌর্য-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া সন্ধিখনন করিতে করিতে পরিমাণ-সূত্র ভুলিয়া আসিয়াছেন মনে হওয়াতে বলিলেন—

"কি দুঃখ! পরিমাণ-সূত্র ভুলিয়া আসিয়াছি।" চিন্তা করিয়া—"হাঁ এই

যজ্ঞোপবীতই প্রমাণসূত্র হউক ; পৈতাটা ব্রাহ্মণদিগের, বিশেষতঃ আমার মত ব্রাহ্মণদিগের, বড়ই উপকরণ দ্রব্য।”

অতএব পৈতা দিয়াই শর্বিলক সিঁদ মোয়ান মাপিয়া লইলেন।

(৬)

মৃচ্ছকটিক-এর মুখপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য। তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি শাস্ত্র-শাসনের অধীনা। মৃচ্ছকটিকের গৌণপাত্র শর্বিলক ইউরোপীয় ছাঁচের লোক। ি সক্ষম, পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণধী। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব বলবতী, ধর্ম শাসনের ততটা বশীভূতা নহে। এক কথায় চারুদত্ত সাত্ত্বিক, শর্বিল রাজসিক পুরুষ। আজি কালি ইউরোপীয় শিক্ষা, ইউরোপীয় ভক্তি ইউরোপীয় অনুকরণের দিন পড়িয়াছে। অতএব বোধ হয়, ইংরাজীতে কৃতবি এতদ্দেশীয় নব্যেরাও যদি মৃচ্ছকটিক পাঠ করেন, তবে তাঁহাদিগেরও মে চারুদত্ত অপেক্ষা শর্বিলককেই ভাল লাগিবে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভা এতদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ে যে চিত্তাদর্শের প্রভেদ জন্মিয়া যাইতেছে, তাহ প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথার উল্লেখ করা গেল। এই কথাটা স্মরণ করি রাখিলেই এখনকার নাটক-নাটিকা, আখ্যায়িকাদি গ্রন্থে যে কি জন্য সত্ত্বগু প্রধান পাত্রদিগের অপেক্ষা রজোগুণপ্রধান পাত্রদিগের অধিকতর গৌর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহারও কারণ উপলব্ধ হইবে। কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃতি কি? আমাদিগের পূর্বাচার্যেরা যে সক গুণ এবং চরিত্রকে অপেক্ষাকৃত দুষ্ট এবং হেয় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাহ ভাল এবং আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে বই ত নয়। ইউরোপীয় শাস্ত্রে শিক্ষিতে যদি মনে করেন যে তাঁহারা ঐ শিক্ষার প্রভাবে শৌর্যগুণের পক্ষপাতী হই উঠিতেছেন, এই জন্য বলা আবশ্যক যে, শৌর্য গুণের মধ্যেও বিলক্ষণ ভে আছে। যে শৌর্যের মূলে যশোলিপ্সা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, অথবা আত্মগৌর থাকে, সে শৌর্য এক প্রকারের, আর যাহার মূলে বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞান, সে শৌ আর এক প্রকারের। এই মৃচ্ছকটিক-এই ঐ দুই প্রকার শৌর্যের উদাহর প্রদর্শিত হইয়াছে। শর্বিলকের শৌর্য প্রথম-প্রকারের—উহা আত্মগৌরবমূল এবং রজোগুণসম্ভূত। নাটকের যে অংশে শর্বিলককে অতি প্রোজ্জলরূ দেখা যায়, সেই স্থানটি লইয়া বিচার করা যাইতেছে। শর্বিলক মদনিক

নিক্রয় হেতু উহার চৌর্যলব্ধ অলঙ্কারমঞ্জুষা লইয়া বসন্তসেনার বাটীতে আসিয়াছেন, এবং মদনিকাকে নিভৃতে বলিতেছেন, "আমি দারিদ্র্যাভিভূত এবং তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত, তোমার জন্যই অদ্য রাত্রিতে সাহসের কর্ম করিয়াছি।"

মদনিকা—শর্বিলক, তুমি একটা স্ত্রীস্বরূপ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত দুইটিকে সংশয়ে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ।

শর্বিলক—কি কি ?

মদ—শরীর এবং চরিত্র।

শর্বি—অপণ্ডিতে ! সাহসে লক্ষ্মীর বাস।

মদ—শর্বিলক ! তোমার চরিত্র অখণ্ডিত আছে—আমার জন্য সাহস কর্ম করায় অতি বিরুদ্ধ আচরণ করা হয় নাই ?

শর্বি—পুষ্পবতী লতার ন্যায় বিভূষিতা কোন অবলার ধন চুরি করি নাই। যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বিপ্রসঞ্চিত সুবর্ণ হরণ করি নাই—ধনার্থী হইয়া ধাত্রী-ক্রোড়স্থিত বালককে অপহরণ করিয়া লই নাই—চৌর্যে প্রবৃত্ত হইয়াও আমার বুদ্ধি কার্যাকার্য-বিচার বিষয়ে সুস্থিরাই থাকে।

শর্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ আছে। কর্তব্যাবধারণে তাঁহার বিলম্ব হয় না। যেমন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়মিত্র "আর্যক" রাজা "পালক" কর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, অমনি সদ্যঃপ্রাপ্তা "মদনিকা"কে ছাড়িয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারার্থ গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন—

"অসাধু রিপুবর্গ মনে মনে ভীত হইয়া বিনা দোষে প্রিয় সুহৃদকে বন্দী করিয়াছে। আমি সত্বরেই যাইয়া যেমন রাহুগ্রাস হইতে শশাঙ্ক মুক্ত হয়েন সেইরূপ তাঁহাকে মুক্ত করি।"

শর্বিলক যাহা বলিলেন তাহাই করিলেন।

শর্বিলক বলিতেছেন—"আমি সেই দুষ্ট নরপতি পালককে বধ করিয়া এবং তাহার রাজ্যে আর্যকের অভিষেক করিয়া তাঁহার শেষ আজ্ঞা শিরোধারণ-পূর্বক বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিব।"

কিন্তু বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিবার জন্যও তাঁহার সমীপস্থ হইতে শর্বিলকের মনে ভয় হইতেছে। তিনি বলিলেন—

ইঁহার বাটীতে চুরি করিয়া আমি মহাপাতক করিয়াছি। কেমন করিয়া নিকটে যাইব ! অথবা সর্বত্র সরলতা শোভনীয়।

(৭)

মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা তাঁহার নাটকের গৌণপাত্র, শর্বিলকের বীর্যশালিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি অত্যুচ্চ গুণাবলী প্রদর্শন করতঃ তিনি রাজস-প্রকৃতিক, অতএব নিজ ইচ্ছাবৃত্তির একান্ত অধীন, এবং পরিশেষে সত্ত্বগুণপ্রধান চারুদত্তের সমীপে লজ্জান্বিত—ইহা দেখাইয়া সত্ত্বগুণেরই যে সম্যক্ প্রাধান্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নহে। মৃচ্ছকটিক-এর রচয়িতা যে সাত্ত্বিক শৌর্যগুণেরই বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাও চারুদত্তের চরিত্র-সংগঠন-প্রণালীতে দেখাইয়াছেন। চারুদত্তও বীরপুরুষ। তবে তাঁহার বীরত্ব বলবিক্রম-প্রকাশে অথবা সুহৃদের কারামোচনে কিম্বা রাষ্ট্রবিপ্লব-সংঘটনে পর্যবসিত হয় না। তাঁহার শৌর্য কিরূপ, আর্য হিন্দুর শৌর্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নাটক হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) বড় একটা বিপদের সময় কোন বন্ধু তাহাকে মিথ্যা কথা বলিবার অনুরোধ করিলে তিনি ঘৃণাপূর্বক বলিলেন—"কি! আজি আমি মিছা কথা বলিব? বরং ভিক্ষা করিয়া ন্যস্ত ধন প্রত্যর্পণের উপায় করিব, তথাপি চরিত্রদূষণ অনৃত বাক্য বলিব না।"

(২) রাজ-দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত, অপরিচিতপূর্ব আর্যক তাঁহার গাড়ি চড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্বক বলিল,—"আমি গোপাল-জাতীয় আর্যক, আপনার শরণাগত।"

চারুদত্ত—"বিধাতা কর্তৃকই তুমি উপনীত হইয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইলে, আমি বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি শরণাগত তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

(৩) এই ব্যাপারের পর হইতে রাজার শ্যালক যে চিরশত্রুতার ভয় দেখাইয়াছিল, সেই শত্রুতার কার্যারম্ভ হইল। সে স্বয়ং বসন্তসেনা কর্তৃক ঘৃণিত এবং পদাহত হইয়া তাহার গলা টিপিয়া মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া গেল; এবং সে মরিয়াছে মনে করিয়া চারুদত্তই অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে মারিয়াছেন এই কথা ব্যক্ত করিল। আদালতে চারুদত্তের বিচার হইল। আনুষঙ্গিক প্রমাণের বলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলেন। রাজা তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

চারুদত্ত বলিতেছেন—"হায়! রাজা পালকের কি অপরিণামদর্শিতা। অথবা দুষ্টমন্ত্রিগণ কর্তৃক এইরূপ ব্যবহারাগ্নিতে পাচিত হইয়া রাজারা বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন।"

(৪) তাহার পর রাজদণ্ডের বিবরণ ঘোষণা করিতে করিতে যখন বধ্য-ভূমিতে লইয়া যায় তখন একজন তাঁহাকে নির্দোষী বলিতেছেন. ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আপনারা শুনিলেন, আমি মরিতে ভীত নই, আমার যশ দূষিত হইয়াছিল এই দুঃখ। যদি যশ বিশোধিত হইল, তবে এই মৃত্যুও পুত্রজন্মের সমান আনন্দকর হইল।"

(৫) সেই প্রিয়া বসন্তসেনাকে স্মরণ করিয়া চারুদত্ত পুনর্বার বলিতেছেন—"আমি প্রবল পুরুষদিগের বাক্যে এবং নিজ ভাগ্যদোষে যদিও আজি দূষিত হইলাম, তথাপি যদি আমার ধর্মের প্রভাব হয়, তবে সুরপতি-ভবন হইতেই হউক, আর যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থান হইতেই হউক, সে নিজ স্বভাব গুণেই আমার এই কলঙ্কের অপনোদন করিবে।"

(৬) ইহার পর শর্বিলক এবং তাহার সহকারিবর্গ যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে চারুদত্তের নিষ্কৃতি হইল, এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়িল। মৃত রাজার শ্যালক বন্দীকৃত হইয়া চারুদত্তের সমক্ষে আনীত হইল। সেই সময়ে ঐ রাজ শ্যালকের সম্বন্ধে চারুদত্তের সহিত শর্বিলকের যে কথোপকথন হয়, তাহা শ্রবণ-যোগ্য।

শর্বি—আর্য চারুদত্ত! আজ্ঞা করুন, এই পাপের সম্বন্ধে কি করা যাইবে?

চারু—কি, আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে?

শর্বি—তাহাতে সন্দেহ কি?

চারু—সত্য?

শর্বি—সত্য।

চারু—যদি তাহাই হয় তবে ইহাকে—

শর্বি—কি মারিয়া ফেলিব?

চারু—না, না, ছাড়িয়া দাও।

শর্বি—কি জন্য?

চারু—যে শত্রু অপরাধ করিয়া শরণাগত হইয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করিতে নাই।

শর্বি—তবে তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে হয় ?

চারু—না, তাহাকে উপকার-হত (অর্থাৎ উপকার দ্বারা তাহার শক্রতা হত) করিতে হয়।

শর্বি—অহো আশ্চর্য ! আর্য আমাকে বলুন কি করিব।

চারু—ছেড়ে দাও।

আর্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্মপ্রভাবে বিশ্বাস, এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সাত্ত্বিক বীরতা। এই বীরতার প্রকৃতি আর কোন জাতি এমত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

(৮)

মৃচ্ছকটিক নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান দুইজনের চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য এবং ইউরোপীয় আর্য, এতদুভয়ের মধ্যে যে চিত্তাদর্শসম্বন্ধীয় মৌলিক ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপীয় পুরুষ সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরস্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে করেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবীরই বীর। সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মনে করেন। তাঁহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্যবীর, প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়—যুদ্ধবীর সকলের পশ্চাদ্ভাগে আইসেন।

সমালোচ্য মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের সাত্ত্বিক ঐতিহাসিক লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া এই বোধ জন্মে যে, জনগণের মধ্যে ধর্মবিষয়ে মতভেদ হইলেই তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষ করে। কিন্তু সকল দেশেই ঐ বিদ্বেষ সমানরূপে প্রখর হয় না। ইউরোপীয়েরা রজোগুণপ্রধান। তাহারা কামক্রোধের একান্ত বশীভূত। আবার তাহাতে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করা তাহাদের শাস্ত্রানুমোদিত। ভারতবর্ষীয়েরা ব্রাহ্মণদিগের সাত্ত্বিক শিক্ষার গুণে চিরকাল রিপুদমনে প্রবণ

এবং পরমার্থদৃষ্টি। তাঁহাদের শাস্ত্রে ভেদ-জ্ঞানের ভূয়সী নিন্দা ও অভেদ-জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। এই সকল কারণে এদেশে মতভেদ হইলেই ইউরোপের ন্যায় পরস্পর পীড়ন, নির্যাতন, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারের সূচনা হয় না।

(এডুকেশন গেজেট, ১২৯৪)

উত্তরচরিত

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

(১)

ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি, এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যেরূপ অনুরাগ, উত্তরচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত বোধ হয় না।" আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না। যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিত-এর মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদুবাবু মধুবাবু তাহার কি বুঝিবেন?

বাস্তবিক, কত কবি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিদিগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাগরাপেক্ষা ঝিলবিলহ্রদের যেরূপ প্রাধান্য, ভবভূতির অপেক্ষা শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্টের সেইরূপ প্রাধান্য। পৃথিবীর নাটক-প্রণেতৃগণ মধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্সপীয়র, এস্কিলস, সফোক্লস, কাল্‌দেরণ, এবং কালিদাস, ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্তী বটে।

সেক্সপীয়র পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় কবি হইলেও, ইউরোপে তাঁহার সমুচিত মর্যাদা অল্পকাল হইয়াছে মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পর দুইশত বৎসর পর্যন্ত কেহই তাঁহার প্রণীত আশ্চর্য নাটকসকলের মর্ম বুঝিতেন না। ড্রাইডেন, পোপ,

জন্সন্‌ প্রভৃতি সকলে স্বয়ং কবি, এবং সকলেই সযত্নে সেক্সপীয়রের গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রশংসাও করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মর্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বল্টের নিজে অতি প্রধান কবি—তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও সেক্সপীয়রের কিছুই মর্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বরং তিনি অনেক নিন্দা এবং উপহাস করিয়াছিলেন। এই ইংলণ্ডীয় কবির যথার্থ মর্যাদা প্রথমে ইংলণ্ডে হয় নাই—শ্লেগেল এবং অন্যান্য জর্মানগণ আধুনিক সেক্সপীয়র পূজার সৃষ্টিকর্তা।

যদি সেক্সপীয়রের এইরূপ হইল, তবে ভবভূতিরও যে এতকাল সমুচিত মর্যাদা হয় নাই, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। আমরাও যে ভবভূতির সমুচিত প্রশংসা করিতে পারিব, এমত নহে, বিশেষ এই পত্রে স্থান অতি অল্প।

উত্তরচরিত-এর উপাখ্যান-ভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু উপাখ্যানবর্ণনকার্যাদিসকল ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্মিলন এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিত-এ সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচরিত-এ সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ, এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন না, যাহা একবার বাল্মীকি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্‌ কবি তাহা পুনর্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? ভবভূতি অথবা ভারতবর্ষীয় অন্য কোন কবি ঈদৃশ শক্তিমান নহেন যে, তদপেক্ষা সরসতা বিধান করিতে পারিতেন। যেমন ভবভূতি এই উত্তরচরিত-এর উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্সপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকেরই উপাখ্যান-ভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ব কবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেক্সপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন—কোন্‌ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের

উপাখ্যান-ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্বকই পূর্বলেখকদিগের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যান-ভাগ তিনি হোমার হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ট্রৈলস্ ও ক্রোসিদা নাটক প্রণয়ন-কালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।

ভবভূতিও সেক্সপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতানির্বাসনবৃত্তান্ত অবলম্বন পূর্বক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, কবিগুরু বাল্মীকির সহিত কদাচ তিনি তুলনাকাঙ্ক্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম* করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ† বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবী-প্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন। ইহাতে এই নাটক অসম্পূর্ণগুণ বলিয়া বোধ হয়। কবি যদি সীতার জীবনোপযোগী পরিণাম প্রযুক্ত করিয়া নাটক সমাপ্ত করিতেন, এবং অন্যান্য কয়েকটি দোষের প্রতিকার করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এই নাটক ভারতভূমিতে অদ্বিতীয় হইত।

উত্তরচরিত-এর চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত, কেন না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাস-এর প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিসুলভ-কৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, কবি সংক্ষেপে পূর্বঘটনা-সকল বর্ণনা করেন। রাম-সীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের

* ইদং গুরুভ্যঃ [কবিভ্যঃ] পূর্বেভ্যো নমোবাক্যং প্রশাস্মহে। প্রস্তাবনা

† দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥ সাহিত্যদর্পণে

স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতানির্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্বাসন সামান্য স্ত্রী-বিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্যের প্রতিমা, বার্ধক্যে যে জীবনা-বলম্বন—ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কাযে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সাথী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্মে যে গুরু—ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে? পত্নী-বিসর্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভালবাসে? সে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত,—জানে না যে,—"সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা, প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ। তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়-গণো, বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলতি চ ॥"*

যাহার পক্ষে—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি,
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি,
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥"†

* "এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি; কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে; অথবা মদ (মাদকদ্রব্য সেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে; ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" —নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা।

† "কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সন্তর্পণস্বরূপ, কর্ণের অমৃতস্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ঔষধস্বরূপ।" —নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩১ পৃষ্ঠা।

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,—

"আবিবাহসময়াদ্ গৃহে বনে,
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতেঽন্যয়া ;
রামবাহুরুপধানমেষ তে ॥"*

যাহার পত্নী—

"—গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ।"†

তাহার কি কষ্ট, কি সর্বনাশ, কি জীবনসর্বস্বধ্বংসাধিক যন্ত্রণা? তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্বপ্রফুল্লকর মধ্যাহ্নসূর্য—সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদম্বিনী,—যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্ত-বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখ-সাগরের ভীষণস্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকূল,—প্রাসাদ-শ্রেণীসমুজ্জ্বল, ফলপুষ্পপরিশোভিতোদ্যানমালামণ্ডিত, এই সর্বসুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকার-সাগরে ডুবাইলেন।

(২)

অঙ্কমুখে, লক্ষ্মণ, রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে দুর্মনায়মানা গর্ভিণী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্যন্ত রামসীতার পূর্ববৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই "চিত্রদর্শন" কেবল প্রেম-পরিপূর্ণ—স্নেহ যেন আর ধরে না। কথায়

---

* "রামবাহু বিবাহের সময় হইতে কি গৃহে, কি বনে, সর্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য করিয়াছে।"

—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩১ পৃষ্ঠা।

† "ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃতশলাকাস্বরূপ, ইঁহারই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দনরসস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইঁহারই এই বাহু আমার কণ্ঠে শীতল এবং কোমল মুক্তাহারস্বরূপ।" —নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩১ পৃষ্ঠা।

... এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথা-প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও ...তার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন—তখন সীতার কেবল "হোদু ...উত্ত হোদু—এহি পেক্খম্ম দাব দে চরিদং"—এই কথাতেই কত প্রেম!

মিথিলাবৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া ...ঠিল! সীতা দেখিলেন,

"আহা! আর্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্ল-প্রায় নবনীলোৎপলবৎ ...মলস্নিগ্ধ কোমলশোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সৌন্দর্য! কেমন অবলীলাক্রমে ...ধনু ভাঙিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া ...ই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন! আহা কি সুন্দর!"

যখন রাম গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন,

"একত্র শয়ন করিয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত ...লগ্ন করিয়া এবং উভয় উভয়কে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ...নবরত মৃদুস্বরে ও যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি ...তিবাহিত করিতাম।"*

যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,

"যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঈষৎ কম্পবান্, তথাপি ...নোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গনকালে অত্যন্ত মর্দনদায়ক, আর দলিত মৃণালিনীর ...ায় ম্লান ও দুর্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন ...রিয়াছিলে।"*

যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা ...লিলেন, "হোক—আমি রাগ করিব—যদি তাঁহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই।" ...খন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় ...চত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, ...চ্ছ ইঅং বি অবরা কা?" সূর্পণখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয়, আমাদের ...তি মিষ্ট লাগে,—

সীতা। হা আর্যপুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা।

রাম। বিরহের এত ভয়—এ যে চিত্র।

* নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উদ্ধৃত।

সীতা। যাহাই হৌক না—দুর্জন হইলেই মন্দ ঘটায়।

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তি তদপেক্ষা হীন নহে—বরং অনেকাংশে তাঁহার প্রাধান্য আছে। কালিদাসের বর্ণনা, তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হ ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্ গুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়াসকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলিন সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এ জন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্ পরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রাসকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই-চারিটা সুন কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয় তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দে যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎ হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

চিত্র-দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন

রামচন্দ্র নির্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, এবং সেই জন্যই ভারতে তাঁহার দেবত্ব-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বস্তুত বাল্মীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দোষ বা সর্বগুণবিভূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই রামায়ণগীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ; কিন্তু সে সকল দো গুণাতিরেক মাত্র। এই জন্য তাঁহার দোষগুলিনও মনোহর। কি গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরা অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহন্তা, তাই বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে পাণ্ডবেরা মাতৃ-কথার অতিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয় কি অনেকের একপত্নীত্ব দোষ নয়?

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম করিয়াছেন—যথা বালিবধ। কিন্তু তি

যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা-বিসর্জ্জনাপরাধ সর্বাপেক্ষা গুরুতর। শ্রীরামের চরিত্র কোন্ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা যাউক।

ভবভূতির রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জ্জন করেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতা ছিল না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়াই, এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কুলধর্ম্ম বলিয়াই তাহাতে তাঁহার এতদূর দার্ঢ্য। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন,

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।*

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, ভার্য্যাকে পবিত্র জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে, সীতা পবিত্রা,—

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্ত্তিশঙ্কাবশতঃ পবিত্রা পতিমাত্র-জীবিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। "আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে। আমি এ অকীর্ত্তি সহিব না—যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।" এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিত চিত্তভাব।

বাস্তবিক সর্ব্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ, এই উভয় চরিত্র গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ, কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক, বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্য্য জাতি বীরজাতি ছিলেন—আর্য্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যে পরিপূর্ণ। ভবভূতি

* "প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে বিসর্জ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না।" —নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

যৎকালে কবি তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র কোমল-প্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতাপবাদ শুনিয়া, ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ-স্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্ছিত হইলেন। তাহার পর দুর্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণ রসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়।

এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীরপ্রকৃতি শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা, আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্ছা গেলেন না,—মাথাও কুটিলেন না—ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরশূন্য ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে, পর্বতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, "আমি সীতাকে পবিত্রা জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।" স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি রাজ-আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।" যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন সেইরূপ লক্ষ্মণকে সীতা-বিসর্জনে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোকসূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। "মর্মাণি কৃন্তুতি" ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি!

ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচরিত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান-কাব্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্যপরম্পরার সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান-কাব্যে লেখকেরা

প্রতীয়মান করিতে চাহেন, সে সকল কার্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজনই তাদৃশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাট্যকারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাই। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিত-এর প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে, সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে—নবপ্রেম-মুগ্ধ অসারবান যুবকের কথা।

(৩)

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবৎসরকাল ব্যবধান। উত্তরচরিত-এর একটি দোষ এই যে নাটকবর্ণিত ক্রিয়াসকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এ সম্বন্ধে উইণ্টর্স টেল্ নামক সেক্সপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশ বৎসর মধ্যে সীতা যমজ সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাঁহার পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূর্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শম্বুক নামক কোন নীচজাতীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য-মধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ-মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শম্বুক পঞ্চবটীর বনে তপ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে মুনিপত্নী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্বে প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্বে একটি একটি বিষ্কম্ভক আছে। এগুলি অতি মনোহর। কখন বিদুষী ঋষিপত্নী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্যময়ী সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিষ্কম্ভকসকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্ভই সুন্দর। যথা—

"ঐ দেখ, এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্লবার্ঘ্যের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।"*

শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর—

"গুরু বুদ্ধিমান্‌কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রূপ দিয়া থাকেন কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্মল মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে. মৃত্তিকা তাহা পারে না।"*

হরেস্‌ হেমান উইলসন্‌ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলিন এমত সুন্দর ভাব আছে যে তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধৃত অংশ এই কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন করিয়াছেন। প্রথম বিরহে তাঁহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালসহকারে সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; সর্বসন্তাপহর্তা কাল এই সন্তাপের শমতা সাধিতে পারে নাই।

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণোরসঃ।†

এইরূপ মর্ম মধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনস্থান; পদে পদে সীতাসহবাসের চিহ্নপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরী-স্রোতঃস্খলিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদীগুলিন দেখিল যে, আজি বড় বিপদ্।

* নৃসিংহবাবুর অনুবাদ।

† অবিচলিত গভীরহেতু হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্য গাঢ়ব্যথ রামের সন্তাপ মুখবদ্ধ পাত্রমধ্যে পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।

তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, "ভগবতি! সাবধান থাকিও—আজ রামের বিপদ্। দেখিও, রাম যদি মূর্চ্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মৃদু মৃদু তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিও।" রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্বসন্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্নিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছেন "ছায়া"। এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণ-দেহমাত্রবিশিষ্টা হতভাগিনী রাম মনোমোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর ভাগীরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে স্বহস্তরচিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সূর্যদেবের পূজা করিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দেবশক্তি প্রভাবে রঘুকুলবধূকে অদর্শনীয়া করিলেন। ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কিরূপ? তাঁহার মুখ পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দর"—কবরী বিলোল—শারদাতপসন্তপ্ত কেতকী-কুসুমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত কিশলয়ের মত, সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; জনস্থানে তাঁহার গভীর প্রেম, পূর্বসুখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থানবনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখীত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এই-মাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্তযূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "সর্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!" রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি

ডাকিলেন, "আর্যপুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!" কি ভ্রম! আর্যপুত্র।
কোথায় আর্যপুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা মূর্চ্ছিত।
হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে
রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী
বিচরণ করিবার মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্ব
মুর্ছিতা সীতার কানে গেল। অমনি সীতার মূর্ছাভঙ্গ হইল—সীতা ভ
আহ্লাদে, উঠিয়া বসিলেন! বলিলেন, "এ কি এ? জলভরা মেঘের স্তনিত
গম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল
আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?" দেখি
তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, "কেন বাছা, একটা অপরিস্ফু
শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলে?" সীতা বলিলেন, "কি
বলিলে ভগবতি? অপরিস্ফুট? আমি সে স্বরেই চিনিয়াছি আমার সে
আর্যপুত্র কথা কহিতেছেন।" তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা-
বলিলেন, "শুনিয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এ
জনস্থানে আসিয়াছেন।" শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বার বৎসরের প
স্বামী নিকটে, নয়নের পুতলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতের অধিক প্রি
সেই স্বামী আজি বার বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিবেন
শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না—"কই স্বামী—কোথায় (
প্রাণাধিক?" বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িতা করিলেন না, কেব
বলিলেন—

"দিঠ্‌ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ"—"সৌভাগ্যক্রমে (
রাজার রাজধর্ম-পালনে ক্রটি হইতেছে না।"

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দ
তাহার তুল্য, সন্দেহ নাই। "দিঠ্‌ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ
—এইরূপ বাক্য কেবল সেক্সপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনি
সীতা আহ্লাদের কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "সৌভাগ্যক্র
সে রাজার ধর্ম-পালনে ক্রটি হইতেছে না।" কিছু দূর হইতে রামের সে
বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া, "সখি, আমায় ধর" বলি
তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে

সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে "সীতে! সীতে!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন, "ভগবতি তমসে! রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামীকে বাঁচাও।"

তমসা বলিলেন, "তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন!" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব।" এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন।[১] রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরে সীতার পূর্বকালের প্রিয়সখী, বন-দেবতা বাসন্তী, সীতার পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সেই হস্তিশিশু স্বয়ং শত্রুজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনা অতি মধুর।

সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটীর বনে, রাম বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন। দূরে গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদগদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গমে দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে সীতার পূর্বসহবাসচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় একটি কদলীবন-

---

১। 'যা হউক তা হউক।' এই কথায় কত অর্থগাম্ভীর্য! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে, "আমার পাণিস্পর্শে আর্যপুত্র বাঁচিবেন কি না জানি না; কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব।" ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে পাণিস্পর্শ সফল হইবে কিনা, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক।" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তরচরিতের অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতার কার্য সন্দেহ নাই। কিন্তু কবির গৌরবার্থ আমাদিগকে সে দোষও স্বীকার করিতে হইল। সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, "যা হবার হউক!" সীতা ভাবিয়াছিলেন, "রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জন করিয়াছেন—বিসর্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয় পত্নীর মত তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।" তাই ভাবিয়া সীতাস্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন, "ভঅবদি তমসে! ওসরহ্ম জাব ণং পেক্খিস্সহি তদো অনব্ভণুন্নাদসন্নিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্সদি।" তবু "মম মহারাও"!

মধ্যবর্তী শিলাতলে, পূর্বপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন ; সেই-খানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন ; এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা পূর্বে পঞ্চবটীবাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বর্ধিত করিয়াছিলেন ! রাম দেখিলেন যে, সেই কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নব কুসুমোদ্গম হইয়াছে, তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়রটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়রটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লব মধ্যে ঘুরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্ব-স্মৃতিপীড়িত করিয়া, সখীনির্বাসন-জনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত ?" কিন্তু সে কথা রামের কানে গেল না— তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন ?" এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, "মহারাজ !" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন ? এত নিষ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জনবৃত্তান্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, "কুমারের কুশল." এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী যখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া বলিলেন, "দেব ! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে ?"

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

"তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত --এইরূপ শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে, তাহাকে—" বলিতে বলিতে সীতাস্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না ; অচেতন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, "আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন ?"

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।

বাসন্তী। কেন বুঝে না?

রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।"

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা করা দুঃসাধ্য। সীতাবিসর্জন জন্য বাসন্তী রাম প্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণাস্বরূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন; সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছিল—আত্মপ্রসাদ,—তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে, সে তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্মের রক্ষার্থই সীতাবিসর্জনরূপ মর্মচ্ছেদী কার্য করিয়াছেন—মর্মচ্ছেদ হউক, ধর্মরক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখাইলেন যে, ধর্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক্ একটি নামমাত্র। সে কুলধর্মরক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখাইলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এক প্রকার যশের লাভ-লালসায় পত্নীবধরূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে?

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম "সীতে! সীতে!" বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা, যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা-বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বাসন্তী ধৈর্য অবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "সখি, আবার ধৈর্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে —তথাপি আমি বাঁচিয়া আছি—আবার ধৈর্য কাহাকে বলে?" রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু

বাসন্তীর মনে সখীবিসর্জনদুঃখ জ্বলিতেছিল—কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন—

সীতা গোদাবরী-সৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্মণায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকাতুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলি বদ্ধ করিতেন!

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, "চণ্ডি জানকি, এই যে চারিদিকে তোমাকে দেখিতেছি—কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে, দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি, নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে; মোহ আমাকে চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব?" বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন—কতবার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িতা হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম।" এই বলিয়া সীতাও মূর্চ্ছিতাপ্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্ভ্রমে রামের ললাটস্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। তিনি আনন্দনিমীলিতালোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি, বাসন্তী, বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল!"

বাসন্তী। কিসে?

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি?

রাম। আমি স্পর্শসুখেই জানিয়াছি। দেখ দেখি, তিনি সম্মুখে কি না?

বাসন্তী। এমনতর মর্মচ্ছেদী দারুণ প্রলাপে কি ফল? আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জ্বলিতেছি, আবার এমনতর এ হতভাগিনীকে কেন জ্বালাইতেছেন?

রাম বলিলেন, "সখী, প্রলাপ কই? বিবাহকালে যে হাত আমি কঙ্কণসহিত ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃত-শীতল স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই বর্ষাকরকতুল্য শীতল ললিত-লবঙ্গকন্দলীনিভ হস্তই আমি পাইয়াছি।"

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ সীতার অদৃশ্য হস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চিরসদ্ভাব সৌম্যশীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধ হইলেন; অতি যত্নে সেই রামললাটস্থিত হস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! যখন রাম সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃতশীতল সুখস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে মনে বলিলেন, "আর্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আর্যপুত্রই আছ!" শেষে যখন রাম সীতার কর গ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল; তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি, তুমি একবার ধর।" সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন। লইয়া, স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চ-কম্পিত-কলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, "কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইঁহার প্রতি এই অনুরাগ।"

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে কই, কোথা সীতা— সীতা ত নাই। তখন রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, "আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব? আমি এখন যাই।" শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবতি তমসে! আর্যপুত্র যে চলিলেন?" তমসা বলিলেন, "চল, আমরাও যাই।" সীতা বলিলেন, "ভগবতি, ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল এই

দুর্লভ জনকে দেখিয়া লই।" কিন্তু বলিতে বলিতে এক বজ্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কানে গেল। রাম বাসন্তীর নিকট বলিতেছেন, "অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী আছে—" সহধর্ম্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আর্যপুত্র! কে সে?" এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, "সে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি!" শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, "আর্যপুত্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এতদিনে আমার পরিত্যাগলজ্জাশল্য বিমোচন করিলে!" রাম বলিতেছেন, "তাহারই দ্বারা আমরা বাষ্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।"

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, "নমো নমো-অপূর্ব্বপুণ্ণজণিদ-দদংসাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং" এই বলিয়া প্রণাম করিতে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, "আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকালজন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখা মাত্র।"

তৃতীয়াঙ্কের সারমর্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কায, বিসর্জনান্তে রাম-সীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, তথাপি উত্তরচরিত-এর এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

উত্তরচরিত-সমালোচনা ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে যে, আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

এদিকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক অভিনব নাটক রচনা

করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তদ্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাহার সহিত আলাপ করিলেন। দুহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্লিষ্ট দশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ, লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার আর অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া বাল্মীকির আশ্রম-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবর্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ করিলেন, এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণকালে এতদূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার করিলেন যে ইহা, নাটকের এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ।

লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, "লতায়াং পূর্বলূনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ!" বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মণ্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পড়িবে।

ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহর। বিদ্যাধরমিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাঁহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভবভূতির কাব্যের "মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থ-বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।" এই বিষ্কম্ভক-মধ্যে ঐরূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য।

দীর্ঘসমাস যে রচনার দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থবোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের

হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার করি, কেন না ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। এ সকল কথা স্বীকার করিয়াও আমরা বরং উত্তরচরিতের অনেক সরলাংশ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি এই (বিষ্কম্ভক মধ্যে) সমাসগুলিন ত্যাগ করিতে পারি না। এই সমাসগুলি কবিত্বপরিপূর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

(৫)

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধসম্বাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কতৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, তৎপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন।

সীতাবিসর্জন-বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহ-সমর্পণ—তন্মধ্যে যমজ-সন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পৃথিবী কর্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা, ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মূর্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভগবান্! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম ?” নটদিগকে বলিলেন, “তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।”

তখন সহসা দেবর্ষি কর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল। গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত, জলমধ্য হইতে উঠিলেন—কে ? স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, “দেখুন! দেখুন!” কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুন্ধতী কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, “উঠ, আর্যপুত্র!”

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। সেই সর্বলোক-সমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্য প্রজাগণ বুঝিল। সীতা লবকুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক এক খানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। একটি একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণনা করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এস্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্বাংশের পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে, সমুদায় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর-গৌরব অনুভব করিতে হইলে, তাহার অনন্ত-বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য-নাটক সমালোচনাও সেইরূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমত অপকৃষ্ট যে তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আনুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে বুঝি আর নাই।

সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক কাব্যে, উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেন না তদুভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য কিছুই নাই।

সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রেই প্রশংসনীয় নহে। রেনল্ড্‌স্ নামক ইংরাজি আখ্যায়িকা-লেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে গণনা করিতে হয়। কেন না সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী

এবং সৌন্দর্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য-বিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।

সৌন্দর্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই, কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় "আলেফ লয়লা" পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনামধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে,—কেবল স্বভাবসঙ্গত গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিত হয়।

অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কিন্তু এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতির মধ্যে, অনেক পাঠকের এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্ত-রঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি?[১] কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই 'ঐবান হো' অপেক্ষা এক বাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ

১ বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুশ্পিন্' খেলার একই দর।

আনন্দ—সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য। শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

অনেকে উত্তর দিবেন, "নীতিশিক্ষা"। যদি তাহা সত্য হয়, তবে, 'হিতোপদেশ' 'রঘুবংশ' হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেননা বোধ হয় 'হিতোপদেশ'-এ 'রঘুবংশ' হইতে নীতি-বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে 'কথামালা' হইতে 'শকুন্তলা' কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া 'শকুন্তলা' পড়িবে?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচনা পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।" চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাবার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

তাহাকে ধর্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না,—চুরি ঈশ্বরাজ্ঞা-বিরুদ্ধ।" চোর বলিল, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।" ধর্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে" চোর বলিল, "তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।"

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, "তুমি চুরি করিও না, কেন না চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্তব্য নহে।"

চোর বলিবে, "যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক্, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।"

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—কেন না লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্যে সে বীতরাগ হয়।

"আত্মপরায়ণতা মন্দ—তুমি আত্মপরায়ণ হইও না"—এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর কোন নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, সমাজকর্তা, বা রাজা বা রাজকর্মচারী কর্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণে বোধ হইয়া থাকিবে যে, উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকতা, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টি দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে সে কি? সৌন্দর্য; অতএব সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিতে হইবে। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানু-কারিতা এবং সৌন্দর্য দুইটি পৃথক গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্যময়, তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি, অনুলিপি মাত্র—তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ-সংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন, সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে। এইরূপ যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্যসৃষ্টিগুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি প্রধান। তৎপরেই মহাভারতকারের নাম নির্দিষ্ট হইবে। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

মহাভারতের পর, বোধ হয় শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিতে হয়। তৎপরে শকুন্তলার প্রণেতা। ভারতবর্ষের আর কোন কবিকে এ সম্বন্ধে অত্যুচ্চ-শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিনখানি নাটক পর্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিত-এ ভবভূতি অনেক দূর পর্যন্ত বাল্মীকি অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টিচাতুর্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র-সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক-নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতকদূর পাইয়াছেন।

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্র-সৃষ্টি-চাতুর্য কিছুই লক্ষিত হয় নাই। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত

মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখকাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবধিই তাঁহার প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল।

তদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান্ করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা এবং পৃথিবী এই নাটকে মানবীরূপিণী। সেই রূপগুলি যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্যের সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য ঐ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্রসৃজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজনকৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তরচরিত-এর তৃতীয়াঙ্ক। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠকের সেই ছায়ার মোহিনীশক্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয় সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

সৃষ্টিকৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটা বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলিও একালে পরিহার্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়; কিন্তু মনুষ্য-চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ—স্থায়ী ভাব কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী,—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।

মনুষ্যের কার্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। বেগের সমুচিত বর্ণন দ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে "স্থায়ী ভাব" নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজী আলঙ্কারিকেরা তাহাকে passions বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে স্নেহ উছলিতে থাকে,—শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তি-প্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙিতেছে; মর্ম ছিঁড়িতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে; চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; কখন আনন্দোত্থিতা; কখন প্রেমাভিভূতা; কখন অভিমানকুন্ঠিতা; কখন আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা; কখন অনুতাপ বিবশা; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক-নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন সীতা বলিলেন, "অম্মহে—জলভরিদমেহত্থণিদগম্ভীরমংসলো কুদোনু এসো ভারদী নিগ্ঘোসো! ভরিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উস্মাবেদি!" তখন বোধ হইল, জগৎ-সংসার সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্ভাবিনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটি মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব হইয়াছে।

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কয়খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের বিলাপ, দেস্‌দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউরিপিদিসের নাটকে আল্‌কেস্তিসের জন্য আদ্‌মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ।

সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ, বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুশীতল, সুবাসিত বারি,—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্বত, মৃদুনিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরল-স্বভাব কুরঙ্গ -সেইখানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন। কবিদের মধ্যে এই গুণটি সেক্সপীয়র ও কালিদাসে বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান। ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী! তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্বোধ্যতা দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণত যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতি মনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন্ বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকে দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিত-এর যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জনাতীত হইবে না। যদি ইহা দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্ধিত হয় বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।

(বঙ্গদর্শন, ১২৭৯)